উচ্চ-মাধ্যমিক

গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রূষা

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

[একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য]

ডঃ নারায়ণী বসু, এম. এ., ডি. ফিল.,

অধ্যাপিকা, সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগ, বিহারীলাল গৃহ-বিজ্ঞান কলেজ,
ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা, হাওড়া গার্ল'স কলেজ, বিশ্বভারতীর পরীক্ষক।
মাধ্যমিক গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (IX & X), খাদ্য ও পুষ্টি (XI & XII)
প্রভৃতি পুস্তক লেখিকা।

ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

ভূমিকা

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুসারে এই নতুন পুস্তক প্রণয়ন করা হইল। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য মেয়েদের গার্হস্থ্য জীবনের জন্য প্রস্তুত করা এবং সুগৃহিণীরূপে গড়িয়া তোলা। জ্ঞানের দিক হইতে নারীর শিক্ষা ও পুরুষের শিক্ষা একরূপ হইতে বাধা নাই কিন্তু মেয়েদের আবার ঘর সামলাইতে হয় এবং দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের তাহারাই মানুষ করেন। তাই উহার জন্য বিশেষ শিক্ষার দরকার একথা আজ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। সাধারণ পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত হইলেও এই বিষয়টি অধ্যয়ন করিয়া মেয়েরা যাহাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অনুপ্রবেশের সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রূষার পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করা হইয়াছে।

আমার অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এই পুস্তক প্রণয়নেও অধ্যাপক ডঃ মনোরঞ্জন দে'র সাহায্য পাইয়াছি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে লেখা ও ছাপার কাজ শেষ করিতে হইয়াছে। সুতরাং ভুল-ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। যাহাদের উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচনা করা হইল তাহারা উপকৃত হইলে সর্বশ্রম সার্থক হইবে।

নারায়ণী বসু

Revised Syllabus for Home Management & Home Nursing

Full Marks : 200

Paper I (Marks : 100)

Home Organisation and Community Concept

A. Study of the House : 1. The family and its housing needs. 2. Selection and planning of a residential accommodation for different socio-economic levels. 3. Interior decoration and colour schemes.

B. A Good Home Maker : 1. Planning and processing of daily duties of a home maker. 2. Household clearing including furniture and equipment. 3. Study of household pests—their prevention and control measures.

C. The Art of Good Grooming and the Home Maker : 1. Clothing—its need and purpose. 2. Choice of clothes for different occasions according to age, sex, occupation and seasonal variations. 3. Selection of fabrics with emphasis on beauty, comfort, washability, durability and ease of handling. 4. Care of clothes,

D. Knowing the Fibres for the Family : 1. Study of different kinds of textile fibres. 2. Different methods of washing and finishing materials of different fibres.

E. Physiology of Human Body and Hygiene : 1. Elementary knowledge of human body systems. 2. Hygiene : (*a*) Air—its composition, impurities and ventilation. (*b*) Water—its sources, pollution and purification.

F. Care of the Child : 1. Place of a child in a house. 2. General management of the baby. 3. Factors and process of growth and development of children.

G. **Care of the Sick at Home** : 1. Basic Principles of Home Nursing. 2. General care of the patient : (*a*) Selection and care of a sick room, (*b*) Nursing of the patient at different age levels—Child, adult and old. (*c*) Administration of food and drugs to patient.

H. **Common Infectious Diseases** : 1. Common childhood diseases. 2 Elementary knowledge of symptoms of infectious diseases. 3. Preventive measures : (*a*) Early diagnosis, (*b*) Isolation, (*c*) Notification, (*d*) Quarantine, (*e*) Disinfection (concurrent, terminal) (*f*) Immunisation, (*g*) Health education.

I. **Providing First Aid at Home** : 1. What is First Aid and where is it applied ? 2. Simple bandaging. 3. Storage of poisonous medicines at home. 4. Maintaining a First Aid Box.

Paper II (Marks : 100)

A. **Effective Management of a Home** : 1. Role of planning, co-operation, guidance and evaluation in the field of home management.

B. **An Ideal Home Maker** : 1. Her personality and behaviour pattern. 2. Management and use of different resources including material, human and financial resources.

C. **Operation of Family Finance** : 1. Family budgeting and income management 2. Maintaining household accounts. 3. Family finance : Family credit and investment of (i) Bank and fixed deposit, (ii) Post Office accounts, (iii) Savings Bank accounts, (iv) National Savings Certificates, (v) Insurance, (vi) Shares in companies.

D. **Selecting Fibres for the Family** : 1. Knowledge of fabrics. 2. Management responsibilities in clothing a family. 3. Different methods of washing and cleaning of clothing including dry cleaning and removal of stains.

E. **Home Maker as a Home Nurse** : 1. Qualification of a good nurse and her duties. 2. The sick-room - choice of the room and its arrangement. 3. Bed making with and without the patient. 4. Home management and family health : (i) Medical care for mothers and infants. (ii) Immunisation and dental care for children. (iii) Recognising symptoms of illness at home. (iv) Care of the old and infirm at home. 5. Rendering First Aid to cases of accidents, sprains and fractures, pains, cuts, bleeding, burning, foreign bodies, bites, stings, fits and fainting.

F. **Child Development and Guidance Programme** : 1. Study and care of children : (*a*) Staying healthy and attractive through the years. (*b*) Birth, infancy and maturation : The first dozen years. (*c*) Puberty and growth. (*d*) Problems of adolescents and delinquents. (*e*) Mental hygiene and principles of child guidance.

G. **Family life Education for Future Home Makers** : 1. Preparation for marital life. 2. Responsibility of parenthood. 3. Beginning of a family. 4. Interpersonal relationship in family life. 5. Concept of family planning and personal health.

সূচীপত্র

॥ প্রথম পত্র ॥

॥ দ্বিতীয় পত্র ॥

গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রূষা

Home Management & Home Nursing

● প্রথম পত্র ●

A. গৃহসংক্রান্ত আলোচনা
(Study of the House)

1. পরিবার এবং উহার গৃহের প্রয়োজনীয়তা (Family and its Housing needs)

খাদ্য এবং বস্ত্রের পরেই মানুষ গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আদিম মানুষ ছিল চরমান। প্রকৃতির পীড়নে, হিংস্র শ্বাপদের অত্যাচারে এবং শিকারের সন্ধানে তাহাকে বারবার বসতি তুলিতে হইয়াছে। চরৈব চরৈব—কোথাও স্থির হইয়া বসার উপায় নাই। অগ্নি ও পশু তাহার যাযাবর জীবনে প্রথম মাটির বন্ধন আনিয়া দিল। শিকারের অনিশ্চিত আহার্যের বদলে সে পালিত পশুর মাংস এবং দুগ্ধের উপর নির্ভর করিতে শিখিল। ধীরে ধীরে চাষবাসও আয়ত্ত হইল। অরণ্য সমতল করিয়া বসতি স্থাপিত হইল। এইভাবে গৃহনির্মাণের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছিল।

গৃহের প্রয়োজনীয়তা : প্রত্যেক মানুষই কতকগুলি ব্যক্তিগত এবং কতগুলি সামাজিক কারণ গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। গৃহ মানুষের অভাব-অভিযোগ মিটায়। তাহার আব্রু রক্ষা করে এবং এইভাবে তাহার কতকগুলি ব্যক্তিগত প্রয়োজন তৃপ্ত করে। তাছাড়া গৃহ ব্যক্তির সামাজিক প্রতিষ্ঠা বাড়ায়। তাহার বিবাহ ও পারিবারিক জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

ভার্জিনিয়া কাটলারের (Virginia Cutler)* মতে কতকগুলি মূল্যবোধ (values) ব্যক্তি তথা পারিবারিক জীবনকে সর্বদা পরিচালিত করিতেছে। উপযুক্ত বাসগৃহের মধ্য দিয়া ঐসব মূল্যবোধ তৃপ্ত হয় তাই মানুষ গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। গৃহের মাধ্যমে যেসব মূল্যবোধ (home values) তৃপ্ত হয় কাটলার উহাদের দশটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন; যথা—সৌন্দর্য (beauty), আরাম (comfort), সুবিধা (convenience), অবস্থান (location), স্বাস্থ্য (health), ব্যক্তিগত আগ্রহ (personal interests), নিরাপত্তা (safety), আব্রু রক্ষা (privacy), সৌহার্দ্যসূচক কাজকর্ম (friendship activities) এবং ব্যয় হ্রাস (economy)।

(১) **সৌন্দর্য :** মানুষের মধ্যে একটি অনন্ত সৌন্দর্যপিপাসা আছে। সে সর্বদা তাহার পরিবেশকে সুন্দর করিয়া রাখিতে চায়। মানুষের পরিবেশের মধ্যে গৃহই হইল সবচেয়ে নিকটতম বস্তু। তাই উহাকে সাজাইয়া সে তাহার সৌন্দর্যের পিপাসা মিটাইতে চেষ্টা করে।

(২) **আরাম (comfort) :** আরামলাভের জন্য মানুষ বিশেষভাবে গৃহের প্রয়োজন অনুভব করে।

(৩) **সুবিধা (convenience) :** গৃহে আমরা নানারকম সুবিধা পাইয়া থাকি। প্রত্যেকে আমরা নিজ নিজ প্রয়োজনমত খাদ্য, বস্ত্র ও বিশ্রামের সুবিধা লাভ করি।

---

* Virginia F, Cutler, (1) Personal and Family values in the choice of a Home, Cornell Univ. Bul 840, 1947. P. 6, (2) A Technique for improving Family Housing, Journal of Home Economies, Vol. 9, March 1947, Pp. 141-147.

তাছাড়া সন্তানদের মানুষ করা, রোগী ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা গৃহেই সুবিধাজনক।

(৪) **অবস্থান** (location) : গৃহের অবস্থানের উপর গৃহের সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে। ভাড়াটে বাড়ি হউক আর নিজ বাড়ি হউক গৃহনির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়—

(ক) চারিপাশের পরিবেশ কিরূপ ?
(খ) প্রতিবেশীদের সাহচর্য কাম্য কিনা ?
(গ) কর্মক্ষেত্র কতটা দূরে ?
(ঘ) স্কুল-কলেজ ও হাটবাজারের কি সুবিধা আছে ? নিজস্ব বাড়ি নির্মাণের সময় আবার জানিতে হয়—
(ঙ) বাড়ির ট্যাক্সের পরিমাণ কত ?
(চ) ভবিষ্যতে উন্নয়নের কতটা সম্ভাবনা আছে ?

(৫) **স্বাস্থ্য** (health) : ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহের প্রয়োজন। মানুষ এখানে পুষ্টিকর খাদ্য এবং উপযুক্ত বিশ্রামের সুযোগ পায়। পরিবেশও স্বাস্থ্যের অনুকূল হওয়া উচিত।

(৬) **ব্যক্তিগত আগ্রহ** (Personal interests) : প্রত্যেক মানুষেরই কিছু-না-কিছু ব্যাপারে শখ থাকে। গৃহের অনুকূল পরিবেশে এইসব শখের চর্চা করা সম্ভব হয়।

(৭) **নিরাপত্তা** (safety) : গৃহ আমাদের সকলের মনে একটা নিরাপত্তা সৃষ্টি করে। গৃহের নিশ্চিত পরিবেশে শিশুরা সবচেয়ে নিরাপদ বোধ করে এবং এখানে তাহাদের সুস্থ মানসিক বিকাশ সম্ভব হয়। রোগী এবং বৃদ্ধেরাও গৃহেই নিজেকে নিরাপদ বোধ করে।

(৮) **আব্রু রক্ষা করা** (privacy) : গৃহ সকলের আব্রু রক্ষায় সাহায্য করে।

(৯) **সৌহার্দ্যসূচক কাজকর্ম** (friendship activities) : মানুষমাত্রই অপরের সঙ্গ কামনা করে এবং অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করে। পরিবারের লোকেরা যখন একটি গৃহে একসঙ্গে বসবাস করে তখন সকলের মধ্যে একটা আবেগের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাছাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গেও সৌহার্দ্য গড়িয়া ওঠে। গৃহে এইভাবে নানা সৌহার্দ্য সূচক কাজকর্ম চলে।

(১০) **ব্যয় হ্রাস** (economy) : গৃহে বাস করিলে স্বভাবতঃই পরিবারের ব্যয় হ্রাস পায়।

পৃথিবীর সকল দেশেই আজ খাদ্য-বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানের সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। সিঙ্গাপুর, হংকং এবং জাপানে বাসস্থানের উন্নততর ব্যবস্থা করিয়া নিম্নলিখিত সুফল পাওয়া গিয়াছে :

(১) জনসাধারণের সামাজিক সন্তোষবিধান ঘটিয়াছে ;
(২) শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ;
(৩) জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে ;
(৪) সাধারণের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সকল উন্নতিশীল দেশগুলির মতই আমাদের দেশও জনসাধারণের বাসগৃহের প্রয়োজন সম্বন্ধে সজাগ এবং সাধ্যমত এই প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

2. বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা ও আর্থিক অবস্থার ব্যক্তিগণের জন্য বাসস্থান নির্বাচন ও পরিকল্পনা (Selection and planning of a residential accommodation for different socio-economic levels)

সরকারী প্রচেষ্টা ঃ জীবনযাত্রার মান অনুসারে আমরা জনসাধারণকে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকি। সরকার-প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে বাৎসরিক ঃ

(১) ৭২০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের লোকেরা নিম্নবিত্ত,

(২) ৭২০০ হইতে ১৮০০০ হাজার পর্যন্ত আয়ের লোকেরা মধ্যবিত্ত এবং

(৩) তাহার ঊর্ধ্বে যাহাদের আয় তাহারা উচ্চবিত্ত।

১৯৫৪ সাল হইতে সরকার কলিকাতার মত বড় বড় শহরগুলিতে নিম্নবিত্তদের জন্য এক কক্ষবিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। এইসব ফ্ল্যাট বাড়িগুলিতে একটিমাত্র শয়ন কক্ষ, একটি রান্নাঘর এবং একত্রে একটি স্নানাগার ও শৌচাগার আছে। স্থানের পরিমাণ ২৪০ বর্গফুট। এইরূপ ফ্ল্যাটগুলি 'গ' শ্রেণীভুক্ত ('C' category)।
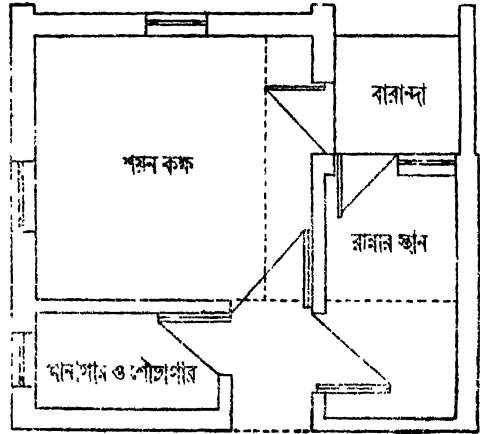
'গ' শ্রেণীর ফ্ল্যাট

১৯৫৯ সাল হইতে মধ্যবিত্তদের জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় একটু উন্নত ধরনের ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে। এই ফ্ল্যাটগুলি বিভিন্ন আয়তনের এবং বিভিন্ন মূল্যের। নিম্নে উহাদের বর্ণনা দেওয়া হইল ঃ

কক্ষের সংখ্যা	স্থানের পরিমাণ (বর্গফুট)	মূল্য (হাজারে)
২ কক্ষবিশিষ্ট	৩২৪।৪১৮।৭৪৩	২১ হইতে ৫৩র মধ্যে
২ কক্ষবিশিষ্ট	৩৩৫'৪২৪	২২।৩২
২।৩ কক্ষবিশিষ্ট	৪২৪।৬০০।৮০০	৩০ হইতে ৬৭র মধ্যে

এইসব ফ্ল্যাটগুলি 'খ' শ্রেণীভুক্ত ('B' category)। ইহাতে ১টি বা ২টি শয়নকক্ষ, একটি বহুউদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য নির্মিত কক্ষ (multipurpose room), রান্নাঘর ও খাবার জায়গা এবং স্নানাগার ও শৌচাগার থাকে।

উচ্চবিত্তদের জন্য আবার বিলাস কক্ষ (luxury apartment) নির্মাণ করা হইতেছে। এইসব ফ্ল্যাটগুলি 'ক' শ্রেণীভুক্ত ('A' category)। ইহাতে গ্যারাজ ও ভৃত্যদেরও থাকার ব্যবস্থা থাকিবে।

'ক' শ্রেণীভুক্ত ফ্ল্যাট

কক্ষের সংখ্যা	স্থানের পরিমাণ (বর্গফুট)	মূল্য
২ কক্ষবিশিষ্ট	১০৮০	১,২৫,০০০ টাকা
৩ কক্ষবিশিষ্ট	১৯৭৫	২,৩০,০০০ টাকা

বাসগৃহ নির্বাচন ঃ আমাদের দেশের শহরাঞ্চলে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা বাসগৃহ নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির কথা চিন্তা করে—

(ক) সাধারণের ব্যবহার্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (Public Utilities), যথা—

(১) বিদ্যুতের সুবিধা-আছে কিনা ;

(২) পানীয় জলের সুবিধা কিরূপ ;

(৩) নর্দমা এবং অনাময় ব্যবস্থা (sanitation) উন্নত কিনা।

(খ) সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সমূহ (services) কতটা ;

(১) পথঘাটের সুবিধা কিরূপ ;

(২) দোকান-বাজারের সুবিধা কতটা ;

(৩) শিক্ষার সুযোগ আছে কিনা [নিম্নবিত্ত লোকেরা স্কুলের শিক্ষার উপর জোর দেয়, পরন্তু মধ্যবিত্তরা কলেজীয় শিক্ষা এবং অন্যান্য বৃত্তি শিক্ষার কথাও চিন্তা করে।] ;

(৪) চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত আছে কিনা অর্থাৎ ডাক্তার, ওষুধের দোকান, হাসপাতাল কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুযোগসুবিধা আছে কিনা।

(গ) উপরোক্ত সুবিধাগুলি ছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা গৃহ নির্বাচনের সময় আবার কিছু স্বাচ্ছন্দ্যের (amenities) কথাও চিন্তা করে, যেমন—

(১) বাড়িটি কোন্ মুখী ? আমাদের এই বাংলাদেশে পূর্ব ও দক্ষিণ দুয়ারী বাড়িই সবচেয়ে ভাল ;

(২) নিকটে কোন খেলার মাঠ, খোলা জায়গা অথবা পার্ক আছে কিনা ;

(৩) সিনেমা, থিয়েটার অথবা অন্য কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদের সুবিধা আছে কিনা।

উচ্চবিত্ত পরিবারের লোকেরা গৃহের স্থান নির্বাচনের সময় যেসব বিষয় চিন্তা করেন সেগুলি এই ঃ

(১) জমির পরিমাণ যথেষ্ট কিনা এবং উহার আকৃতিটি সুন্দর কিনা ;

(২) জমিটি কোন্ দিকে মুখ করিয়া অবস্থিত ;

(৩) জমি উন্নয়নে কিরূপ খরচ পড়িবে ;

(৪) জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত আছে কিনা ;

(৫) জমিটি কি ভরাট ;

(৬) রাস্তাঘাটের দূরত্ব কতটা ; পথঘাট মোটর চলাচলের উপযোগী কিনা ;

(৭) জল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, জলবাহিত প্রণালী এবং টেলিফোনের সুবিধা পাওয়া যাইবে কিনা ;

(৮) নিকটে পেট্রোল পাম্প আছে কিনা ;
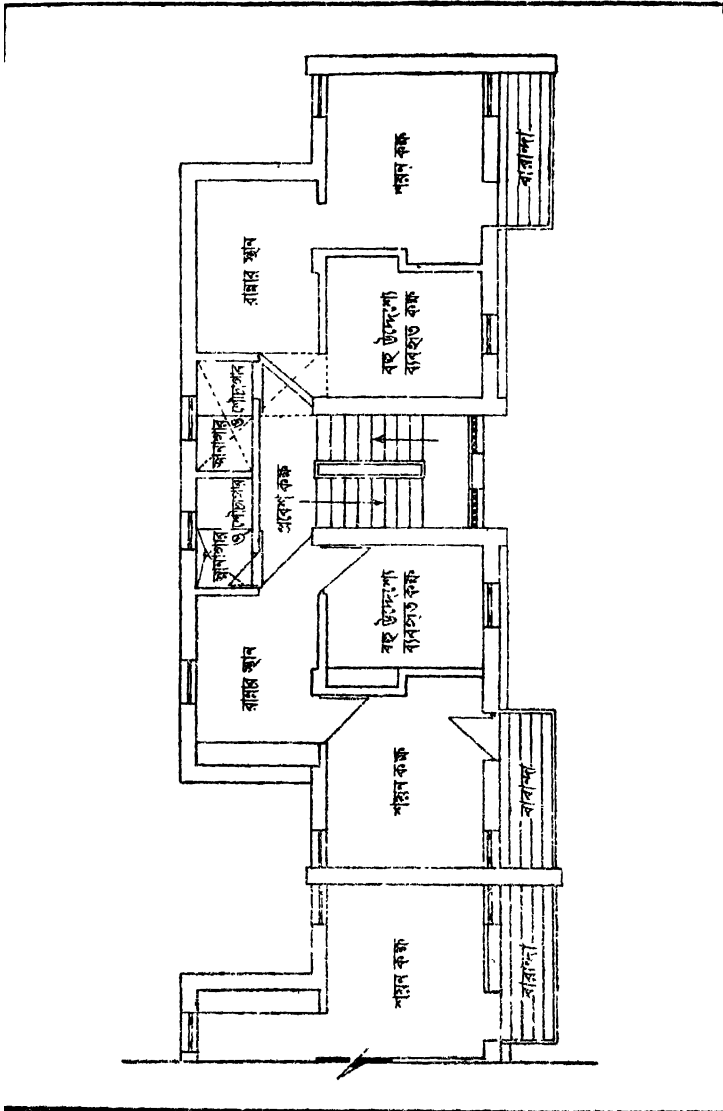
দুইটি পাশাপাশি 'খ' শ্রেণীর ফ্ল্যাট

(৯) প্রতিবেশীরা কোন্ শ্রেণীর ; তাহাদের আর্থিক ও সামাজিক মান কিরূপ ;

(১০) এতদ্ব্যতীত সকল রকম সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথাও তাহারা চিন্তা করেন।

বাসস্থান পরিকল্পনার মূল নীতি ঃ মানুষ যখন একটি বাসস্থানের নকশা (design) বা পরিকল্পনা (planning) গ্রহণ করে তখন সে তাহার কতগুলি আকাঙ্ক্ষা বা মূল্যবোধ পরিতৃপ্ত করিতে চায়। বেয়ারের (Beyer)*-মতে এই মূল্যবোধ হইল নয়টি। গুরুত্ব অনুসারে সাজাইলে উহারা হইল অর্থ বাঁচান (economy), পরিবার কেন্দ্রিকতা (family centrism), দৈহিক স্বাস্থ্য (physical health), সৌন্দর্য (aesthetics), অবসর (leisure), সাম্য (equality), স্বাধীনতা (freedom), মানসিক স্বাস্থ্য (mental health) এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা (social establishment)। অর্থ বাঁচাইবার জন্য জমির দাম এবং নির্মাণ খরচের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রত্যেক পরিবারই আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে গৃহ নির্বাচন করিবেন।

নিম্নবিত্তদের আর্থিক আয় এতই সীমাবদ্ধ যে গৃহের নকশা রচনার সময় তাহারা কেবল কোন মতে দিন যাপনের জন্য একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি মাত্র কক্ষ থাকে এবং উহাকে নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। সঙ্গে রান্নার একটু জায়গা এবং স্নানাগার ও শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকে।

মধ্যবিত্তরা পরিবারকেন্দ্রিক গৃহপরিকল্পনার চেষ্টা করেন। গৃহের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র শয়ন কক্ষের ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না বটে তবে সকলেই যাহাতে আরামে বসিয়া নিজ নিজ কাজ করিতে পারে এবং একত্রে গল্পগুজব করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। সাধারণতঃ এইরূপ গৃহে অন্ততঃ একটি বা দুইটি শয়ন কক্ষ, একটি বসার ঘর, রান্না ও খাবার জায়গা, স্নানাগার ও শৌচাগার থাকে।

পরন্তু বিত্তবানরা গৃহপরিকল্পনার সময় পরিবারের প্রয়োজন এবং আরামের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। তাছাড়া বেয়ারের (Beyer) নয়টি মূল্যবোধও তাঁহাদের পরিকল্পনায় কমবেশী প্রাধান্য পায়। প্রথমেই তাহারা সমস্ত গৃহকর্মের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তালিকায় যেসব কাজ স্থান পায় তাহা এই ঃ

(১) আমোদ-প্রমোদজনিত কাজ ;

(২) গৃহকর্ম, যেমন—রান্না করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ধোওয়া ও ইস্ত্রি করা, সেলাই করা ইত্যাদি কাজ ;

(৩) ব্যক্তিগত কাজ, বিশ্রাম ও নিদ্রা ;

(৪) উপাসনা ;

(৫) জিনিসপত্র মজুত করা।

উপরোক্ত সমস্ত কাজের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ বা স্থান থাকে।

* Glenn H. Beyer, Housing · A Factual Analysis. New York : The Macmillan Company, 1958, Pp 174-177.

বিভিন্ন কক্ষের আয়তন :

বৈঠকখানার আয়তন—	১২ × ১৬ ১৪′ × ২১′ ১৪′ × ২৪′
শয়নকক্ষের আয়তন—	১০′ × ১২′ ১২′ × ১৪′
খাবার ঘরের আয়তন—	১২′ × ১২′
বসার ঘরে খাবার জায়গার আয়তন—	৮′ × ১২′
রান্নাঘরের আয়তন—	৮′/৯′ × ১২′
ভাঁড়ার ঘরের আয়তন—	১০ × ১২′
একাধিক স্নানাগার ও— শৌচাগার	৫′ × ৭′ ৭′ × ৮′
ভৃত্যদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ	

গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের গৃহের স্থান নির্বাচন : গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণতঃ স্কুল, হাসপাতাল, পুলিশ ফাঁড়ি, রাস্তাঘাট, বাস চলাচল, খেলার মাঠ, খোলা জায়গা এবং কমিউনিটি সেণ্টারের সুবিধা দেখিয়া বাসস্থান নির্বাচন করেন।

তাহাদের গৃহপরিকল্পনায় বসার ঘর, শয়ন কক্ষ, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ইত্যাদি ব্যতীত বারান্দা, খানিকটা খোলা জায়গা, গোশালা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা থাকে।

সরকারী সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে যেসব গৃহ মজবুত, স্বাস্থ্যপ্রদ, আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে তৈরী করা সম্ভব, নিরাপদ ও বাড়ির লোকেদের আব্রু রক্ষা করে, ধর্ম বিশ্বাসে বাধা দেয় না সেই সব বাসস্থানই গ্রামবাসীদের নিকট গ্রহণযোগ্য।

4. গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা ও বর্ণ-পরিকল্পনা
(Interior decoration and colour schemes)

শিল্প-সৃষ্টি মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ হাতের কাছে যাহা পায় তাহাকেই সুন্দর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। কুম্ভকার মাটির গায়ে কয়েকটি আঁচড় কাটিয়া সুন্দর ঘট-পট তৈয়ারী করে, চিত্রকর কাগজের গায়ে রেখা টানিয়া দৃষ্টিমধুর চিত্রাঙ্কন করে, ছুতোর কাঠ কাটিয়া চমৎকার আসবাব তৈয়ারী করে, স্থপতি পাথর খুদিয়া মূর্তি গড়ে; মানুষের স্বভাবই হইল অতি সাধারণ জিনিসকে সুন্দর করিয়া তোলা। যে গৃহে আমরা বাস করি আমাদের পরিবেশের মধ্যে সেই গৃহই হইল সবচেয়ে পরিচিত এবং নিকটতম বস্তু। একটুখানি প্রসাধনের সাহায্যে উহাকে সুন্দর করিয়া তুলিতে পারিলে সমস্ত জীবনযাত্রা মনোরম হইয়া ওঠে।

গৃহসজ্জা কারুশিল্পের (fine arts) অন্তর্গত নয়। চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত কিংবা সাহিত্য রচনা, স্থাপত্য বিদ্যা ইত্যাদি সকলই কারুশিল্পের অন্তর্গত কেননা এই সব ক্ষেত্রে শিল্প শিল্পীর অন্তরের অনুপম সৃষ্টি। পরন্তু গৃহসজ্জা আলঙ্কারিক শিল্প (decorative art) বলিয়া গণ্য। কারুশিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পবস্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ উহা আপনাতে আপনি পূর্ণ। দর্শকের লক্ষ্যস্থল ঐ শিল্পদ্রব্যটি। আলঙ্কারিক শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক্। শিল্পী এখানে নতুন জিনিস সৃষ্টি করেন না,

অপরের সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য উহাতে কতকগুলি আলঙ্কারিক বস্তু সংযোগ করেন মাত্র। এই বস্তুগুলি সুন্দর বটে তবে উহাদের উদ্দেশ্য অন্য বস্তুর সৌন্দর্য বাড়ান। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে একজন চিত্রকর অনেক চিত্র আঁকিতে পারেন এবং প্রত্যেকটি চিত্রই হয়ত শিল্প হিসাবে অতুলনীয় কিন্তু তাই বলিয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ঐরূপ অনেক চিত্র রাখিলে স্বভাবতঃই কক্ষের সৌন্দর্য ব্যাহত হইবে। শুধু চিত্র সন্নিবেশের ক্ষেত্রে নয়, আসবাবপত্রের নির্বাচন, পুষ্পবিন্যাস, পর্দার রং নির্বাচন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই গৃহ-প্রসাধনকারীর নিকটে গৃহই হইবে মুখ্য বস্তু এবং গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় অলঙ্কার সংযোগ করা হইবে উহারা সর্বদাই গৌণ ভূমিকা অবলম্বন করিবে।

আলংকারিক শিল্পের মূল নীতি : কারুশিল্পের সঙ্গে প্রত্যেক আলঙ্কারিক শিল্পের একটি ব্যাপারে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের মূল নীতিগুলিই এক। কারুশিল্পের মতই অলঙ্কার শিল্পের মূল নীতি হইল পাঁচটি—সঙ্গতি (proportion), সামঞ্জস্য (balance), সমন্বয় (harmony), ছন্দ (rhythm) ও গুরুত্ব (emphasis)। এই পাঁচটির সমাবেশ না ঘটিলে প্রত্যেক শিল্পসজ্জাই ব্যর্থ হইয়া যায়।

(১) **সঙ্গতি (Proportion) :** দুইটি জিনিসের পারস্পরিক সম্বন্ধের মিত্রতা বা মিলনের নামই সঙ্গতি। এই মিত্রতা পূর্ণের সঙ্গে অংশের কিংবা অংশের সঙ্গে অংশের মধ্যেও সংঘটিত হইতে পারে। গৃহ-প্রসাধনে এই সঙ্গতি বা মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলা উচিত।

(২) **সামঞ্জস্য (Balance) :** কারুশিল্পের ক্ষেত্রেই হউক কিংবা আলঙ্কারিক শিল্পের ক্ষেত্রেই হউক শিল্পবস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব থাকিলে সমস্ত জিনিসটির সৌন্দর্য যথাযথ ফুটিয়া ওঠে না। গৃহ-প্রসাধনের সময় যখন আসবাব বা অন্যান্য বস্তু সমাবেশের বাহুল্যে সমস্ত মনটা একদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তখন তাহার বিপরীত অংশে কিছু রাখিয়া কক্ষের ভারসাম্য রক্ষা করিতে হয়। এই ভারসাম্য বা সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সর্বদা যে দুই দিকে একই মূল্যের বা একই ওজনের বস্তু সমাবেশ করিতে হইবে এইরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। দুই দিকে দ্রষ্টার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একদিকে ভারী বস্তু এবং বিপরীত দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু সমাবেশ করিয়াও এই সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়। সামঞ্জস্য রক্ষার দুই জাতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—

(ক) চাক্ষুষ বা প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য (formal balance)

(খ) অপ্রত্যক্ষ বা অন্তরের সামঞ্জস্য (informal balance)

চাক্ষুষ সামঞ্জস্য (Formal balance) : কেন্দ্র স্থির রাখিয়া দুই দিকেই যদি সমান গুরুত্বের জিনিস রাখা যায় তবে তাহাকেই বলে চাক্ষুষ সামঞ্জস্য। যেমন একটি টেবিলের উপর কেন্দ্র ঠিক করিয়া সমান দূরত্ব বজায় রাখিয়া যদি একই নকশার সমান মাপের সমান ওজনের দুইটি ফুলদানী সাজান হয় তবে উহাদের আমরা চাক্ষুষ সামঞ্জস্য বলিব। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুই দিককার বস্তুর গুরুত্ব সমান দেওয়া হইয়াছে।

অপ্রত্যক্ষ বা অন্তরের সামঞ্জস্য (Informal balance) : গৃহ প্রসাধনের বেলায় যখন সমান গুরুত্বের জিনিস দিয়া ঘর না সাজাইয়া একদিককার প্রসাধনে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় যাহাতে সাধারণের দৃষ্টি ঐ দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং অন্যদিকে সাদামাটা কিছু

রাখিয়া কক্ষের ভারসাম্য বজায় রাখা হয় তখন তাহাকে বলে অপ্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য। গৃহ-প্রসাধনে যদিও প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য রক্ষার রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে তবু এই প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্যের নীতি যদি সমস্ত বাড়িটিতে মানিয়া চলা হয় তবে তাহা নিতান্তই ছাঁচে ঢালা সাজ বলিয়া প্রতিভাত হয়। ছাঁচে ঢালা একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন সজ্জা একঘেয়ে খাদ্যের মতই বিরক্তিকর।

(৩) **সমন্বয় (Harmony)**: সমন্বয় শিল্পতত্ত্বের অন্যতম মূলনীতি। গৃহে শুধুমাত্র কতকগুলি দামি দামি জিনিস জড় করিলেই গৃহ-প্রসাধনের পক্ষে যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে ভাবা ভুল। আলঙ্কারিক শিল্পের আসল কৃতিত্ব যাবতীয় সামগ্রীর একত্র সন্নিবেশে এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় বা ঐক্য সাধনে।

(৪) **ছন্দ (Rhythm)**: গৃহসজ্জার আর একটি লক্ষ্য হইল ছন্দ রক্ষা। এই ছন্দগতি বা ছন্দলীলা ঠিক কি জিনিস তাহা কথায় প্রকাশ করা বড় কঠিন। সঙ্গীত ও নৃত্যের ছন্দ আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে, নানা তাল এবং বিরামের মধ্য দিয়া ছন্দ আপনাকে প্রকাশ করে। ছন্দের এই উচ্চ-নীচ গতি, এই নতুনত্বই ছন্দের প্রধান আকর্ষণ। গতি (movement) এবং পুনরাবৃত্তি (repetition) হইল ছন্দের প্রাণ।

চলিতে চলিতে ছন্দের গতি স্থির হইয়া যায়। ইহার নাম যতি। যতির শেষে আবার গতির পুনরাবৃত্তি ঘটে; অর্থাৎ গতির শেষে কিছুক্ষণ বিরাম, আবার গতি। গতি এবং যতি উভয়ে মিলিয়া ছন্দ। এই ছন্দ কারুশিল্পে এবং প্রত্যেক আলঙ্কারিক শিল্পেই অনুভূত হয়। গৃহ-প্রসাধনের বেলাতেও উহার চিত্রসন্নিবেশে, আসবাবপত্র সংস্থানে এই ছন্দ মানিয়া চলা দরকার। সমস্ত কক্ষে যতগুলি বস্তু সাজান হইবে একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং উহাদের মধ্যে পরিমিত ব্যবধান রাখিয়া চল। এই যতির নিয়ম মানিয়া চলিলে গৃহের কোন এক স্থানে দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিবে না। সমস্ত কক্ষটি যেন একটি ছন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইবে এবং কক্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চোখ নাচিয়া বেড়াইবে। প্রত্যেক বার যতির পরেই একটি নতুন কিছু দেখার জন্য মন প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাঝখানের এই যতি বা বিরাম না থাকিলে এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর পার্থক্য অনুভব করা যায় না এবং সৌন্দর্যবোধ পীড়িত হয়। যতি আছে বলিয়াই বিভিন্ন বস্তুর সৌন্দর্য বিশেষভাবে উপভোগ করা যায়।

(৫) **গুরুত্ব (Emphasis)**: গৃহ-প্রসাধনের অন্যতম মূলনীতি হইল গুরুত্ব। প্রতি কক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রাখা প্রয়োজন, যেমন বসার ঘরে একটি কার্পেট কিংবা ডিভান, শয়নকক্ষে একটি সুদৃশ্য আসবাব বা একটি তৈলচিত্র, খাবার ঘরের টেবিলে একগুচ্ছ ফুল সাজাইয়া রাখিলে গৃহে প্রবেশ করিবার পরে দৃষ্টি গিয়া ঐখানে নিবদ্ধ হয় এবং মন কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকে। এইভাবে প্রতি কক্ষেই কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বস্তু সংযোগ করিলে গৃহে একটি সুন্দর গম্ভীর আবহাওয়া সৃষ্টি হয় এবং গৃহ প্রসাধন সার্থক হইয়া ওঠে।

অলঙ্কার শিল্পের মূল নীতিগুলি আলোচিত হইল। এইবার গৃহপ্রসাধনের কয়েকটি বিশেষ নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

উপরোক্ত নীতিগুলি কারুশিল্প এবং আলঙ্কারিক শিল্পের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য। ইহাদের স্মরণ রাখিয়া সব রকমের অলঙ্কার শিল্পের কাজে হাত দিতে হয়। তবে গৃহ-প্রসাধনের আবার নিজস্ব কতকগুলি নিয়ম রহিয়াছে। সেগুলি হইল বর্জন (elimination), পুনর্বিন্যাস (rearrangement) ও গোপন (concealment)।

বর্জন : গৃহ প্রসাধনের প্রথম সূত্র হইল বর্জন। প্রত্যেক বাড়িতেই কিছু-না-কিছু প্রাচীন ঐতিহ্যমূলক জিনিস থাকে যাহার সঙ্গে বাড়ির লোকেদের একটা আবেগ জড়িত থাকে। ঘর সাজাইবার সময় তাহারা সচরাচর এইসব জিনিসগুলি বাদ দিতে চান না। কিন্তু উহারা যদি কক্ষের সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়ক না হয় তবে নির্মম হস্তে এইসব জিনিসকে বর্জন করিতে হয়।

পুনর্বিন্যাস : বরাবর একভাবে জিনিসপত্র সাজাইয়া রাখিলে প্রসাধন একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়। তাই মাঝে মাঝে বাড়ির জিনিসপত্র অদলবদল করিয়া সাজাইলে চোখের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হইয়া ওঠে।

গোপন : গৃহপ্রসাধনের তৃতীয় এবং শেষ নীতিটি হইল গোপন। গৃহের কোন গঠনগত ত্রুটি কিংবা দৈন্য গোপন করা প্রসাধনকারীর অন্যতম দায়িত্ব। যেমন, ঘরে ভাঙাচোরা দেওয়াল থাকিলে ওয়ালপেপার দিয়া ঢাকিয়া দিয়া, পুরাতন কিংবা বাড়তি জিনিসগুলি পর্দা দিয়া আড়াল করিয়া গৃহে অনাড়ম্বর সৌন্দর্য ফুটান যায়। বস্তুতঃ কি বর্জন করিব, কি গোপন করিব এবং হাতের কাছে যে সব প্রসাধনসামগ্রী রহিল উহাদের কিভাবে পুনর্বিন্যাস করিব তাহারই উপর নির্ভর করে গৃহপ্রসাধনের সাফল্য।

বর্ণ-পরিকল্পনা (Colour Scheme) **:** গৃহ-প্রসাধনেও বর্ণ বা রঙ্ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মানুষ যে কোন প্রসাধনের মূল্য নির্ণয়ের পূর্বে বর্ণের শক্তি অনুভব করে। শিশুরা অল্প বয়সেই বর্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। মানুষের উপর বর্ণের প্রভাব খুব বেশী। গানে সুর সংযোগ করিলে যেমন নতুন মূল্য পাইয়া উহা উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, গৃহ-প্রসাধনে তেমনি উপযুক্ত বর্ণবিন্যাস করিতে পারিলে উহা আমাদের মনকে আকর্ষণ করে, চিত্তকে প্রফুল্ল করিয়া তোলে। কক্ষের মেঝে, দেওয়াল হইতে শুরু করিয়া আসবাবপত্র, পর্দা, বাতি প্রভৃতির রঙ্ নির্বাচনে মুন্সিয়ানার দরকার।

বিজ্ঞানীদের মতে সূর্যরশ্মির মধ্যে সাতটি বর্ণ লুকানো রহিয়াছে (vibgyor)। এই সাতটি বর্ণ হইল—বেগুনী (Violet), তুঁতে (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হরিদ্রা (Yellow), কমলা, (Orange) ও লাল (Red)। চিত্রশিল্পীরা এই সাতটি বর্ণকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে—(১) মূল বা শুদ্ধ বর্ণ, (২) গৌণ বা মিশ্র বর্ণ এবং (৩) প্রান্তিক বর্ণ।

(১) **মূল বা শুদ্ধ বর্ণ** (Primary colour) **:** লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটি মূল বা শুদ্ধ বর্ণ নামে পরিচিত, কারণ ইহারা অপর কোন বর্ণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয় না।

(২) **গৌণ বা মিশ্র বর্ণ** (Secondary colour) **:** শুদ্ধ বর্ণগুলির পরস্পরের সংমিশ্রণে আবার তিনটি গৌণ বা মিশ্র বর্ণ উৎপন্ন হয়। যেমন,

(ক) কমলা (হলুদ ও লালের মিশ্রণে উৎপন্ন)।

(খ) বেগুনী (লাল ও নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন)।

শুদ্ধ বর্ণ

সবুজ

কমলা

বেগুনী
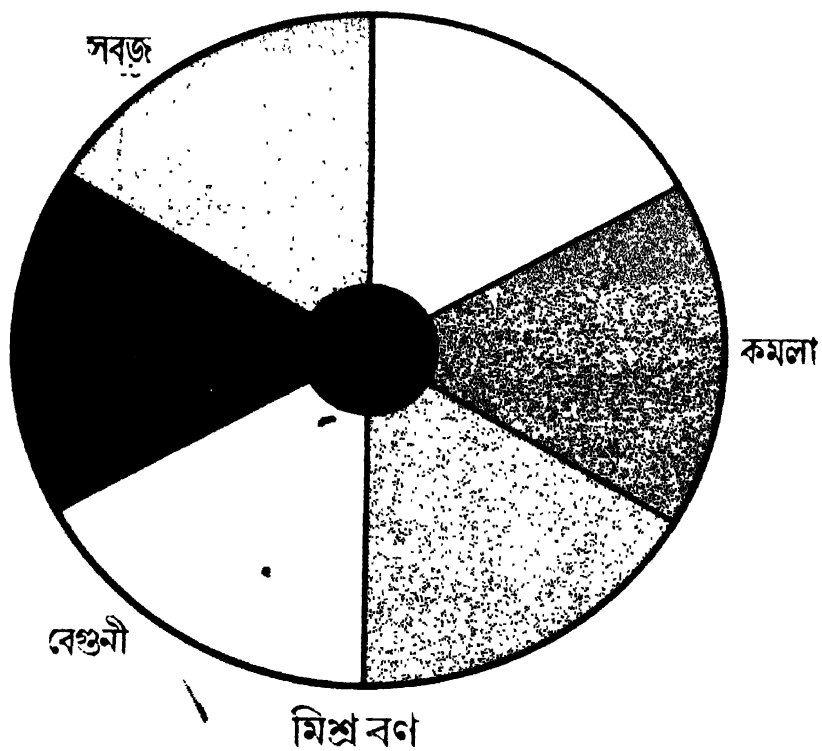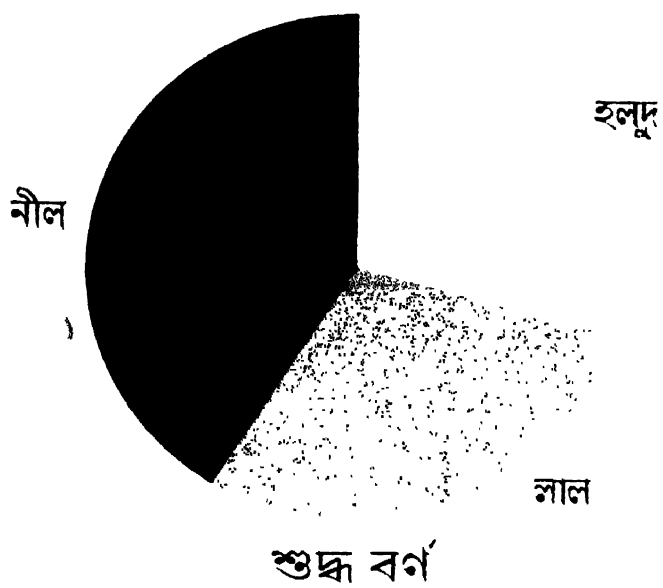
মিশ্র বর্ণ

(গ) সবুজ (নীল ও হলুদের মিশ্রণে উৎপন্ন)।

(৩) **প্রান্তিক বর্ণ** (Tertiary colour) : উপরোক্ত তিনটি শুদ্ধ বর্ণ এবং তিনটি মিশ্র বর্ণের সংমিশ্রণে আবার ছয়টি প্রান্তিক বর্ণ উৎপন্ন হয়। যেমন,

এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সূর্যরশ্মির সাতটি বর্ণের মধ্যে তিনটি শুদ্ধ বর্ণ, তিনটি মিশ্র বর্ণ এবং তুঁতে রঙটি প্রান্তিক বর্ণের অন্তর্গত।

শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ : সাতটি বর্ণের একত্র সংযোগে শ্বেত বর্ণ উৎপন্ন হয় এবং সমস্ত বর্ণের অভাবে কৃষ্ণবর্ণ উৎপন্ন হয়।

উষ্ণ বা উজ্জ্বল বর্ণ (Warm colour) : শুদ্ধ বর্ণগুলির মধ্যে লাল ও হলুদ এবং উহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন সমস্ত বর্ণগুলি উষ্ণ অর্থাৎ উজ্জ্বল বর্ণ নামে পরিচিত। পরন্তু নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণগুলি শীতল বা স্নিগ্ধ বর্ণ (cool colour) নামে পরিচিত। শুদ্ধ নীল এবং নীলাভ-সবুজ (নীল ও সামান্য হলুদের মিশ্রণে উৎপন্ন) বর্ণ দুইটি সবচেয়ে স্নিগ্ধ। কিন্তু নীলের সঙ্গেই যদি আবার হলুদের পরিমাণ বেশী দিয়া হরিদ্রাভ-সবুজ বর্ণ প্রস্তুত করা হয় তবে উহা উজ্জ্বল বর্ণে পর্যবসিত হইবে। সাধারণতঃ উজ্জ্বল বর্ণ আমাদের চোখ ঝলসাইয়া চক্ষুকে পীড়িত করিয়া তোলে এবং স্নিগ্ধ বর্ণ আমাদের চক্ষু জুড়ায়, অন্তর তৃপ্ত করে।

বিজ্ঞানীদের মতে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন বর্ণকে আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা থাকে। বস্তু যে বর্ণটি আত্মসাৎ করিতে পারে না সেই বর্ণই বস্তুর দেহে প্রতিফলিত হয়। গাঁদাফুল সমস্ত বর্ণ পরিপাক করিয়া ফেলে কেবল হরিদ্রা বর্ণটি পরিপাক করিবার ক্ষমতা উহার নাই। তাই গাঁদাফুল আমাদের চোখে হলুদ দেখায়। যে বস্তু কোন বর্ণই আত্মসাৎ করিতে পারে না উহাকে সাদা দেখায় এবং যে বস্তু সব বর্ণ আত্মসাৎ করিয়া বসে উহাকে আমরা কালো দেখি। শুদ্ধ, মিশ্র এবং প্রান্তিক বর্ণের নানা অনুপাতের মিশ্রণে আমরা শতশত বর্ণ দেখি।

মিত্র ও বিবাদী বর্ণ : বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে নানা জাতীয় সম্বন্ধ আছে। কতকগুলি বর্ণের মধ্যে মিত্রতার (harmony) সম্পর্ক এবং কতকগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্যের (contrast) সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সম্পর্ক অনেকটা সঙ্গীত শাস্ত্রের বাদী-বিবাদী সুরের মত। মিত্রভাবাপন্ন বর্ণগুলি পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে, আর বিপরীত বর্ণগুলি একে অপরকে বিদ্বেষ করে, একের প্রভাবের বিরুদ্ধে অপরে বিরুদ্ধাচারণ করে।

বিবাদী বর্ণগুলি পরস্পরের বিরোধিতা করিলেও বিবাদী বর্ণের সমন্বয়ে ও সম্মিলনে পরস্পরের বিবাদ তিরোহিত হইয়া যায় এবং তাহারা একে অপরের পরিপূরক বলিয়া গণ্য হয়।

বর্ণচক্রে মাত্র বারোটি পরিপূরক বর্ণ দেখানো হইল। বিচক্ষণ শিল্পীরা বর্ণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া আপনার রুচিমত গৃহ প্রসাধন করিবেন। গৃহপ্রসাধনে রঙের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

মনের উপর বর্ণের প্রতিক্রিয়া ঃ মনের সঙ্গে বর্ণের একটি নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে। এক‌েকটি বর্ণ আমাদের মনে এক‌েকটি ভাব জাগায়। নীচে কয়েকটি বিশেষ বর্ণের প্রতিক্রিয়ার কথা বলিতেছি।

সাদা রঙ ঃ পবিত্রভাবের প্রতীক। মনে নির্মল ও শুচিভাব আনে। সরস্বতী শ্বেতবরণা ও শ্বেতবসনা—কারণ তিনি অজ্ঞান দূর করিয়া আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের আলো জ্বালান।

লাল রঙ ঃ রক্ত ও আগুনের বর্ণ। উভয়ই আমাদের জীবনস্বরূপ। লাল রঙ মনে শক্তি সঞ্চার করে ও কর্মে উদ্দীপনা জাগায়। তবে টকটকে লাল রঙটি খুব উজ্জ্বল বলিয়া গৃহসজ্জায় উহার বহুল ব্যবহার চলে না।

হলুদ রঙ ঃ অনেক বাড়ির দরজা-জানালা এবং দেওয়ালের বাহিরের দিকে এই রঙটি দেখা যায়। সূর্যরশ্মির সোনালী রঙটি হলুদেরই একটি মিশ্র বর্ণ। যে কক্ষে সূর্যালোক প্রবেশ করে না সেখানে হলুদ রঙের ফুল কিংবা পর্দা দিয়া সূর্যালোকের ছটা আনা যায়।

নীল রঙ ঃ আকাশ ও সমুদ্রের রঙ। মনকে সতেজ, স্নিগ্ধ ও নির্মল রাখিতে সাহায্য করে। অনেকেই শয়ন কক্ষের পর্দা ও বাতিতে নীল রঙটি পছন্দ করেন।

কমলা রঙ ঃ নীল ও লালের মিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণ। মনে আশা, উৎসাহ ও সৌহার্দের ভাব জাগায়। বসন্ত ঋতুর উপযোগী এই রঙটি।

বেগুনী রঙ ঃ লাল ও নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন। বেগুনী রঙ মনের উপর একটি স্নিগ্ধ প্রতিক্রিয়া করে। গৃহসজ্জায় উহার সীমিত ব্যবহার চলে।

সবুজ রঙ ঃ হলুদ ও নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন। মনকে সরস, সতেজ ও নবীন রাখে। অতিশয় স্নিগ্ধ বর্ণ তবে সবুজের মধ্যে হলুদের ভাগ বেশী হইলে সবুজ রঙ উগ্র হইয়া পড়ে।

আলপনা

বাংলার পল্লীজীবনে একদিন যখন প্রাচুর্য ছিল তখন ব্রত এবং পূজা-অর্চনা লইয়া মেয়েদের দিনগুলি কাটিত। আলপনা প্রথমে ব্রতেরই একটি অঙ্গস্বরূপ ছিল এবং লক্ষ্মীব্রত, মাঘমণ্ডলের ব্রত, তারাব্রত ইত্যাদি সকল ব্রতেই আলপনা দিবার প্রচলন ছিল। আজকাল উৎসবে-অনুষ্ঠানেও আলপনা দিতে দেখা যায় এবং ইহা ক্রমশঃ গৃহসজ্জার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতেছে। আলপনা শিল্পটি এক সময়ে লোপ পাইতে বসিয়াছিল। তারপর শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নন্দলাল বসুর চেষ্টায় উহা পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে।

আলপনা কাহাকে বলে ? সংস্কৃত 'আলিম্পন' শব্দ হইতে আলপনা কথাটির উৎপত্তি। মূল ধাতু 'লিপ' কথার অর্থ 'চিত্রণ' (to paint) নয়, উহার অর্থ 'লেপন' (to plaster)।

আলপনার উপকরণ বড় সামান্য। খানিকটা ভিজা আতপ চাউলের পিটুলি হইল আলপনার প্রধান উপকরণ। পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড আঙ্গুলে জড়াইয়া লইয়া পিটুলির সাহায্যে মেয়েরা মাটিতে কিংবা দেওয়ালে যে ছবি আঁকে তাহারই নাম আলপনা।

আলপনার উপকরণ ঃ চাউলের পিটুলিই হইল আলপনার প্রধান উপকরণ এবং মেয়েদের আঙ্গুলে জড়ান বস্ত্রখণ্ডটি তুলির কাজ করে। চালের পরিবর্তে চকের গুঁড়া কিংবা জিংক অক্সাইডের সঙ্গে গদ মিশাইয়া লইয়া চমৎকার আলপনা দেওয়া যায় এবং ঐ আলপনা পিটুলির আলপনার তুলনায় স্থায়ী এবং উজ্জ্বল হয়।

আলপনায় রঙের ব্যবহার ঃ অনেকে আলপনায় বিভিন্ন রঙ্ ব্যবহার করেন। কালো রঙের জন্য কাঠ কয়লার গুঁড়ো, লাল রঙের জন্য লাল আবির, সবুজ রঙের জন্য পাতার রস—সাধারণতঃ শিম পাতার রস এবং বাদামী রঙের জন্য ইটের গুঁড়ো ব্যবহার করা চলিতে পারে।

বিভিন্ন দেশের আলপনা ঃ আলপনা বাংলাদেশের কোন নিজস্ব শিল্প নয়। বাংলা দেশেই এই শিল্পটির উৎপত্তি হইয়াছিল তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। বস্তুতঃ ভারতের সর্বত্রই আলপনার প্রচলন আছে এবং বাংলা দেশ হইতে শুরু করিয়া

উড়িষ্যা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, কেরল ইত্যাদি সমুদ্র-তীরবর্তী দেশগুলিতেই এই শিল্পটি বিশেষ ভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

বাংলাদেশ ঃ সাধারণতঃ ব্রত, বিবাহাদি মঙ্গলকর্ম ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানে আলপনা দেওয়া হইয়া থাকে। বাংলাদেশে তরল ও শুষ্ক উভয় প্রকার আলপনা দিবার রীতি আছে। পিটুলি গোলা দিয়া সচরাচর তরল আলপনা দেওয়া হয়। তাছাড়া শুকনো গুঁড়ো, যেমন কাঠকয়লার গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, চাল ও খড়ির গুঁড়ো, আবির ইত্যাদি দিয়া শুষ্ক আলপনা দেওয়া হইয়া থাকে। তাছাড়া ফল কাটিয়া রেকাবিতে ফলের আলপনা ও বিভিন্ন ফুলের আলপনা বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

উড়িষ্যা ঃ উড়িষ্যা অঞ্চলে ধূলি ও কাদামাটির সাহায্যে আলপনা দিবার প্রচলন ছিল। উড়িষ্যার এই আলপনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃৎশিল্প ও স্থাপত্য শিল্পের অন্তর্গত। উড়িষ্যার মন্দিরগুলিতে ঐ রাজ্যের আলপনার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

গুজরাট ঃ গুজরাট অঞ্চলে অতিথির সম্মানার্থে ভোজনের স্থানে আলপনা দেওয়া হয়। সেখানে ইহাকে রঙ্গোলি বা রঙ্গরেখাবলি বলা হয়।

দক্ষিণ ভারত ঃ দক্ষিণ ভারতে পিটুলি ব্যতীত অন্যান্য কতকগুলে শুকনো উপাদান যেমন, চাল, ডাল, বিভিন্ন মশলা ও শস্য আলপনায় ব্যবহার করা হয়। প্রথমে
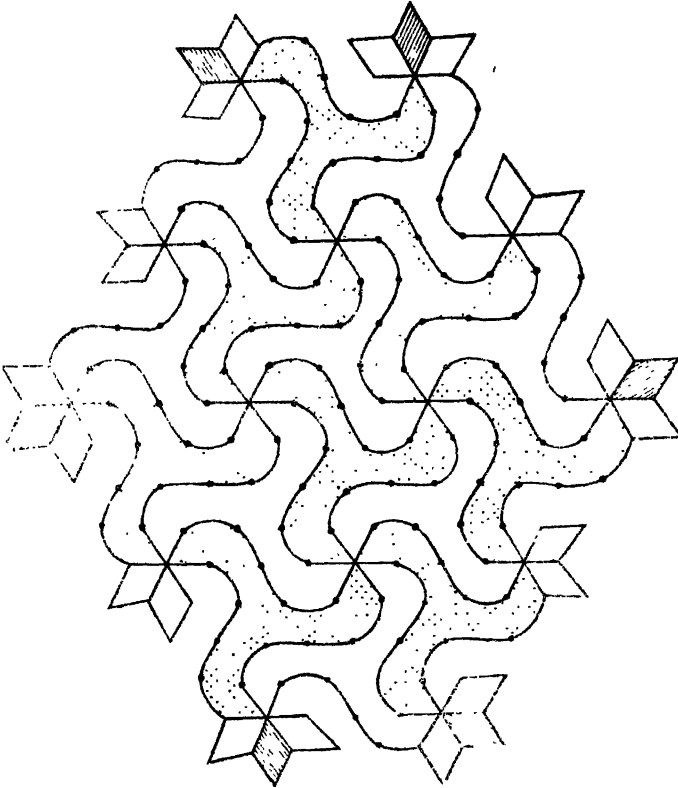
দক্ষিণ ভারতের আলপনা (ক)

লোহার পাত কিংবা ডাইস কাটিয়া বিভিন্ন নক্শা তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়। আলপনার স্থানে ঐ ডাইস বসাইয়া রং মিলাইয়া বিভিন্ন রং অথবা শস্য ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তারপর ঐ ডাইসটি তুলিয়া নিলে সুন্দর আলপনা অঙ্কিত হয়। দক্ষিণ ভারতে আলপনা দৈনন্দিন গৃহসজ্জার একটি প্রধান উপাদান। প্রতিদিন প্রভাতে গোবরমাটি দিয়া আঙিনা নিকাইয়া পিটুলি গোলা জল দিয়া দক্ষিণী মেয়েরা সাধারণতঃ
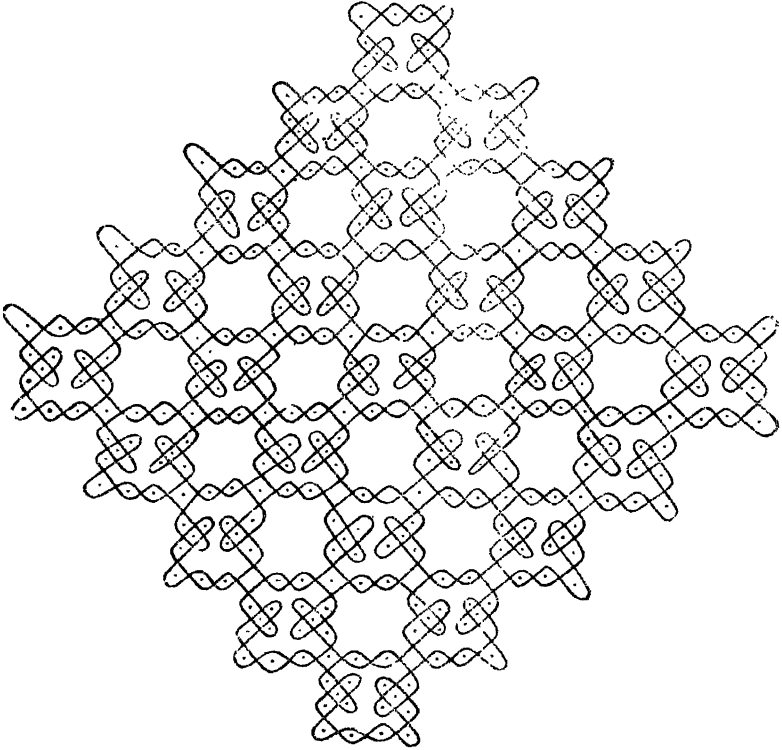
দক্ষিণ ভারতের আলপনা (খ)

জ্যামিতিক নক্শার আলপনা আঁকে। আমাদের বাংলাদেশের মেয়েদের সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালার মতই আলপনা আঁকা দক্ষিণী মেয়েদের নিত্যকর্মের অন্তর্গত।

আলপনার বিভিন্ন স্তর ঃ আলপনার দুইটি স্তর রহিয়াছে—(১) একটি ব্রতের অঙ্গ হিসাবে, (২) আরেকটি মণ্ডন শিল্পরূপে।

(১) **ব্রতের অঙ্গ হিসাবে আলপনা ঃ** ব্রতের সঙ্গে আলপনার একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কিছু কামনা করিয়া সমাজে যে অনুষ্ঠান চলে তাহারই নাম ব্রত। মানুষ কিছু কামনা করে এবং আলপনার মধ্য দিয়া সেই কামনার ছবি আঁকে। নীচে এইরূপ কয়েকটি ব্রত এবং উহার আলপনার উল্লেখ করিতেছি। যেমন

ভাদুলি ব্রত ঃ আমাদের দেশের একটি মেয়েলী ব্রত ভাদুলি। আত্মীয়-স্বজনরা জলপথে বিদেশে যায়। তাহাদের নিরাপদে ফিরিয়া আসার কামনা করিয়া মেয়েরা

লক্ষ্মীর ব্রতের আলপনা এবং চারিপাশে আলপনার বিভিন্ন নক্‌শা

ভাদুলি ব্রত করে। ব্রতস্থানে ভাদুলির মূর্তি স্থাপন করিয়া চারিপাশে জোড়া নৌকা, নদী, সমুদ্র, কাঁটাবন, নানা হিংস্র জন্তু ইত্যাদি আলপনায় আঁকা হয়। এইভাবে নানা বিপদ অতিক্রম করিয়া জলপথে নিরাপদে ফিরিয়া আসার কামনা আলপনায় ব্যক্ত হয়।

লক্ষ্মী ব্রত মেয়েদের একটি খুব বড় ব্রত। আশ্বিন-পূর্ণিমায় যখন হেমন্তের শস্য ঘরে আসে তখন এই ব্রতটি উদ্‌যাপন করা হয়। লক্ষ্মী হইলেন সম্পদ্, কল্যাণ ও শ্রীর দেবতা। লক্ষ্মীর ব্রতের মধ্য দিয়া মেয়েরা শস্য কামনা করে। লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, পদ্ম, ধানছড়া তাই আলপনার প্রধান অঙ্গ। শ্রী ও সম্পদ্ ব্যতীত মেয়েদের মনে থাকে অলঙ্কার, আয়না, চিরুনী ইত্যাদির কামনা। লক্ষ্মীব্রতের আলপনায় এইগুলিও দেখা যায়।

মাঘমণ্ডলের ব্রত ঃ পৌষের সংক্রান্তি হইতে মাঘের সংক্রান্তি পর্যন্ত এক মাস ধরিয়া এই ব্রতটি চলে। মাঘমণ্ডলের ব্রতের মধ্য দিয়া সূর্যের অভ্যুদয় এবং আলোঝলমল বসন্ত দিনগুলিকে কামনা করা হয়। ব্রতকথায় চাঁদের সঙ্গে সূর্যের পরিণয় এবং অবশেষে পুত্ররূপে ঋতুরাজ বসন্তকে লাভের গল্প আছে। পৃথিবীর সঙ্গে বসন্তের পরিণয়ের কাহিনী দিয়া ব্রত শেষ করা হয়। মাঘমণ্ডলের ব্রত বস্তুতঃ সূর্যলাভের উপাসনা। সূর্য ভারতের সর্বত্র নানাভাবে পূজিত। বৈদিক ঋষিরাও আলো চাহিয়া এই আলোর দেবতাকে উপাসনা করিয়াছেন। এই মেয়েলী ব্রতটিতেও দেখি একই কামনা। শীতের কুয়াসা যখন সূর্যকে আবৃত করিয়া রাখে মেয়েরা তখন সূর্যলাভের জন্য মাঘমণ্ডলের ব্রত করে। সূর্য গোলাকার বলিয়া সূর্যের প্রতীক হইল মণ্ডলাকার রেখাচিত্র।

(২) মণ্ডনশিল্প হিসাবে আলপনা ঃ ব্রতের কামনা আলপনার ছবিতে প্রকাশ পাইত। কিন্তু আলপনা ক্রমশঃ ব্রত অনুষ্ঠানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শিল্পকাজ হিসাবে গৃহসজ্জার বিশিষ্ট উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এখনকার উৎসবে-অনুষ্ঠানে আলপনা না হইলেই চলে না।

আলপনা যদি শুধুমাত্র কামনার প্রকাশ হইত তবে অন্নপ্রাশনের পিঁড়িতে যেমন তেমন করিয়া অন্নের ঘটি-বাটিগুলি আঁকিয়া দিলেই কামনা সফল হইতে পারিত। কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে দেখি লতাপাতা, পদ্ম, সূর্যোদয়ের বিভিন্ন রূপক ইত্যাদি। এই সবের মধ্য দিয়া একটি শিল্প রচনার চেষ্টা প্রকাশ পায়। সমস্ত রকমের আলপনাকে মোট আটটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

মাঘমণ্ডলের ব্রতের আলপনা
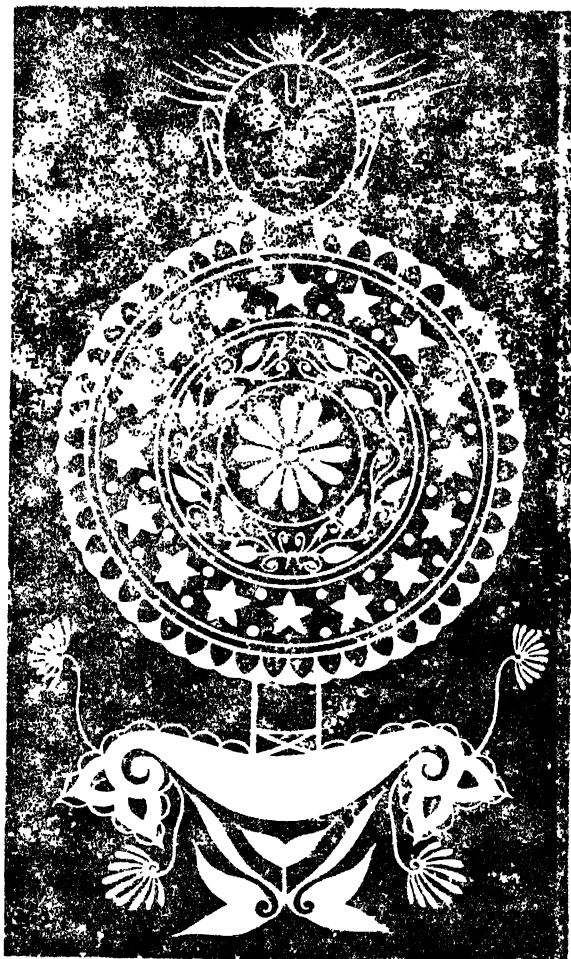
(১) প্রথমে পদ্ম; (২) লতামণ্ডন বা পাড়। পাড়ের মধ্যে মোচালতা, খুন্তিলতা, কলমিলতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য; (৩) গাছ, ফুল ইত্যাদি; (৪) নদনদী, পল্লী-জীবনের নানা দৃশ্য; (৫) পশুপক্ষী, মাছ ও নানা জীবজন্তু; (৬) চন্দ্রসূর্য, গ্রহনক্ষত্র; (৭) নানা অলঙ্কার ও আসবাব; (৮) পিঁড়িচিত্র।

আলপনার এই সমস্ত পদ্ম কিংবা লতা ইত্যাদির সঙ্গে বাস্তবের পদ্ম ও লতার কোন

মিল নাই। নারীহৃদয়ের মধ্যে যে রসসৃষ্টির অনন্ত ভাণ্ডার জমা রহিয়াছে সেখান হইতে এই শিল্পটি যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইতেছে। আমাদের দেশের মেয়েরা নিজ নিজ কল্পনা হইতে দেওয়ালে মেঝেতে এবং পিঁড়িতে এইসব ছবি আঁকিয়া যায়।

আলপনার বৈশিষ্ট্য ঃ আলপনা কিন্তু কখনও নিখুঁত হয় না। অবনীন্দ্রনাথের মতে ছেলে ভুলানো ছড়া যেমন মায়ের মনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, উহা কখনও ব্যাকরণ কিংবা ছন্দশাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া চলে না, আলপনাও তেমনি মেয়েদের কাঁচা হাতের আঁকা-বাঁকা রেখার একটি চিত্রমাত্র, উহা কখনও জ্যামিতিক নক্শার মত নির্ভুল নয়। তবে এই অপটু শিল্পীদের হাতের আঁকাবাঁকা আলপনায় যে স্বাভাবিক শ্রী ও সৌন্দর্য ফুটিয়া ওঠে তাহা সত্যই অতুলনীয়।

পুষ্পবিন্যাস (Flower arrangement)

পৃথিবীর মধ্যে ফুলকে আমরা সবচেয়ে পবিত্র জিনিস বলিয়া মনে করি। রূপ এবং গন্ধ—ফুলের এই দুইটি প্রধান আকর্ষণ। পবিত্রতা এবং সৌন্দর্যের জন্য ইহাকে আমরা দেবপূজার প্রধান উপকরণ করিয়াছি।

ফুলের ব্যবহার ঃ বহুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে ফুল দিয়া প্রধানত পূজো হইত। তবে মেয়েরা আবার অনেকে ফুলের গহনা করিয়া পরিত। বিবাহ প্রভৃতি উৎসবেও ফুলের ব্যবহার ছিল। তাছাড়া ঝরাফুল দিয়া ঘর সাজানো হইত। তোমরা জান যে গাছ হইতে অনেক ফুল ঝরিয়া পড়ে। আবার ঝড়-বৃষ্টিতে অনেক ফুল নষ্ট হয় এবং ডালপালা ভাঙ্গিয়া গিয়া ফুলগাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐসব ফুল পাতা নষ্ট না করিয়া গৃহসজ্জার কাজে উহাদের ব্যবহার করা হইত। তারপর ফুলের আদর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গাছ হইতে ফুল তুলিয়া ঘর সাজান হইতে লাগিল। আজকাল বিবাহে, জন্মদিনে, শ্রাদ্ধ-বাসরে, এমন কি সাধারণ সভায় ফুল চাই। অবস্থাপন্ন লোকেরা অনেকেই বাড়িতে একটু ফুলের বাগান করেন এবং সুবিধা না থাকিলে বাজার হইতে ফুল কিনিয়া আনিয়া ঘর সাজান। পুষ্পবিন্যাস আজ আলংকারিক শিল্পের (decorative) অন্তর্গত। আলঙ্কারিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে উহা অপরের সৌন্দর্য বাড়ায়। সামান্য পুষ্পবিন্যাসের দ্বারা বাস্তবিকই আমরা একটি কক্ষের সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়াইয়া তুলিতে পারি।

পুষ্পবিন্যাসের সাধারণ নিয়ম (General principles of flower arrangement) ঃ ছবির মত ফুলেরও **রঙ** (colour), **রেখা বা গড়ন** (line), **ছন্দ** (rhythm) ও **সমন্বয়ের** (balance) দিক আছে।

(১) প্রথমেই ধর রঙের কথা। পুষ্পবিন্যাসের সময় খেয়াল রাখিবে যে ফুলের রঙটি যেন সকলের চোখে পড়ে। সমস্ত কক্ষটি আবার উহার চারি দেওয়াল, পর্দা, আসবাব ইত্যাদি লইয়া পুষ্পবিন্যাসের পশ্চাদ্ভূমি রচনা করিতেছে। এই পশ্চাদ্ভূমির সঙ্গে মিল রাখিয়া ফুলের রঙ নির্বাচন করা যায়, কিংবা উহাদের কোন বিপরীত রঙের ফুলও নির্বাচন করা যায়। মোটের উপর পুষ্পবিন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা দ্বন্দ্ব কিংবা সমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিতে পারি।

(২) ফুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উহার রেখা। সব ফুলেরই রেখা অর্থাৎ একটি বিশেষ আকৃতি রহিয়াছে। তবে কোন কোন ফুল, যেমন—ম্যাগনোলিয়া গ্ল্যাণ্ডিফ্লোরা, ডালিয়া, প্রকাণ্ড সূর্যমুখী, জলপদ্ম ইত্যাদির আকৃতি অতি সুন্দর। সাজাইবার সময় উহাদের আকৃতির প্রাধান্য দেওয়া উচিত। গুচ্ছাকারে না সাজাইয়া ফুলদানিতে এই জাতীয় দুই চারিটি ফুল আলগাভাবে রাখিয়া দিলে উহাদের আকৃতি বেশ উপভোগ করা যায়। পরন্তু গাঁদা, ফ্লক্স, ডায়ানথাস ইত্যাদি ফুল স্তবকাকারে সাজানোর উপযোগী।

(৩) ফুলের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল উহার ছন্দ। পুষ্পবিন্যাসের সময় ফুলের স্বাভাবিক ছন্দ বজায় রাখিতে হয়· অর্থাৎ গাছে উহারা যেভাবে ফুটিয়া থাকে সেইভাবে উহাদের সাজান উচিত। অবশ্য সুদক্ষ শিল্পীর হাতে অনেক ত্রুটিই চাপা পড়িয়া যায়। যেমন, লম্বাবৃন্তের ফুলের জন্য চাই লম্বা গড়নের পুষ্পাধার, কিন্তু নীচু পুষ্পাধারও যদি প্রশস্ত হয় তবে তাহাতে গ্ল্যাডিওলাস, রজনীগন্ধা কিংবা লিলি সাজান চলে।

বেল, যুঁই, অপরাজিতা, শিউলী প্রভৃতি ফুল জলে ভাসাইয়া সাজাইতে হয়। জলপদ্ম কিংবা শালুক জাতীয় যেসব ফুল জলে ফোটে তাহাদের জলে ভাসাইয়া রাখিলে একদিকে যেমন টাটকা থাকে অন্যদিকে তেমনি ফুলের স্বভাবিক ছন্দ বজায় রাখা যায়।

(৪) ছন্দের মতই পুষ্পবিন্যাসে সামঞ্জস্যের নীতি প্রতিফলিত হওয়া উচিত। উজ্জ্বলতম, উচ্চতম কিংবা দীর্ঘতম অর্থাৎ সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফুলটি কেন্দ্রে রাখিয়া উহার চারিপাশে অন্যান্য ফুলগুলি বিন্যস্ত করিলে সামঞ্জস্যের নীতি রক্ষা করা সহজ হয়।

(৫) সবশেষে স্মরণ রাখিবে যে পুষ্পবিন্যাসে সারল্যের নীতি অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আগেই বলিয়াছি পুষ্পবিন্যাস একটি আলঙ্কারিক শিল্পবিশেষ। অপরের সৌন্দর্য বাড়ানোতেই উহার সার্থকতা। ফুলদানিতে ফুল ঠাসাঠাসি করিয়া রাখিলে সমস্ত কক্ষটি ফুলের ভারে ভারাক্রান্ত বোধ হয় এবং পুষ্পবিন্যাসের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

স্থান অনুযায়ী পুষ্পবিন্যাস: আমরা বাড়িতে সচরাচর ঠাকুর ঘরে, বৈঠকখানা ঘরে, শয়ন কক্ষে টেবিলে ও বারান্দার কার্ণিসে পুষ্পবিন্যাস করিয়া থাকি।

ঠাকুর ঘর: পূজার প্রধান উপকরণ ফুল। ফুলের বর্ণ আমাদের মনে একটি গভীর রেখাপাত করে। যেমন সাদা রঙটি পবিত্রতার ভাব জাগায়, লাল রঙটি জাগায় কর্মে উদ্দীপনা, হলুদ রঙটি একাধারে জাগায় জানার ইচ্ছা (জ্ঞান) এবং কর্মে প্রবৃত্তি। এইভাবে একেকটি রঙ একেকটি ভাবের প্রতীক হইয়া আছে। দেবতারাও আবার নানা ধরনের। মায়ের শক্তিতে জগৎ চলে, মায়ের পূজায় তাই রাঙা জবা দরকার। শিব

আবার ভোলানাথ—সমস্ত জগতের মালিক হইয়াও তিনি নিজে কিছু করেন না। তাঁহার জন্য চাই সাদা দ্রোণ ফুল। সরস্বতী জ্ঞানদায়িনী—জগতে জ্ঞান বিতরণ করাই তাঁহার কাজ। তাই সরস্বতী পূজায় আমরা দিই পলাশ, গাঁদা এবং হলুদ রঙের যাবতীয় ফুল। সর্বদা সাদা ফুল দিয়াই পূজার ঘরটি সাজান যায়। তবে কোন্ দেবতার পূজা হইতেছে জানিয়া লইয়া দেবতার প্রতীক ফুলটি আগে দিতে হয়। পূজার বেদীতে ফুল সাজান যায়, আবার মাটিতে ফুলের আলপনাও খুব সুন্দর হয়।

বৈঠকখানা ঃ বৈঠকখানাই পুষ্পবিন্যাসের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত স্থান বলিয়া গণ্য হয়, কারণ এখানেই আমরা অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করিয়া থাকি। পুষ্পবিন্যাস স্বভাবতঃই কক্ষের সৌন্দর্য বাড়াইতে সাহায্য করে। শীতের সময় নানা মরসুমী ফুল, বর্ষায় জলপদ্ম, রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস কিংবা লিলি এবং গ্রীষ্মে সুগন্ধ ফুল দিয়া বৈঠকখানা সাজাইবে।

সাধারণতঃ কক্ষের মাঝখানে কিংবা সুন্দর একটি কোণ বাছিয়া লইয়া ফুলদানিতে ফুল সাজান যায়। দেওয়ালে দেওয়ালে ফুলদানী টাঙাইয়া তাহাতে ফুল ঝুলাইয়া দেওয়া যায়। নীচু আধারে ফুল ভাসাইয়া রাখাও মন্দ নয়।

শয়নকক্ষ ঃ শয়নকক্ষে ব্যক্তিগত রুচিই প্রাধান্য পাইবে। এখানে কোন সার্বজনীন নিয়ম খাটে না। তবে উগ্রগন্ধের ফুল বর্জন করিয়া বেল, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, শিউলি ইত্যাদি মৃদু সুগন্ধি ফুলই শয়নকক্ষের উপযোগী।

খাবার ঘরের পুষ্পবিন্যাস ঃ খাবার ঘরে পুষ্পবিন্যাসের গুরুত্ব খুব বেশী। প্রথমতঃ টেবিলের উপরে একগুচ্ছ ফুল সাজাইয়া রাখিলে কক্ষটির শোভা বাড়ে, উপরন্তু উহা অন্তরের তৃপ্তিদায়ক বলিয়া ভোজনকে আরও আনন্দদায়ক করিয়া তোলে। খাবার ঘরে পুষ্পবিন্যাসের নিয়মগুলি মোটামুটি এই ঃ—

(১) এমনভাবে ফুল সাজাইবে যেন আহারের সময় টেবিলে মুখোমুখি বসিয়া কথাবার্তা বলিতে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

(২) নীচু পুষ্পাধারে ছোট ছোট ফুল সাজাইয়া কিংবা ভাসাইয়া রাখাই খাবার ঘরের পক্ষে আদর্শ পুষ্পবিন্যাস, কারণ এইভাবে ফুল রাখিলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে পারে।

(৩) টেবিলের ঠিক মাঝখানটিতে ফুলদানি রাখিবে, যাহাতে উহা প্রত্যেকের দৃষ্টিগোচর হয়।

(৪) খুব বড় টেবিলে কোন ভোজের আয়োজন করিলে উল্লিখিত নিয়মগুলি পালনের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, কারণ সেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না চালাইয়া সাধারণতঃ পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিদের সঙ্গেই গল্পগুজব করে। সুতরাং বড় টেবিলে রুচিমত ফুল সাজানো যায়।

ফুলের বদলি জিনিস (Substitutes) ঃ ফুল কম থাকিলে ফুলের বদলে অন্য জিনিস দিয়া অনায়াসে ফুলের অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। ফুলের বদলি হিসাবে প্রথমেই পাতার নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত মোমবাতি, নানা রকমের মাটির ফল কিংবা সুন্দর খেলনা ফুলের সঙ্গে সাজাইয়া দেওয়া চলে। টেবিলের ঠিক মাঝখানে ফুল রাখিয়া দুই পাশে দুইটি সুন্দর মোমবাতি কিংবা একদিকে ফুল অন্যদিকে একটি ঝুড়িতে কৃষ্ণনগরের তৈয়ারী কিছু মাটির ফল রাখিয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায়।
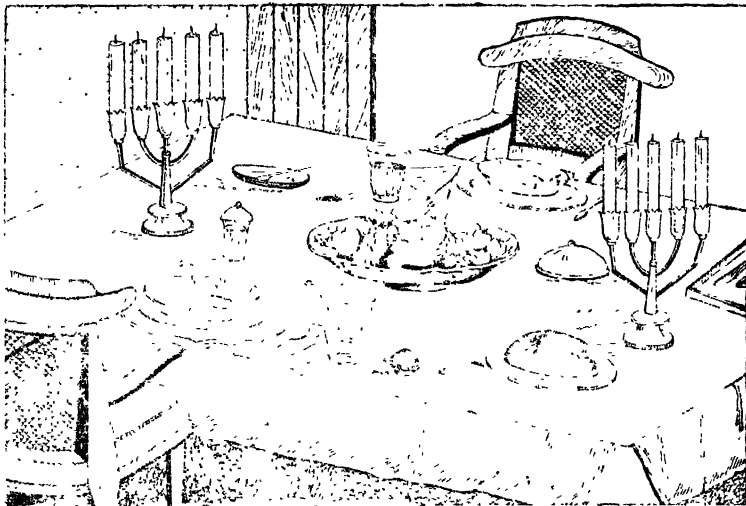
দুইপাশে ক্যান্ডেল দিয়া ফুলের অভাব পূরণ করা হইতেছে

ফুলের বদলি হিসাবে কাগজ কিংবা প্লাস্টিকের ফুলের ব্যবহারও আজকাল বাড়িয়া গিয়াছে। তবে উহারা প্রকৃত ফুলের সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম নয়।

জাপানী প্রথায় পুষ্পবিন্যাস ঃ জাপানীদের পুষ্পবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে তাহারা পুষ্পাধারে তিনটি স্তর রচনা করিয়া ফুল সাজায়। সবচেয়ে দীর্ঘতম ফুলটিকে তাহারা কেন্দ্রে স্থাপন করে। এই সর্বোচ্চ ফুলটি হইল স্বর্গের প্রতীক। দ্বিতীয় স্তরটির উচ্চতা সর্বোচ্চ ফুলের তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত। এইটি হইল মানুষের প্রতীক। তৃতীয় বা সর্বনিম্ন ধাপটি দ্বিতীয় ধাপের ঠিক অর্ধেক পর্যন্ত উঁচু। এই শেষোক্ত স্তরটি ধরিত্রীর প্রতীক। জাপানীরা ফুল সাজাইবার সময় এইভাবে মাটি, মানুষ ও তাহাদের সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ রাখে। জাপানীদের পুষ্পবিন্যাসের এই স্তরবিভাগের সঙ্গে আমাদের উপনিষদের লোকসংস্থানের মিল দেখা যায়। উপনিষদের ভাষায় সৃষ্টির

সর্বপ্রথমে জড়ের প্রকাশ অর্থাৎ মর্ত্য পৃথিবী বা মরলোক। তাহাতে দেখা দিল প্রাণের স্পন্দন বা প্রাণলোক। প্রাণের দেবতা মানুষ, তাহার প্রতিষ্ঠা এই মর্ত্য পৃথিবীতে। কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীতে আবদ্ধ থাকে নাই, তাহার অভীপ্সা ছুটিয়াছে দ্যুলোক অর্থাৎ অমৃতের পানে। উপনিষদের এই তত্ত্বকেই জাপানীরা তাহাদের পুষ্পবিন্যাসের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু জাপান নয় সমস্ত প্রাচ্যদেশ জুড়িয়া এইভাবে শিল্পসাধনার সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহ।
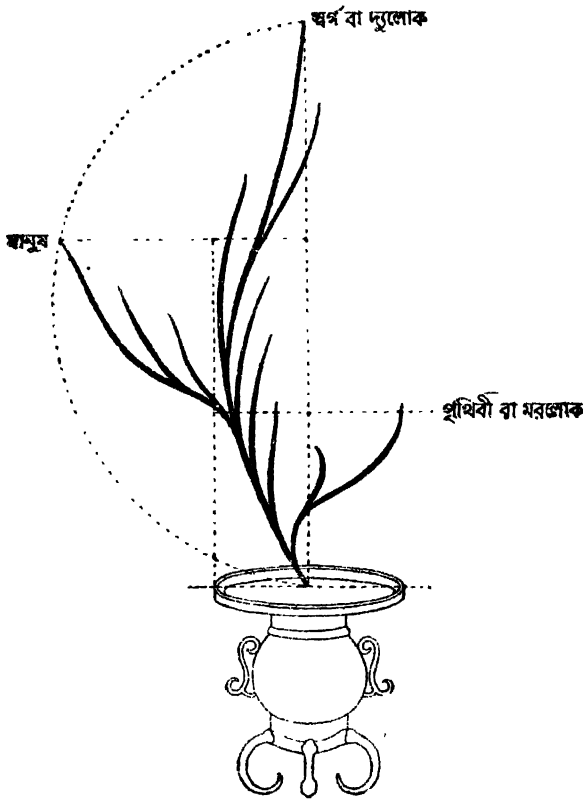
জাপানীদের পুষ্পবিন্যাসের স্তর

রূপ-সাধনার ভিতর দিয়া আমাদের শিল্পীরা অরূপের সাধনাই করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য মনীষীরাও আজকাল স্বীকার করিতে শুরু করিয়াছেন যে সমস্ত শিল্পের

প্রেরণা আসে অতীন্দ্রিয়ের আভাস হইতে। এই আভাস যে পায় নাই সে শিল্পের

নীচু আধারে সাজান লিলি

টেকনিক আয়ত্ত করিতে পারে কিন্তু তাহার হাতে প্রকৃত শিল্প ফোটে না

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুগৃহিণী
(A good Home Maker)

1. গৃহিণীর দৈনন্দিন কাজের পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি (Planning and processing of daily duties of a home maker) :

গৃহকর্ম সুসম্পন্ন করার জন্য দুইটি জিনিস দরকার—একটি সময় পরিকল্পনা এবং অপরটি ঐ পরিকল্পনাকে কাজে রূপায়িত করা। *সময় পরিকল্পনা দেখিয়া আন্দাজ করা যায় এক ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতটা কাজ সমাধা করিতে চায়; যেমন, সকালে কতটা, বিকালে কতটা, সারাদিন অথবা সপ্তাহে কতটা। দ্বিতীয়তঃ, সময় পরিকল্পনায় কার্যপরম্পরারও ইঙ্গিত পাওয়া যায় অর্থাৎ কোন্ কাজের পরে কোন্ কাজ করা হইবে তাহা জানা যায়। কাজের একটি পরিকল্পনা থাকিলে সময় এবং শ্রম বাঁচান যায় এবং নানা অনিশ্চয়তা ও অযথা উদ্বেগের হাত হইতে মানুষ মুক্তি পায়।

সময় পরিকল্পনার সুবিধা : সময় পরিকল্পনা থাকার কতকগুলি সুবিধা আছে, যেমন :

(১) অনেক সমস্যা সম্বন্ধে অনেক আগে হইতে ভাবা যায় ;

(২) বিভিন্ন সমস্যাগুলি সম্বন্ধে ভাবিবার অবকাশ থাকে এবং প্রতিদিন যে নিত্যনতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে সহজেই সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় ;

(৩) প্রত্যহের পরিকল্পনা তৈরী করা এবং সেই অনুসারে কাজ করাটা অভ্যাসে পরিণত হয় ;

(৪) পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার অভ্যাস থাকিলে কাজে বেগ আসে এবং সহজেই দক্ষতা অর্জন করা যায় এবং অন্য কাজের জন্য যথেষ্ট ফাঁকা সময় পাওয়া যায়।

সময় পরিকল্পনার ভিত : একটি উপযুক্ত এবং কার্যকরী সময় পরিকল্পনা করার সময় প্রত্যেক গৃহিণীকে স্থির করিতে হয় :

(১) দিনে কতটা এবং কি কি কাজ করা হইবে ;

(২) সপ্তাহে কতটা এবং কি কি কাজ করা হইবে ;

(৩) বিশেষ এবং ঋতুর কাজগুলি দিন অথবা সপ্তাহের কাজের মধ্যে কিভাবে খাপ খাওয়ান সম্ভব ;

(৪) কোন্ কাজ করার পক্ষে কোন্ সময় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ? কতকগুলি দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজ আছে যেগুলি ঠিক বছরের পর বছর একইভাবে চলিতে থাকে কিন্তু ঋতুর বিশেষ কাজ অথবা বাৎসরিক কাজের বহু অদলবদল হয়, যেমন কোন বৎসর বাড়ি চুনকামের পরিকল্পনা করা, কোন বৎসর শীতের গরম জামা-কাপড় বোনা কিংবা সেলাই

* সময় পরিকল্পনা সম্বন্ধে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

করা হয়। ঐসব কাজ করিতে ঠিক একরকম পরিশ্রম কিংবা সময় প্রয়োজন হয় না এবং উহাদের সম্পন্ন করিতে গেলে অন্য পরিকল্পনায় কিছুটা রদবদল করিতে হয়।

প্রত্যেক বাড়িতেই সময় পরিকল্পনা কতকগুলি বাইরের কাজ অথবা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। যেমন গৃহকর্তার অফিস কয়টায়, ছেলেমেয়েরা কখন স্কুলে যাইবে, এইসবের উপর নির্ভর করে সকালবেলার জলখাবারের সময় ও ধরন। তেমনি গৃহিণী বাহিরে কোথাও কর্মরত, না সর্বদা গৃহেই থাকেন তাহার উপর তাঁহার কাজের সময় ও ধারা নির্ভর করে। কতকগুলি কাজের জন্য অবশ্য নির্দিষ্ট সময় থাকা দরকার কিন্তু কতকগুলি কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় রাখার প্রয়োজন নাই, সুবিধামত যে কোন সময়ে করিলেই চলে।

গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তির কতকগুলি কাজের সময় থাকে এবং ঐ সময়ের নড়চড় করা সম্ভব নয়। যেমন ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া, টিউটোরিয়াল ক্লাশ করা, সাপ্তাহিক নাচ বা গানের ক্লাশ করা, স্বামীস্ত্রীর অফিসে যাওয়া ইত্যাদি। সময় পরিকল্পনার সময় এই সব কাজের প্রাধান্য দিতে হয় এবং গৃহিণীর সমস্ত কাজও এই রুটিন অনুসারে বাঁধা থাকে।

কোন কাজে যখন অপরের সহযোগিতা দরকার তখন ঐ ব্যক্তির অবসর সময় দেখিয়া কাজের সময় স্থির করিতে হয়। বাড়ির কোন কাজে যদি আবার বাইরের কোন লোকের সাহায্য দরকার হয় তখন সময় অনুযায়ী তাহাকে দিয়া কাজ করাইয়া লইতে হয়।

সাধারণতঃ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে দিনে, সপ্তাহে এবং বৎসরে নিম্নলিখিত কাজ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ঃ

প্রত্যহের কাজ

শিশুদের যত্ন ;
খাদ্য পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও পরিবেশন, টিফিন তৈরী করা ;
বাসন মাজা ও কাপড় কাচা ;
গৃহের যত্ন ,
বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত কাজ ;
সামাজিক কর্তব্য যদি কিছু থাকে ;
আকস্মিক কাজ।
রোগী ও বৃদ্ধদের যত্ন ;
গৃহপালিত পশুর তত্ত্বাবধান।

সাপ্তাহিক কাজ

কাপড় কাচা-ধোওয়া :
ইস্ত্রি করা ;
সপ্তাহের বিশেষ সাফাই-এর কাজ ;
ভাল রান্না বা খাবার তৈরী করা।
ব্যাঙ্কের কাজ সারা ;
ডাক্তারের কাছে যাওয়া ;
প্রতিবেশী ও আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ;
বাগানের কাজ ;
অন্য কোন কাজ যদি কিছু থাকে।

দৈনন্দিন সময় পরিকল্পনা	গৃহিণী	কর্তা	কর্তার মা	পুত্র	কন্যা	ঝি
5—5-30 শয্যা ত্যাগ, বিছানা তোলা, প্রাতঃকৃত্য সমাপন ও পূজা	√			√	√	
5-30—6-30 জলখাবার প্রস্তুত, পরিবেশন ও বাজার	√	√				
6-30—10-30 রান্না কাজ, কাচা, ধোওয়া	√					√
10-30—12 সাপ্তাহিক কাজ	√					√
12—1 স্নানাহার	√					
1—2 বিশ্রাম	√					
2—4-30 সাপ্তাহিক কাজ	√					
4-30—5-30 বিকালের জল-খাবার পর্ব	√					
5-30—7 ফাঁকা সময়	√					
7—9-30 সপ্তাহের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান, নৈশভোজন প্রস্তুত করণ	√	√				
9-30—10-30 নৈশ আহার ও রান্নাঘরের কাজ চুকান	√					√

সাপ্তাহিক কাজ ঃ সময়-সকাল 10—12

সাপ্তাহিক কাজ
সোম—সপ্তাহের কাচা
মঙ্গল—ইস্ত্রি ও বিছানা রৌদ্রে দেওয়া
বুধ—সাপ্তাহিক সাফাই
বৃহ—লক্ষ্মী পূজার কাজ
শুক্র—ব্যাঙ্ক/ডাক্তারের কাছে যাওয়া
শনি—ভাল খাবার তৈরী করা
রবি—ছেলেমেয়েদের কাজে সাহায্য করা

সাপ্তাহিক কাজ ঃ সময়-দুপুর 2—4-30

সাপ্তাহিক কাজ
সোম—রিফু
মঙ্গল—বিছানা তোলা
বুধ—সেলাই
বৃহ—অন্য কোন বিশেষ কাজ করা
শুক্র—প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করা
শনি—ফাঁকা সময়
রবি—বেড়ান

ঋতুর অথবা বৎসরের কাজ

শিশুদের ছুটির কাজের পরিকল্পনা করা ;
ছুটিতে কোথাও ভ্রমণ পরিকল্পনা করা ;
বাৎসরিক পরিচ্ছন্নতা,
শীতবস্ত্র ধোওয়া ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

বৎসরের খাদ্য সংরক্ষণ করা ;
পোশাক অথবা শয্যা প্রস্তুত করা, ফুল ও সবজি বাগান করা, অন্যান্য কাজ।

বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, শাশুড়ি আছেন। গৃহিণী বাহিরে কাজ করেন না এবং বাড়িতে একজন ঝিয়ের সাহায্য পান, গৃহের অন্যান্য লোকেরাও সাধ্যমত কাজে সাহায্য করেন। পূর্বপৃষ্ঠায় এইরূপ একটি পরিবারের দিন ও সপ্তাহের কাজের পরিকল্পনা দেওয়া হইল।

2. গৃহের যত্ন ও পরিচ্ছন্নতা

আসবাব ও অন্যান্য গৃহসরঞ্জাম পরিষ্কার রাখার উপায় (Care of a household cleaning—cleaning of furniture and household equipment)

গৃহের যত্ন : উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার উপরেই নির্ভর করে গৃহের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব। ঠিকভাবে যত্ন নিলে একটি বাড়ি বহুদিন পর্যন্ত মজবুত থাকে এবং বংশানুক্রমে মানুষ ঐ গৃহে বসবাস করিতে পারে। তবে ইহার জন্য প্রতিটি জিনিস উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনমত মেরামত করা দরকার। গৃহের গরম পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বাড়তি পোশাকগুলি মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিতে হয়, আসবাবপত্র ও বাসন-কোসন পালিশ করাইতে হয়, বৈদ্যুতিক পাখা ও সেলাই-এর কলে তেল দিতে হয়, মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক তারগুলি ঠিক আছে কিনা মিস্ত্রি দিয়া পরীক্ষা করাইয়া লইতে হয়, তাছাড়া বাড়িঘর চুনকাম ও মেরামত করিতে হয়।

গৃহের পরিচ্ছন্নতা : গৃহের যত্ন লইতে হইলে গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। গৃহের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা গৃহপরিচালনার একটি প্রধান অঙ্গ। খালি হাতে কখনও গৃহ পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। ইহার জন্য সর্বদাই কতকগুলি সামগ্রীর প্রয়োজন।

গৃহ পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম : গৃহ পরিষ্কারের জন্য ফুলঝাড়ু, শক্ত ঝাঁটা, ঝাড়ন, ব্রাশ, মপ (mop), লম্বা হাতলওয়ালা ব্রাশ, কার্পেট ঝাড়বার ঝাড়ন ইত্যাদি জিনিসের প্রয়োজন হয়। এতদ্ব্যতীত বালতি, মগ, ন্যাতা ইত্যাদিও দরকার।

গৃহ পরিষ্কারের পরিকল্পনা : প্রত্যেক গৃহিণীই কিছুটা প্রাত্যহিক ধোয়া-মোছার কাজ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে গৃহের সমস্ত ময়লা অপসারিত হয় না এবং গৃহের প্রত্যেকটি কোণ, বাড়তি জামাকাপড়, বাসনকোসন ইত্যাদি পরিষ্কৃত হয় না। গৃহের সর্বাঙ্গীণ পরিচ্ছন্নতার জন্য তাঁহাকে দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং বাৎসরিক পরিকল্পনা করিয়া লইতে হয়।

দৈনিক পরিচ্ছন্নতা ঃ শয়নকক্ষ ঃ প্রাত্যহিক ধোয়ামোছা বলিতে শুধুমাত্র কক্ষগুলির উপরিভাগের পরিচ্ছন্নতাই বোঝায়। প্রতিদিন গৃহে যে ধুলাবালি সঞ্চিত হয় উহা অপসারণ করাই দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য। প্রথমেই ঘরের দরজা-জানালাগুলিকে খুলিয়া দাও। পাটি, মাদুর, শতরঞ্জি প্রভৃতি ঘরের বাহিরে নিয়া ঝাড়িয়া ফেল। বিছানা গুটাইয়া রাখিয়া সমস্ত কক্ষের ধুলা ঝাটাইয়া ফেল এবং একটা ঝাড়ন দিয়া সমস্ত আসবাব ও বইগুলি ঝাড়িয়া লও। এইবার ভিজা ন্যাতা দিয়া সমস্ত কক্ষ মুছিয়া ফেলিয়া বিছানা পাতিয়া রাখ।

বৈঠকখানা ঃ দরজা-জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া ঘর ঝাড়িয়া ফেল। শয়নকক্ষের মতই বসিবার ঘরও প্রত্যহ ধোয়ামোছা করা উচিত। বাহির হইতে বহু লোক জুতার সঙ্গে ধুলাবালি ও রোগজীবাণু নিয়া আসে। প্রতিদিন বৈঠকখানা না ধুইলে ঐ ধুলা কক্ষে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং গৃহের লোকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। বৈঠকখানা ঘর মুছিবার পূর্বে সমস্ত আসবার ঝাড়ন দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবে। ফুলদানির জল ও বাসি ফুল বদলাইয়া নতুন ফুল সাজাইয়া রাখিবে।

রান্নাঘর ঃ গৃহের সমস্ত কক্ষের তুলনায় রান্নাঘর ও খাবার ঘরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। রান্নাঘরের সমস্ত উচ্ছিষ্ট পাত্র ও রান্নার কাজে ব্যবহৃত বাসনকোসন প্রতিদিন মাজিয়া ফেলিবে। রান্নাঘরের মেঝেতে প্রত্যহ যে সকল তেল কালি পড়ে তাহাও ভাল করিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিবে এবং খাবার টেবিল প্রত্যহ দুই বেলা পরিষ্কার করিয়া রাখিবে।

পায়খানা ও স্নানাগার ঃ পায়খানা ও স্নানাগার পরিষ্কার করাও প্রাত্যহিক পরিচ্ছন্নতার অন্তর্গত। মেথর আসিলে জল ঢালিয়া দিয়া প্রত্যহ পায়খানা পরিষ্কার করাইবে। শহরে জলবাহিত প্রণালীর ব্যবস্থা থাকিলে পায়খানা প্রস্রাবাগারে জলের সঙ্গে নির্বীজক ঔষধ ঢালিয়া দিবে। তবে মলশোধনী পায়খানা হইলে এইরূপে নির্বীজক ঔষধ ঢালিতে নাই। অনবরত জল পড়িতে পড়িতে স্নানাগার পিচ্ছিল হইয়া পড়ে। তাই প্রতিদিন স্নানাগার ধৌত করিয়া দিবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি, শিশুদের জামাকাপড় এবং অন্তর্বাস প্রতিদিন স্নানের সময় কাচিয়া ফেলিবে। ইহাও প্রাত্যহিক পরিচ্ছন্নতার অন্তর্গত।

সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতা ঃ দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতার তুলনায় সাপ্তাহিক ধোয়া-মোছার কাজে আরও বেশী মনোযোগ দিতে হয়, ইহা আরও বেশী খুটিয়া করিতে হয়। যেমন ধর প্রাত্যহিক ধোয়ামোছার কাজ করিবার সময় আমরা সাধারণতঃ চারি দেওয়ালের ঝুল, মাকড়সার জাল ইত্যাদি ঝাড়িয়া ফেলি না। তাই সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া এই সকল ঝুল ঝাড়া উচিত। বিছানাপত্র সপ্তাহে একদিন রৌদ্রে দিয়া গরম করিয়া লইবে। এইরূপ রৌদ্রদগ্ধ শয্যায় ছারপোকার উৎপাত থাকে না। এতদ্ব্যতীত বাড়ির সমস্ত আবর্জনা স্তূপাকার করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার নির্বীজক ঔষধ দিয়া ঘরের মেঝে ধুইয়া ফেলিবে। দরজা-জানালার পর্দা, বিছানা ইত্যাদি সপ্তাহে একবার করিয়া কাচিবে এবং সমস্ত জামাকাপড় ইস্ত্রি করিবার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট রাখিবে।

বাৎসরিক পরিচ্ছন্নতা ঃ প্রতিদিন এবং সপ্তাহে একবার করিয়া বাড়িঘর পরিষ্কার করিলেও সমস্ত বাড়ি জঞ্জালমুক্ত হয় না, কারণ আলমারির কোণে, দেওয়ালে টাঙানো ছবির গায় এত ধূলাবালি জমিয়া থাকে, পুরাতন বাসনকোসন ও আসবাবের এমনভাবে পালিশ নষ্ট হইয়া যায় ও রং চটিয়া যায় যে বৎসরে অন্ততঃ একবার সমস্ত অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি বাছিয়া ফেলিয়া বাড়িঘর জঞ্জালমুক্ত করিতে হয় এবং আসবাবপত্র মেরামত ও পালিশ করিতে হয়। সাধারণতঃ বাড়ি চুনকাম করাইবার সময় ঘরের জিনিসপত্র বাহির করিতে হয় বলিয়া বাৎসরিক পরিচ্ছন্নতার কাজটাও অনেকে একই সঙ্গে চুকাইয়া ফেলেন। শীতের প্রয়োজনীয় পোশাক ও শয্যাদ্রব্য প্রস্তুত করা এবং বাড়ীর যাবতীয় রেশমী পশমী বস্ত্রাদি একবার রৌদ্রে দেওয়া অথবা কাচাইয়া লওয়া উভয়ই বাৎসরিক কাজের অন্তর্গত। বাৎসরিক পরিচ্ছন্নতার কাজকে দুই পর্যায়ে ভাগ করিতে পারি—(১) ধূলাবালির অপসারণ ও জঞ্জালমুক্ত করা, (২) গৃহের মেঝে, দেওয়াল, বস্ত্রাদি, বাসনকোসন ও আসবাবের পরিচ্ছন্নতা ও ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করা।

ধূলাবালি অপসারণ ঃ ধূলি সাধারণতঃ দুই প্রকার—জৈব ধূলি ও অজৈব ধূলি। ছেঁড়া চুল, হাতের নখ, নিষ্ঠীবন ও মলমূত্রাদি অর্থাৎ মানুষ কিংবা অপর প্রাণীর দেহ হইতে নির্গত হইয়া যে সকল পদার্থ ধূলিতে পরিণত হইয়াছে তাহা সমস্তই জৈব ধূলির অন্তর্গত। মাটি, বালুকণা অথবা অপর কোন ধাতব পদার্থ চূর্ণকে অজৈব ধূলি বলে।

ধূলির মত ক্ষতিকর বস্তু কমই আছে। ধূলিকণার সঙ্গে রোগের জীবাণু মিশ্রিত থাকে। মলমূত্র, নিষ্ঠীবন ইত্যাদির সঙ্গে যে সকল রোগজীবাণু নির্গত হয় উহারা ধূলির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আমাদের খাদ্য ও পানীয় দূষিত করে এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে আমাদের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে। অদৃশ্যভাবে ধূলিকণা সর্বদা আমাদের ঘরের আনাচে কানাচে সঞ্চিত হইয়া থাকে। কোন স্যাঁতাসেঁতে জায়গায় কিংবা তেলের উপরে ধূলি পড়িয়া কালো চটচটে হইয়া যায়। এই কারণে বাড়ির অন্য কক্ষের মধ্যে রান্নাঘরটি সবচেয়ে বেশী ময়লা হয়। আবার মসৃণ স্থানের চেয়ে খসখসে দেওয়ালে সহজেই ময়লা আটকাইয়া যায়। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া বাড়ি পরিষ্কার না করিলে উহা শীঘ্রই বাসের অনুপযুক্ত হইয়া ওঠে। তবে আমরা প্রত্যহ যেভাবে গৃহ পরিষ্কার করি তাহাতে গৃহের উপরিভাগের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভব হইলেও বইপত্র, আলমারি, ঘরের কোণ ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। তাই বৎসরে অন্তত একবার বাড়িঘর চুনকাম করাইবে, দরজা-জানালা রং করাইবে এবং সমস্ত গৃহের জঞ্জাল দূর করিবে।

বাড়ির মেঝে, আসবাবপত্র ও বাসনকোসনের পরিচ্ছন্নতা ঃ ধূলিকণা ও জঞ্জাল অপসারণ করা ব্যতীত বাড়ির আসবাব পালিশ করাইবার প্রয়োজন আছে। গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি পালিশ করাইবার উদ্দেশ্য একাধারে উহাদের পরিষ্কার করা এবং বস্তুগুলির ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখা। ধাতবপাত্রাদি, কাচের বাসন, বেত ও কাঠের আসবাব, চামড়ার জিনিস ইত্যাদি পরিষ্কার রাখার উপাদান ও পদ্ধতি এক নয়। কোন্ বস্তু কি উপায়ে রাখিতে হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল।

বিভিন্ন আসবাব পরিষ্কার রাখার উপায় ঃ আমাদের দেশের অধিকাংশ আসবাবই বেত, কাঠ, চামড়া কিংবা স্টীল নির্মিত। উহাদের পরিষ্কার পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

বেতের ব্যবহার ঃ গৃহস্থালীর নানা কাজে বেতের প্রয়োজন হয়। ঝুড়ি, হাতব্যাগ বিশেষতঃ আসবাব প্রস্তুতিতে আমরা বেত ব্যবহার করিয়া থাকি। বেতের আসবাবে সুবিধা এই যে উহা অত্যন্ত হাল্কা এবং সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়।

বেতের আসবাব পরিস্কার রাখার উপায় ঃ ঝাড়ন কিংবা লম্বা দাঁড়ওয়ালা ব্রাশ দিয়া প্রত্যহ বেতের আসবাব ঝাড়িয়া ফেলিবে। ময়লা হইলে সাবান গুলিয়া লইয়া বেতের সামগ্রী ধুইয়া ফেলিলেই উহা পরিস্কার হইয়া যাইবে। বেতের পালিশ উঠিয়া গেলে তেলের দুই প্রস্থ পাতলা পেইন্ট লাগাইয়া দিলেই ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে।

কাঠের ব্যবহার ঃ গৃহস্থালীর সঙ্গে কাঠের এক নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। আমাদের গৃহনির্মাণের একটি প্রধান উপাদান হইল কাঠ। আমাদের আসবাবপত্রও প্রধানতঃ কাঠের তৈয়ারী। সামান্য যত্ন নিলেই এইসব আসবাব মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

কাঠের আসবাব পরিস্কার রাখার উপায় ঃ কাঠের আসবাব পরিস্কার রাখিতে হইলে প্রত্যহ সমস্ত আসবাবের ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিবে এবং মাঝে মাঝে উহার গায়ে নিম্নলিখিত যে কোন সলিউশান মাখাইয়া দিবে ঃ

(ক) ১। পাউন্ড মৌমাছির মোম
২। ১ পাইন্ট তার্পিন তেল
৩। ½ পাইন্ট অ্যালকোহল

অথবা

(খ) তার্পিন তেল ১ ঃ ভিনিগার ১ ঃ মসিনা বীজের তেল ১।

কাঠের রঙ নষ্ট হইলে খুব মসৃণ ব্রাশ বা তুলি দিয়া পারমাঙ্গানেট সলিউশান লাগাইয়া দিবে। কাঠের গায় কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলে মসিনার তেল ১ ঃ তার্পিন তেল ১½ ঃ হোয়াইটিং অথবা কর্ণফ্লাওয়ার ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ছিদ্রটি বুজাইয়া দিবে এবং তারপর কাঠ পালিশ করিয়া ফেলিবে। কাঠের উপর জলের দাগ পড়িলে মেথিলেটেড স্পিরিট কিংবা অ্যামোনিয়া সলিউশান ঘষিয়া দাগ তুলিয়া ফেলিবে।

চামড়ার ব্যবহার ঃ কাঠ, বেত প্রভৃতির মত চামড়াও একটি নিত্যব্যবহার্য অতি আবশ্যক সামগ্রী। মৃত পশুর দেহ হইতে চামড়া খুলিয়া নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঐ চামড়াকে মসৃণ, নমনীয় ও টেকসই করিয়া আমাদের ব্যবহারের উপযুক্ত করা হয়। চামড়ার বস্তু দামী হইলে সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী বলিয়া লোকে চামড়ার জিনিস যেমন জুতা, স্যুটকেশ, আসবাব ইত্যাদি কেনা পছন্দ করে।

চামড়ার আসবাব পরিস্কার রাখার উপায় ঃ প্রত্যহ ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিবে। ময়লা হইলে গরম জলে সাবান গুলিয়া লইয়া উহাতে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া আসবাব মুছিয়া ফেলিবে। অতিরিক্ত ময়লা হইলে মসিনা বীজের তেলে (linseed oil) ভিনিগার (২ তেল ঃ ১ ভিনিগার) মিশ্রিত করিয়া চামড়ার গায়ে খুব ভাল করিয়া ঘষিয়া ময়লা তুলিয়া ফেলিবে। তারপর যে কোন একটি পালিশ লাগাইবে ঃ

(ক) চামড়া পালিশের ক্রীম।
(খ) জুতার কালি।
(গ) মৌমাছির মোম ও তার্পিন তেল।
(ঘ) ভেসিলিন।

স্টীলের আসবাব পরিষ্কার রাখার উপায়ঃ প্রতিদিন আসবাবের ধূলা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে হয়। মাঝে মাঝে ভেসিলিন মাখাইয়া পালিশ করিয়া লইলে স্টীলের আসবাব অত্যন্ত চকচকে ও উজ্জ্বল থাকে।

গৃহের সরঞ্জামঃ গৃহে আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য সরঞ্জামগুলি প্রধানতঃ কাচ কিংবা নানারকম ধাতু দিয়া প্রস্তুত। এইসব কাচের পাত্র এবং ধাতব দ্রব্য পরিষ্কার রাখার উপায় বর্ণিত হইল।

কাচ (Glass)ঃ আমরা সাধারণতঃ কাচের জগ, জার, শিশি, বোতল, গ্লাস, ডিশ ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকি। উত্তাপ লাগিলে ফাটিয়া যায় বলিয়া কাচের বাসন রন্ধনের অনুপযুক্ত। তবে অধুনা রন্ধনের উপযোগী কাচও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে ইহাতে সাধারণতঃ জল, শরবত ইত্যাদি ঠাণ্ডা জিনিসই রাখা হয়। এতদ্ব্যতীত ঘি, মাখন, মধু, মশলা, আচার, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি বস্তুও কাচের বোতলে কিংবা জারে রাখা যায়। ঠাণ্ডা যে-কোন দ্রব্য কাচের পাত্রে ভাল থাকে। স্বচ্ছ বলিয়া ঔষধপত্র কাচের পাত্রেই রাখিবার নিয়ম। কাচের মধ্য দিয়া ঔষধের রঙ্ এবং পরিমাণ সহজেই দেখা যায়।

পরিষ্কার রাখার সরঞ্জামঃ ঈষদুষ্ণ সাবান জল ও বস্ত্রখণ্ড।

পরিষ্কার রাখার উপায়ঃ ময়লা কিংবা তেলতেলে হইলে ঈষদুষ্ণ গরম জলে সাবান গুলিয়া কাচের পাত্রগুলি ডুবাইয়া রাখ। এইবার একটি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড কিংবা খবরের কাগজ দিয়া পাত্রগুলি ভাল করিয়া ঘষিয়া ফেল। তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া নাও। জল শুকাইয়া গেলে পরিষ্কার শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া পাত্রগুলি মুছিয়া ফেল।

পরিষ্কার করিবার জন্য অন্য কোন বস্তু না পাইলে শুধু লবণ ঘষিয়া কাচের পাত্র পরিষ্কার করা যায়।

ধাতু

ধাতু আমাদের একটি নিত্য-ব্যবহার্য বস্তু। লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি যে সকল ধাতু আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি উহাদের কোনটিই ধাতু হিসাবে পাওয়া যায় না। মাটির অনেক নীচে উহাদের খনিজ পাওয়া যায়। ঐ খনিজ তুলিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহাদের নিষ্কাশন করা হয়। কোন কোন ধাতু, যেমন—লোহা, সোনা ইত্যাদি এত নরম থাকে যে বিশুদ্ধ অবস্থায় উহাদের ব্যবহার করা চলে না। তখন আবার কোন ধাতু মিশাইলে উহারা মজবুত ও ব্যবহারের উপযোগী হইয়া থাকে। এইরূপ ধাতুকে বলে সংকর ধাতু। দৈনন্দিন কাজে সংকর ধাতুরই ব্যবহার বেশী।

উপযোগিতার দিক হইতে ধাতু দুই শ্রেণীর ঃ

(ক) আলঙ্কারিক ধাতু, যেমন—সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি। এইসব ধাতু দিয়া আমরা অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া থাকি।

(খ) উপযোগী ধাতু, যেমন—লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি। রান্নাঘরের কাজেই এই ধাতুগুলির ব্যবহার বেশী।

রঙ্-এর দিক হইতেও ধাতুগুলি দুই শ্রেণীর ঃ

(ক) সাদা ধাতু, যেমন—রূপা, টিন, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি।

(খ) রঙিন ধাতু যেমন—সোনা, তামা, কাঁসাও পিতল।

আমরা বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার এবং উহাদের পরিষ্কার রাখার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

তামা (Copper) : আমরা পূজার বাসনকোসনের জন্যই বেশীর ভাগ তামার পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। পানীয় জল সংরক্ষণের জন্যও তামার পাত্র বেশ উপযোগী।

পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম : গরম জল, হোয়াইটিং, তেঁতুল কিংবা লেবু।

পরিষ্কার রাখার উপায় : প্রথমে তামার বাসনগুলি গরম জলে ডুবাইয়া রাখ। তারপর জলের সঙ্গে কিছুটা হোয়াইটিং গুলিয়া লইবে। গরম জলে ডুবান বাসনগুলি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মুছিয়া লইয়া হোয়াইটিং মাখাও এবং গরম জলে পুনর্বার ধুইয়া ফেল।

তামার বাসনে তেলকালি লাগিয়া থাকিলে লেবু কিংবা তেঁতুল মাখাইয়া ছাই দিয়া মাজিয়া ফেল। তারপর জলে ধুইয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া মুছিয়া শুষ্ক করিয়া রাখ।

পিতল (Brass) : দুই ভাগ তামার সঙ্গে একভাগ দস্তা মিশাইয়া পিতল প্রস্তুত করা হয়। পিতলের বাসন দামে সস্তা অথচ মজবুত বলিয়া অনেকে পিতলের হাঁড়ি, কড়াই ইত্যাদি ব্যবহার করা পছন্দ করেন। রান্নার কাজে পিতলের বাসন অবশ্য ব্যবহার করা চলে কিন্তু পিতলের 'কল' উঠিয়া খাদ্যদ্রব্যকে বিষাক্ত করিয়া ফেলে বলিয়া রান্নার সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্যদ্রব্যকে বাসন হইতে নামাইয়া ফেলা উচিত। তাছাড়া পিতলের থালাতে কখনও কোন অম্লদ্রব্য রাখা চলে না।

পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম : জল, তেঁতুল কিংবা লেবু, লবণ, ছাই ও ব্রাসো।

পরিষ্কার রাখার উপায় : বাসনগুলিতে অল্পক্ষণ একটু তেঁতুল কিংবা লেবু ও লবণ মাখাইয়া রাখ। তারপর ছাই দিয়া মাজিয়া গরম জলে ধুইয়া জল মুছিয়া ফেল। এইবার বাসনগুলিতে সামান্য ব্রাসো মাখাইয়া রোদ্রে রাখিয়া পরিষ্কার শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া ঘষিয়া ফেলিলেই বাসনের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে।

লোহা (Iron) : লোহা আমাদের জীবনে একটি অপরিহার্য ধাতু। লোহা পিটাইয়া কড়াই, খুন্তি, চাটু, বঁটি ইত্যাদি আমাদের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যগুলি প্রস্তুত হয়। লোহার সঙ্গে অন্য ধাতু মিশ্রিত করিয়া যে সংকর ধাতু প্রস্তুত হয় তাহাকে বলে ইস্পাত বা স্টীল। লোহার সঙ্গে শতকরা ১৫ কিংবা ১৬ ভাগ ক্রোমিয়াম মিশ্রিত করিয়া স্টেনলেস স্টীল প্রস্তুত হয়। উহা সর্বদা ঝকঝকে থাকে এবং উহাতে কখনও মরিচা পড়ে না।

পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম : জল, সোডা, ছাই, ঝামা, তেল কিংবা ভেসিলিন।

স্টেনলেস স্টীলের বাসনের জন্য চাই গুঁড়া সাবান কিংবা ভীম।

পরিষ্কার রাখার উপায় : গরম জলে সোডা মিশাইয়া লোহার পাত্রগুলি উহাতে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখ। তারপর পাতলা মিহি ছাই দিয়া মাজিয়া পাত্রগুলি আবার গরম জলে ধুইয়া ফেল। মরিচা থাকিলে ঝামা দিয়া ঘষিয়া ফেলিবে। তারপর ধুইয়া জল মুছিয়া ফেলিয়া তেল কিংবা ভেসিলিন মাখাইয়া রাখিবে।

স্টেনলেস স্টীলের পাত্রে ভীম কিংবা গুঁড়া সাবান মাখাইয়া ধুইলেই পরিষ্কার হইবে।

বিশেষ নির্দেশ : **লোহার পাত্র সর্বদা জল মুছিয়া শুষ্ক অবস্থায় রাখিবে,** নতুবা মরিচা পড়িবে।

কাঁসা (Bell metal) : কাঁসা একটি মিশ্র ধাতু। তামা, টিন ও দস্তা মিশাইয়া কাঁসা প্রস্তুত হয়। কাঁসা খুব মজবুত তবে স্টেনলেস স্টেনলেস স্টীল আসিয়া ক্রমশঃ

উহার স্থান দখল করিয়া লইতেছে। কাঁসার পাত্রের একটি অসুবিধা যে উহাতে কোন অম্লদ্রব্য রাখা চলে না। অধিক উত্তাপ পাইলে কিংবা কঠিন জিনিসের উপর পড়িলে কাঁসা ফাটিয়া যাইতে পারে।

পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম ঃ জল, তেঁতুল কিংবা লেবু ও ছাই।

পরিষ্কার রাখার উপায় ঃ তেঁতুল কিংবা লেবু মাখাইয়া লইয়া ছাই দিয়া মাজিয়া ফেলিলেই চলে। বাসনগুলি ধুইয়া ফেলিয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া জল মুছিয়া রাখিবে।

রুপা (Silver) ঃ রুপা একটি মূল্যবান ধাতু। আলঙ্কারিক ধাতুরূপেই রুপা বেশী আদৃত তবে ইহার ব্যবহারিক মূল্যেও আছে। ধনীর গৃহে রুপার বাসনের প্রচলন আছে, তাছাড়া মেডেল, কাপ ইত্যাদিতেও কিছুটা রুপা ব্যবহার হয়। তবে দামী ধাতু বলিয়া দৈনন্দিন জীবনে রুপার ব্যবহার খুবই কমিয়া আসিতেছে।

পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম ঃ (১) সিলভো, অথবা, (২) মেথিলেটেড স্পিরিট সাধারণ পাত্রের জন্য শুধু গরম সাবান জল, কারুকার্যখচিত পাত্রের জন্য সিলভো অথবা স্পিরিট, হোয়াইটিং, অ্যামোনিয়া ও উষ্ণ জল।

রৌপ্যপাত্রগুলি গরম সাবান জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। তারপর তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া মুছিয়া লও। কারুকার্যখচিত বাসনে অনেক সময় ময়লা পড়ে। ময়লা বাসন Silvo দিয়া ধীরে ধীরে ঘষিয়া ফেলিলেই চকচকে দেখায়।

অন্য উপায় ঃ হোয়াইটিং ও মেথিলেটেড স্পিরিট মিশাইয়া লইয়া মসৃণ বস্ত্রখণ্ড-দ্বারা ধীরে ধীরে বাসনের গায় মাখাও। সমস্ত পাত্রগুলি মাখান হইলে গরম জলে দুই এক ফোঁটা অ্যামোনিয়া ফেলিয়া দিয়া রুপার বাসনগুলি তাহাতে ধুইয়া লও। তারপর শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া জল মুছিয়া ফেল।

বিশেষ নির্দেশ ঃ রুপার বাসনে কখনও অ্যাসিড লাগাইবে না।

অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium) ঃ ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় ধাতু। বর্তমান যুগের জীবনযাত্রায় লোহার পরেই অ্যালুমিনিয়ামের স্থান। সব রকমের খাদ্য ইহাতে অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। হাল্কা, টেকসই ও তাপসুপরিবাহী বলিয়া রান্নার কাজে এই ধাতুটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম ঃ গরম জল, ছাই ও স্টীলউল।

পরিষ্কার রাখার উপায় ঃ ছাই দিয়া মাজিয়া লইয়া গরম জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইবে। পাত্রে কোন দাগ থাকিলে স্টীলউল দিয়া দাগ তুলিয়া ফেলিবে।

বিশেষ নির্দেশ ঃ সোডা কিংবা কোন প্রকার ক্ষারদ্রব্য ব্যবহার করা চলিবে না।

এনামেল (Enamel) ঃ সস্তা বলিয়া এনামেল পাত্রের প্রচলন বাড়িতেছে। রান্নার পক্ষে অবশ্য ইহা উপযোগী নয়। তবে খাদ্যদ্রব্য ঠাণ্ডা কিংবা গরম যে কোন অবস্থায় ইহাতে ঢালিয়া রাখা যায়। এনামেলের পাত্রে খাদ্যবস্তুর স্বাদ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকে। তবে প্রলেপ উঠিয়া গেলে পাত্রের গায় সহজেই ময়লা আটকাইয়া যায়। তাই প্রলেপ-ওঠার পাত্র কদাপি ব্যবহার করিবে না।

পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম ঃ সাবান কিংবা সোডা ও গরম জল।

পরিষ্কার রাখার উপায় ঃ সাবান কিংবা সোডা মাখাইয়া ছাই দিয়া মাজিয়া গরম জলে ধুইয়া ফেলিলেই চলে।

ধাতু	পরিষ্কার করার সরঞ্জাম	দাগ তোলা	বিশেষ নির্দেশ
তামা	গরম জল, হোয়াইটিং, লেবু কিংবা তেঁতুল।	লেবু কিংবা তেঁতুল।	টক মাখাইয়া ফেলিয়া রাখিবে না।
পিতল	জল, তেঁতুল বা লেবু এবং লবণ, ছাই ও ব্রাসো।	ঐ	ঐ
লোহা	জল, সোডা, ছাই, ঝামা, তেল ও ভেসিলিন।	ঝামা	সর্বদা শুষ্ক রাখিবে এবং তেল বা ভেসিলিন মাখাইয়া রাখিবে।
কাঁসা	জল, তেঁতুল কিংবা লেবু ও ছাই।	লেবু কিংবা তেঁতুল	টক মাখাইয়া রাখিবে না।
রূপা	গরম সাবান জল ও বস্ত্রখণ্ড, কারুকার্যখচিত পাত্রের জন্য (১) সিলভো বা (২) স্পিরিট, হোয়াইটিং, অ্যামোনিয়া ও জল।		অ্যাসিড লাগাইবে না।
অ্যালুমিনিয়াম	গরম জল, ছাই, স্টীলউল।	স্টীলউল	কখনও সোডা ব্যবহার করিবে না।
এনামেল	সাবান কিংবা, সোডা, ছাই ও গরম জল।		

3. অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ—উহাদের বিনাশ এবং নিয়ন্ত্রণের উপায় (Study of household pests—their prevention and control measures)

স্যার প্যাট্রিক ম্যান্সন সর্বপ্রকার কীটপতঙ্গের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহারা নানাপ্রকার রোগের জীবাণু বহন করিয়া বেড়ায়। ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর, ডেঙ্গু, প্লেগ, ফাইলেরিয়া কালাজ্বর প্রভৃতি রোগ ছড়ায় কীটপতঙ্গ। কীটপতঙ্গের সঙ্গে বাস্তবিক আমাদের এক নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। গৃহপালিত পশু বাদ দিলে কীটপতঙ্গের মত আর অন্য কোন প্রাণীর সঙ্গে মানুষের বোধ হয় এমন ঘনিষ্ঠতা নাই। উহারা আমাদেরই আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং আমাদের খাদ্য, বস্ত্র ও আসবাবপত্র খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। আমরাও অনেক কীটের দেহ দিয়া আমাদের বস্ত্র

তৈয়ারী করিয়া থাকি। সব পতঙ্গই যে মানুষের অনিষ্ট করে তাহা নয়. অনেকে আবার আমাদের উপকারও করিয়া থাকে। তবে অধিকাংশ পতঙ্গই অত্যন্ত বিপজ্জনক। উহারা রোগজীবাণু বহিয়া আনিয়া নানাভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করাইয়া দেয়। প্রধানতঃ মশা ও ইঁদুর-মাছি (Rat-fleas) বলিয়া এক ধরনের ক্ষুদ্র মক্ষিকা ম্যালেরিয়া ও প্লেগের বীজ ছড়াইয়া যে কত লোকের প্রাণ নষ্ট করে তাহার ইয়ত্তা নাই। কতকগুলি কীটপতঙ্গ রোগের নিষ্ক্রিয় বাহক মাত্র (passive agents)। ইহারা রোগীর মলমূত্র, কফ, থুথু ইত্যাদিতে বসিয়া রোগের জীবাণু বহন করিয়া আনিয়া আমাদের খাদ্য দূষিত করে। তারপর ঐ খাদ্য গ্রহণ করিয়া আমরা ঐ সব রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। কোন কোন কীটপতঙ্গ আবার সক্রিয়ভাবে রোগ ছড়ায়। ইহাদের বলে সক্রিয় বাহক (active agents)। ইহারা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত পান করিয়া আপনাদের দেহে রোগের জীবাণু বহন করে এবং সুস্থ ব্যক্তির দেহে দংশন করিবার সময় ঐ জীবাণু ঢালিয়া দেয়। রোগ-সংক্রমণ করা ব্যতীত অনেক কীটপতঙ্গ আমাদের আসবাবপত্র, পুস্তক ও পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি কাটিয়া কুটিয়া নষ্ট করে।

কীটপতঙ্গের শ্রেণীবিভাগ ঃ

উপরোক্ত তিন উপায়ে কীটপতঙ্গ আমাদের অনিষ্ট সাধন করে বলিয়া কীটপতঙ্গের আমরা তিনটি শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি। নিম্নে এই শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হইল ঃ

(১) **রক্ত চুষিয়া যেসব কীটপতঙ্গ আমাদের অনিষ্ট করে ঃ**

(ক) মশা ঃ মশা আমাদের রক্ত পান করিবার সময় আমাদের দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং আমাদের বাড়ির আশেপাশে যেখানেই জলাভূমি কিংবা একটু স্যাঁতসেঁতে জায়গা পায় সেখানেই ডিম পাড়িয়া বসে।

(খ) বালু-মক্ষিকা ঃ ভারতের কোথাও কোথাও বালু-মক্ষিকা দেখা যায়। এই পতঙ্গ কামড়াইলে জ্বর হয়।

(গ) ছারপোকা ও মক্ষিকা ঃ ইহারা আমাদের সঙ্গে আমাদের বাসগৃহেই ঘুমাইয়া থাকে এবং আমাদের রক্ত পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে ও বিভিন্ন রোগ ছড়ায়।

(ঘ) উকুন ঃ মানুষের রক্ত পান করিয়া বাঁচে এবং নানারূপ রোগ ছড়ায়।

(২) **আমাদের খাদ্যের মধ্য দিয়া যেসব কীটপতঙ্গ রোগের জীবাণু ছড়ায় ঃ**

(ক) মাছি ঃ সমস্ত কীটপতঙ্গের মধ্যে মাছির মত বোধহয় মানুষের আর দ্বিতীয় শত্রু নাই। সব রকমের পেটের পীড়া সংক্রামিত হয় মাছির সাহায্যে।

(খ) পিপীলিকা ঃ কদাচিৎ রোগের জীবাণু ছড়ায়। আমাদের খাদ্যে বসিয়া খাদ্য নষ্ট করা ছাড়া ইহারা তেমন কোন অনিষ্ট করে না।

(গ) আরশোলা (cockroach) ঃ মাছির মতই আরশোলা উহার দেহে রোগের জীবাণু লইয়া আমাদের খাদ্যের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায় এবং খাদ্য দূষিত করে।

(ঘ) ইঁদুর ঃ ইঁদুর প্লেগ ছড়াইতে সাহায্য করে।

(৩) **যে সমস্ত কীটপতঙ্গ আমাদের জিনিসপত্র নষ্ট করে ঃ**

(ক) ঘুণ (moth) ঃ ঘুণ আমাদের কাঠের আসবাব নষ্ট করে।

(খ) সিলভার ফিস ঃ কৃত্রিম রেশমী কাপড়চোপড়, কলপ দেওয়া বস্ত্র এবং কাগজ নষ্ট করে।

(গ) বইএর উকুন (book lice) ঃ বই কাটে।

(ঘ) আরশোলা ঃ আমাদের বই, ছবি, রেশমী বস্ত্র ও চামড়ার জিনিস নষ্ট করে।

(ঙ) ইঁদুর ঃ বস্ত্রাদি ও আসবাবপত্র কাটিয়া নষ্ট করে।

(চ) ঝিঁ ঝিঁ (cricket), বোলতা (wasp) ও উই (white ant) ঃ আমাদের কাঠের আসবাব নষ্ট করে।

কীটপতঙ্গের বৈশিষ্ট ঃ

কীটপতঙ্গের দেহে একটি কঠিন আবরণ থাকে এবং সমস্ত শরীরটি তিন ভাগে বিভক্ত —(১) দুইটি শুঁড়বিশিষ্ট মস্তিষ্ক। (২) তিন ভাগে বিভক্ত বক্ষঃস্থল। বক্ষঃস্থলে তিন জোড়া পা ও এক কিংবা দুই জোড়া ডানা থাকে। (৩) উদর সাধারণতঃ নয় বা দশ ভাগে বিভক্ত। মানুষের মত কীটপতঙ্গের কোন ফুসফুস নাই। উহারা ফুসফুসের বদলে অন্য একটি অঙ্গ দিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ সমাধা করে। কীটপতঙ্গের মধ্যে নারী ও পুরুষের ভেদ সুস্পষ্ট। ডিম হইতে ইহাদের জন্ম হয়। কোন্ কীটপতঙ্গ কি কি রোগ ছড়ায় নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল ঃ

(১) মশা (mosquito) ঃ ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, পীতজ্বর ও ডেঙ্গু।

(২) উপমক্ষিকা (fleas) ঃ বিউবোনিক প্লেগ, টাইফাস ও কালাজ্বর।

(৩) উকুন (lice) ঃ টাইফাস জ্বর ও ট্রেঞ্চ জ্বর।

(৪) গৃহমক্ষিকা (house flies) ঃ টাইফয়েড, কলেরা ও আমাশয়।

(৫) বালু-মক্ষিকা (sand flies) ঃ বালু-মক্ষিকা জ্বর ও কালাজ্বর।

কীটপতঙ্গের আক্রমণ এড়াইতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অবশ্যই পালন করিবে ঃ

(১) বাসগৃহ যতদূর সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক রাখিবে।

(২) বসতবাটির আশেপাশে কোথাও জল জমিয়া থাকিতে দিবে না। নিকটেই যদি পুষ্করিণী থাকে তবে উহাতে মশার ডিম (larvae) ধ্বংসকারী মাছ রাখিবে। যদি খানা, ডোবা কিংবা এঁদো পুকুর থাকে তবে উহাতে প্রতি সপ্তাহে কেরোসিন কিংবা ডি. ডি. টি. ছড়াইবে।

(৩) যেখানেই ভাঙা শিশি, কাচের বোতল ইত্যাদি পাইবে তাহা দূরে ডাস্টবিনে নিয়া ফেলিবে, কারণ, এই সব ভাঙা শিশি-বোতলেও বৃষ্টির জল জমিয়া মশার সৃষ্টি হইতে পারে।

(৪) খাটাল, গোশালা ও আস্তাবল পরিষ্কার ঝকঝকে রাখিবে।

(৫) ঘরের মেঝেতে, দেওয়াল কিংবা ছাতে কোথাও যদি কোন ফাটল কিংবা গর্ত থাকে তবে উহা তৎক্ষণাৎ বুজাইয়া ফেলিবে। ইঁদুর, আরশোলা ও ছারপোকার বাসস্থান এই সমস্ত ফাটল।

(৬) মাঝে মাঝে বাড়ি চুনকাম করাইবে।

(৭) মাঝে মাঝে সমস্ত আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার ও খাট পরীক্ষা করিয়া দেখিবে কোথাও ছারপোকা জন্মিয়াছে কিনা। এতদ্ব্যতীত আলমারির পশ্চাৎ ও ঘরের অন্ধকার কোণগুলি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া ঝাঁট দিবে। দিনের বেলায় মশা ও আরশোলা ঐসব স্থানে লুকাইয়া থাকে।

(৮) বাড়ির সমস্ত আবর্জনা, তরকারির খোসা, মাছের আঁশ, ডিমের খোলা একটি ঢাকনাওয়ালা পাত্রের মধ্যে প্রথমে জমাইয়া রাখিবে। তারপর ঐগুলি একসঙ্গে পোড়াইয়া ফেলিবে।

(৯) ঘরের জানালায়, অন্ততঃ রান্নাঘরের দরজা ও জানালায় মশা মাছি প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ সূক্ষ্ম জাল আঁটিয়া দিবে।

(১০) কোন খাদ্যই না ঢাকিয়া রাখিবে না।

(১১) বাড়িতে ইউক্যালিপটাস, নিম ও তুলসী গাছ পুঁতিয়া দিলে বায়ু বিশুদ্ধ হয়। তামাক গাছও রোগের জীবাণু ধ্বংস করে।

(১২) বাড়িতে নিম অথবা তামাক পাতা পোড়াইলে অথবা ধূপধুনা জ্বালাইলেও কীটপতঙ্গ দূর হয়। কাপড়চোপড় ও বইএর আলমারিতে শুকনো নিম পাতা ও তামাক পাতা দিয়া রাখিলে পোকা কাটিতে পারে না। কর্পূর অথবা নেপথালিন, ইউক্যালিপটাস তেল, পাইন ও দেবদারু কাঠ ঘরে রাখিয়া দিলে অথবা পোকামাকড়ের সম্ভাব্য বাসস্থানে পাইরেথ্রাম, সালফার, বোরাক্স, ফটকিরি কিংবা লঙ্কার গুঁড়া ছিটাইয়া দিলেও উহারা ধ্বংস হয়।

(১৩) জীবাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিবে। সমস্ত রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট হইল পেট্রোল, কেরোসিন, সালফার গ্যাস ও ফরমালডিহাইড ; কোন কোন ক্ষেত্রে নারিকেল তেলও কার্যকরী।

সাবান, গরম জল ও কেরোসিন তেলের মিশ্রণে এক প্রকার জীবাণুনাশক লোশন তৈয়ারী হয়। এই লোশন তৈয়ারীর উপাদান নিম্নরূপ :

সাবান	···	৩ ভাগ
গরম জল	···	১৫ ভাগ
কেরোসিন	···	৮২ ভাগ

প্রথমে গরম জলে সাবান বেশ ভাল করিয়া গুলিয়া নাও। তারপর একটি গরম জলের পাত্রের মধ্যে কেরোসিনের বোতলটি রাখিয়া কেরোসিন উত্তপ্ত করিয়া নাও। মনে রাখিবে আগুনের কাছে রাখিয়া কেরোসিন গরম করিতে নাই। এইবার উত্তপ্ত কেরোসিন সাবান মিশ্রিত গরম জলের সঙ্গে মিশাইয়া নাও। যে লোশন তৈয়ারী হইল উহা কোন বোতলে পুরিয়া রাখিবে। তারপর প্রয়োজনমত জলের সঙ্গে (লোশন ৯ : জল ১০) মিশাইয়া ঘরে স্প্রে কর। ইহা অত্যন্ত সস্তা এবং কার্যকরী।

মশা

মশা আমাদের পরম শত্রু। ভারতের প্রায় সর্বত্রই মশার উপদ্রব দেখা যায়।

মশার স্বভাব ও জীবন-বৃত্তান্ত : ইহা একপ্রকার ডানাযুক্ত ক্ষুদ্র পতঙ্গ বিশেষ। পুরুষ মশা সাধারণতঃ ঘাসপাতার রস খাইয়া জীবনধারণ করে কিন্তু স্ত্রীমশার ডিমের পরিপুষ্টির জন্য মানুষের রক্ত না হইলে চলে না। বদ্ধ জলাশয় পাইলে উহারা ডিম পাড়িয়া রাখে। চারিটি অবস্থার ভিতর দিয়া মশার পরিণতি হয়—ডিম, শুককীট বা লার্ভা, মূককীট অর্থাৎ পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ মশক।

মশার ডিমগুলি প্রথমে জলে ভাসিয়া বেড়ায়। তারপর প্রায় ২০ ঘণ্টা পরে উহাদের শূককীট বাহির হয়। বায়ু গ্রহণ করিবার সময় শূককীটগুলি কিছুক্ষণ পর পরই
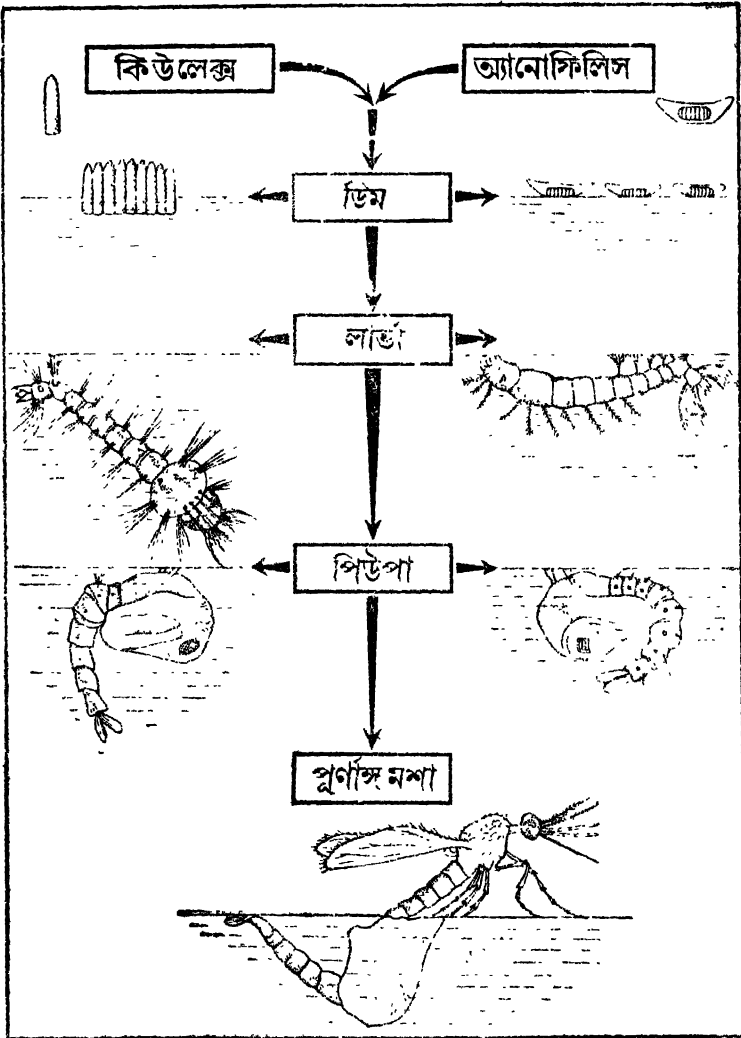
জলের উপর ভাসিয়া ওঠে। ৭ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে শূককীটগুলি মূককীটে পরিণত হয় এবং তিন চারদিন পরে খোলস বদলাইয়া ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ মশা বাহির হইয়া আসে।

মশার প্রকারভেদ ঃ মশা সাধারণতঃ তিন প্রকার ঃ অ্যানোফিলিস, কিউলেক্স ও স্টেগোমায়া। উহারা যথাক্রমে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া এবং ডেঙ্গুজ্বর ছড়াইয়া থাকে।

মশা নিবারণ : (১) যে সমস্ত স্থানে মশার ডিম পাড়িবার সম্ভাবনা আছে সেই সমস্ত গর্ত, খানা, ডোবা, এঁদো পুকুর ইত্যাদি ভরাট করিয়া ফেলিবে এবং বাড়ির আশেপাশে কোন জঞ্জাল জমিতে দিবে না।

(২) শূককীট অবস্থায় মশা নিধন করা সহজ। শূককীটগুলি বায়ু ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। কাজেই যে জলে মশা ডিম পাইয়াছে ঐ জলে কিছু কেরোসিন ঢালিয়া দিলে জলের উপর একটি পাতলা আবরণ পড়ে শূককীটগুলি তখন ঐ আবরণ ভেদ করিয়া বায়ু গ্রহণ করিতে পারে না এবং বায়ুর অভাবে শীঘ্র মরিয়া যায়।

পুষ্করিণীতে মাছ রাখিলে মাছও মশার শূককীট খাইয়া ফেলে।

(৩) রাত্রে সর্বদা মশারি খাটাইয়া শুইবে।

(৪) অন্ধকার না হইলে অ্যানোফিলিস মশা বাহির হয় না। সুতরাং অন্ধকার হইবার পূর্বেই ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিবে।

(৫) ডি. ডি. টি., গ্যামাক্সিন কিংবা কেরোসিন লোশন স্প্রে করিলেও মশা ধ্বংস হয়। ঘরে নিমপাতা কিংবা ধূপ পোড়াইলে মশা দূর হয়।

ছারপোকা

প্রকৃতি : ছারপোকা অতিশয় বিরক্তিকর ও ঘৃণ্য জীব। মানুষের রক্ত পান করিয়াই উহারা বাঁচিয়া থাকে। প্রতি পাঁচদিন অন্তর উহাদের একবার করিয়া আহার দরকার। তবে খাদ্য না পাইলেও উহারা একনাগাড়ে কয়েক মাস মরার মত থাকিতে পারে।

বাসস্থান : ঘরের ফাটলে, মেঝেতে, খাটে, বিছানা ও আসবাবপত্রে ছারপোকা লুকাইয়া থাকে।

ছারপোকা

ছারপোকা নিবারণ : (১) বিছানাপত্র নিয়মিত রৌদ্রে দিলে এবং বাড়ি মাঝে মাঝে চুনকাম করাইলে ছারপোকা জন্মিবার সম্ভাবনা কম থাকে।

(২) ছারপোকা জন্মাইলে আসবাবে ফুটন্ত জল ঢালা সঙ্গত কারণ ইহাতে তাহাদের বংশ হ্রাস পায়।

(৩) কেরোসিন তেলের সঙ্গে ডি. ডি. টি. কিংবা গ্যামাক্সিন স্প্রে করিয়া দিলে ছারপোকা নষ্ট হয়।

(৪) বাড়ি মাঝে মাঝে চুনকাম করাইলে দেওয়ালের ফাটলে আর ছারপোকা জন্মিতে পারে না।

উকুন

প্রকৃতি : উকুন একপ্রকার ডানাবিহীন ক্ষুদ্র পতঙ্গ। ইহারা মানুষের রক্ত পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে। সাধারণতঃ উকুনের সান্নিধ্যে না আসিলে উকুন জন্মায় না। সাধারণতঃ মাথায় ও গায়েই উকুন জন্মায়। তবে নোংরা দেহে আশ্রয় পাইলে সহজেই উহাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে।

রোগ সংক্রমণ : উকুন টাইফাস জ্বর সংক্রামিত করে। টাইফাস রোগীর রক্ত পান করিবার সময় ঐ রোগের জীবাণু উকুনের পেটে চলিয়া যায় এবং সেখানেই বাড়িতে

থাকে। প্রায় ৭ দিন পরে কোন সুস্থ ব্যক্তির রক্ত পান করিবার সময় ঐ জীবাণু ঢালিয়া দেয়।

উকুন নিবারণ ঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই উকুন প্রতিরোধের সর্বপ্রধান উপায়। উকুন আছে এরূপ লোকের সংস্রব এড়াইয়া চলিবে। মাথায় উকুন জন্মাইলে ডি. ডি. টি. (৫% ভাগ) জলে গুলিয়া মাথা ঘষিয়া ফেলিবে। উকুন দূর করা দুঃসাধ্য হইলে মাথা ন্যাড়া করাই সঙ্গত।

মশা, ছারপোকা এবং উকুন এই পতঙ্গগুলি রোগের সক্রিয় বাহক।

মাছি

মাছি আমাদের পরম শত্রু। ইহারা মল, মূত্র, গয়ের ইত্যাদির উপর বসিয়া সমস্ত
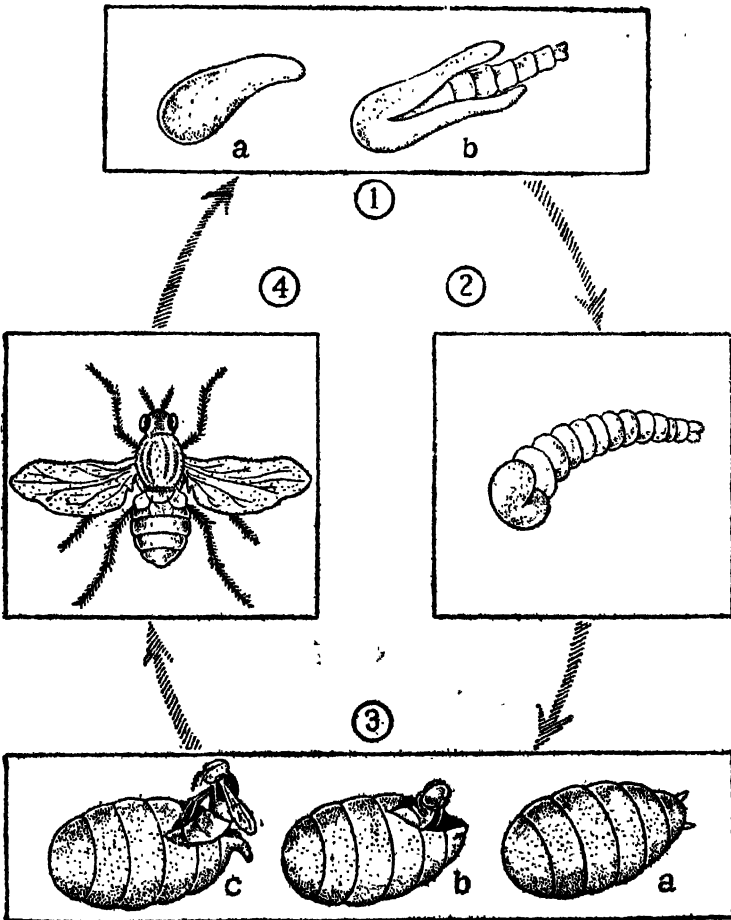
দেহে রোগের জীবাণু বহন করে এবং তারপর আমাদের খাদ্যদ্রব্যে বসিয়া খাদ্যদ্রব্য

দূষিত করে। এইভাবে মাছির দ্বারা টাইফয়েড, আমাশয়, কলেরা প্রভৃতি রোগ সংক্রামিত হয়। এতদ্ব্যতীত ক্ষতস্থানে বসিয়া ডিম পাড়িয়া ক্ষত বিষাক্ত করিয়া তোলে।

জীবন-বৃত্তান্ত ঃ মশার মতই মাছিরও চারিটি অবস্থা—(১) ডিম, (২) শূককীট, (৩) মূককীট ও (৪) পূর্ণাঙ্গ মাছি।

(১) **ডিম্ব ঃ** মাছির ডিমগুলি দেখিতে চকচকে সাদা। ডিমগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র এবং সাধারণতঃ উপর্যুপরি সাজান থাকে।

(২) **শূককীট ঃ** একদিনের মধ্যে ডিমগুলি শূককীটে পরিণত হয়। আমরা ময়লার মধ্যে যে পোকা দেখি সেগুলি মাছির শূককীট।

(৩) **মূককীট ঃ** প্রায় এক সপ্তাহ পরে শূককীটগুলি মূককীটে পরিণত হয়। ইহারা দেখিতে গুটির আকার। মূককীটগুলির কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।

(৪) **পূর্ণাঙ্গ মাছি ঃ** সাধারণতঃ চার পাঁচদিন পরে মূককীটগুলির খোলস ফাটিয়া যায় এবং ডানাযুক্ত ক্ষুদ্র মাছি বাহির হইয়া আসে।

মাছি নিবারণ ঃ (১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই মাছির বংশবৃদ্ধি নিবারণ করিতে সাহায্য করে। বাড়ির ভিতর গোশালা, পায়খানা, নর্দমা সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে। গৃহের সমস্ত জঞ্জাল জড় করিয়া নিয়মিত পুড়াইয়া ফেলিবে।

(২) যেখানে সেখানে থুথু কিংবা গয়ের ফেলিবে না। এইসব জিনিসে বসিয়া মাছি যাহাতে রোগবিস্তার করিতে না পারে সেইজন্য উহাদের সর্বদা মাটি চাপা দিয়া ফেলিবে।

(৩) বাড়ি হইতে অনেক দূরে খাটা-পায়খানা রাখিবে।

(৪) খাদ্যদ্রব্য কদাপি অনাবৃত রাখিবে না।

ধাড়ি মাছির উচ্ছেদ ঃ সব রকম সাবধানতা সত্ত্বেও মাছি জন্মিতে পারে। তখন ফর্মালিন ডি. ডি. টি. ও পাইরেথ্রাম পাউডার ছড়াইয়া দিলে মাছির উপদ্রব্য কমিয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত ফ্লাই-পেপার ও ফ্লাই-ট্র্যাপের সাহায্যে মাছি মারিয়া ফেলিবে। রেড়ির তেল ৫ ভাগ ও রজন ৮ ভাগ একত্রে ফুটাইয়া আঠা তৈয়ারী করিয়া কাগজে ছড়াইয়া রাখিলে মাছির পা আটকাইয়া যায়। তারপর ঐ কাগজগুলি জড়াইয়া ফেলিবে।

আরশোলা ঃ আরশোলা অত্যন্ত বিপজ্জনক পতঙ্গ। প্রথমতঃ ইহারা আমাদের বইপত্র, কাপড়চোপড় এবং চামড়ার জিনিসপত্র খায়। উপরন্তু ইহারা নানা রোগের বাহকও বটে।

আরশোলা নর্দমার নোংরা এবং সবরকমের আবর্জনা ঘাটিয়া বেড়ায়। তারপর সেখান হইতে জীবাণু বহন করিয়া আনিয়া আমাদের খাদ্যে বসে। আরশোলা এইভাবে এমিবাজনিত আমাশয়, পোলিওমাইলিটিস এবং ডিপথেরিয়া ছড়াইতে সাহায্য করে।

আরশোলা প্রতিরোধ ঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই আরশোলা প্রতিরোধের প্রধান উপায়। মাঝে মাঝে বাড়ি চুনকাম করাইলেও আরশোলার উপদ্রব এড়ান যায়। বাড়িতে আরশোলা জন্মিলে খাবারের সঙ্গে বিষ মাখাইয়া দিলে আরশোলা ঐ বিষাক্ত খাবার খাইয়া মরিয়া যাইবে।

ইঁদুর ঃ কাপড়-চোপড়, বই ও মূল্যবান আসবাব কাটিয়া ইঁদুর আমাদের ক্ষতি করে। ইঁদুরের দংশনে একপ্রকার জ্বর (Rat Bite fever) হয়। সবচেয়ে ভয়ের

কথা এই যে ইঁদুর প্লেগ রোগের বাহক উপমক্ষিকাকে আকর্ষণ করিয়া আনে। এইসব উপমক্ষিকা ইঁদুরের রক্ত পান করে এবং প্রথমে ইঁদুরের মধ্যে প্লেগ ছড়ায়। পরে ইঁদুরের অভাবে তৃষ্ণার্ত হইয়া মানুষের রক্ত পান করে। দংশনকালে মানুষের দেহে প্লেগের জীবাণু সংক্রামিত করে।

নিবারণ ঃ (১) ইঁদুর খাদ্যের লোভেই বাড়িতে উৎপাত করে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য সতর্কতার সঙ্গে ইঁদুরের নাগালের বাহিরে রাখিবে।

(২) বাড়িতে বিড়াল পুষিলেও ইঁদুরের উপদ্রব থাকে না।

(৩) ইঁদুর ধরা ফাঁদও ব্যবহার করা চলে।

(৪) আটা কিংবা ময়দার সঙ্গে ইঁদুর মারা বিষ বাড়ির চারিদিকে ছড়াইয়া দিলে ইঁদুর ঐ বিষ খাইয়া মরিয়া যাইবে।

মাছি, আরশোলা ইত্যাদি পতঙ্গগুলি রোগের নিষ্ক্রিয় বাহক।

রুপালী পোকা (Silver fish) ঃ এই কীটগুলির গায়ের বর্ণ রুপালী আকৃতি ঠিক মাছের মত এবং দেহ অতিশয় মসৃণ। এইজন্য ইহাদের silver fish বা রুপালী পোকা বলা হয়। ইহারা মাছি কিংবা পোকার মত উড়িতে পারে না, তবে আঁকিয়া বাঁকিয়া পলাইয়া যাইতে পারে। কৃত্রিম রেশম বস্ত্র ইহাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং মাড়, বার্নিশ অথবা আঠা লাগানো জিনিস ইহারা খায়। আলমারির ভিতরে বই থাকিলে রুপালী পোকার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

নিবারণ ঃ বায়ু-সঞ্চালন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইহাদের দমন রাখে। মাঝে মাঝে বই, কাপড়চোপড় ঝাড়িয়া ফেলিলে বা পোশাক-পরিচ্ছদ রৌদ্রে দিলে ইহাদের উপদ্রব কমিয়া যায়। টাটকা পাইরেথ্রাম পাউডার ছিটাইয়া দিলে ইহাদের উপদ্রব কমে। তাছাড়া ঘরে পাইরেথ্রাম কিংবা গন্ধক পোড়াইলেও রুপালী পোকা ধ্বংস হয়।

উঁই ঃ উঁই পিপীলিকার মত পতঙ্গ নয়, তবে উহাদের মতই সুসংবদ্ধ। কাঠই ইহাদের প্রধান খাদ্য। উহারা তাই গাছের গুঁড়ি কিংবা কাঠের স্তম্ভের ভিতরটা এমনভাবে খাইয়া শেষ করিয়া ফেলে যে বাহিরের কেবল কাঠের ফাঁপা খোলাটি দাঁড়াইয়া থাকে। তারপর একদিন ধীরে ধীরে গাছটি আপনার ভারে ভাঙিয়া পড়ে।

উঁই প্রতিরোধের উপায় ঃ বাড়িতে উঁইএর বাসা থাকিলে তৎক্ষণাৎ ভাঙিয়া ফেলিবে। বাড়িতে ফাটল দেখিলে তৎক্ষণাৎ ভরাট করিয়া দিবে।

গাছে উঁই দেখিলে কেরোসিন তেলের লোশন স্প্রে করিয়া দিবে। বাজারে পোকামাকড় ধ্বংস করিবার যেসব ঔষধ পাওয়া যায় তাহাও মাঝে মাঝে স্প্রে করিবে।

কীটপতঙ্গের আক্রমণ এড়াইতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অবশ্য পালন করা উচিত ঃ

(১) বসতবাটি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক রাখিবে।

(২) বসতবাটির আশেপাশে কোথাও জল জমিতে দিবে না ; কারণ জল জমিয়া থাকিলে মশা সৃষ্টি হয়।

(৩) বাড়িতে কোথাও ফাটল কিংবা গর্ত থাকিলে তৎক্ষণাৎ বুজাইয়া ফেলিবে, নতুবা ইঁদুর, আরশোলা ও ছারপোকার উৎপাত বাড়িবে।

(৪) মাঝে মাঝে চুনকাম করাইবে এবং সেই সঙ্গে আসবাবপত্রগুলিও পালিশ করাইয়া লইবে।

(৫) বাড়ির সমস্ত আবর্জনা, তরকারির খোসা মাটি চাপা দিয়া দিবে, নতুবা নিয়মিত পোড়াইয়া ফেলিবে।

(৬) খাদ্যদ্রব্য সর্বদা ঢাকিয়া রাখিবে।

(৭) প্রতিদিন বাড়িতে ধূপধুনা দিবে এবং কাপড়চোপড় ও বইএর আলমারিতে ন্যাপথালিন কিংবা নিমপাতা দিয়া রাখিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

C. দেহসৌষ্ঠব বাড়াইবার কৌশল এবং সুগৃহিণী (The Art of Good Grooming and the Home Market)

1. পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য (Clothing—its need and purpose)

নিম্নলিখিত চারিটি কারণে আমরা পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব তথা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া আসিতেছি।

(১) শালীনতা রক্ষার জন্য : আদিম যুগের মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু যেদিন হইতে মানুষের মনে লজ্জার উদয় হইল সেদিন হইতে সে লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্রাদির গুরুত্ব অনুভব করিল। এক সময় বস্ত্র হিসাবে গাছের পাতা, বাকল, বন্য পশুর চামড়া ইত্যাদি বিভিন্ন তন্তুর বস্ত্রাদি ব্যবহার করিত।

(২) শীতাতপ হইতে দেহকে রক্ষা করার জন্যও আমরা বস্ত্রাদির গুরুত্ব অনুভব করিয়া থাকি। শীতের সময় দেহের তাপ বজায় রাখিতে আমরা পশমের বস্ত্রাদি ব্যবহার করি। পশমের বস্ত্রাদি অনেক দামী। এইজন্য দরিদ্র জনসাধারণ পশমের পরিবর্তে সুতির মোটা বস্ত্রাদি ব্যবহার করে। ঋতুভেদে বস্ত্রের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। যে সকল বস্ত্র জলে নষ্ট হয় না এবং সহজেই জলে ধোওয়া যায় সেইরূপ বস্ত্রাদি বর্ষাকালের উপযোগী। আবার গ্রীষ্মকালে প্রচুর ঘাম হয়। সুতরাং যে সকল তন্তু সহজেই ঘাম শুষিয়া লইতে পারে এবং যাহা দেহের উত্তাপ দ্রুত বায়ুতে সঞ্চালিত করিয়া দেহকে শীতল রাখিতে পারে সেইরূপ বস্ত্রাদিই গ্রীষ্মকালের উপযোগী। এইজন্য সুতি ও লিনেন বস্ত্রাদি এই সময় বিশেষ উপযোগী।

(৩) দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্যও আমরা পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব অনুভব করিয়া থাকি। সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। সৌন্দর্যচর্চার জন্য আমরা কত রকমের জিনিস ব্যবহার করি। ঐ সকল উপকরণের মধ্যে পোশাকের স্থান সকলের ঊর্ধ্বে।

(৪) রোগ-জীবাণু, আগুন এবং অন্যান্য অনিষ্টকর দ্রব্যাদির হাত হইতে দেহকে রক্ষা করাও পোশাক-পরিচ্ছদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোনও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করার সময় চিকিৎসকগণ হাতে দস্তানা পরিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে মুখেও অনুরূপ কোনো বস্ত্রাদির আবরণ ব্যবহার করেন। আবার রসায়নাগারে বিজ্ঞানীরা অ্যাসিড বা অন্য কোন মারাত্মক রাসায়নিক দ্রব্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 'অ্যাপ্রন' ব্যবহার করেন। ফায়ার ব্রিগেডের কর্মচারীরা আগুনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অ্যাসবেসটসের বস্ত্রাদি ব্যবহার করে। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার অনিষ্টকর দ্রব্যাদির হাত হইতে দেহকে রক্ষা করাও পোশাক-পরিচ্ছদের একটি কাজ।

2. বয়স, স্ত্রীপুরুষ ভেদে, পেশা এবং ঋতু অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন (Choice of clothes for different occasion according to age, sex, occupation and seasonal variations)

বয়স অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন : মানুষের জীবনকে আমরা শৈশব, কৈশোর ও যৌবন ও বার্ধক্য—প্রধানতঃ এই তিনটি পর্যায় ভাগ করিতে পারি। জীবনের এই তিনটি

প্রধান স্তরে মানুষের প্রয়োজন এবং রুচির পার্থক্য দেখা যায়। তাই পোশাক নির্বাচনের সময় প্রথমেই বয়সের কথা বিবেচনা করা দরকার। প্রথমেই শিশুর পোশাক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

(১) শিশুর পোশাক নির্বাচনে দৈহিক প্রয়োজনীয়তার দিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হয়। পোশাক পরিধানের জন্য দুইটি উদ্দেশ্য অর্থাৎ শালীনতা এবং সৌন্দর্য রক্ষার প্রশ্নটি শিশুর নিজের কাছে অবান্তর। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ঐ দুইটি দিকও বিবেচনা করিতে হয়। তবে শিশুর প্রাথমিক প্রয়োজন স্বাস্থ্য। শিশুর জন্য চাই স্বাস্থ্যসম্মত পোশাক।

যে পোশাক শিশুর দেহের তাপ-সংরক্ষণে এবং তাহাকে আরাম দিতে সমর্থ তাহাই স্বাস্থ্যসম্মত পোশাক। সুতির তন্তু তাপ-সুপরিবাহী বলিয়া গ্রীষ্মকালে শিশুকে আরাম দেয়, পরন্তু রেশম, পশম, কটসউল, ফ্লানেল প্রভৃতি তন্তুর পোশাক তাপ-কুপরিবাহী বলিয়া শীতকালে শিশুর দেহের তাপ সংরক্ষণে সাহায্য করে। ঐ সব তন্তুর মধ্যে আবার পশমই হইল সবচেয়ে বেশী তাপ-কুপরিবাহী। এইজন্য গ্রীষ্মকালে সুতির এবং শীতকালে পশমের পোশাকই শিশুর স্বাস্থ্যসম্মত।

(২) শিশুর অন্যতম প্রয়োজন পরিচ্ছন্নতা। প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুর রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা অনেক কম। শিশুর বস্ত্রের উপাদান এইরূপ হওয়া চাই যাহা সহজেই কাচা এবং শুকানো যায়। এই হিসাবে সুতির তন্তুই আমাদের দেশের শিশুদের উপযোগী।

(৩) ব্যবহারের সুবিধা দেখিয়া শিশুর পোশাকের উপাদান নির্বাচন করিবে। বয়স্কদের দিনে বারবার পোশাক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নানা কারণে শিশুর ঘন ঘন পোশাক বদলান দরকার। এইজন্য ব্যবহারের সুবিধা দেখিয়া শিশুর পোশাক নির্বাচন করিবে।

(৪) শিশুর অঙ্গ সঞ্চালন যাহাতে ব্যাহত না হয় এইজন্য ঢিলাঢালা পোশাকই স্বাস্থ্যসম্মত।

(৫) শিশুর পোশাকের রঙ্ উজ্জ্বল ও পাকা হওয়া চাই। ছোট শিশুরা উজ্জ্বল বর্ণই পছন্দ করে এবং উহা শিশুর মনও প্রফুল্ল রাখে।

(৬) সবচেয়ে শেষের কথা হইল শিশুর পোশাক হইবে হাল্কা, নরম, বাহুল্যবর্জিত ও সস্তা।

এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"শিশুরা, যাহারা ধূলিমাটিকে ঘৃণা করে না, যাহারা রৌদ্র-বৃষ্টি-বায়ুকে প্রার্থনা করে, যাহারা সাজসজ্জা করাইতে গেলে পীড়াবোধ করে, নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাতেই যাহাদের সুখ, নিজের স্বভাবে স্থিত করিয়া যাহাদের লজ্জা নাই; সঙ্কোচ নাই, অভিমান নাই, তাহাদিগকে চেষ্টার দ্বারা বিকৃত করিয়া দিয়া চিরদিনের মত অকর্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতামাতার দ্বারাই সম্ভব……" (শিক্ষাসমস্যা)।

"অভিভাবকদের লজ্জা নিবারণ ও গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য লেস ও সিল্কের আবরণে বাতাসের সোহাগ ও আলোকের চুম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা চীৎকার

শব্দে বধির বিচারকদের কর্ণে শিশুজীবনের অভিযোগ উত্থাপিত করিতে থাকে। বস্তুতঃ এ ঝগড়া তো শিশুর সঙ্গে নয়, এ ঝগড়া প্রকৃতির সঙ্গে।"

"ইহার সঙ্গে আসিল শিশুকে অকালে দৈহিক লজ্জা শিখান, 'অর্থহীন ভদ্রতাবোধ ও বাবুগিরি শিখান', আর নির্যাতন—'এই কাপড় ছিঁড়িল, এই কাপড় ময়লা হইল; আহা সেদিন এত টাকা দিয়া এমন সুন্দর জামা করাইয়া দিলাম লক্ষ্মীছাড়া কোথা হইতে তাহাতে কালি মাখাইয়া আনিল।' এই বলিয়া যথোচিত চপেটাঘাত ও কানমলার যোগে শিশুজীবনের সকল খেলা ও সকল আনন্দের চেয়ে কাপড়কে যে কী করিয়া খাতির করিয়া চলিতে হয় তাহা শিখান হইয়া থাকে।" (আচরণ)

রবীন্দ্রনাথ সাত বৎসর পর্যন্ত শিশুকে উলঙ্গ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এই ব্যাপারে মতভেদ থাকিতে পারে। তবে বলা যায় মহার্ঘ বা জমকালো পোশাকের তুলনায় বেশী পরিমাণে নরম, পরিষ্কার এবং সাদাসিধা জামাকাপড়ই শিশুর পক্ষে উপযুক্ত। শিশুর দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া জামাকাপড় জোগাইয়া চলা কঠিন। তাই যে সব কাপড় সহজে কাচা যায় বারবার বদলান যায়, সুলভ অথচ যা রুচিসঙ্গত এবং সুশ্রী শিশুর পক্ষে তাহাই প্রশস্ত।

কৈশোর ও যৌবনের পোশাক : কৈশোর বিশেষতঃ যৌবনের পোশাকের প্রধান উদ্দেশ্য হইল আপন আপন সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করিয়া তোলা। তাছাড়া তাহাদের পোশাকও শিশুর পোশাকের মতই স্বাস্থ্যসম্মত হইবে। অতিরিক্ত আঁটসাট ব্লাউজ অথবা কর্সেট তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়।

পোশাকের রঙ্ কিশোরী মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্য হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিশেষ সাহায্য করে। যেমন একটি কালো মেয়ে বিরোধী (contrast) বর্ণের পোশাক পরিধান করিতে পারে কিন্তু গভীরভাবে বিরোধী (sharp contrast) বর্ণের পোশাক তাহার পক্ষে বেমানান।

উৎসব এবং বিবাহাদি অনুষ্ঠানে কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের পোশাক হইবে উজ্জ্বল এবং সময় বিশেষে জমকালো। সাধারণতঃ লাল, কমলা, হলুদ বা গাঢ় অন্য কোন রঙের পোশাক উৎসবের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। তবে গাত্রবর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া উৎসবের দিনের পোশাকের রঙও নির্বাচিত হওয়া উচিত।

মেয়েদের পোশাকের ক্ষেত্রে শালীনতার প্রশ্নটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ব্যয়বহুল ও কদর্য পোশাক দেখিয়া সমাজবেত্তা ভেবলেন কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ফ্যাসান মানেই ব্যয়বাহুল্য এবং কদর্যতা'। ব্যয়বহুল এবং কদর্য পোশাক পরিত্যাগ করিয়া স্বাস্থ্য-সম্মত রুচিকর পোশাক পরিধান করা কর্তব্য।

বৃদ্ধ বয়সের উপযোগী পোশাক : বয়স বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে বেশভূষায়ও পরিবর্তন আনা দরকার। বাহুল্যবর্জিত সাদামাটা পোশাকই বৃদ্ধ বয়সের উপযুক্ত। তবে শিশুর মতই বৃদ্ধের পোশাকও পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যের অনুকূল বিশেষতঃ ঋতুর উপযোগী হওয়া চাই।

স্ত্রীপুরুষভেদে পোশাকের বিভিন্নতা : প্রত্যেক দেশেই স্ত্রীলোক এবং পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট পোশাকের ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সাধারণতঃ ছোট ছোট বালকদের জন্য শার্ট-প্যাণ্ট, বালিকাদের জন্য আবার ফ্রক, ইজার, পুরুষদের জন্য ধুতি-পাঞ্জাবী, শার্ট-প্যাণ্ট, স্ত্রীলোকের জন্য শাড়ি-ব্লাউজ নির্ধারিত রহিয়াছে।

পেশা অনুযায়ী পোশাক ঃ নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী প্রত্যেক লোকের পোশাক পরিধান করা উচিত। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের উপযোগী পোশাক হইল ধুতি ও পাঞ্জাবী। ঐরূপ বৃত্তিতে নিযুক্ত মেয়েদেরও অতিরিক্ত জমকালো পোশাক বেমানান। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেয়ে তাহাদের পোশাক যেন মানুষের মনে সম্ভ্রম জাগায়। পরন্তু একজন এয়ার হস্টেসের (air hostess) পোশাক হইবে বাহারে এবং উজ্জ্বল কিংবা একটি মেয়ের পোশাক যদিও শাড়ি এবং ব্লাউজ তথাপি একটি মেয়ে-পাইলটের পোশাক হইবে শার্ট-প্যান্ট নতুবা তাহার কাজে অসুবিধা ঘটিবে।

অনেক বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আবার নির্দিষ্ট পোশাক আছে। ভারতের জাতীয় পোশাক ধুতি এবং কুর্তা তথাপি চিকিৎসক, সৈনিক, বিমানচালক, কারখানার ফোরম্যানদের নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করিতে হয় নতুবা তাহাদের কর্মক্ষমতা ব্যাহত হয়, অনেকের আবার জীবনহানিরও আশঙ্কা থাকে। এই জন্যই বৃত্তি বা কর্ম অনুসারে পোশাক পরিধান করা উচিত।

ঋতু অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন ঃ পোশাক প্রত্যেক ঋতুর উপযোগী হওয়া চাই। দেহের তাপ সংরক্ষণ বস্ত্রের সর্বপ্রধান গুণ। যে তন্তুর তাপ সংরক্ষণের ক্ষমতা যত বেশী সেই তন্তুর পোশাক দেহকে উত্তপ্ত রাখিতে তত বেশী সমর্থ। উত্তাপ-সংরক্ষণক্ষমতা অনুযায়ী বস্ত্রকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি ঃ তাপ-সুপরিবাহী এবং তাপ-কুপরিবাহী। তাপ-কুপরিবাহী তন্তু দেহের উত্তাপ বাহিরের বায়ুতে পরিবাহিত করিতে পারে না। এইজন্য দেহ এবং ঐ তন্তুর দ্বারা প্রস্তুত পোশাকের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ু উত্তপ্ত থাকিয়া দেহ গরম রাখে। রেশম, পশম ইত্যাদি তাপ-কুপরিবাহী তন্তু, তবে উভয়ের মধ্যে পশমের দেহকে উত্তপ্ত রাখিবার ক্ষমতা বেশী কারণ একদিকে যেমন তাপের কুপরিবাহী তেমনি অন্যদিকে ইহা নিজের মধ্যে অধিক পরিমাণে বায়ু আবদ্ধ রাখিতে পারে। তাপ সুপরিবাহী তন্তুর জামাকাপড় দেহ এবং পোশাকের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ুর উত্তাপ বাহিরের বায়ুতে সহজেই পরিবাহিত করিতে পারে। ফলে দেহ শীতল থাকে। সকল রকম তন্তুর মধ্যে সুতি সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ-সুপরিবাহী।

আমাদের দেহের তাপমাত্রা হইল ৯৮ ডিগ্রী। বায়ুর তাপমাত্রা সর্বদা ৯৮ ডিগ্রী থাকে না। আবহাওয়া অনুযায়ী উহা ওঠানামা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্রতা যখন বেশী থাকে তখন বস্ত্রের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ু হইতে তাপ পরিবাহিত হইতে না পারিলে গরম লাগে ও ঘাম হয়। এইজন্য গ্রীষ্মকালের উপযোগী স্বাস্থ্যসম্মত পোশাকের উপাদান হইল তাপ-সুপরিবাহী সুতির তন্তু। শীতের সময় আবার তাপ-কুপরিবাহী তন্তু যেমন কট্‌সউল, ফ্লানেল, রেশম, পশম ইত্যাদির পোশাক দেহ উত্তপ্ত রাখিতে পারে। এই সকল তন্তুর মধ্যে আবার পশমই সর্বাপেক্ষা বেশী তাপ-কুপরিবাহী। তাছাড়া পশমের অন্যান্য গুণও আছে, যেমন—

(ক) পশমে ধুলোবালি লাগিলে সহজেই ঝাড়িয়া ফেলা যায়।

(খ) পশম তন্তুগুলি আঁকাবাঁকা এবং খাঁজ খাঁজ বলিয়া উহা অন্যান্য তন্তুর তুলনায় গরম।

(গ) অন্যান্য তন্তুর তুলনায় অধিক জল শোষণ করিয়াও ইহা আপনার শুষ্কতা বজায় রাখিতে পারে। বর্ষার ফলে কিংবা শীতের সময় কুয়াশা লাগিয়া পশমের জামা

ভিজিয়া যায় না। তাছাড়া পশমের জামা পরিয়া যদি ঘাম হয় তবে পশম ঐ ঘাম শুষিয়া লইবার পরেও নিজের শুষ্কতা বজায় রাখে।

এই সকল কারণে শীতকালে পশমের পোশাকই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। গ্রীষ্ম এবং শীত ঋতুর উপযোগী পোশাকের কথা আলোচনা করা হইল। অন্যান্য ঋতুতে বিশেষতঃ ঋতু পরিবর্তনের সময় আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পোশাকের তন্তু নির্বাচন করিবে।

3. **পোশাকের উপাদান নির্বাচন** (Selection of fabrics with emphasis on beauty, comfort, washability, durability and ease of handling) : দেশ, কাল, আবহাওয়া, ঋতু এবং সর্বোপরি রুচি অনুযায়ী মানুষ পোশাকের উপাদান নির্বাচন করিয়া থাকে।

সৌন্দর্যবোধ : পোশাক নির্বাচনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির দৈহিক সৌন্দর্য বাড়ানো। অবশ্য সৌন্দর্যের দিকে বেশী নজর দিতে গিয়া উহা যেন কখনই মানুষের আর্থিক সীমা অতিক্রম না করে।

আরাম : তন্তুর প্রধান গুণ হইল দেহের তাপ সংরক্ষণ। যে তন্তুর তাপ সংরক্ষণের ক্ষমতা যত বেশী সেই তন্তুর পোশাক দেহকে উত্তপ্ত রাখিতে তত বেশী সমর্থ। উত্তাপ সংরক্ষণক্ষমতা অনুযায়ী বস্ত্রকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি—তাপ-সুপরিবাহী এবং তাপ-কুপরিবাহী। তাপ-কুপরিবাহী তন্তু দেহের উত্তাপ বায়ুতে পরিবাহিত করিতে পারে না। এইজন্য দেহ এবং ঐ তন্তুর দ্বারা প্রস্তুত পোশাকের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ু উত্তপ্ত থাকিয়া দেহকে গরম রাখে। রেশম, পশম ইত্যাদি তাপ-কুপরিবাহী তন্তু। তাই শীতের সময় ঐসব উপাদানে নির্মিত পোশাক আমাদের আরাম দেয়। তাপ-সুপরিবাহী তন্তুর জামাকাপড় দেহ এবং পোশাকের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ুর উত্তাপ বাহিরের বায়ুতে পরিবাহিত করিতে পারে। ফলে দেহ শীতল থাকে। সকল রকম তন্তুর মধ্যে সুতি সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ-সুপরিবাহী। গ্রীষ্মকালে তাই সুতির পোশাক সর্বাপেক্ষা আরামদায়ক। মোটের উপর বিভিন্ন শ্রেণীর তন্তু বিভিন্ন ঋতুতে আরামদায়ক। তাই আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পোশাকের উপাদান নির্বাচন করিতে হয়।

কাচার সুবিধা : কাচার সুবিধা দেখিয়া পোশাকের উপাদান নির্বাচিত হওয়া উচিত। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জামাকাপড় ধুলাবালি এবং ঘামে সহজেই নোংরা হইয়া যায়। যেসব কাপড় নিয়মিত ধোয়া যায় না তাহা ঠিক আমাদের দেশের পক্ষে উপযোগী নয়। ধোয়া-কাচার সুবিধার জন্য আজকাল আমাদের দেশে নাইলন, ডেক্রন, টেরিলিন ইত্যাদি সাংশ্লেষিক তন্তুগুলি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। তবে ঐসব তন্তুগুলি ঠিক সকল ঋতুর উপযোগী নয়।

স্থায়িত্ব : পোশাকের অপর গুণ হইল উহার স্থায়িত্ব। যেসব কাপড় সহজেই ফাঁসিয়া যায়, কিংবা রঙ চটিয়া যায় উহা ব্যবহারের উপযোগী নয়।

ব্যবহারের সুবিধা : ব্যবহারের সুবিধা দেখিয়া সর্বদা পোশাকের উপাদান নির্বাচন করিবে। সুতির তন্তু যদিও আরামদায়ক তথাপি উহা কাচা, কলপ দেওয়া, ইস্ত্রি করা অত্যন্ত সময় ও শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। তাই যাহাদের প্রতিদিন কাজে ছুটিতে হইতেছে

তাহারা অনেকেই সুতির তন্তু পরিত্যাগ করিয়া নাইলন, ডেক্রন ইত্যাদি সাংশ্লেষিক তন্তুর দিকে ঝুঁকিতেছেন। একই কারণে জরির কাজ করা শাড়ি ইত্যাদিও দৈনন্দিন ব্যবহারের অনুপযোগী।

মোটের উপর যাহা সুন্দর ও স্থায়ী, আরামদায়ক, সহজেই কাচা যায় তাহাই পোশাকের আদর্শ উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়।

পোশাকের যত্ন

উপযুক্ত সংরক্ষণ ও যত্নের উপরই গৃহের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। নিয়মিত দামী ও মহার্ঘ পোশাক ক্রয় করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যে দুই-এক প্রস্থ দামী ও মহার্ঘ পোশাক আমাদের থাকে সেগুলিকে যদি ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায় তবে বিবাহ ও উৎসবাদিতে পোশাকের অভাব হইবে না। উপযুক্ত যত্ন লইলে নিত্য ব্যবহার্য পোশাক-গুলিও বহুদিন ব্যবহারের উপযোগী থাকে।

পোশাকের প্রধান শত্রু হইল আরশোলা, রুপালী পোকা ইত্যাদি। এইসব পোকার উপদ্রব হইতে পোশাক রক্ষার জন্য আলমারি ও ট্রাঙ্কে ন্যাপথালিন দিয়া রাখিতে হয়। জলীয় বাষ্প থাকিলে কাপড়ে ফাঙাস জন্মিয়া mildew সৃষ্টি করিবার আশঙ্কা থাকে। যেখানে ঐ ফাঙাস লাগিয়া থাকে সেখানে কাপড়ের তন্তুগুলি তাড়াতাড়ি ফাঁসিয়া যায়। তাই কাপড় কাচা ও ইস্ত্রি করার পরে পোশাক সর্বদা কিছুক্ষণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবে এবং এইভাবে বায়ুচালিত করিয়া তুলিয়া রাখিবে। নিত্যব্যবহার্য পোশাক-গুলি হাতের কাছে রাখা যায় তবে দামী সুতি ও সিল্কের পোশাক ও গরম বস্ত্রগুলি ব্যবহারের পর কাচিয়া ও বায়ুচালিত করিয়া লইবে। তারপর বাক্স অথবা আলমারিতে ন্যাপথালিন দিয়া সর্বদা সুরক্ষিত করিয়া রাখিবে। তাছাড়া বছরে দুই একবার এইসব তোলা পোশাকগুলি রৌদ্রে দিয়া লইতে হয়।

চতুর্থ অধ্যায় | পরিবারের উপযোগী তন্তু সংক্রান্ত জ্ঞান
(Knowing the Fibres of the family)

1. **বিভিন্ন তন্তু এবং সাংশ্লেষিক তন্তু সম্বন্ধে আলোচনা** (Study of different textiles including synthetic fibres) : সৃষ্টির আদিতে অসভ্য বর্বর মানুষের লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত পোশাক-পরিচ্ছদের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লজ্জা নিবারণ ও শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিল। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত রুচির পরিবর্তন হওয়ায় পোশাক-পরিচ্ছদেও নানা বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। প্রথমে এই পোশাকের উপকরণ ছিল প্রকৃতিজাত সুতি, লিনেন, রেশম ও পশম। আজকাল মানুষ তাহার প্রয়োজন মত আরো অনেক রকমের তন্তু আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষের আবিষ্কৃত এই সকল তন্তুর ভিতর রেয়ন, নাইলন, ভিনিয়ন, সরন ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে।

কিরূপ তন্তু দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভব ?

বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ, যেমন কাপড়-জামা ইত্যাদি সুতা হইতেই বোনা হইয়া থাকে। এই সুতা আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ বা তন্তুর সাহায্যে প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন বস্তুর আঁশের গুণাগুণের ভিতর অনেক পার্থক্য আছে। এইজন্য সকল বস্তুর আঁশ বা তন্তু হইতে আমাদের কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুত করা যায় না। যেমন, তুলা ও পাটের আঁশের মধ্যে প্রথমটি অনেক সরু, মসৃণ, নরম ও নমনীয় বলিয়া তুলা হইতেই কাপড় প্রস্তুত হয়। পাটের আঁশ অনেক মোটা, খসখসে বলিয়া ঐ আঁশ হইতে সাধারণতঃ কাপড় প্রস্তুত হয় না। সাধারণতঃ যে সকল গুণ থাকিলে আঁশ বা তন্তুকে কাপড় বুনিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করা হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল :

(১) সুতা যত শক্ত হইবে কাপড় তত টেকসই হইবে। আঁশগুলিকে লম্বালম্বি জোড়া দিয়াই সুতা প্রস্তুত করা হয়। আঁশ লম্বা হইলে এই জোড়াও শক্ত হয়। সুতরাং লম্বা আঁশ বা তন্তু কাপড় বুনিবার পক্ষে উপযুক্ত। আঁশগুলি ছোট হইলেও যদি ঐ আঁশের মধ্যে ভাঁজ থাকে তবে উহা দ্বারা শক্ত সুতা প্রস্তুত করা যায়। যেমন, তুলার আঁশগুলি লম্বায় ছোট হইলেও ইহাদের মধ্যে ভাঁজ থাকায় তুলা হইতে টেকসই কাপড় প্রস্তুত হয়।

(২) আঁশগুলি শুধু শক্ত হইলেই চলিবে না। স্থিতিস্থাপকতা এবং নমনীয়তাও উৎকৃষ্ট আঁশের বিশেষ গুণ। আঁশকে দুমড়াইলে বা মোচড়াইলে যদি ভাঙিয়া যায় তবে তাহা দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে না।

(৩) কাপড়কে যাহাতে বিভিন্ন রঙে রঙিন করা যায় সেইজন্য বিভিন্ন রঙ ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকা আঁশ বা তন্তুর একটি প্রয়োজনীয় গুণ। আঁশে ট্যানিন নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকিলে বা মোম জাতীয় তৈলাক্ত পদার্থ থাকিলে রং তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। এই কারণেই একপ্রকার প্রকৃতিজাত রেশম তন্তু (wild silk) এবং অ্যাসিটেট রেয়ন দ্বারা রঙিন বস্ত্র প্রস্তুত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য।

(৪) আঁশের চাকচিক্য বা ঔজ্জ্বল্য একটি আবশ্যক গুণ। রেশম তন্তুর স্বাভাবিক চাকচিক্যের জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহা সুতির বস্ত্র অপেক্ষা অধিক আদৃত হইয়া আসিতেছে। সুতির বস্ত্রেও আজকাল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চাকচিক্য সৃষ্টি করা হয়। ইহাকেই 'মারসেরাইজড্ কাপড়' (mercerized cloth) বলে।

(৫) প্রত্যেক আঁশই প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার ময়লা, গাম, পেকটিন ইত্যাদির সহিত মিশ্রিত থাকে। আঁশ হইতে সুতা প্রস্তুত করিবার সময় এই সকল ময়লা দূর করিয়া লওয়া হয়। যে আঁশ হইতে যত সহজে এই ময়লা দূর করা যায়, তাহা বস্ত্র তৈয়ারী করিতে তত বেশী উপযোগী। পাট, রেশম ইত্যাদি তন্তুর অন্যান্য গুণ থাকিলেও ইহাদের ময়লা বিশেষতঃ আঁশের উপরে শক্ত গাম সহজে দূর করা যায় না বলিয়া ইহারা তুলা বা লিনেন আঁশের তুলনায় নিকৃষ্ট।

(৬) বিভিন্ন আঁশের ক্ষয় প্রতিরোধ করিবার শক্তি বিভিন্ন। পশমের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। এইজন্য উহা পোকায় কাটিয়া সহজেই নষ্ট করিয়া দেয়। পশমের ন্যায় লিনেন এবং প্রকৃতিজাত রেশমকে অত সহজেই পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিতে পারে না। অতএব লিনেন এবং প্রকৃতিজাত রেশম এক্ষেত্রে পশম হইতে শ্রেষ্ঠ।

(৭) এতদ্ব্যতীত যে সকল আঁশ স্বাভাবিক তাপে, মৃদু ক্ষার বা অ্যাসিডে নষ্ট হইয়া যায় না তাহাই বস্ত্রশিল্পে বিশেষ উপযোগী।

তন্তুর শ্রেণীবিভাগ ঃ প্রাচীনকালে বস্ত্রশিল্পে সাধারণতঃ রেশম, পশম, সুতি ও লিনেন এই চারি প্রকারের তন্তুই ব্যবহার করা হইত। আধুনিক যুগে বিভিন্ন প্রকারের রেয়ন, নাইলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি মনুষ্যসৃষ্ট তন্তুও বস্ত্র-শিল্পে প্রচুর ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন তন্তুগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) অকৃত্রিম বা প্রকৃতিজাত তন্তু।

(২) কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট তন্তু।

অকৃত্রিম বা প্রকৃতিজাত তন্তুগুলিকে আবার তাহাদের উৎপত্তি অনুসারে বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করা যায়। যেমন,

(ক) উদ্ভিজ্জ তন্তু ঃ উদ্ভিদ্-জগৎ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে উদ্ভিজ্জ তন্তু বলে। সুতি, লিনেন, র‍্যামী, ক্যাপক, পাট, নারিকেল ছোবড়া ইত্যাদি তন্তুগুলি উদ্ভিজ্জ তন্তু।

(খ) প্রাণিজ তন্তু ঃ যে সকল তন্তু প্রাণিজগৎ হইতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে প্রাণিজ তন্তু বলে। এই জাতীয় তন্তুর মধ্যে রেশম ও পশমের নাম উল্লেখযোগ্য।

(গ) খনিজ তন্তু ঃ এই জাতীয় তন্তু বিভিন্ন আকরিক হইতে পাওয়া যায়। এস্‌বেস্‌টস্ (Asbestos), গ্লাস ও ধাতব তন্তু এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট তন্তুগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ

(ক) রেয়ন তন্তু

(খ) ক্যাসন

(গ) সিনথেটিক (synthetic) বা সাংশ্লেষিক তন্তু।
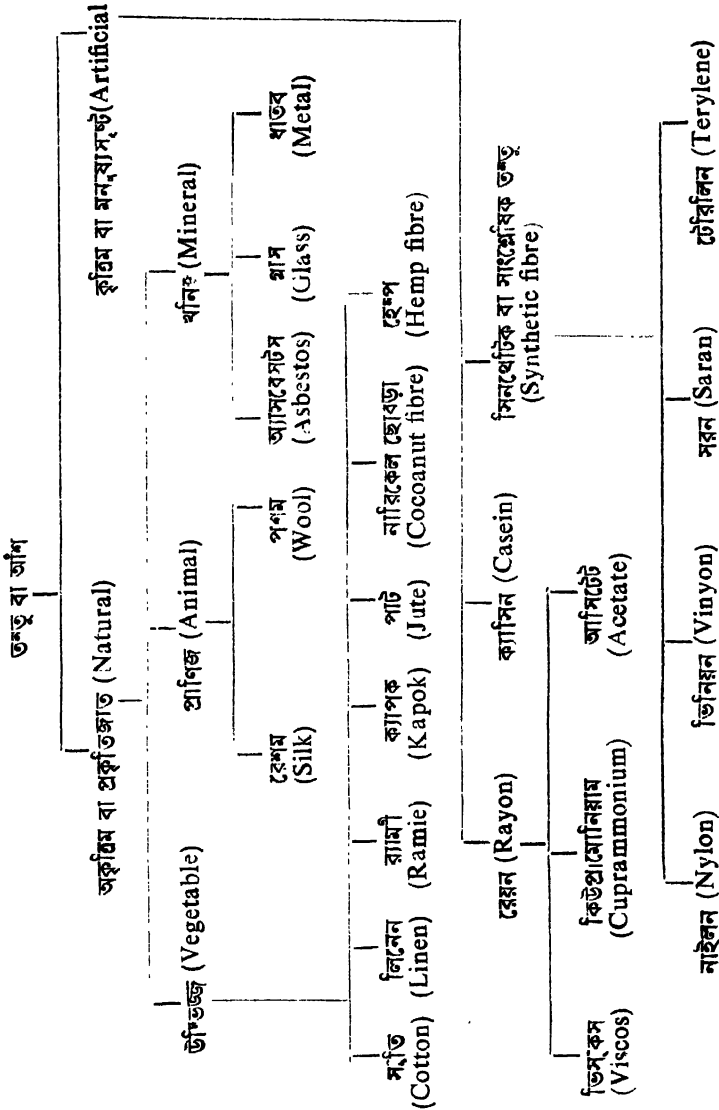
রেয়ন তন্তুকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় ; যেমন—ভিসকস্ রেয়ন, কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন, অ্যাসিটেট রেয়ন। এই সকল রেয়ন উদ্ভিদ্ এবং প্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহারা সাংশ্লেষিক তন্তুর অন্তর্গত নহে।

সিন্থেটিক বা সাংশ্লেষিক তন্তুগুলি উদ্ভিদ্ বা প্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন নহে। ইহারা জল, বায়ু এবং কয়লা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়। এইজন্য ইহারা সাংশ্লেষিক তন্তু। নাইলন, ভিনিয়ন, সরণ এবং টেরিলিন এই জাতীয় তন্তু।

অকৃত্রিম বা প্রকৃতিজাত তন্তু (Natural Fibres)

(ক) উদ্ভিজ্জ তন্তু

সুতি, লিনেন ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই জাতীয় আঁশ সেল্যুলোস (Cellulose) নামক একপ্রকার পদার্থ দ্বারা গঠিত। সেল্যুলোসের রাসায়নিক সংকেত (chemical formula), $(C_6H_{10}O_5)n$, অর্থাৎ $C_6H_{10}O_5$, এই সংকেতটিকে n-সংখ্যক বার (n-এর অর্থ অসংখ্য) লম্বালম্বি ভাবে সাজাইয়া একটি সেল্যুলোসের অণু (Molecule) পাওয়া যায়। এইরূপ অসংখ্য সেল্যুলোসের অণু একত্রিত হইয়া একটি তন্তু বা আঁশের সৃষ্টি হয়। সেল্যুলোস আবার কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H) এবং অক্সিজেন (O) সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে কোন একটি উদ্ভিজ্জ তন্তু কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক পদার্থের দ্বারা গঠিত।

সুতি

উৎপত্তি ঃ সুতি কাপড়ের তন্তুগুলি তূলা হইতেই আসে। তূলা গাছ সাধারণতঃ ·৯ মিটার হইতে ১·৫ মিটার লম্বা হয়। প্রথমে ঈষৎ পীতবর্ণের ফুল ফোটে। পরে

আড়াআড়িভাবে কর্তিত অংশের চিত্র
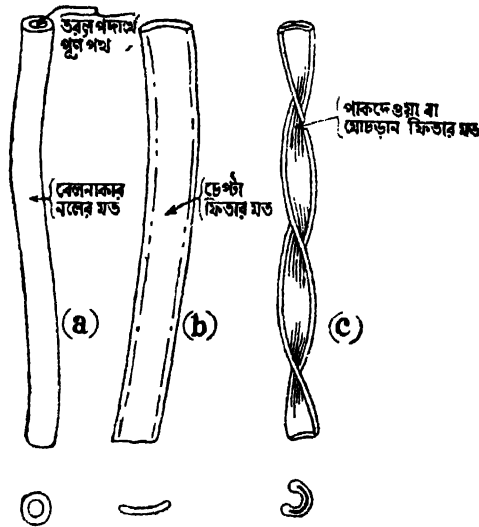
ঐ ফুল হইতে ফলের সৃষ্টি হয়। তূলা ফল পাকিলে ফাটিয়া যায় এবং তূলার সাদা আঁশগুলি বাহিরে আসিয়া বাতাসের সহিত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই আঁশগুলিকে যন্ত্রের সাহায্যে বীচি হইতে পৃথক্ করিয়া গাঁট বাঁধিয়া কাপড় বুনিবার জন্য চালান করা হয়।

প্রথম অবস্থায় তুলার এক একটি আঁশকে অণুবীক্ষণ (Microscope) যন্ত্রের তলায় দেখিলে বেলনাকার এক একটি নলের ন্যায় দেখা যাইবে। ইহার আগা এবং গোড়া প্রায় সমান মোটা। এই বেলনাকার নলের ঠিক মধ্য দিয়া একটি সরু পথ আছে। প্রাথমিক অবস্থায় এই পথটি তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। আঁশগুলি যখন ফল হইতে বাহির হইয়া আসে তখন রৌদ্রের প্রভাবে ঐ রস শুকাইয়া যায় এবং আঁশটিও ধীরে ধীরে বেলনাকার হইতে চেপ্টা হইয়া ক্রমে একটি ফিতার মত হইয়া পড়ে। দেখিতে ফিতার মত হইলেও আঁশগুলি ঠিক ফিতার মত সোজা নহে ; উহারা অনেকটা পাক দেওয়া বা মোচড়ান ফিতার মত। সাধারণতঃ তুলার আঁশে প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় ১৫০টি করিয়া এই পাক বা মোচড় থাকে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আঁশে প্রতি ইঞ্চিতে ২৫০টি পাকও দেখা যায়।

তুলার আঁশগুলি সাধারণতঃ আধ ইঞ্চি হইতে আড়াই ইঞ্চি লম্বা হয়। আঁশগুলি যত লম্বা ও সরু হয় কাপড়ও তত সূক্ষ্ম ও মিহি হয়। মোটা ও ছোট আঁশ হইতে সাধারণতঃ মোটা ও নিকৃষ্ট জাতীয় কাপড় তৈয়ারী হয়। অত্যধিক ছোট আঁশ কাপড় বুনিবার অনুপযুক্ত। ইহা রেয়ন নামক কৃত্রিম তন্তু তৈয়ারীর কাজে ব্যবহার করা হয়।

সরবরাহ : পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তুলা কম বেশী জন্মিয়া থাকে। সমগ্র উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ আমেরিকা হইতেই আসে। তুলা উৎপাদনে আমেরিকার পরই ভারতের নাম করা যাইতে পারে। আফ্রিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইত্যাদি দেশও কিছু কিছু তুলা উৎপন্ন করিয়া থাকে। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র এবং দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলেই প্রধানতঃ তুলা জন্মে। পশ্চিমবঙ্গের তুলা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। মহারাষ্ট্রে উৎপন্ন তুলা উৎকৃষ্টতর। আমেরিকায় উৎপন্ন তুলা মধ্যম শ্রেণীর। ভারতের ন্যায় সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপন্ন তুলাও নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

প্রকৃতি : ক্ষার দ্রব্য প্রয়োগে তুলার আঁশের কোন ক্ষতি হয় না। এইজন্য সাবান, সোডা ইত্যাদি ক্ষার-দ্রব্যাদি দ্বারা সূতি কাপড় পরিষ্কার করা যায়। প্রয়োজন হইলে সোডা ইত্যাদি দ্বারা সুতির কাপড় ফুটানও চলিতে পারে। রঙিন কাপড় হইলে ক্ষার-দ্রব্যের সংস্পর্শে ঐ রং চটিয়া যাইতে পারে।

তুলার আঁশ অ্যাসিডের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। কখনও কখনও সূতি কাপড়ের দাগ উঠাইবার জন্য লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা অক্‌জালিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় কাপড়খানি তৎক্ষণাৎ প্রচুর পরিমাণে জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। যদি সামান্য অ্যাসিডও কাপড়ে লাগিয়া থাকে তবে শুকাইবার পর কাপড়ের ঐ স্থান ফাঁসিয়া যাইবে। সুতির কাপড় কোন অবস্থাতেই গাঢ় অ্যাসিডের সংস্পর্শে আনিতে নাই।

ক্লোরিন এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড এই দুইটি রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা তুলার আঁশ নষ্ট হয় না। রঙিন কাপড়-চোপড় সাদা করিতে হইলে ক্লোরিন, ব্লিচিং পাউডার বা হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের লঘু দ্রবণ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সাধারণ উত্তাপে সুতির কাপড়ের কোন ক্ষতি হয় না। এইজন্য সুতির কাপড় রৌদ্রে শুকাইতে পারা যায় এবং গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা যায়। তবে খুব বেশী গরম

ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে সূতি পুড়িয়া লালচে দাগ পড়িবে। তুলার আঁশ উত্তাপ-সুসঞ্চালক। কাচিবার সময় রগড়াইলে সূতির কাপড়ের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। সূতির কাপড়ে রঙ ধরান পশমের মত সহজ না হইলেও খুব কঠিন কাজ নহে।

লিনেন (Linen)

উৎপত্তি ঃ তিসি ও মসিনা গাছ (Flax) হইতেই এই তন্তুটির উৎপত্তি। ইহা একটি ঋজু এবং সরু গাছ—প্রায় ৯১½ সে. মি. হইতে ১০১½ সে. মি. লম্বা হয়। লিনেন তন্তুটি মসিনা গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। মসিনা গাছের উপরের ছালটি সরাইয়া লইলে এই তন্তুটি গাছের মাথা হইতে শিকড় পর্যন্ত ছড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। প্রথমে মসিনা গাছটি কাটিয়া উহার বিচিগুলি বাহির করিয়া লওয়া হয় পরে গাছটিকে জলে ভিজাইয়া রাখা হয়; কিছুদিন পরে তন্তুগুলি নরম হইলে কাণ্ড হইতে উহা পৃথক্ করা হয়।

সরবরাহ ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রচুর পরিমাণে মসিনা গাছের চাষ করা হয়। ইহা ছাড়া বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জার্মানী ও আমেরিকাতেও মসিনার চাষ করা হয়। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট লিনেন তন্তু বেলজিয়ামেই উৎপন্ন হয়।

প্রকৃতি ঃ লিনেন তন্তুগুলি তুলার তন্তুর ন্যায় সেলুলোস নামক একই উপাদানে গঠিত। দৈর্ঘ্যে এই সকল তন্তু প্রায় এক ইঞ্চি হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তুগুলি লম্বালম্বি জোড়া লাগিয়া সাধারণতঃ ২৩ সে. মি. হইতে কয়েক মিটার লম্বা আঁশের সৃষ্টি করে। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র তন্তু কতকগুলি অণুকোষের (Cell) সমষ্টিমাত্র। তন্তুগুলি সোজা ও সরল হইলেও নলের মত বেলনাকৃতি নহে। একটি ক্ষুদ্র তন্তুকে আড়াআড়িভাবে
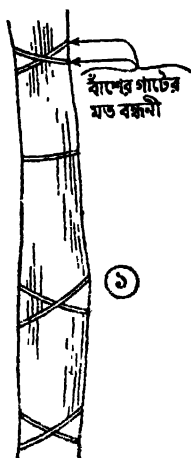
কাটিলে (Cross section) উহা দেখিতে একটি বহুভুজের মত হইবে। প্রত্যেকটি তন্তুর গায়ে মাঝে মাঝে বাঁশের গাঁটের মত বন্ধনী দেখা যায়। আঁশগুলির বহির্ভাগ খুব মসৃণ এইজন্য লিনেন বস্ত্রের এত চাকচিক্য।

লিনেন তন্তুর গুণাগুণ অনেকটা সুতির গুণাগুণের অনুরূপ। সুতির মত লিনেন বস্ত্রও সাবান, সোডা ইত্যাদি ক্ষার-দ্রব্যে পরিষ্কার করা যায়। ক্ষার দ্রব্যে ফুটাইলে বা আছড়াইয়া কাচিলে এই তন্তুর কোন ক্ষতি হয় না। সুতির মত লিনেনও অ্যাসিডের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। ক্লোরিন, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ইত্যাদি দ্বারা লিনেন বস্ত্রের রং দূর করা যায়। সুতির মত এই তন্তুও সাধারণ তাপে নষ্ট হয় না।

সুতি হইতে লিনেনের আঁশগুলি অধিকতর শক্ত। এইজন্য সুতির বস্ত্র অপেক্ষা লিনেনের বস্ত্র বেশী দিন স্থায়ী হয়। সুতির বস্ত্রে সাধারণতঃ কোন ঔজ্জ্বল্য থাকে না। কিন্তু লিনেনের বস্ত্র খুব চকচকে এবং জমকালো হয়। এই বস্ত্র সুতির বস্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশী জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া লইতে পারে। উত্তাপ সঞ্চালন করিবার ক্ষমতাও ইহার সুতি অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার রং ধারণ করিবার ক্ষমতা সাধারণ সুতি অপেক্ষা অনেক কম।

র‍্যামি (Ramie)

লিনেনের ন্যায় র‍্যামিও একপ্রকার গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। এশিয়া ও আমেরিকায় সাধারণতঃ এই গাছের চাষ করা হয়। র‍্যামির আঁশগুলি সাধারণতঃ ১৫২—২৬ সেণ্টিমিটার লম্বা হয়। কখনও কখনও ৬১ সেণ্টিমিটার পর্যন্ত ইহাদের লম্বা হইতে দেখা যায়। এই তন্তুর মাঝে মাঝে বাঁশের গাঁটের মত বন্ধনী দেখা যায়। তন্তুগুলি দেখিতে অনেকটা চুলের মত এবং মাঝখানটা ফাঁপা। তুলা এবং লিনেনের মত ইহাও সেলুলোস হইতে উৎপন্ন। লিনেনের মত র‍্যামির আঁশগুলিও চকচকে।

পাট (Jute)

ভারতই পাটের প্রধান উৎপত্তিস্থল। লিনেন এবং র‍্যামির মত পাটের আঁশ বা তন্তুও পাট গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। পাট গাছ সাধারণতঃ ৩—৩·৬ মিটার লম্বা হয়। পাতাগুলি পৃথক্ করিবার জন্যে বা পাতা ঝরাইবার জন্য পাটগাছ কিছুদিন মাঠের মধ্যে ফেলিয়া রাখা হয়। পরে গাছগুলি জলের মধ্যে কিছুদিন ভিজাইয়া রাখিলে আঁশগুলি নরম ও আলগা হইয়া যায়। এইবার আঁশগুলি কাণ্ড হইতে সহজেই পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়।

পাটের আঁশ সাধারণতঃ ১·২ মি. হইতে ২·৪ মি. লম্বা হইতে পারে। সেলুলোস হইতেই পাটের উৎপত্তি। তুলা, লিনেন এবং র‍্যামি হইতে ইহার পার্থক্য এই যে পাঠের উপাদানে লিগ্নো সেলুলোস (Ligno Cellulose) নামে সেলুলোসের এক প্রকার যৌগ (Compound) দেখা যায়। ইহার সাহায্যেই পাট প্রথম তিন শ্রেণীর আঁশ হইতে চিনিয়া বাহির করা যায়।

পাট দিয়া সাধারণতঃ থলে প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট হইতে কার্পেট ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হেম্প (Hemp)

এই তন্তুও র‍্যামির মত একপ্রকার গাছের কাণ্ড হইতেই উৎপন্ন হয়। রাশিয়া, চীন জাপান, ইটালী, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে এই তন্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। আঁশগুলি

সাধারণতঃ ·৯ মিটার হইতে ২·৪ মিটার লম্বা হয়। ইহা দেখিতে অনেকটা লিনেনের আঁশের মতই। কিন্তু লিনেনের আঁশ হইতে এই আঁশ অনেক বেশী মোটা। আঁশগুলির প্রান্ত ভাগ সরু এবং দ্বিধাবিভক্ত। লিনেন তন্তুর প্রান্তভাগ কখনও দ্বিধাবিভক্ত হয় না। সুতরাং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিলে লিনেন তন্তু ও হেম্প তন্তুর এই পার্থক্য সহজেই ধরা পড়িবে। এই তন্তু জলে বা বৃষ্টিতে সহজে নষ্ট হয় না। সেইজন্য ইহা দ্বারা দাঁড় এবং নৌকা ও জাহাজের পালের কাপড় প্রস্তুত করা হয়। এই আঁশগুলিরও মূল উপাদান সেলুলোস।

ক্যাপক (Kapok)

এই তন্তু অনেকটা তুলার তন্তুর ন্যায়। বেলনাকৃতি এই আঁশগুলির একপ্রান্ত স্ফীত, দেখিতে অনেকটা বালবের মত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই আকৃতি দেখিয়া ইহা অন্যান্য তন্তু হইতে চিনিয়া বাহির করা যায়। ইহা নরম এবং দেখিতে চকচকে। ক্যাপক আঁশের মধ্যে অসংখ্য বায়ুপূর্ণ গর্ত থাকে এবং ইহার মধ্যে সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না। সেলুলোসই এই তন্তুর মূল উপাদান।

এই সকল বিভিন্ন তন্তুর মধ্যে সুতি এবং লিনেনই সাধারণতঃ কাপড়, জামা ইত্যাদি পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। র‍্যামি, পাট, ক্যাপক ইত্যাদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর তন্তু। এইগুলি সাধারণতঃ থলে, কার্পেট, দাঁড় ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

(খ) প্রাণিজ তন্তু

রেশম ও পশম প্রাণিজ তন্তু

রেশম (Silk) : গুটিপোকা হইতে রেশম তন্তু উৎপন্ন হয়। রেশম দুই শ্রেণীর —(১) বন্য (wild) ও কৃষিজ (cultivated)। গুটিপোকা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বনে-বাদাড়ে যে রেশম তন্তু সৃষ্টি করে তাহাকে বন্য রেশম বলে। পরন্তু গুটিপোকা চাষ করিয়া যে রেশম পাওয়া যায় তাহাই কৃষিজ রেশম নামে পরিচিত। বন্য রেশম অপেক্ষা কৃষিজ রেশম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। সকল প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে রেশমই সবচেয়ে দীর্ঘ।

প্রকৃতি : গুটিপোকার মুখ হইতে যে লালা নিঃসৃত হয় তাহা এক শ্রেণীর প্রোটিন। ইহার মধ্যে ফাইব্রয়েন ও সেরিসিন ৩ : ১ অনুপাতে থাকে। ফাইব্রয়েনের উপর সেরিসিনের একটি আবরণ পড়ে। ফাইব্রয়েনের মৌল (ingredients) কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। পশমের ন্যায় ইহাতে কোন সালফার থাকে না। ইহার ফর্মুলা নিম্নরূপ :—

$$(C_{24}H_{38}O_5N_8)_n$$

ফাইব্রয়েন রসের ঘনত্ব ১·২৫ হইতে ১·৩ পর্যন্ত হয়। এখানে ফাইব্রয়েন ও সেরিসিনের আকার দেখান হইল। রেশমী তন্তুগুলি খুব সরু হয় বলিয়া সাধারণতঃ ছয় হইতে আটটি তন্তু লইয়া এক একটি সুতা প্রস্তুত করা হয়। পশমের তন্তুগুলির

ন্যায় রেশম তন্তুগুলির ব্যাস সর্বত্র সমান নহে। প্রায়শঃই দেখা যায় যে একটি রেশম তন্তুর একপ্রান্ত যতখানি মোটা অপর প্রান্ত ততটা মোটা নয়। সাধারণতঃ উহা অন্তিম প্রান্তে সরু হইয়া যায়। এইজন্য রেশম বস্ত্রে বুনন (spinning) সর্বত্র সমান (uniform) হয় না। রঙ করার পর উহা ধরা পড়ে।

রেশম কমনীয় এবং খুবই দৃঢ়। ইহার তন্তু পশম তন্তু অপেক্ষা দৃঢ়তর কিন্তু সুতি হইতে কম দৃঢ়। ইহা দেখিতে অত্যন্ত চকচকে (Lustrous) এবং তাপ সংরক্ষক বলিয়া শীতকালেও রেশমী পোশাক পরিধানযোগ্য। ইহার নমনীয়তা অসাধারণ।

(a) ফাইব্রয়েন (b) সেরিসিন
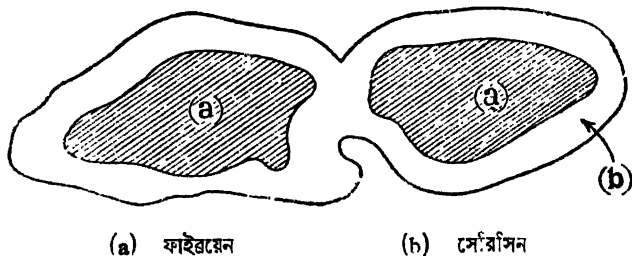
অধিকাংশ রেশমের বর্ণই প্রথমাবস্থায় সামান্য হলুদ থাকে কিন্তু পরে নানা প্রকারে ইচ্ছামত রঙ করা হয়। চৈনিক রেশম প্রায়ই সাদা হয়। রেশমের ১১% জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা আছে। ঠাণ্ডা জলে রেশম ম্যাটম্যাটে হইয়া যায় এবং গরম জলে ইহা চকচক করিতে থাকে। রেশমের বুনন খুব পাতলা বলিয়া ইহাকে সর্বদা সতর্ক-ভাবে ব্যবহার করিতে হয়।

লঘু কস্টিক সোডার দ্রবণে রেশম দ্রবীভূত হইয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় তসরের এই দিক হইতে সর্বাধিক সুবিধা আছে। ক্ষার ইহার উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। রেশমের অ্যাসিড প্রতিরোধের একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে।

রেশম চিনিবার উপায় (Identification of Silk) ঃ রেশম চিনিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথমতঃ, সালফিউরিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ রেশমকে খয়েরী রঙের থকথকে পদার্থে রূপান্তরিত করে। তারপর ইহাতে অল্প ট্যানিক অ্যাসিড ঢালিলে উহা কঠিন আকারে পৃথকীকৃত হয় (precipitates out)।

দ্বিতীয়তঃ, কিউপ্রো অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে বলা হয় সুইটজার দ্রবণ (schweitzer's solution) ; ইহা কপার হাইড্রেটকে অ্যামোনিয়ায় দ্রবীভূত করিয়া পাওয়া যায়। এই দ্রবণ সকল রেশমকেই দ্রবীভূত করে। রেশম চিনিবার পক্ষে এই দ্বিতীয় উপায়টি শ্রেষ্ঠ।

পশম (Wool)

মানুষের ব্যবহার্য আধুনিক শীতবস্ত্রাদির তালিকায় পশম অপরিহার্য। মানুষের আচ্ছাদন সমস্যা সমাধানে প্রকৃতির অবদান যতখানি, প্রাণিজগতের অবদান যে তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে পশমই তাহার উৎকৃষ্টতম প্রমাণ। প্রাণিজ তন্তু হইতেই পশমের উদ্ভব। ইহাই পশমের মূল কথা। দেশ-বিদেশে বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবরণ তথা লোম হইতেই পশম সৃষ্টি হয়।

পশমের প্রকৃতি ও স্বরূপ : মানুষের কেশের ন্যায় পশুর লোমও ক্রমবর্ধমান। কাজেই লোম যতই কাটা হয় ততই উহা আবার সৃষ্টি হয় সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মেই। ভেড়ার লোম হইতে পশম তন্তু প্রস্তুত হয়।

পশমের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার নমনীয়তা। সাধারণ গুটানো অবস্থায় উহাকে টানিলে পশম লম্বা হয় আবার ছাড়িয়া দিলে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। তবে এই নমনীয়তার পরিমাণ নির্ভর করে পশম কতখানি নরম (soft) তাহার উপর। পশমকে উত্তমরূপে ধূলি ময়লা তৈলাদি হইতে বাষ্প-ধৌত (steam-wash) পদ্ধতিতে মুক্ত করা হইলে উহার নমনীয়তা ও কমনীয়তা বাড়ে। পশমের এক একটি তন্তু বা Fibre-এর দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ তিন ইঞ্চি হইতে এক ফুট পর্যন্ত হয়। পশমের প্রাকৃতিক বর্ণ সাদা, ক্রীম, ঈষৎ হলুদ, লালচে, বাদামী প্রভৃতি নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। তবে যত সাদা হয় ততই উহার প্রকৃতি (quality) ভাল হয়। অধুনা কলে ইচ্ছামত পশম রং করা হয়।

পশম তন্তু তাপ ও জলীয় বাষ্প দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং ফলে উহাকে দুমড়াইয়া বা মোচড়াইয়া দিলে তাপের প্রভাবে পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাই পশমের বস্ত্রাদি ধুইবার ক্ষেত্রে শীতল জল অপেক্ষা সামান্য উষ্ণ জল ব্যবহার করিলে উহার ময়লা কাটিয়া যায় এবং উহার আকৃতি নষ্ট হইবার কিছুমাত্র ভয় থাকে না।

পশম তন্তুর ঘাত সহিবার ক্ষমতা অল্প। তাই পশমের পোশাকাদি যত্ন করিয়া রাখা বিধেয়। অত্যধিক চাপে, ড্যাম্প লাগিলে পশমের তন্তুগুলি উহাদের স্বাভাবিক গুণ হারাইয়া ফেলে। ফলে বস্ত্র নষ্ট হইয়া যায়। অত্যধিক চাপে কোন কোন পশম জমাট বাঁধিয়া যায় এবং উহার নমনীয়তা (Elasticity) হারাইয়া ফেলে। ভিজা অবস্থায় রাখিলে ছাতা (Fungus) পড়িয়া যায়, কড়া রৌদ্রে রঙ জ্বলিয়া যায় এবং উপযুক্তরূপে রক্ষণের অভাবে পোকায় কাটিয়া ফেলে। পশম আগুনে পুড়িয়া যায়। পশম পোড়া গন্ধ অনেকটা শিং বা পালক পোড়া গন্ধের মত।

কস্টিক সোডার মৃদু দ্রবণেই পশম সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইয়া যায়। কাজেই কস্টিক সোডা বা পটাশ লইয়া কাজ করিতে গেলে পশমের জামা ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। তবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পশমকে শুধু বিকৃত করিয়া দেয় (swells up), দ্রবীভূত করে না। সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিডে শুধু পশমের রং চটিয়া যায় এবং একটি হলুদ রঙের আবরণ পড়ে।

পশম তন্তুর গঠন (Fibre structure) **:** পশম তন্তুতে 'কেরাটিন' (Keratin) নামক একপ্রকার প্রোটিন থাকে। অন্যান্য জৈব পদার্থের ন্যায় ইহারও অনেকগুলি অণু একত্রে সংবদ্ধ আকারে থাকে। এই অবস্থায় 'কেরাটিন' অণুর নাম "মিসেলে" (Micellae)। কেরাটিনে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার বিদ্যমান। এইগুলি কতকগুলি কাঠির গুচ্ছের আকারে (Bundles of sticks) থাকে। কেরাটিনের ফরমুলা ও গঠন নিম্নরূপ :- $(C_{42}H_{157}O_{15}N_5S)$

তোমরা সকলে ভুট্টা দেখিয়াছ। ভুট্টার গায়ে একপ্রকার আঁশের মত আবরণ থাকে। পশম তন্তুও ঠিক সেইরূপ সরু সরু আঁশে ঢাকা থাকে। আবার কোন কোন তন্তুর মাছের আঁশের মত সুবিন্যস্ত খোলস থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় কাচের স্লাইডে পশম তন্তু টান করিয়া ধরিলে উহার গঠন দেখা যায়। এখানে একটি চিত্র দেওয়া হইল।

পশম চিনিবার উপায় (Identification of Wool) : কোন বস্ত্র পশমের কিনা জানিতে হইলে উহার তন্তুকে পটাশিয়াম প্লামবেটের (K_2PbO_2) লঘু দ্রবণে এক মিনিট ধরিয়া ফুটাইতে হয়। পশম থাকিলে উহার বর্ণ গাঢ় খয়েরী হইয়া যায়।

পশমের সরবরাহ : ইংল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সব কয়টি দেশই প্রায় সমভাবে পশমের চাহিদা মিটাইতে সাহায্য করিতেছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় মেষ পালিত হয় বলিয়া উৎপন্ন পশমের প্রকৃতিও বিভিন্ন।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় একটি পশম তন্তুর আকৃতি

প্রত্যেক দেশের পশমের এই স্বকীয়তার জন্যই উহারা পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার সহিত তাল রাখিয়া নিজের নিজের চাহিদাকে সমানভাবে বাড়াইতে সমর্থ হইতেছে, ফলে কোন একটি দেশে পশমের বাজার স্থাপিত না হইয়া কয়েকটি দেশে উহা ছড়াইয়া আছে।

কৃত্রিম তন্তু (Artificial Fibres)

তুলা, রেশম, পশম প্রভৃতি প্রকৃতিজাত তন্তু হইতেই আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি সর্বপ্রথম প্রস্তুত করা হইত। আজকাল কিন্তু এই সকল প্রকৃতিজাত তন্তু ছাড়াও অন্যান্য বহু প্রকারের তন্তুদ্বারা প্রস্তুত কাপড় বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন নূতন এই সকল তন্তু মানুষ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় সৃষ্টি করিয়াছে। মনুষ্য-নির্মিত এই সকল তন্তুকেই কৃত্রিম তন্তু (Artificial fibres) বলে। যেমন—নাইলন, ডেক্রন, ভিনিয়ন, সরন ইত্যাদি এই শ্রেণীর কৃত্রিম তন্তু। এই সকল তন্তুর মধ্যে নাইলন, ডেক্রন, ভিনিয়ন, সরন ইত্যাদিকে **সাংশ্লেষিক তন্তু** (Synthetic Fibres) বলা হয়, কারণ গবেষণাগারের দ্রব্যাদি (Laboratory chemicals) হইতেই এই সকল তন্তু নির্মিত হইয়া থাকে। রেয়নকে ঠিক সাংশ্লেষিক তন্তু বলা চলে না ; কারণ উহা প্রকৃতিজাত সেলুলোস হইতেই বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রেয়ন (Rayon) **:** রেয়নই মনুষ্য-নির্মিত সর্বপ্রথম কৃত্রিম তন্তু। ঔজ্জ্বল্যে এবং চাকচিক্যে ইহা প্রায় প্রকৃতিজাত রেশম তন্তুর মতই। এইজন্যই রেয়নকে কৃত্রিম রেশম (Artificial silk) বা 'আর্ট সিল্ক' বলা হয়। তুলার সকল আঁশের দৈর্ঘ্য

সমান নয়। ইহার মধ্যে বড় আঁশগুলি সূতিবস্ত্র প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ছোট ছোট আঁশগুলি ঐ বস্ত্র প্রস্তুতির কাজে লাগে না। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ-যুক্ত তুলা (Cotton linters) এবং বিশুদ্ধ উদ্ভিদ্-মণ্ডই (Wood-pulp) উৎকৃষ্ট রেয়ন প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক পদ্ধতির ফলে তুলার আঁশে ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য সৃষ্টি হয় এবং রেশম বলিয়া মনে হয়। রেয়ন প্রস্তুতির বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যথা—(১) ভিসকোস (Viscose), (২) কিউ-প্রামোনিয়াম (Cu-prammonium), (৩) সেলুলোস অ্যাসিটেট (Cellulose acetate), এবং (৪) সেলুলোস নাইট্রেট (Cellulose nitrate)। ইহাদের মধ্যে সেলুলোস অ্যাসিটেট এবং সেলুলোস নাইট্রেট তন্তু দেখিতে রেয়ন তন্তুর ন্যায় হইলেও ইহাদের প্রকৃতপক্ষে রেয়ন বলা হয় না। মোট উৎপন্ন রেয়নের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ কিউপ্রামো-নিয়াম পদ্ধতিতে প্রস্তুত হয়, অবশিষ্ট রেয়ন ভিসকোস পদ্ধতিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রকৃতি : লম্বালম্বিভাবে দেখিলে রেয়নতন্তু অনেকটা চওড়া ফিতার মত বলিয়া মনে হয়। আড়াআড়িভাবে কাটা তল অসমান ধারবিশিষ্ট পাতার মত দেখায়। নিম্নে উহাদের চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল।

রেয়ন তন্তু
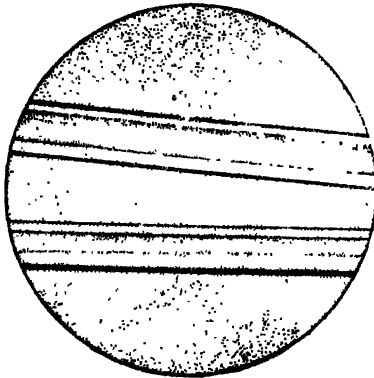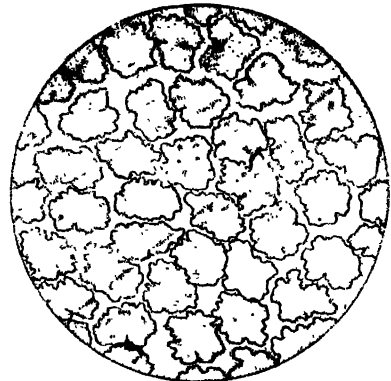
রেয়ন তন্তু (আড়াআড়িভাবে কাটা তল)

কিউপ্রামোনিয়াম তন্তুর আড়াআড়ি কাটা তল দেখিতে বৃত্তাকৃতি। জলে ভিজাইলে এই রেয়ন তন্তু শতকরা ২৫ হইতে ৪০ ভাগ জল শোষণ করে এবং জোর অনেক কমিয়া যায়। ঠাণ্ডা জল অপেক্ষা গরম জল হইতে ইহা বেশী জল শোষণ করে। এই জন্যই রেয়ন বস্ত্র গরমজলের পরিবর্তে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ধুইতে হয়; কিন্তু শুষ্ক রেয়ন বস্ত্রে আবার পূর্ব জোর ফিরিয়া আসে। ভিজা অবস্থায় রেয়ন বস্ত্রের কোন রকম পরিবর্তন হইলে শুষ্ক অবস্থায় ঐ আকৃতি আর ফিরিয়া আসে না। এই জন্যই রেয়নের জামা-কাপড় খুব সাবধানে যত্নের সহিত ধুইতে হয়। আজকাল অবশ্য রেয়ন তন্তুর অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং জলে ভিজাইলেও এখন আর তন্তুর জোর কমিয়া যায় না। আজকাল রেয়নের তোয়ালে (towel) এবং রুমালও ব্যবহৃত হইতেছে।

রেয়নতন্তু সেলুলোস হইতে প্রস্তুত। সুতরাং সূতির বস্ত্রে যে সকল রঙ ধরে তাহাদের সাহায্যে রেয়ন বস্ত্রও রঙ করা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে সূতির বস্ত্র

অপেক্ষা রেয়ন বস্ত্র রঙ করা অনেক সহজ। পূর্বেই বলিয়াছি অ্যাসিটেট রেয়ন বিশুদ্ধ সেলুলোজ নয় এবং ইহাকে প্রকৃতপক্ষে রেয়নও বলা চলে না। এইজন্য এই জাতীয় কাপড়ে রঙ ধরান অনেক কষ্টসাধ্য। সুতির বস্ত্রের ন্যায় ইহাও অ্যাসিডের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। তবে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে মৃদু অ্যাসিড প্রয়োজন বোধে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মৃদু ক্ষার জাতীয় দ্রব্যে রেয়নের কোন ক্ষতি হয় না। রেয়ন বস্ত্রে সুতির বস্ত্রের মতোই গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে অত্যধিক গরম ইস্ত্রি ব্যবহারে পোড়া দাগ পড়িতে পারে। রেয়নতন্তু আগুনে সুতির মতোই শিখাসহ পুড়িতে থাকে।

নাইলন (Nylon): নাইলনই প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যসৃষ্ট প্রথম সাংশ্লেষিক তন্তু। 1935 খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার Du Pont Company উক্ত সংস্থা গবেষণার দ্বারা রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে কয়েকটি তন্তুর ন্যায় পদার্থ প্রস্তুত করে। ইহার মধ্যে Fibre—66এ স্বাভাবিক তন্তুর প্রায় সকল গুণই দৃষ্ট হয়। এই Fibre—66ই পরে নাইলন নামে
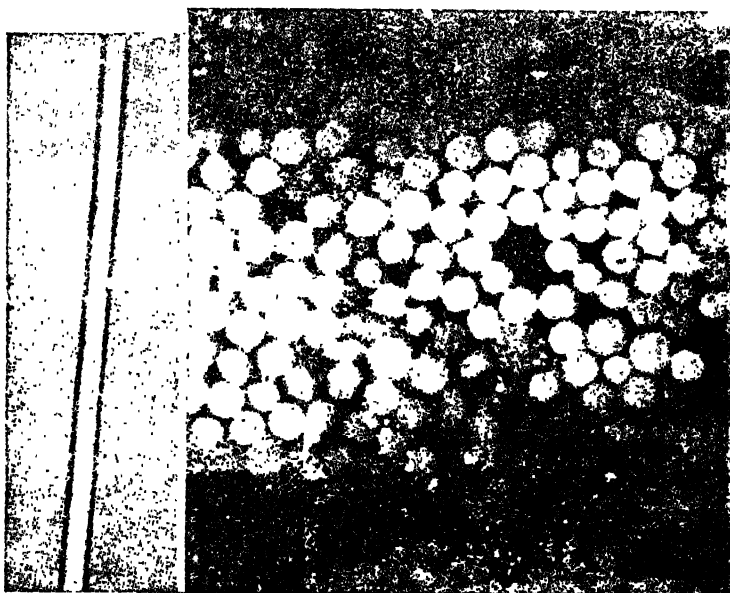
নাইলন তন্তু আড়াআড়িভাবে কাটা তল

পরিচিত হয়। তখন এই নাইলন টুথ ব্রাস প্রভৃতিতেই ব্যবহৃত হইত। ক্রমশঃ গবেষণার ফলে ইহার আরও উন্নতি হয় এবং 1940 খৃঃ সর্বপ্রথম নাইলন তন্তু কাপড় বুনিবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

নাইলন তন্তু দুইটি ধাপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে কয়লা, জল এবং বায়ুর সাহায্যে নাইলনের কুচি (Flakes) প্রস্তুত হয় এবং দ্বিতীয় ধাপে এই কুচি হইতে নাইলনতন্তু সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতি: লম্বালম্বিভাবে দেখিলে নাইলনের তন্তু লম্বা নলাকৃতি বলিয়া মনে হইবে। আড়াআড়িভাবে কাটা তল কতগুলি ক্ষুদ্র বৃত্তের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়।

নাইলনতন্তু সাধারণতঃ অর্ধস্বচ্ছ (translucent)। আজকাল অস্বচ্ছ (opaque) নাইলন তন্তুও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় তন্তু খুব শক্ত, ইলাস্টিক এবং টিকসই। নাইলনের জল শোষণ করিবার ক্ষমতা খুবই সামান্য। আজকাল এই তন্তুর উপর এক-প্রকার প্রলেপ লাগাইয়া জল শোষণ ক্ষমতা বাড়ানো হইয়াছে। নাইলন তন্তু 480° ফাঃ উত্তাপে গলিয়া যায়। সুতরাং সাধারণ উত্তাপে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। ইহা আগুনের সংস্পর্শে শিখাসহ জ্বলে না, গলিয়া যায়। জল বা ড্রাইক্লিনিংএ ব্যবহৃত তরল পদার্থে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। মৃদু ক্ষারে এবং ঈষদুষ্ণ জলে এই জাতীয় বস্ত্রাদি অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়। মৃদু অ্যাসিড নাইলনের কোন ক্ষতি করে না। শতকরা ৩ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দ্রবণ নাইলনের পক্ষে ক্ষতিকর। ক্লোরিনের ন্যায় উগ্র ব্লিচিং পদার্থ নাইলনের বস্ত্রে ব্যবহার করিতে নাই। অপেক্ষাকৃত মৃদু ব্লিচিংই নাইলনের পক্ষে নিরাপদ। সূর্যের আলোতে এই জাতীয় তন্তু নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং নাইলনের বস্ত্রাদি ছায়ায় শুকাইতে হয়। এই জাতীয় বস্ত্রের সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা হইতেছে যে ইহা কোন পোকায় কাটিতে পারে না। অবশ্য নাইলনের সহিত পশম মিশানো থাকিলে উহা পোকায় কাটিতে পারে।

ডেক্রন (Dacron)**:** 1946 খৃঃ ব্রিটেনে টেরিলিন (Terylene) নামক এক প্রকার নূতন তন্তু আবিষ্কৃত হয়। এই টেরিলিন ইথিলিন গ্লাইকল (Ethylene glycol) এবং ডাই-মিথাইল টেরেথ্যালেট (Dimethyl terephthalate) হইতে প্রস্তুত হইত। আমেরিকার Du Pont Company ঐ বৎসর টেরিলিনের সর্বস্বত্ব ক্রয় করিয়া উহার আরও উন্নতির জন্য গবেষণা কার্য চালাইতে থাকে। এই কোম্পানী অবশেষে ঐ তন্তুকেই ডেক্রন নাম প্রদান করে।
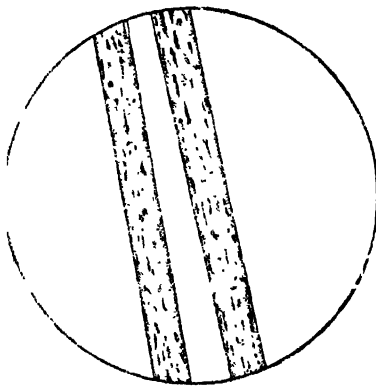
ডেক্রন তন্তু

প্রকৃতি: ডেক্রনের সহিত অ্যাসিটেট তন্তুর কিছুটা মিল দেখা যায়। ডেক্রনের তন্তু অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে প্রায় নাইলনের মতই।

আগুনের সংস্পর্শে ইহা গলিয়া শক্ত দানাতে পরিণত হয়। ডেক্রনের কাপড় ঘামে বা জলে কুঁচকাইয়া যায় না এবং ইহার ভাজও নষ্ট হয় না। ডেক্রন-উপাদানে প্রস্তুত জামা-কাপড়ের ইস্ত্রি করার কোন প্রয়োজন হয় না। এইজন্য ইহার প্রচলন দিন দিনই বাড়িতেছে। মৃদু অ্যাসিড এবং ক্ষার ডেক্রন তন্তুর কোন ক্ষতি করে না। ব্লিচিং দ্রব্যাদি এই জাতীয় তন্তুতে নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। নাইলনের মত ডেক্রন তন্তুও পোকায় কাটিতে পারে না। আজকাল অনেক প্রকার রঙিন ডেক্রন দেখিতে পাওয়া যায়। ডেক্রন পুড়িবার সময় কালো ধোঁয়া (dark-smoke) বাহির হয়।

নাইলন পুড়িবার সময় ধূসরবর্ণের (whitish gray) ধোঁয়া বাহির হয়। এই পরীক্ষার সাহায্যে ডেক্রন ও নাইলনের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়।

আজকাল আরও নূতন নূতন অনেক তন্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ওরলন (Orlon), সরন (Saran), ভিনিয়ান (Vinyon) ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। মনুষ্যসৃষ্ট সর্বাধুনিক তন্তু হইতেছে টেফলন (Teflon)। ইহা 1954 খৃঃ আমেরিকার Du Pont Company কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

খনিজ তন্তু (Mineral Fibres)

খনিজ তন্তুসমূহ তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ; অ্যাসবেসটস, গ্লাস এবং ধাতব। এই সকল তন্তু বস্ত্রশিল্পে খুব বেশী ব্যবহৃত হয় না।

অ্যাসবেসটস (Asbestos) : ইহা একপ্রকার প্রাকৃতিক তন্তু, খনিতে বিভিন্ন প্রকার অপদ্রব্যের (impurities) সহিত ইহা আকরিক হিসাবে পাওয়া যায়। রাসায়নিক পদ্ধতিতে অপদ্রব্যসমূহ দূর করিয়া এই তন্তু প্রস্তুত করা হয়।

প্রকৃতি : অ্যাসবেসটস তন্তু লম্বায় $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি হইতে $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। ইহাদের ব্যাস অত্যন্ত ছোট। অণুবীক্ষণের সাহায্যে এই তন্তু মসৃণ, সরল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দণ্ডের মত দেখায়। শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগ সুতি মিশাইয়া এই তন্তু তাপের কুপরিবাহী বলিয়া ইহার সাহায্যে অগ্নিনির্বাপক দলের পোশাক, দস্তানা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। পরীক্ষাগারেও আসবেস্টসের পাত উত্তপ্ত বীকার ইত্যাদি ঠাণ্ডা করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

গ্লাস (Glass) : 1893 খৃঃ চিকাগো শহরে লিবি গ্লাস কোম্পানী (Libbey Glass Company) প্রথম গ্লাস এবং রেশম তন্তুর সংমিশ্রণে একটি আলো আচ্ছাদনী (lamp shade) প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শন করে। একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী ঐ আচ্ছাদনী দেখিয়া উহার সাহায্যে একটি পোশাক প্রস্তুত করেন। জানা যায় যে স্পেন দেশের রাজকন্যাও বহু অর্থব্যয়ে গ্লাস তন্তুর একটি পোশাক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই পোশাকের একটি অসুবিধা ছিল এই যে ইহা ভাঁজ করা যাইত না। 1938 খৃষ্টাব্দেই প্রথম বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত হইবার মত উন্নত ধরনের গ্লাস তন্তু উৎপন্ন হয়। গ্লাসের মার্বেল (marbles) হইতেই এই তন্তু প্রস্তুত করা হয়। ইলেকট্রিক চুল্লিতে প্রায় ২৪০০° ফ.ঃ উত্তাপে এই মার্বেলগুলি গালাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া চালনা করা হয়।

প্রকৃতি : গ্লাসের তন্তুসমূহ স্বচ্ছ, মসৃণ ও সরু দণ্ডের ন্যায়। আড়াআড়ি ভাবে কাটা তল কতগুলি বৃত্তের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়।

গ্লাসতন্তু আগুনে বা অ্যাসিডে নষ্ট হয় না এবং পোকায় কাটিতে পারে না। সূর্যের আলোতে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। জলে ধুইলে ইহার আকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। তবে খুব সতর্কতার সহিত ধুইতে হয়। যেমন মোচড়ান বা দুমড়ান না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মোচড়াইলে গ্লাসতন্তুগুলি ভাঙিয়া যায়। এই কারণেই এই তন্তুর বস্ত্রশিল্পে বহুল প্রচলন নাই।

জানালা-দরজার নকশার কাজে এই তন্তুর প্রচলন বেশ দেখা যায়। ধুলাবালি ইত্যাদি এই ধরনের তন্তুতে লাগিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং এই সকল পর্দা

সহজে ময়লা হয় না। কোট জ্যাকেট ইত্যাদিতেও আজকাল এই তন্তু ব্যবহৃত হইতেছে।

ধাতব তন্তু (Metal Fibres) ঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও বিভিন্ন শঙ্কর ধাতু (alloys) আজকাল বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই সকল ধাতব তন্তু প্রধানতঃ কাপড়ের উপর নকশা প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও কখনও সুতি,
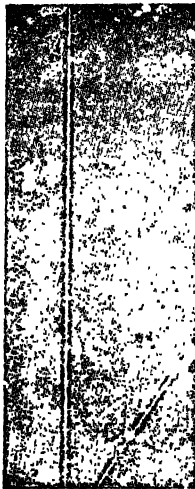
লম্ব তন্তু
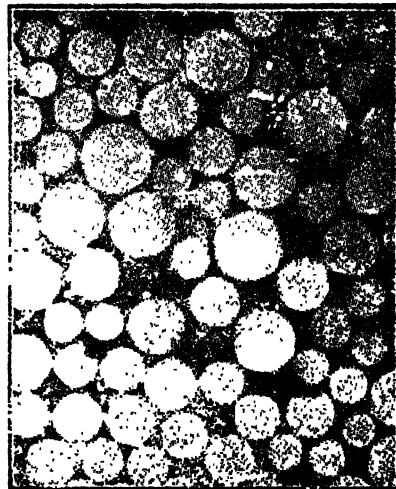
আড়াআড়িভাবে কাটা তন্ত

লিনেন, রেয়ন ইত্যাদি তন্তুর উপরে এই সকল ধাতুর আবরণে একপ্রকার নূতন তন্তু সৃষ্টি করিয়া কাপড় প্রস্তুত করা হয়। এই ধরনের কাপড়ের ধাতু কিছুদিন পরে ক্ষয় হইয়া কাপড়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া ফেলে। কিছুদিন যাবৎ অ্যালুমিনিয়াম ধাতু হইতেও তন্তু প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রশিল্পে ব্যবহার করা হইতেছে।

2. বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন তন্তুর বস্ত্রধৌতি ঃ
(Different methods of washing and finishing materials of different fibres)

তোমরা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে একখানি কাপড় বা একটি ব্লাউজ কিছুদিন ব্যবহার করিলেই উহা ময়লা হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। তখন উহা সাবান, সোডা বা অন্য কোন পরিষ্কারক দ্রব্য দ্বারা পরিষ্কার করিয়া তবেই ব্যবহার করিতে হয়। শুধু পরিষ্কার করিলেই হয় না, কাপড়ের স্বাভাবিক কাঠিন্য ও চকচকে ভাবটি ফিরাইয়া আনিবার জন্য উহাতে নীল, কলপ ইত্যাদি লাগাইয়া ইস্ত্রি করিয়া লইতে হয়। সুতরাং বস্ত্রধৌতি বলিতে শুধুমাত্র সাবান, সোডা ইত্যাদির সাহায্যে বস্ত্রখানি পরিষ্কার করাই বুঝায় না; নীল দেওয়া, কলপ লাগান, ইস্ত্রি করা ইত্যাদি

বিভিন্ন আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া—যাহার সাহায্যে বস্ত্রখানির পূর্বের সৌন্দর্য ফিরাইয়া আনা হয়—সমস্তই বস্ত্রধৌতির অন্তর্গত। বস্ত্রধৌতির মূল উদ্দেশ্য দুইটি :

(১) কাপড়ের ময়লা প্রভৃতি দূর করিয়া উহা পরিষ্কার করা (washing) এবং (২) পরিষ্কার কাপড়ে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরাইয়া আনিয়া উহার উৎকর্ষ সাধন করা (Finishing)।

বস্ত্রধৌতি প্রণালীটি নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে : (১) ময়লার তারতম্য অনুসারে বস্ত্রাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা (sorting), (২) রিফু বা সেলাই করা (mending), (৩) দাগ উঠান (stain removal), (৪) জলে ভিজানো (steeping), (৫) ময়লা দূর করা (cleaning), (৬) ফুটান (boiling), (৭) নীল দেওয়া (blueing), (৮) কলপ দেওয়া (starching), (৯) শুষ্ক করা (drying), (১০) আর্দ্র করা (damping), (১১) ভাঁজ করা (folding), (১২) ইস্ত্রি করা (ironing), (১৩) বায়ু চালিত করা এবং তুলিয়া রাখা (airing and storing)।

উপরোক্ত স্তরগুলি অনুসরণ করিয়া সাদা সূতি ও লিনেন বস্ত্র ধুইবে।

সূতি এবং লিনেনের ছাপা রঙিন বস্ত্রাদি ধুইবার পদ্ধতি

আজকাল রঙিন ও ছাপা বস্ত্রাদির প্রচলন প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সকল বস্ত্রাদি ধুইবার সময় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ইহাদের মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) পাকা রঙের বস্ত্রাদি, (২) কাঁচা রঙের বস্ত্রাদি। তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, কোন কোন কাপড়ে সাবান ঘষিলে সহজে উহার রঙের কোন পরিবর্ত হয় না ; ইহাদের রঙ পাকা বলিয়া সহজে নষ্ট হয় না। এইজন্য বস্ত্রাদি পরিষ্কার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। আবার এমন অনেক কাপড় আছে যাহাদের রঙ সামান্য সাবানজলে ধুইলেই উঠিয়া যায়। ইহাদের রঙ কাঁচা, সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত পরিষ্কার করিতে হয়।

পাকা রঙের বস্ত্রাদি : এই সকল বস্ত্র ধুইবার প্রণালী অনেকটা সাদা বস্ত্র ধোওয়ার প্রণালীর অনুরূপ। প্রয়োজনমত রিফু বা সেলাই করিয়া কোন দাগ লাগিয়া থাকিলে তাহা উঠাইতে হয়। দাগ উঠানোর সময় সর্বদাই দাগ উঠাইবার দ্রব্যটি জলে গুলিয়া ব্যবহার করিবে। কখনও পাউডার বা গুঁড়া রঙিন কাপড়ে ব্যবহার করা উচিত নয়। ইহাতে রঙ চটিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। ক্লোরিন বা এই ধরনের উগ্র ব্লীচিং দ্রব্যাদি কখনও রঙিন কাপড়ে ব্যবহার করিবে না। অত্যধিক ময়লা হইলে কাপড়গুলি কিছুক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ইহাতে ময়লা আলগা হইয়া আসিবে এবং পরিষ্কার করিতে সুবিধা হইবে। জলে ভিজাইবার সময় প্রতি ১০ ছটাক জলে বড় চামচের এক চামচ লবণ গুলিয়া লইবে। ইহাতে কাপড়ের রঙ স্থায়ী হইবে। সর্বদাই ঠাণ্ডা বা ঈষদুষ্ণ এবং মৃদু জল ব্যবহার করিবে। তেমন ময়লা না হইলে কাপড় জলে ভিজাইবার প্রয়োজন নাই। ঈষদুষ্ণ মৃদু জলে কিছু সাবান বা সাবানের গুঁড়া গুলিয়া ফেনা হইলে উহাতে এইবার কাপড়খানি ভিজাইবে। জলের উষ্ণতা যেন ১০০-১১০° ফাঃ-এর মধ্যে থাকে। ধীরে ধীরে রগড়াইয়া কাপড় হইতে ময়লা বাহির করিয়া দিবে।

প্রয়োজন হইলে থুপিয়া কাচিতেও পার। ময়লা উঠিয়া গেল প্রায় ১০ ছটাক ঠাণ্ডা জলে বড় চামচের এক চামচ ভিনিগার গুলিয়া তাহাতে কাপড়খানি ২-৩ মিনিট ভিজাইয়া রাখ। ধুইবার সময় রঙ বিবর্ণ হইয়া গেলে ইহাতে আবার উহার ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে। কাপড়ের কাঠিন্যের জন্য এইবার ১ঃ৪ বা ১ঃ৬ স্টার্চের দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ডুবাইয়া লইবে। কাপড়ের জমিন সাদা হইলে নীলজলে ডুবাইতে পার। ভিনিগারে ভিজাইবার পর স্টার্চের সহিত নীল ব্যবহার করিবে। কাপড়ের জমিন সাদা না হইলে পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে না। কাপড় হইতে জল যথাসম্ভব নিংড়াইয়া ফেলিয়া উহাকে ছায়ায় শুকাইতে দিবে। রঙিন কাপড় রৌদ্রে শুকাইতে হয় না। শুকাইয়া গেলে ঘরে আনিয়া ইস্ত্রি করিবে। ইস্ত্রি করিবার প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্বে জল দ্বারা আর্দ্র (damping) করিয়া লইবে। খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে রঙ চটিয়া যাইতে পারে।

কাঁচা রঙের বস্ত্রাদি ঃ কাঁচা রঙের কাপড় ধুইবার পূর্বে কখনও জলে ভিজাইয়া রাখিবে না। গরম জলের পরিবর্তে ঠাণ্ডা জলে সাবান গুলিয়া ফেনা প্রস্তুত কর। সাবানে যেন ক্ষার বেশী না থাকে। সর্বদা ভাল সাবান ব্যবহার করিবে নতুবা খারাপ সাবান হইলে রঙ চটিয়া যাইবে। খুব বেশী সাবান গুলিবে না এবং সর্বদাই মৃদু জল ব্যবহার করিবে। সাবান-জলে অল্প লবণ গুলিয়া লইলে রঙ স্থায়ী হইবে। কাপড়খানি জলে ভিজাইবার পর রগড়াইয়া বা থুপিয়া ময়লা দূর কর। এইবার ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ভিনিগার মিশ্রণে ডুবাও। মিনিট কয়েক রাখিলে কাপড়ের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে। এখন ১ঃ৪ বা ১ঃ৬ স্টার্চের দ্রবণে ডুবাইয়া লও এবং কাপড় হইতে অতিরিক্ত জল নিংড়াইয়া ফেলিয়া ছায়ায় শুকাও। অল্পক্ষণ আর্দ্র করিয়া রাখিয়া ইস্ত্রি কর। অধিকক্ষণ আর্দ্র রাখিলে রঙ জ্বলিয়া যাইবে।

রঙিন বস্ত্রাদি ধুইবার মূল কথাগুলি হইতেছে ঃ—

(১) পাকা রঙের অল্প ময়লা কাপড় ও কাঁচা রঙের কাপড় ধুইবার পূর্বে জলে ভিজাইয়া রাখিবে না।

(২) পাকা রঙের অত্যধিক ময়লা বস্ত্রাদি লবণজলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

(৩) পাকা রঙের কাপড় ঈষদুষ্ণ জলে এবং কাঁচা রঙের কাপড় ঠাণ্ডা জলে ধুইবে।

(৪) যে সাবানে বেশী ক্ষার আছে তাহা ব্যবহার করিবে না।

(৫) সাবান-জলে রঙিন বস্ত্রাদি বেশীক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে না।

(৬) সর্বশেষে ভিনিগারের জলে ভিজাইলে কাপড়ের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে।

(৭) রঙিন কাপড় ছায়ায় শুকাইতে দিবে।

(৮) অত্যধিক গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিও না। তাহাতে রঙ চটিয়া যাইবে।

(৯) এক একবারে একটি করিয়া বস্ত্র ধুইবে।

সাদা পশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি

পশমের বস্ত্রাদি অপেক্ষাকৃত মূল্যবান এবং অসাবধানতার ফলে অতি সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। ধুলাবালি ইত্যাদি ময়লা গভীরভাবে এই সকল বস্ত্রে বসিতে পারে না।

এইজন্য ধুইবার পূর্বে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় না, ঝাড়িয়া ফেলিলেই আলগা ময়লা বাহির হইয়া যায়। নূতন বস্ত্রাদি অবশ্য প্রায় আধঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিলে ভাল হয়। জলে সামান্য বোরাক্স (Borax) বা অ্যামোনিয়া (Ammonia) গুলিয়া লইতে হয়। পশমের বস্ত্রাদি ধুইবার জন্য সর্বদাই মৃদু জল ব্যবহার করিবে। বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা উভয় প্রকার জলই এই সকল বস্ত্র ধুইবার পক্ষে অনুপযোগী। জলের উষ্ণতা প্রায় ১০০° ফাঃ হওয়া উচিত। পশমের বস্ত্রাদি তাড়াতাড়ি ধুইতে হয় কারণ ভিজা অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে পশম শক্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া যায়। উষ্ণ জলে সামান্য অ্যামোনিয়া (এক গ্যালন জলে বড় চামচের আধ চামচ) এবং ভাল সাবান বা লাক্স (Lux) সাবানের গুঁড়া গুলিয়া ফেনা প্রস্তুত কর। মনে রাখিবে পশমের বস্ত্রে অত্যধিক ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। ডিটারজেণ্ট (Neutral Detergent), রিঠা প্রভৃতি এই জাতীয় বস্ত্র ধৌতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পশমের কাপড়খানি সাবান-জলে ডুবাইয়া ধীরে ধীরে রগড়াইয়া উহার ময়লা দূর কর। কখনও ঘষিয়া পরিষ্কার করিবে না, ইহাতে বস্ত্রটি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। এইবার উষ্ণ জলে (১০০° ফাঃ) বস্ত্রখানি কয়েকবার ভাল করিয়া ধুইয়া ঈষৎ চাপ দিয়া বস্ত্র হইতে জল বাহির করিয়া দাও। কখনও নিংড়াইয়া জল বাহির করিবে না। টার্কিশ তোয়ালে দিয়া জড়াইয়া কিছুটা জল শুষিয়া লও এবং বস্ত্রখানি টান টান করিয়া মুক্ত বাতাসে ছায়ায় মেলিয়া দাও। ধুইবার সময় বস্ত্রের যে সঙ্কোচন হয়, শুকাইবার সময় বার বার টানিয়া দিলে উহা দূর হয় এবং বস্ত্রের স্বাভাবিক আকৃতি ও নম্রতা বজায় থাকে। বস্ত্রগুলি যখন সামান্য ভিজা থাকিবে তখন অল্প গরম ইস্ত্রি দ্বারা ভাঁজ করা অবস্থায় উল্টাপিঠে চাপিয়া দিতে হয়। শুকাইয়া গেলে একটি ভিজা মসলিন কাপড় উপরে রাখিয়া ইস্ত্রি করিবে। কখনও খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিবে না। ইস্ত্রির পর বায়ুতে ফেলিয়া রাখিবে।

রঙিন পশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি ঃ রঙিন বস্ত্রাদি ধোয়ার পদ্ধতি প্রায় সাদা বস্ত্রের মতই। তবে এই ক্ষেত্রে কখনও অ্যামোনিয়া ব্যবহার করিবে না; কারণ ইহা রঙিন পশমের ক্ষতি করে। সাবানজলে বস্ত্রাদি বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিবে না এবং ময়লা পরিষ্কার হইলে উষ্ণজলে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। ধুইবার সময় জলে একটু ভিনিগার ও লবণ মিশাইয়া লইবে (এক গ্যালন জলে বড় চামচের এক চামচ লবণ ও সমপরিমাণ ভিনিগার)। ইহাতে বস্ত্রের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে। শুকাইবার সময় টানিয়া পূর্বাবস্থায় রাখিয়া শুকাইবে, তাহা হইলে আকৃতির কোন পরিবর্তন হইবে না। অল্প ভিজা থাকিতে ইস্ত্রি করিবে। শুকাইয়া গেলে ভিজা মসলিন কাপড় উপরে রাখিয়া ইস্ত্রি করিবে। খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিবে না। সর্বশেষে বায়ু চালনা (Airing) করিয়া Mildew-র হাত হইতে রক্ষা করিবে।

পশমের বস্ত্র ধুইবার সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা মনে রাখিবে ঃ—

(১) কখনও খুব গরম বা ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করিবে না।

(২) অত্যধিক ক্ষার জাতীয় সাবান বা সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করিবে না।

(৩) কখনও ঘষিয়া পরিষ্কার করিবে না।

(৪) ভিজা অবস্থায় বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিবে না।

(৫) মোচড়াইয়া জল নিংড়াইবে না। ইহাতে তন্তুগুলি ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

(৬) সূর্যালোকে বা অত্যধিক গরম স্থানে শুকাইবে না।

(৭) অত্যধিক গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিবে না।

(৮) ইস্ত্রি হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে বাক্সে তুলিয়া রাখিবে না। কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে রাখিয়া দিবে।

সাদা রেশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি

পশমের মত রেশমেও ধুলা, বালি ইত্যাদি একেবারে কাপড়ে বসিয়া যায় না। সুতরাং জলে ভিজাইয়া রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। অনেক পুরানো ও অত্যন্ত বেশী ময়লা রেশমের বস্ত্র অবশ্য অল্পক্ষণ ঈষদুষ্ণ জল ও বোরাক্সের (Borax) দ্রবণে ভিজাইয়া রাখিলে পরিষ্কার করিতে সুবিধা হয়। প্রথমে বস্ত্রখানি ঝাড়া দিয়া আলগা ময়লা যতদূর সম্ভব দূর কর। প্রয়োজনমত রিফু, সেলাই ইত্যাদি করিবার পর যদি কোন দাগ লাগিয়া থাকে তবে উহা উঠাইতে চেষ্টা কর। সর্বদাই দাগ লাগামাত্র উঠাইতে হয়, পুরান দাগ রেশমের বস্ত্র হইতে উঠানো খুবই মুস্কিল। দাগ উঠাইয়া বস্ত্রখানি এইবার ঈষদুষ্ণ সাবান জলে ডুবাও। সর্বদাই মৃদু জল ব্যবহার করিবে। জল খুব গরম হইলে রেশমের ক্ষতি হইবে। নিউট্রাল ডিটারজেন্ট (Neutral Detergent) রেশমের বস্ত্র ধুইবার পক্ষে খুবই উপযোগী। রিঠা, ভাল সাবান ও সাবানের গুঁড়াও ব্যবহার করা চলিতে পারে। অত্যধিক ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করিলে রেশমের ক্ষতি হইবে। ময়লা দূর হইলে বস্ত্রখানি ভাল করিয়া ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া লইবে। সর্বশেষে একবার ঠাণ্ডা জলে ধুইবে। ইহাতে রেশমের কাঠিন্য কিছু ফিরিয়া আসিবে। রেশমের বস্ত্রাদিতে সাধারণতঃ কলপ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। সামান্য ভিজা থাকিতে ইস্ত্রি করিলেই কাপড়ের কাঠিন্য ফিরিয়া আসে। প্রয়োজন মত গঁদের জল (Gum-water) কলপ হিসাবে ব্যবহার করিতে পার (৩ ছটাক জলে চা-চামচের এক চামচ গঁদের জল)। যদি রেশমের মধ্যে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করিতে চাও তবে ৩ ছটাক জলে একটি বড় চামচের এক চামচ মেথিলেটেড স্পিরিট (Methylated Spirit) গুলিয়া উহাতে বস্ত্রখানি ডুবাইয়া লইবে। হাতে চাপিয়া যতদূর সম্ভব জল বাহির করিয়া দাও। কিছুক্ষণ ছায়ায় শুকাও। রৌদ্রে বা উষ্ণ তাপে শুকাইলে অথবা অধিক উত্তপ্ত ইস্ত্রির সংস্পর্শে আসিলে সাদা রেশমের কাপড়ে হলদে দাগ পড়ার আশঙ্কা থাকে। ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য অবশ্য বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে কিন্তু সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নাই।* রেশমের বস্ত্র একটু ভিজা অবস্থাতেই ইস্ত্রি করিতে হয়। কারণ একবার শুকাইয়া গেলে আর জল ছিটাইয়া আর্দ্র করা যায়

* বায়ুর (air) মধ্যস্থিত গন্ধকই এই হলদে বর্ণের কারণ—তাহারও কাহারও এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। গন্ধক বা গন্ধকজাত কোন যৌগই (compound) বায়ুর স্বাভাবিক উপাদান নয়। তবে শিল্প এলাকায় গন্ধকের যৌগ বায়ুতে দূষিত গ্যাসরূপে কখনও কখনও দেখা যায়। কিন্তু অধিক উত্তপ্ত ইস্ত্রির সংস্পর্শে এবং যে সকল অঞ্চলে এই গন্ধকজাত যৌগ উৎপন্নকারী কোন শিল্পই নাই সেখানেও যখন সূর্যালোকে সাদা রেশম হলদে হইয়া যায় তখন একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ঐ গন্ধক বা গন্ধকজাত কোন যৌগই এই হলদে বর্ণ সৃষ্টির প্রকৃত কারণ নয়।

না। এইরূপক্ষেত্রে বস্ত্রখানি পুনরায় ভিজাইতে হয়। রেশমে খুব বেশী গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে রেশম পুড়িয়া যাইবে। (Tussore) এবং শ্যানটুং (Shantung) রেশম শুষ্ক অবস্থায় ইস্ত্রি করিতে হয়। তসর ইস্ত্রির পর বায়ুচালিত করিয়া শুষ্ক করিবে।

রঙিন রেশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি : ছাপা এবং রঙিন রেশমের বস্ত্রাদি অনেক সময় সাবানজলে ধুইলে একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই ক্ষেত্রে জলের পরিবর্তে পেট্রল (Petrol) ব্যবহার করিবে। যদি সাবানজলে উহার রঙের বিশেষ কোন পরিবর্তন না হয়, তবে একটু সাবধানতার সহিত জলেই বস্ত্রখানি ধুইবে। সুতরাং প্রথমে বস্ত্রখানির এক কোণে একটু সাবানজল ঘষিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবে। রঙিন বস্ত্রাদি ধুইবার জন্য ডিটারজেন্টই বিশেষ উপযোগী। লাক্স পাউডার এবং রিঠাও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্ষারজাতীয় দ্রব্যাদি কখনও ব্যবহার করিবে না, ইহাতে রঙ চটিয়া যাইবে। ঈষদুষ্ণ জলে লাক্স বা ডিটারজেন্ট গুলিয়া ফেনা হইলে উহাতে বস্ত্রখানি ডুবাইয়া তাড়াতাড়ি ময়লা দূর করিতে চেষ্টা করিবে। বেশীক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে রঙ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ময়লা পরিষ্কার হইলে বস্ত্রখানি প্রথমে একবার ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া লও। দ্বিতীয়বার ঠাণ্ডা জলে লবণ ও ভিনিগার (এক গ্যালন জলে বড় এক চামচ লবণ ও সমপরিমাণ ভিনিগার) গুলিয়া উহাতে বস্ত্রখানি ধুইবে। ইহাতে রঙের চাকচিক্য ফিরিয়া আসিবে। অনেক সময় কালো রেশমের বস্ত্র ধুইবার ফলে সবুজ বা লালচে হইয়া যায়। এই সকল বস্ত্রাদি ধুইতে জলে সামান্য অ্যামোনিয়া মিশাইতে হয়। পরে পরিষ্কার বস্ত্রটি গাঢ় নীলজলে ডুবাইলেই উহাতে কোন প্রকার দাগ দেখা যাইবে না। শুকাইবার এবং ইস্ত্রি করিবার প্রণালী সাদা রেশমের বস্ত্রাদির অনুরূপ। রেশমের বস্ত্র ধুইবার মূল কথাগুলি হইতেছে ঃ—

(১) সাধারণতঃ ধুইবার পূর্বে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় না ;
(২) ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিবে এবং সর্বশেষে একবার ঠাণ্ডা জলে ধুইবে।
(৩) ক্ষারজাতীয় সাবান ব্যবহার করিবে না।
(৪) সর্বদা মৃদু জল ব্যবহার করিবে।
(৫) কখনও ঘষিয়া ময়লা পরিষ্কার করিবে না, ইহাতে তন্তু ছিঁড়িয়া যাইবে।
(৬) কখনও মোচড়াইয়া জল নিংড়াইবে না।
(৭) রঙিন ও ছাপা রেশম হইলে ধুইবার জলে লবণ ও ভিনিগার মিশাইবে।
(৮) কাঠিন্যের জন্য গঁদের জল কলপ হিসাবে ব্যবহার করিবে।
(৯) সর্বদা ছায়ায় শুকাইবে।
(১০) সামান্য ভিজা থাকিতেই ইস্ত্রি করিবে।
(১১) তসর (Tussore) ও শ্যানটুং (Shantung) রেশম শুকাইয়া ইস্ত্রি করিবে।

কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র ধুইবার প্রণালী

রেয়ন প্রভৃতি কৃত্রিম রেশম ধুইবার প্রণালী প্রায় রেশমেরই অনুরূপ। ধুলাবালি ইত্যাদি ময়লা কৃত্রিম রেশমে গভীর ভাবে বসিতে পারে না। অধিকক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলে তন্তুগুলি পচিয়া যায়। এইজন্য কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রাদি জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় না। সর্বদাই মৃদু ও ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিবে। অত্যধিক ক্ষার

জাতীয় দ্রব্যাদি বর্জন করিবে। লাক্স সাবানের গুঁড়া, নিউট্রাল ডিটারজেন্ট, রিঠা প্রভৃতি ঈষদুষ্ণ জলে গুলিয়া কাপড়খানি উহাতে ভিজাইয়া আলগা হাতে রগড়াইয়া কাচিবে। কৃত্রিম রেশমে সাধারণতঃ কোন কলপের প্রয়োজনই হয় না। অনেক দিনের ব্যবহারে যদি স্বাভাবিক কাঠিন্য নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে গঁদের জল কলপ হিসাবে ব্যবহার করিবে। হাতে চাপিলেই কৃত্রিম রেশম হইতে জলটুকু বাহির হইয়া যায়। একখানি টার্কিশ তোয়ালেতে কাপড়খানি আঁট করিয়া জড়াইয়া রাখিলে অধিকাংশ জলই বাহির হইয়া যাইবে। এই সকল কাপড় কখনও রৌদ্রে শুকাইতে হয় না। একটা কাঠের ফ্রেমে কাপড়খানি টানিয়া পূর্বাকৃতিতে আনিয়া ছায়ায় শুকাইতে হয়। শুকাইবার সময় টানিয়া কাপড়খানিকে পূর্বাকৃতিতে না আনিলে কাপড়খানির আকৃতি নষ্ট হইয়া যাইবে। অল্প ভিজা থাকিতেই ইস্ত্রি করিয়া লইবে। খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে কৃত্রিম রেশম সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং ইস্ত্রি করিবার সময়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবে। প্রায় অধিকাংশ কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রই উল্টাপিঠে ইস্ত্রি করিতে হয়।

নাইলন (Nylon), **টেরিলিন** (Terylene) বা **ডেক্রন** (Dacron) **প্রভৃতি ধুইবার প্রণালী ঃ** এই সকল সিনথেটিক (Synthetic) তন্তু জলে ভিজাইয়া রাখিলে সহজে নষ্ট হয় না। সুতরাং অত্যন্ত ময়লা বস্ত্রাদি ঈষদুষ্ণ সাবানজলে ভিজাইয়া রাখিলে সহজে পরিষ্কার হয়। নাইলন ইত্যাদিতে মৃদু ও ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিবে। ভাল সাবানের গুঁড়া, নিউট্রাল ডিটারজেন্ট, রিঠা প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। ধুইবার সময়ে কখনও মোচড়াইবে না, ইহাতে তন্তুগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। একখানি বড় তোয়ালেতে পরিষ্কার বস্ত্রখানি জড়াইয়া রাখিলে জলটুকু বাহির হইয়া যাইবে। একটি কাঠের ফ্রেমে বস্ত্রখানি টানিয়া স্বাভাবিক আকৃতিতে আনিয়া শুকাইতে দিবে। নাইলন, টেরিলিন প্রভৃতির তন্তুগুলি এমনভাবে নির্মিত যে ইহাতে কোন ভাঁজ পড়ে না (anti-crease)। তাই উহাদের ইস্ত্রি করিবার প্রয়োজন হয় না।

জর্জেট (Georgette) **এবং ক্রেপ ডি সীন** (Crape de Chine) **ধুইবার প্রণালী ঃ** এই জাতীয় কাপড়ে ক্রেপ মিশ্রিত থাকে, তাই ধুইবার সময়ে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সাবধানতা অবলম্বন করিলে কোন কোন জর্জেট ও ক্রেপ ডি সীন জলেই ধুইতে পারা যায়। আবার এমন কাপড়ও আছে যাহা অতি সাবধানতার সহিত পরিষ্কার করিলেই কুঁচকাইয়া আকৃতি নষ্ট হইয়া যায়। এই সব কাপড় জলে পরিষ্কার না করিয়া ড্রাই ওয়াশ (Dry wash) করাইতে হয়। জলে ধুইবার উপযুক্ত জর্জেট ও ক্রেপ ডি সীন রেশমের কাপড় ধুইবার প্রণালীতে ধুইতে হয়। উৎকৃষ্ট সাবানের গুঁড়া, নিউট্রাল ডিটারজেন্ট ইত্যাদি পরিষ্কার দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করিবে। কখনও ঘষিয়া ময়লা দূর করিবে না, ইহাতে জমিন নষ্ট হইয়া যাইবে। আলগা হাতে রগড়াইয়া ময়লা বাহির করিয়া দিবে। শুকাইবার সময়েই সর্বাধিক সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। ধুইবার পূর্বে প্রস্থের মাপ একটি কাঠের লাঠিতে চিহ্নিত করিয়া রাখিবে। ধুইবার পরে যাহাতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ঠিক থাকে, সেইজন্য ভিজা কাপড়খানি ঐ কাঠের লাঠিতে জড়াইয়া লইতে হয়। জড়াইবার সময়ে কাপড়খানি টানিয়া প্রস্থের দাগের সহিত মিলাইয়া জড়াইবে এবং ঐ জড়ানো অবস্থাতেই কাপড়খানি শুকাইবে। উপরের কিছুটা অংশ শুকাইয়া গেলে উহা অন্য একটি লাঠিতে জড়াইয়া লইবে। এইভাবে কাপড়খানি

ধীরে ধীরে শুকাইলে ইস্ত্রি করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। ভাঁজ করিয়া সামান্য গরম ইস্ত্রি দ্বারা চাপিয়া দিলেই ইস্ত্রির প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে।

অর্গাণ্ডি (Organdie) ধুইবার প্রণালী : অত্যন্ত মিহি এবং দামী সুতা হইতে এই কাপড় প্রস্তুত হয়। সাদা, ছাপা, রঙিন প্রভৃতি বহু প্রকার অর্গাণ্ডি পাওয়া যায়। ইহা ধুইবার প্রণালী ছাপা ও রঙিন সুতীর কাপড় ধুইবার অনুরূপ। অত্যধিক ক্ষারজাতীয় সাবান সোডা ব্যবহার করা এবং জলে ফুটানো অর্গাণ্ডির পক্ষে ক্ষতিকর। নূতন কাপড়ে কলপ লাগে না। সামান্য ভিজা অবস্থায় ইস্ত্রি করিলেই স্বাভাবিক কাঠিন্য ফিরিয়া আসে। পুরানো কাপড়ে পাতলা স্টার্চের (starch) কলপ ব্যবহৃত হইতে পারে। খুব দামী ও মিহি জমিনের অর্গাণ্ডিতে গঁদের জল স্টার্চের বদলে কলপ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সাদা কাপড়ের হলদেটে ভাব দূর করা

(Removal of Yellowish Colour from White Clothes)

বস্ত্রধৌতির বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি তোমরা জানিলে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সব রকম সাবধানতা সত্ত্বেও সাদা বস্ত্রাদি অনেকবার ধুইবার পর তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই একটা হলদেটে রঙ দেখা দেয়। কাপড়ের হলদেটে ভাবটি বিভিন্ন ব্লিচিং অপসারকের সাহায্যে দূর করা যায়। বিভিন্ন ব্লিচিং অপসারকের মধ্যে ক্লোরিন সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী। কিন্তু ইহা অত্যন্ত উগ্র বলিয়া সুতি ও লিনেনের কাপড় বাদে অন্যান্য কাপড়ে ইহা ব্যবহার করিলে কাপড় ফাঁসিয়া যাইতে পারে। ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ এবং জাভেলী দ্রবণে এই ক্লোরিন থাকে বলিয়া কেবলমাত্র সুতি ও লিনেনের কাপড়েই এই দুই প্রকার দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। সালফার বা গন্ধক পোড়াইয়া যে গ্যাস পাওয়া যায় তাহাকে সালফার ডাই-অক্সাইড বলে। এই গ্যাসও এক প্রকার ব্লিচিং অপসারক। তবে ইহা ক্লোরিনের ন্যায় তত উগ্র নয়। সুতরাং ইহা নির্ভয়ে রেশম, পশম, নাইলন, রেয়ন, ডেক্রন ইত্যাদি কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং অক্সালিক অ্যাসিডেরও সামান্য ব্লিচিং করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং এই সকল দ্রব্যাদিও রেশম, পশম ইত্যাদি দামী কাপড়ে নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সুতি ও লিনেনের সাদা কাপড়ের হলদে ভাব দূর করিবার পদ্ধতি

প্রাচীন পদ্ধতি : অতি প্রাচীন কাল হইতেই সূর্যের আলো, বায়ু, জলীয় বাষ্প ও সবুজ ঘাসের সাহায্যে সুতি ও লিনেনের সাদা কাপড়ের হলদে ভাব দূর করিবার

পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহাই সর্বাপেক্ষা সহজ পদ্ধতি এবং ইহাতে কোন অর্থেরও প্রয়োজন হয় না। কাপড়খানি পরিষ্কার করিয়া টান টান করিয়া খোলা জায়গায় সবুজ ঘাসের উপর মেলিয়া দিতে হয় এবং মাঝে মাঝে কাপড়ের উপর জল ছিটাইয়া উহাকে আর্দ্র অবস্থায় রাখিতে হয়। বায়ুর অক্সিজেন, সবুজ ঘাস, জলীয় বাষ্প এবং রৌদ্রের সাহায্যে কাপড়ের হলদে রঙটি দূর করিয়া উহাতে সাদা ধবধবে ভাবটি ফুটাইয়া তোলে।

আধুনিক পদ্ধতি ঃ উপরের পদ্ধতির একটি অসুবিধা হইতেছে এই যে আকাশ যখন মেঘলা থাকে বা বর্ষার দিনে আকাশে সূর্য দেখা যায় না তখন এই পদ্ধতি অচল হইয়া পড়ে। কিন্তু এই নূতন পদ্ধতি গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতেই প্রযোজ্য।

প্রথমে কাপড়খানি পরিষ্কার করিয়া ব্লিচিং পাউডারের একটি লঘু জলীয় দ্রবণে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিতে হয় (ব্লিচিং পাউডারের পরিবর্তে জাভেলী দ্রবণও ব্যবহার করা যাইতে পারে)। পরে কাপড়খানি ঐ দ্রবণ হইতে উঠাইয়া হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের অতি লঘু দ্রবণে আরও কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়।
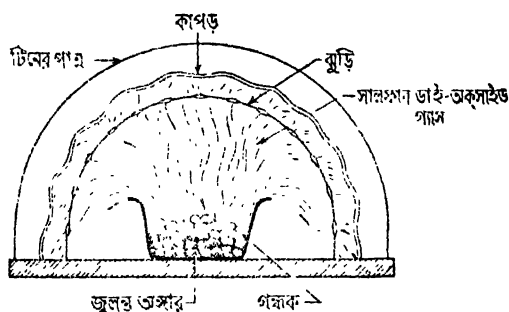
রেশম ও পশমের কাপড়ের হলদে ভাব দূর করিবার পদ্ধতি

ইহাতে কাপড়ের হলদেটে ভাবটি কাটিয়া উহাতে সাদা ধবধবে ভাবের সৃষ্টি হয়। এখন কাপড়খানি ভাল করিয়া জলে ধুইয়া উহা হইতে অ্যাসিড সম্পূর্ণ বিদূরিত করিতে হয়, কারণ সামান্য অ্যাসিডেও কাপড় ফাঁসিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। কাপড়খানি এইবার প্রথমে সোডার জলীয় দ্রবণে এবং পরে সোডিয়াম বাই-সালফাইট অথবা 'হাইপো'র লঘু দ্রবণে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া পরে জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়।

রেশম, পশম ও অন্যান্য দামী কাপড়ের হলদে ভাব দূর করিবার পদ্ধতি ঃ এই সকল কাপড়ে উপরের কোন পদ্ধতিই প্রয়োগ করা যাইবে না। এই জাতীয় বস্ত্রে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস যেমন কার্যকরী তেমনি নিরাপদ।

একটি মাটির পাত্রে কিছুটা জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়া উহাতে কয়েক টুকরা গন্ধক স্থাপন কর। পাত্রটি এখন একটি বড় বাঁশের বা বেতের ঝুড়ি দ্বারা ঢাকিয়া দাও। এই

ঝুড়ির উপর ঐ হলদে দাগওয়ালা পরিষ্কার কাপড়খানি ছড়াইয়া দাও এবং সমস্ত ঝুড়িটি আরেকটি বড় টিনের, কাঠের বা মাটির পাত্র দ্বারা এরূপ ভাবে ঢাকিয়া দাও যেন ঝুড়ি এবং ঐ পাত্রের মাঝে বেশ কিছুটা জায়গা থাকে। জ্বলন্ত অঙ্গারে গন্ধক

সূতি ও লিনেন কাপড়ের হলুদে ভাব দূর করিবার পদ্ধতি
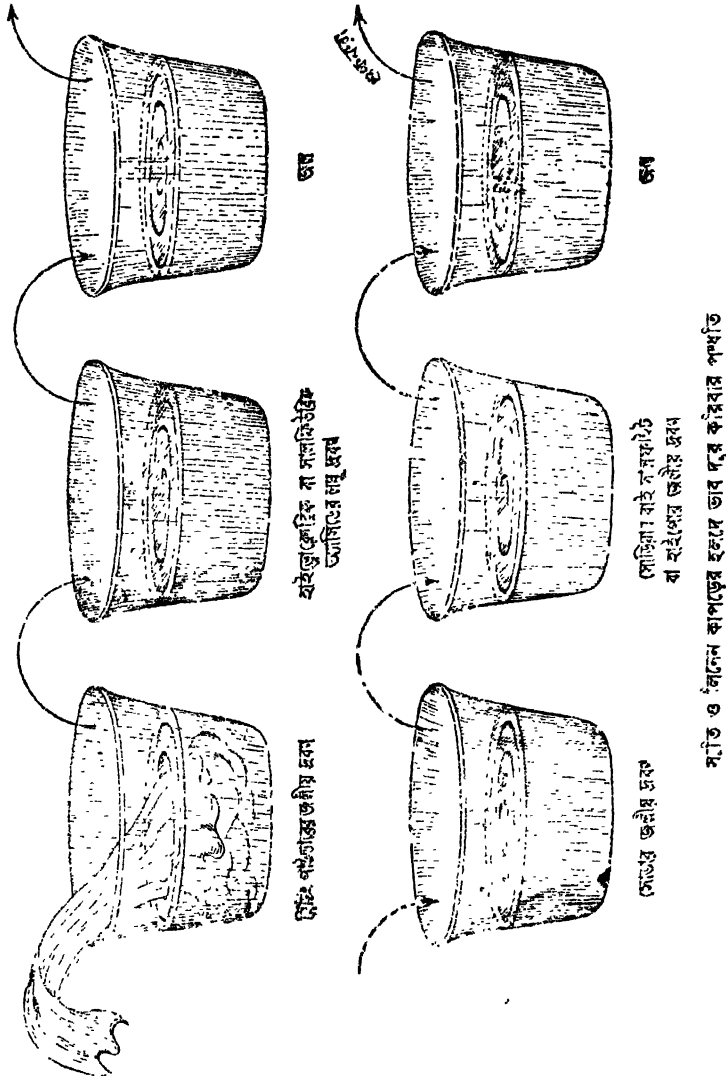
পুড়িয়া সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইবে। এই গ্যাস ঝুড়ির ছিদ্র দিয়া কাপড়ের হলদে অংশের উপর ক্রিয়া করিবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই উহাতে সাদা ধবধবে ভাব ফুটিয়া উঠিবে। এইবার কাপড়খানি ভাল করিয়া জলে ধুইয়া শুকাইয়া লও।

১. দেহের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান (Elementary Knowledge of human body systems.)

নর-কঙ্কালের গঠন (Structure of the human skeleton)

স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক নর-কঙ্কালটি সাধারণতঃ ২০৬টি হাড় বা অস্থি দ্বারা গঠিত। এই অস্থিগুলিকে উহাদের আকৃতি অনুযায়ী কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা যায়—যথা, (১) **লম্বা অস্থি** (Long bones), (২) **ছোট অস্থি** (Short bones), (৩) **চ্যাপ্টা অস্থি** (Flat bones) এবং (৪) **অনিয়তাকার অস্থি** (Irregular bones)। হাত এবং পায়ের অস্থিগুলিই লম্বা অস্থির অন্তর্গত। ইহারা দেখিতে বেশ লম্বা এবং নলাকৃতি। আবার হাতের কব্জি (wrist) এবং পায়ের গোড়ালিতে (ankle) কতকগুলি ছোট ছোট হাড় বা অস্থি দেখা যায়। এইগুলি লম্বা অস্থির তুলনায় অনেক ছোট। আবার আমাদের পিঠে ঘাড়ের কাছে দুই পাশে দুইখানি বড় চ্যাপ্টা হাড় আছে। হাতের সঙ্গে এই হাড় দুইখানি সংযুক্ত। ইহা ছাড়া করোটি বা মাথার খুলিটিও কয়েকটি চ্যাপ্টা হাড়ের দ্বারাই প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কতকগুলি বিশেষ আকৃতির অস্থিও আমাদের দেহে দেখা যায়। মানবদেহের মেরুদণ্ডটি এইরূপ কতকগুলি বিশেষ আকৃতির অস্থিদ্বারা গঠিত। এই অস্থিগুলিকেই অনিয়তাকার অস্থি বলে।

সমগ্র নর-কঙ্কালটিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহাদের একটি করোটি (Skull), মেরুদণ্ড (Backbone or Vertebral Column), পঞ্জর (Ribs) এবং উরঃফলক (Sternum) ইত্যাদি লইয়া গঠিত। ইহা ছাড়া অক্ষকাস্থি (Clavicle), অংসফলক (Scapula), বাহু, শ্রোণিচক্র (Pelvic girdle), পা ইত্যাদি লইয়া অপর অংশটি গঠিত। এই অংশটিকে **অ্যাপেণ্ডিকুলার কঙ্কাল** (Appendicular skeleton) বলে।

করোটি (Skull): সমগ্র করোটিটি প্রায় ২২ খানা অস্থিদ্বারা গঠিত। ইহাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) মস্তিষ্কাধার (Cranium) এবং (২) মুখমণ্ডলের অস্থিসমূহ (Bones of the face)। মস্তিষ্কাধার ৮ খানি এবং মুখমণ্ডল ১৪ খানা অস্থি লইয়া গঠিত। মস্তিষ্কাধারের এই ৮ খানি অস্থি পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে
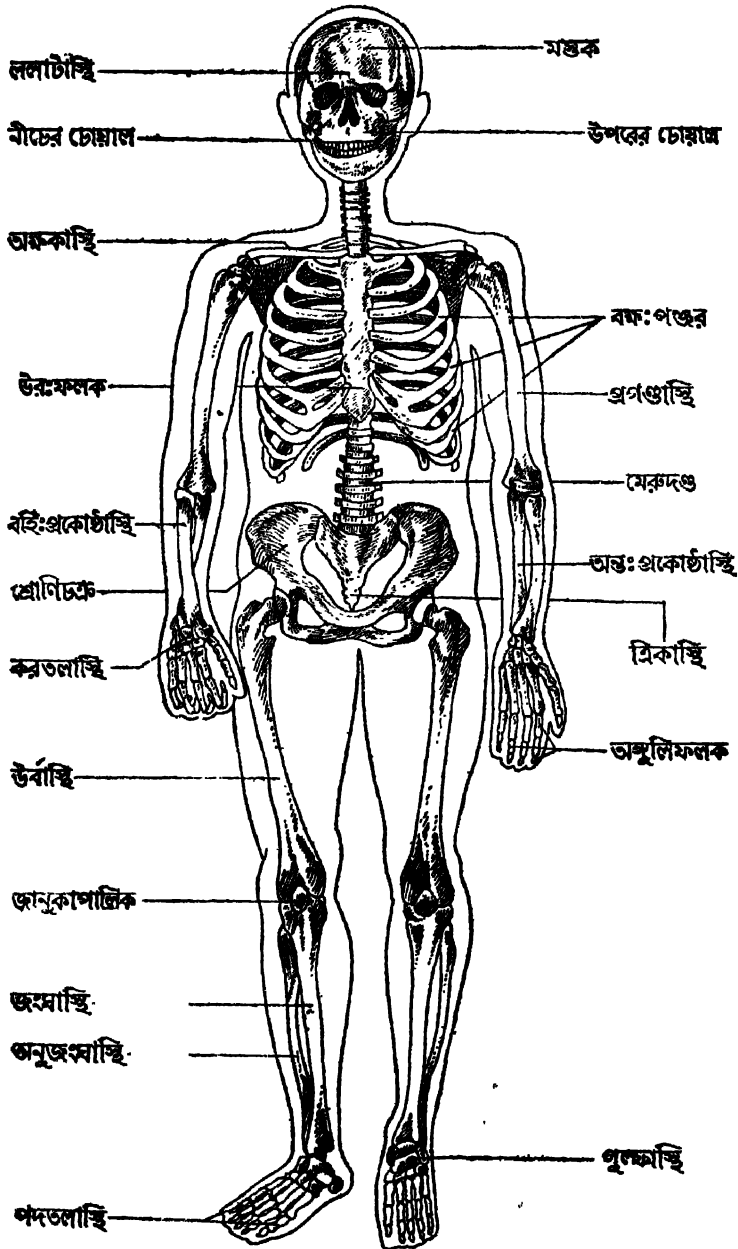
নরকঙ্কালের সামনের দিক

নরকঙ্কালের পিছনের দিক
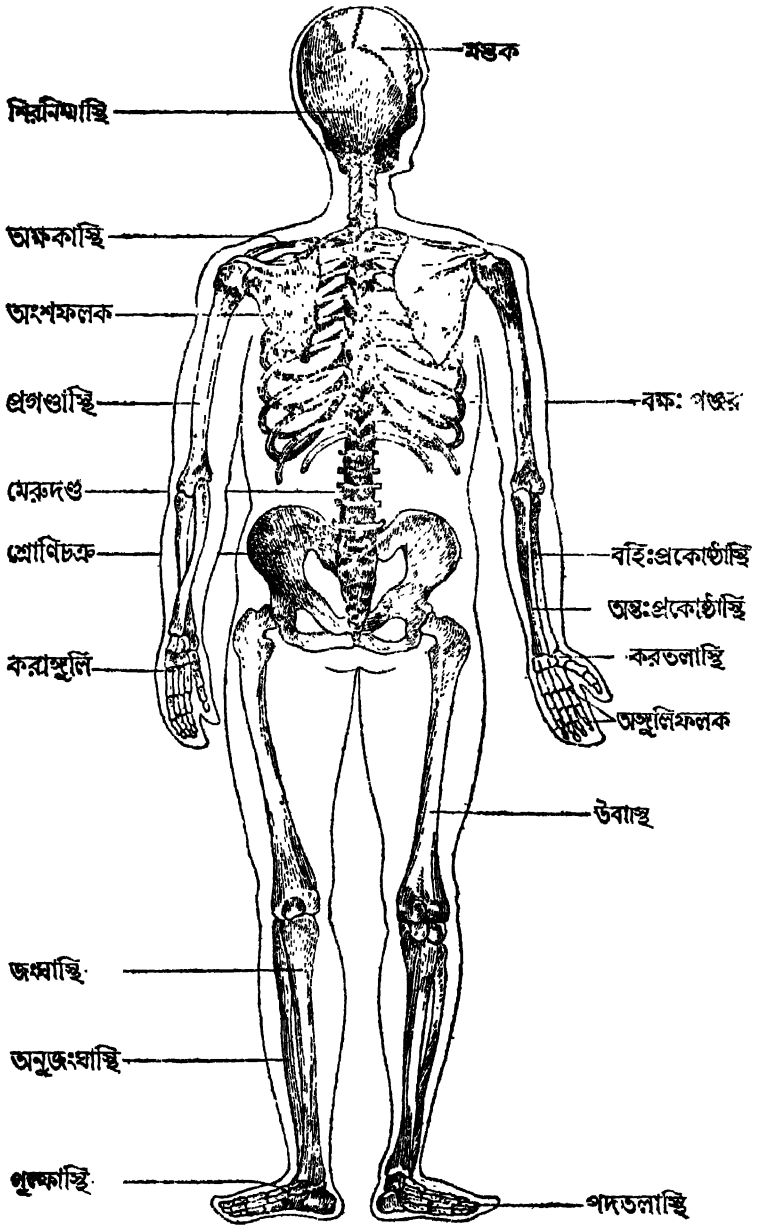
আবদ্ধ হইয়া একটি কোটরের সৃষ্টি করিয়াছে। এই কোটরেই মস্তিষ্ক (Brain) থাকে মস্তিষ্কাধারে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। এই সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া রক্তপ্রণালী ও স্নায়ুসমূহ প্রবিষ্ট হয়। রগাস্থি দুইটির মধ্যে শ্রবণযন্ত্র অবস্থান করে এবং ইহার মধ্য হইতে একটি প্রণালী বা ডাক্ট বাহির হইয়া বহিঃকর্ণ পথে গিয়াছে।

করোটি
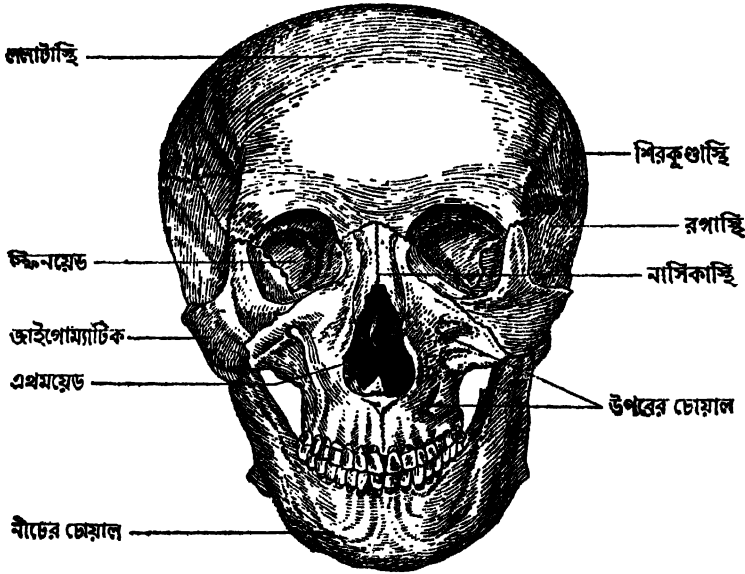
মস্তিষ্কাধারের বিরাট গহ্বরের সহিত শিরনিম্নাস্থিতে অবস্থিত একটি ছিদ্রপথে মেরুদণ্ডের ছিদ্রের (Neural canal) সংযোগ আছে। সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord) এই ছিদ্রপথেই মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করে ; ইহা ছাড়া প্রতি কানে ছোট ছোট তিনটি করিয়া অস্থি আছে এবং কণ্ঠে (Throat) একটি U আকৃতির অস্থি আছে।

মেরুদণ্ড (Vertebral Column) ঃ দেহের পিছন দিকে করোটির নিম্নদেশ হইতে শ্রোণিচক্রের (Pelvic girdle) একটু নীচে পর্যন্ত যে অস্থিনির্মিত দেহকাণ্ডটি অবস্থিত তাহাই মেরুদণ্ড নামে পরিচিত। ইহা একখানা লম্বা অস্থিদ্বারা প্রস্তুত নয়। ইহা ছোট ছোট প্রায় ৩৩ খানা অনিয়তাকার অস্থিখণ্ডের দ্বারা গঠিত। এক একটি অস্থিখণ্ডকে ভার্টিব্রা বা কশেরুকা (Vertebrae) বলে। প্রত্যেকটি কশেরুকা হুবহু একই রকম না হইলেও ইহাদের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেকটি কশেরুকার

মধ্যে একটি করিয়া বেশ বড় ছিদ্র দেখা যায়। এই ছিদ্রটিকে নিউরাল গহ্বর (Neural Cavity or Neural canal) বলে।

কশেরুকাগুলি উপর্যুপরি সজ্জিত হইয়া মেরু-দণ্ডটি গঠন করে। প্রত্যেক দুইটি কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থানে তরুণাস্থি স্তবকের (Cartilage) একটি পুরু আস্তরণ থাকে। এই তরুণাস্থি স্তবকের জন্যই মেরুদণ্ড স্থিতিস্থাপকতা ও সচলতা লাভ করে। মেরুদণ্ড-সংলগ্ন পেশী সংকুচিত হইলে তরুণাস্থি স্তবকও সংকুচিত হয় এবং কশেরুকা-গুলি পরস্পরের দিকে সরিয়া আসে। ফলে দেহের দৈর্ঘ্য কমিয়া যায়। আবার পেশীগুলি শিথিল হইয়া গেলে তরুণাস্থি স্তবকগুলিও প্রসারিত হয় এবং কশেরুকাগুলি পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। ফলে দেহের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। এইজন্যই শায়িত অবস্থায় আমাদের দেহের দৈর্ঘ্য দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে কিছুটা বেশী হয়। আবার ডাইনে অথবা বাঁয়ে দেহ বাঁকাইলে ঐ দিকের তরুণাস্থি স্তবকগুলি সংকুচিত হয় এবং অপরদিকে স্তবকগুলি প্রসারিত হয়। ফলে কশেরুকাগুলি তথা সমগ্র মেরুদণ্ডটি ঐ বাঁকের দিকে হেলিয়া পড়ে। এইরূপে কশেরুকার মধ্যবর্তী এই তরুণাস্থি স্তবকের জন্য সমগ্র মেরুদণ্ডটি ডাইনে-বাঁয়ে ও সম্মুখে-পিছনে যথেষ্ট পরিমাণে বাঁকান যায় এবং সঞ্চালন করা যায়। সমস্ত কশেরুকাগুলি পর পর এইভাবে সাজান থাকে যে উহাদের নিউরাল গহ্বরগুলি মিলিত হইয়া একটি নলের আকার ধারণ করে। এই ফাঁপা নলের মধ্য দিয়াই সুষুম্নাকাণ্ড প্রবাহিত হয়। সমগ্র মেরুদণ্ডটিকে উহার বিভিন্ন অংশের কাজের তারতম্য অনুযায়ী ৫টি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) গ্রীবাদেশীয় (Cervical vertebrae)—করোটির দিক হইতে প্রথম ৭ খানি কশেরুকা লইয়া এই অংশটি গঠিত। (২) বক্ষদেশীয় অংশ (Thoracic vertebrae)—গ্রীবা দেশীয় কশেরুকার পরবর্তী ১২ খানা কশেরুকা লইয়া এই অংশটি গঠিত। এই সকল কশেরুকার প্রত্যেকটির সহিত এক জোড়া করিয়া পঞ্জরের অস্থি সংলগ্ন থাকে। (৩) কটিদেশীয় অংশ (Lumber vertebrae)—বক্ষদেশীয় কশেরুকার পরবর্তী ৫ খানা কশেরুকা লইয়া এই কটিদেশীয় অংশটি গঠিত। (৪) ত্রিকাস্থি (Sacral vertebrae)—কটিদেশীয় কশেরুকার পরবর্তী ৫ খানা কশেরুকাকে ত্রিকাস্থি বলে। পরিণত বয়সে এই ৫ খানি অস্থি যুক্ত হইয়া একখানি ত্রিকাস্থিতে (Sacrum) পরিণত হয়। (৫) অনুত্রিকাস্থি (Coccygeal vertebrae)—অবশিষ্ট ৪ অথবা ৫ খানি কশেরুকা লইয়া অনুত্রিকাস্থি গঠিত। যে সকল স্তন্যপায়ী জীবের লেজ আছে তাহাদের অনুত্রিকাস্থিতে অনেকগুলি কশেরুকা থাকে এবং এই অনুত্রিকাস্থিই লেজের কঙ্কাল গঠন করে। মানুষের পূর্ব-পুরুষদেরও যে লেজ ছিল অনুত্রিকাস্থির এই ৪।৫ খানা কশেরুকাই তাহার প্রমাণ।

পশুদের মেরুদণ্ডটি প্রায় সোজা, কেবলমাত্র গ্রীবাদেশে একটি বাঁক আছে। কিন্তু মানুষের মেরুদণ্ডে গ্রীবাদেশ ছাড়াও বক্ষ, কটি এবং ত্রিকাস্থিদেশে বক্রতা আছে। এই বক্রতাগুলির জন্য দণ্ডায়মান অবস্থায় দেহের ভারকেন্দ্রটি একটি লম্ব রেখার উপর অবস্থান করে এবং গোড়ালির নিকট পায়ের পাতার মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। ভারকেন্দ্রের এইরূপ অবস্থানের জন্যই আমাদের দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং দুই পায়ে হাঁটা সম্ভব হয়। এই বক্রতার জন্যই হাঁটা-চলা, দৌড়ান, লাফান ইত্যাদির সময় মেরুদণ্ডটি স্প্রিং-এর ন্যায় কাজ করে এবং মস্তিষ্ককে গুরুতর আঘাত ও আলোড়নের হাত হইতে রক্ষা করে। ইহা ছাড়া মেরুদণ্ডের বক্রতা ইহাকে অধিকতর স্থিতিস্থাপকতা ও নমনীয়তা দান করে।

পঞ্জরাস্থি (Ribs) : বার জোড়া পঞ্জরাস্থিদ্বারা বক্ষ-গহ্বরটি গঠিত। এই বক্ষ-গহ্বরেই হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস অবস্থিত। প্রত্যেক জোড়া পঞ্জরাস্থির এক প্রান্ত পিছন
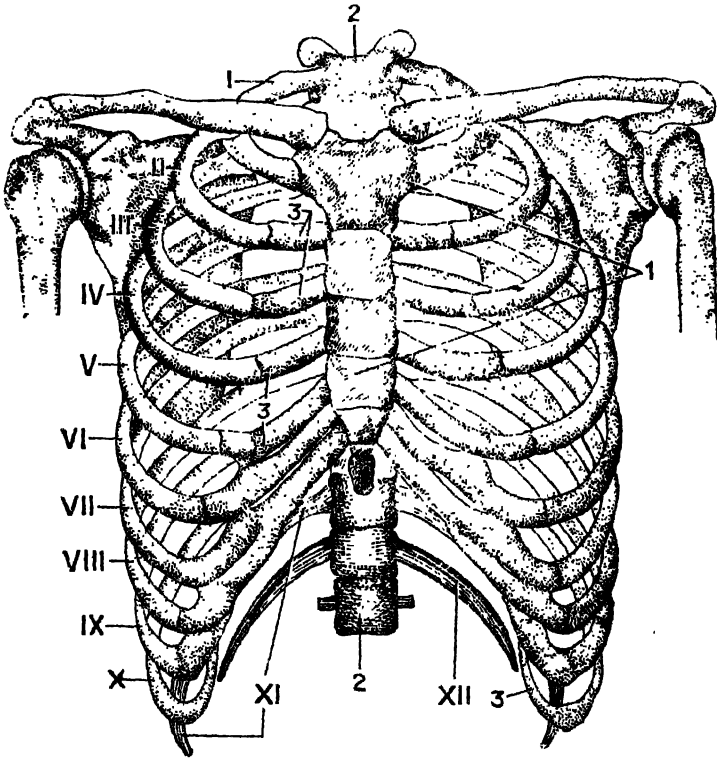
1. উরঃফলক 2. মেরুদণ্ড 3. পঞ্জরাস্থির, তরুণাস্থির গঠিত অংশ I—XII. পঞ্জরাস্থি

দিকে এক একটি বক্ষদেশীয় কশেরুকার উভয় পার্শ্বে সংযোজিত আছে। উপরের দশজোড়া পঞ্জরাস্থির অপর প্রান্ত তরুণাস্থির দ্বারা সম্মুখের উরঃফলকের (Sternum)

সহিত সংযুক্ত। অষ্টম, নবম এবং দশম পঞ্জরাস্থিসমূহ সরাসরি উরঃফলকে সংযুক্ত নয়। উহাদের তরুণাস্থিগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া সপ্তম পঞ্জরাস্থি তরুণাস্থির মাধ্যমে উরঃফলকের সহিত যুক্ত হইয়াছে। একাদশ এবং দ্বাদশ পঞ্জরাস্থির অপর প্রান্ত যুক্ত অবস্থায় আছে। ইহারা উরঃফলকের সহিত যুক্ত নয়। পঞ্জরাস্থিগুলি কশেরুকা হইতে সম্মুখের দিকে প্রসারিত হইবার সময় একটু নীচের দিকে হেলিয়া থাকে। প্রশ্বাস গ্রহণের সময় পঞ্জরাস্থির সম্মুখপ্রান্তে একটু উপরের দিকে উঠিয়া বক্ষ-গহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি করে। এই সম্বন্ধে শ্বসনতন্ত্রে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। পঞ্জরাস্থিসমূহ হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসকে আকস্মিক আঘাত ও আলোড়ন হইতে রক্ষা করে।

স্কন্ধ ও বাহু (Pectoral girdle and the arm)ঃ আমাদের ঘাড়ের দুই পাশে

স্কন্ধ ও বাহু
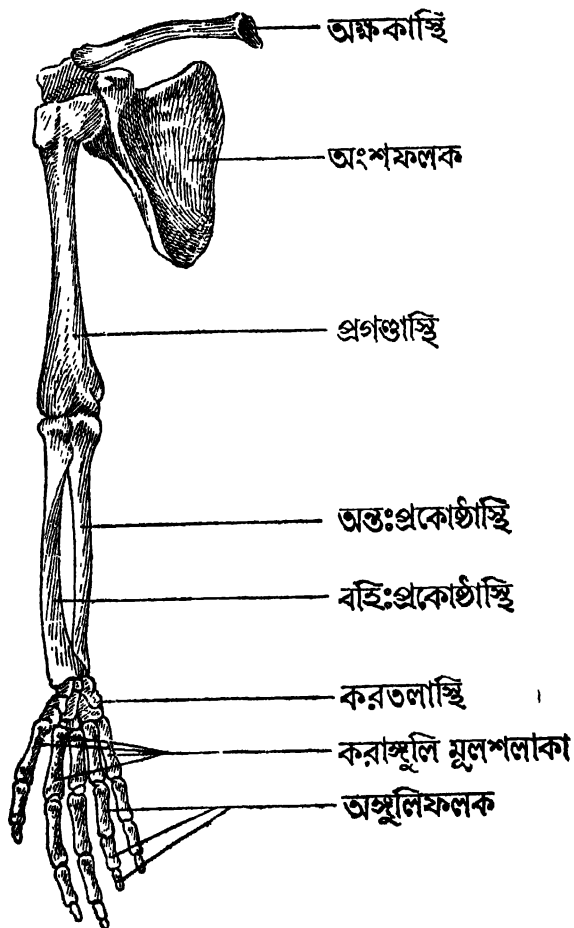
দুইখানা বাঁকা হাড় অনায়াসেই হাত দ্বারা অনুভব করা যায়। এই হাড় দুইখানাকে অক্ষকাস্থি (Clavicle or collar bones) বলে। ইহাদের একপ্রান্ত উরঃফলকের সহিত এবং অপর প্রান্ত অংসফলকের (Scapula or shouldes blader) সহিত সংযুক্ত। পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগে দুই পার্শ্বে যে দুইখানা বড় চেপ্টা অস্থি হাত হইতে মেরুদণ্ডের দিকে প্রসারিত তাহাদের অংসফলক বলে। এই অংসফলক এবং অক্ষকাস্থি হাতের দিকে একত্রে সংযুক্ত আছে। আমাদের প্রত্যেক বাহুতে তিনখানি করিয়া লম্বা অস্থি আছে। উপরের অস্থিখানিকে প্রগণ্ডাস্থি (Humerus) বলে। প্রগণ্ডাস্থির গোলাকৃতি প্রান্ত বা 'বল' অংসফলকের এক প্রান্তে অবস্থিত গর্তের (Socket) মধ্যে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ থাকে। অপর দুইখানি লম্বা অস্থি কনুই হইতে হাতের কব্জি পর্যন্ত অংশে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে ভিতরের দিকে অবস্থিত অস্থিখণ্ডকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (Ulna) এবং বাহিরের দিকের অস্থিখানাকে বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (Radius) বলে। এই অস্থি দুইখানি কনুইতে প্রগণ্ডাস্থির সহিত সংযুক্ত। ইহাদের অপর প্রান্ত হাতের কব্জিতে আসিয়া মিশিয়াছে। হাতের কব্জিতে ছোট ছোট আটখানি অস্থি আছে। ইহাদের কারপাল অস্থি (Carpal bones) বা করতলাস্থি বলে। কব্জি হইতে পাঁচখানি অপেক্ষাকৃত বড় অস্থি অঙ্গুলির মূল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আমাদের হাতের করতল (Palm of the hand) গঠন করিয়াছে। এই পাঁচখানি অস্থিকে করাঙ্গুলি মূলশলাকা (Metacarpal bones) বলে। হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে (Thumb) দুইখানি এবং অন্যান্য অঙ্গুলির প্রত্যেকটিতে তিনখানি করিয়া মোট ১৪ খানি অস্থিদ্বারা এক হাতের পাঁচটি অঙ্গুলি গঠিত। এই অস্থিগুলিকে অঙ্গুলিফলক (Phalanges) বলে। অতএব প্রত্যেক স্কন্ধে ২ খানি এবং প্রত্যেক বাহুতে ৩০ খানি অস্থি অবস্থিত।

শ্রোণিচক্র ও পা (Pelvic girdle and the leg) ঃ শ্রোণিচক্রে দুইখানি বড় বড় গামলার ন্যায় শ্রোণিচক্রাস্থি আছে। কোমরের নীচে দুই পাশে এই দুইখানি অস্থি অবস্থিত। প্রত্যেকটি শ্রোণিচক্রাস্থি আবার ইলিয়াম (Ilium), ইশিয়াম (Ischium) এবং পিউবিশ (Pubis) নামক তিনখানি অস্থির মিলনে গঠিত হইয়াছে। শ্রোণিচক্রাস্থি দুইখানি ত্রিকাস্থির (sacrum) সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন ; দুইখানি শ্রোণিচক্রাস্থির

প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া গভীর গর্ত (socket) আছে। এই গর্তকে এসিটাবুলাম (Acetabulum) বলে। বাহুর মত প্রত্যেক পায়ে ৩ খানি করিয়া লম্বা অস্থি আছে। উপরের অস্থিখানিকে উর্বাস্থি (Femur) বলে। এই উর্বাস্থির গোলাকৃতি প্রান্ত শ্রোণিচক্রাস্থির এসিটাবুলামে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকে। উর্বাস্থির অপর প্রান্তে জংঘাস্থি (tibia) এবং অনুজংঘাস্থির (fibula) সহিত সংযুক্ত। এই সংযোগ স্থানকে জানুসন্ধি (knee joint) বলে। এই জানুসন্ধির সম্মুখে একটি ছোট চ্যাপ্টা অস্থি থাকে। ইহাকে জানুকাপালিক (patella or knee caps) বলে। জংঘাস্থি এবং অনুজংঘাস্থি পায়ের গোড়ালিতে (heel) আসিয়া মিলিত হইয়াছে। গোড়ালিতে ছোট ছোট সাতখানি অস্থি আছে। ইহাদের গুল্ফাস্থি (tarsal bones) বলে। হাতের করতলের মত পায়ের পাতাতেও পাঁচখানি অস্থি আছে। ইহাদের পদতলাস্থি (Metatarsals) বলে। হাতের অঙ্গুলির মত পায়ের অঙ্গুলিতেও মোট ১৪ খানি অস্থি আছে। ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে (Great toe) দুইখানি এবং অপর চারিটি অঙ্গুলির প্রত্যেকটিতে তিনখানি করিয়া মোট ১২ খানি। এই সকল অস্থিকে পদাঙ্গুলি ফলক (phalanges) বলে। সুতরাং বাহু এবং পায়ের গঠনে অনেক সাদৃশ্য আছে। পায়ে মোট ৩০ খানি অস্থি আছে।
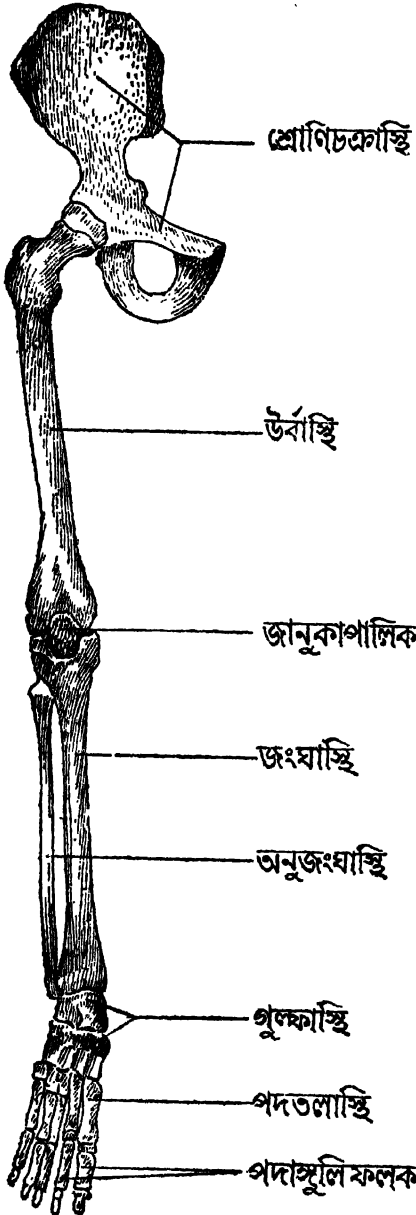
শ্রোণিচক্র ও পা

পেশী (Muscles)

নর-কঙ্কালের উপর পেশী বা মাংসপেশীর আবরণে মানবদেহ গঠিত। এই পেশীর মধ্যে আবার অসংখ্য শিরা, ধমনী এবং স্নায়ু প্রবাহিত হয়। আমাদের দেহে বিভিন্ন প্রকারের পেশী দেখিতে পাওয়া যায়। কতগুলি পেশী দেহের অভ্যন্তরে কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের ক্রিয়ার উপরে আমাদের ইচ্ছাশক্তির কোন প্রভাব থাকে না, যেমন কোন খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিলে উহা গলনালী হইয়া ক্রমশঃ পাকস্থলী এবং অন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়। গলনালী, পাকস্থলী, অন্ত্র ইত্যাদির পেশীসমূহের ক্রিয়ার ফলেই খাদ্যদ্রব্য এইরূপে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সকল অঙ্গের (organs) পেশীকে মসৃণ পেশী (smooth muscles বলে। ইহারা দেহের অভ্যন্তরে আমাদের ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর না করিয়াই কাজ করিয়া থাকে। আবার কতকগুলি পেশীর একপ্রান্ত বা উভয় প্রান্তই অস্থি বা হাড়ের সহিত সংযুক্ত থাকে। এই প্রকার অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীর সংখ্যাই আমাদের দেহে অধিক। এই সকল পেশীর মোট ওজন আমাদের দেহের মোট ওজনের অর্ধেকেরও বেশী। সাধারণতঃ শরীরের পেশী বা মাংশপেশী বলিতে এই অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীই বুঝায়। এই সকল পেশীতে ফিকা ও গাঢ় রঙের ডোরা কাটা থাকে বলিয়া এই জাতীয় পেশীকে **ডোরাকাটা পেশী** (striated muscles) বলে। ইহা ছাড়া **হৃৎপিণ্ডের পেশী** (Heart or cardiac muscles) একটি ভিন্ন প্রকারের পেশী। পাকস্থলী, অন্ত্র ইত্যাদির পেশীর ন্যায় হৃৎপিণ্ডের পেশীও আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া সর্বদাই কাজ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু পাকস্থলী ইত্যাদির মসৃণ পেশীর সহিত হৃৎপিণ্ডের পেশীর আকৃতিগত পার্থক্য আছে।

পেশীর গঠন ঃ অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীসমূহ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহারা কতগুলি লম্বা সরু সরু পেশী তন্তু (fibres) গুচ্ছাকারে একত্রিত হইয়া গঠিত হইয়াছে। এক একটি তন্তুর মধ্যে একই আবরণীর (membrane) মধ্যে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। সুতরাং একটি তন্তু একাধিক কোষের দ্বারা গঠিত বলা যায়। পেশী তন্তুর জীবোপাদানে অতি সূক্ষ্ম বহু সংখ্যক পেশী-সূত্র (Fibrils) দেখা যায়। এই সকল পেশীসূত্র পেশী তন্তুর সমগ্র দৈর্ঘ্য ব্যাপিয়া প্রসারিত থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় যে পেশী সূত্রগুলি গুচ্ছাকারে পর পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এবং গুচ্ছগুলির একটি অংশের রঙ ফিকা এবং পরবর্তী অংশের রঙ গাঢ়। লম্বালম্বি ভাবে গঠিত পেশীসমূহে এই ফিকা এবং গাঢ় রঙের ডোরাগুলি আড়াআড়ি-ভাবে অবস্থান করে এবং সমস্ত তন্তুটি ডোরা কাটা বলিয়া মনে হয়। এই কারণেই অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীগুলিকে ডোরাকাটা (striated) পেশী বলে। ডোরাকাটা পেশীগুলি সহজেই উত্তেজিত হয় এবং দ্রুত সংকুচিত হইতে পারে। মানবদেহের ডোরাকাটা পেশীগুলি সেকেণ্ডে দশবারেরও বেশী সংকুচিত হইতে পারে। মসৃণ পেশীর (Smooth muscles) তন্তুগুলিতে একটি করিয়া নিউক্লিয়াস থাকে অর্থাৎ একটি তন্তু একটি কোষের দ্বারাই গঠিত এবং ইহাতে ডোরা কাটা থাকে না। এই শ্রেণীর পেশী অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয় এবং উত্তেজনার ফলে সংকুচিত হইতেও অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে। মসৃণ তন্তুতে গঠিত পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশী-সমূহের সংকোচন হইতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে।

পেশীর কাজ (১) পেশীর প্রধান কাজ আমাদের দেহে গতি সঞ্চার করা। হাঁটা, দৌড়ান, লেখা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার কাজে দেহের বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। পেশীসমূহই দেহের ঐ সকল অংশকে সচলতা প্রদান করে। দেহের কোন অঙ্গই পেশীর সাহায্য ব্যতীত কোন কাজ করিতে পারে না। পেশীসমূহ সাধারণতঃ খুব শক্ত সাদা
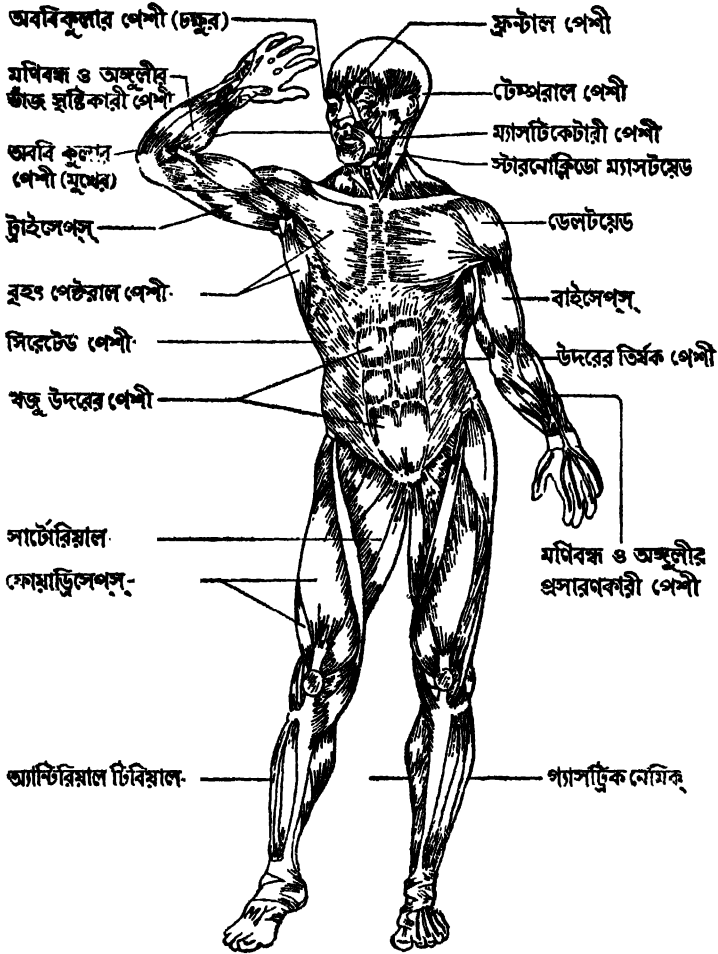
মানবদেহের সম্মুখভাগের পেশী সমূহ

ফিতার ন্যায় কণ্ডোরার (tendon) মাধ্যমে অস্থির সহিত সংযুক্ত থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেশীর উভয় প্রান্ত এই কণ্ডোরার সাহায্যে নিকটস্থ অস্থি-গ্রন্থির (joint) সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। যখন পেশীতে কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় তখন পেশীটি সংকুচিত হইয়া ঐ পেশী-সংলগ্ন অস্থিকে সচল করিয়া তোলে। যান্ত্রিক, তাপোদ্দীপক,

বৈদ্যুতিক বা রাসায়নিক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার উত্তেজনায় পেশীর সংকোচন ঘটে। তবে জীবন্ত দেহে পেশীর স্বাভাবিক উত্তেজনা ঘটে স্নায়ুতাড়না হইতে (Nerve impulses); অর্থাৎ স্নায়ুদ্বারা পেশী উত্তেজিত হইয়া সংকুচিত হয়, ফলে পেশীসংলগ্ন অঙ্গে গতি সৃষ্টি হয়। আমাদের বাহুর ওঠা-নামা দ্বারা পেশীর ক্রিয়া সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

(২) পেশীর অপর একটি কাজ হইল দেহে তাপ উৎপন্ন করা। আমাদের দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮·৬° ফাঃ। শীত-গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই এবং সকল প্রাকৃতিক অবস্থায়ই সুস্থ লোকের দেহের এই উত্তাপ রক্ষিত হয়। সুতরাং দেহ হইতে অনবরত যে তাপ চারিপাশে বায়ুমণ্ডলে বাহির হইয়া যাইতেছে তাহা পূরণ করিয়া দেহের উত্তাপ বজায় রাখিতে হইলে দেহের মধ্যে অনবরত তাপ উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পেশীসমূহই এই তাপ উৎপাদন করিয়া দেহের উষ্ণতা বজায় রাখে। তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ যে খাদ্য-দ্রব্য হইতে আমাদের দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে যে শক্তি (energy) থাকে তাহাকে রাসায়নিক শক্তি (Chemical energy) বলে। পেশীর সংকোচনের সময় খাদ্যের এই রাসায়নিক শক্তি কিছুটা যান্ত্রিক শক্তিতে (Mechanical energy) পরিণত হইয়া পেশী সংকোচনে সহায়তা করে। রাসায়নিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হইবার সময় অবশ্যম্ভাবীরূপে কিছুটা তাপ (Heat energy) উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক শক্তির কেবলমাত্র শতকরা ২০/৩০ ভাগ যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। অবশিষ্ট ৭০/৮০ ভাগ তাপে পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে পেশীর ক্রিয়ায় বা সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে দেহে তাপ উৎপন্ন হয় এবং এই তাপই দেহের উষ্ণতা বজায় রাখে।

মানবদেহের সম্মুখ ভাগের পেশীসমূহ :

(১) **ফ্রন্টাল পেশী :** এই পেশীটি ললাটে লম্বালম্বিভাবে ভাঁজ সৃষ্টি করে। (২) **চক্ষুর অরবিকুলার পেশী :** এই পেশীর সাহায্যে চক্ষুর পাতা দুইটি বন্ধ করা যায়। (৩) **টেম্পরাল পেশী :** মাথা ঘুরাইতে সাহায্য করে। (৪) **মুখের অরবিকুলার পেশী :** এই পেশীর সংকোচনে মুখবিবর বন্ধ হয়। (৫) **ম্যাস্টিকেটারী পেশী :** খাদ্যদ্রব্য চিবাইতে এই পেশীটি অন্যান্য পেশীর সহিত সহযোগিতা করে। (৬) **স্টারনোক্লিডো ম্যাস্টয়েড :** দুই পাশের দুইটি পেশী একযোগে সংকুচিত হইয়া মস্তকের সামনের দিকে অবনমিত করে। এক পাশের একটি পেশী সংকুচিত হইলে মস্তকটি সংকোচনের দিকে নত হয়। (৭) **বৃহৎ পেক্টরাল পেশী :** এই পেশীর সংকোচনে বাহু সম্মুখের দিকে আগাইয়া যায় এবং উত্তোলিত বাহু নীচের দিকে নামিয়া আসে। বাহু স্থির থাকিলে ইহার সাহায্যে বক্ষ উত্তোলিত হয়। (৮) **সিরেটেড পেশী :** গভীর প্রশ্বাসের সময় এই পেশীর সংকোচনে বক্ষ উত্তোলিত হয়। (৯) **ঋজু উদরের পেশী :** ইহা সংকুচিত হইলে দেহকাণ্ড সম্মুখের দিকে অবনমিত হয়। (১০) **উদরের তির্যক পেশী :** ইহা দেহকাণ্ডকে সম্মুখে ও পার্শ্বের দিকে ঘুরাইতে সাহায্য করে। (১১) **কোয়াড্রিসেপস্ :** ইহার সাহায্যে উরু সম্প্রসারণ করা হয়। (১২) **সার্টোরিয়াল পেশী :** ইহা পদদ্বয়কে হাঁটুতে ভাঁজ করে এবং ভিতরের দিকে ঘুরায়। (১৩) **গ্যাস্ট্রক-নেমিক্ পেশী :** ইহার সাহায্যে পায়ের পাতা নীচু করিয়া এবং গোড়ালি উঁচু করিয়া

রাখা যায় অর্থাৎ ইহার সাহায্যে পায়ের অঙ্গুলিতে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারা যায়। (১৪) অ্যান্টিরিয়াল টিবিয়াল : ইহার সাহায্যে পায়ের পাতা সোজা করা যায়।
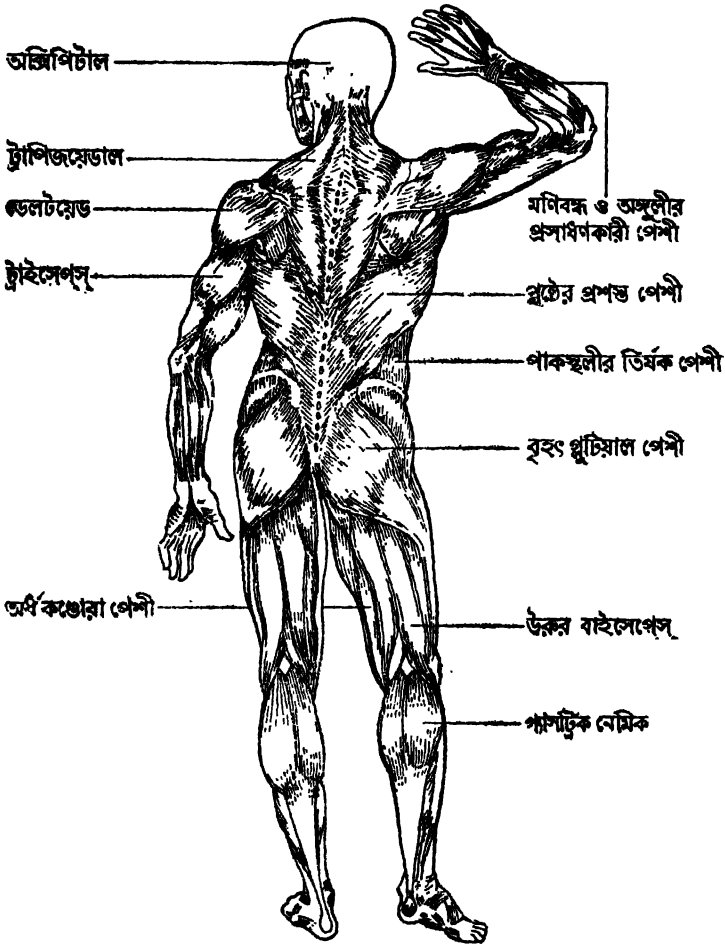
মানবদেহের পিছনদিকের পেশী সমূহ

(১৫) ডেলটয়েড পেশী : এই পেশীর সাহায্যে বাহু উত্তোলন করা যায়। (১৬) ট্রাই-সেপ্‌স্ পেশী : ইহার সাহায্যে গুটানো বাহুকে সোজা করা যায়। (১৭) বাইসেপ্‌স্ পেশী : ইহার সাহায্যে সোজা বাহুকে গুটানো যায়। (১৮) মণিবন্ধ ও অঙ্গুলির ভাঁজ সৃষ্টিকারী পেশীসমূহ। (১৯) মণিবন্ধ ও অঙ্গুলির প্রসারণকারী পেশীসমূহ।

মানবদেহের পিছন দিকের পেশীসমূহ : (১) **অক্সিপেটাল পেশী :** মাথা ঘুরাইতে সাহায্য করে। (২) **ট্র্যাপিজয়েড পেশী :** অংসফলককে মেরুদণ্ডের দিকে আকর্ষণ করে। (৩) **ডেলটয়েড পেশী :** বাহুকে উত্তোলিত করে। (৪) **ট্রাইসেপ্‌স্‌ পেশী :** গুটানো বাহুকে সোজা করে। (৫) **পৃষ্ঠের প্রশস্ত পেশী :** বাহুকে ভিতর ও পিছনের দিকে ঘুরায়। (৬) **মণিবন্ধ ও অঙ্গুলির প্রসারণকারী পেশী :** (৭) **মণিবন্ধ ও অঙ্গুলির ভাঁজ সৃষ্টিকারী পেশী।** (৮) **পাকস্থলীর তির্যক পেশী :** ইহার সাহায্যে দেহকাণ্ড সম্মুখের দিকে অবনমিত হয় ও একদিকে ঘোরে। (৯) **বৃহৎ গ্লুটিয়াল পেশী :** ইহার সাহায্যে উরু বাহিরের দিকে ঘোরে। (১০) **অর্ধকণ্ডোরা পেশী :** ইহার সাহায্যে হাঁটু সোজা করা যায় এবং হাঁটুতে ভাঁজ সৃষ্টি করা যায়। পদদ্বয়কে ভিতরের দিকে ঘুরাইতেও ইহা সাহায্য করে। (১১) **উরুর বাইসেপ্‌স্‌ :** ইহার সাহায্যে হাঁটু ভাঁজ করা যায়। (১২) **গ্যাসট্রিকনেমিক পেশী :** ইহার সাহায্যে পায়ের অঙ্গুলিতে ভর দিয়া গোড়ালি উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারা যায়।

রক্তসংবহন তন্ত্র

(Circulatory System)

আমাদের দেহের বিভিন্ন কোষে খাদ্যদ্রব্য পেঁছাইয়া দেওয়া এবং ঐ সকল কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি দূষিত এবং অসার পদার্থ ফুসফুস, বৃক্ক ইত্যাদিতে পরিবহন করিয়া দেহ হইতে অপসারণে সাহায্য করাই এই তন্ত্রের প্রধান কাজ। ট্রেন, স্টীমার ইত্যাদির সাহায্যে যেমন দেশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে খাদ্য-দ্রব্য ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি লইয়া যাওয়া হয়, তেমনি দেহের মধ্যে এই রক্ত-বহন তন্ত্র ট্রেন, স্টীমারের মত দেহের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্যাদি পরিবহন করিয়া থাকে। এই তন্ত্রের প্রধান প্রধান কার্য:

(১) অন্ত্র (Intestine) এবং যকৃত হইতে ইহার সাহায্যে খাদ্য-দ্রব্য বিভিন্ন কোষে পেঁছাইয়া দেওয়া হয়।

(২) ফুসফুস হইতে অক্সিজেন এই তন্ত্রের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন কোষে যায় এবং কোষ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ফুসফুসে ফিরিয়া আসে ;

(৩) নাইট্রোজেন-ঘটিত দূষিত পদার্থ (ইউরিয়া ইত্যাদি) এই তন্ত্রের সাহায্যে বৃক্কে পেঁছাইয়া দেওয়া হয়।

(৪) দেহের তাপসৃষ্টিকারী অঙ্গের সহিত যথা, মাংসপেশী (muscles), এবং তাপ অপসারণকারী অঙ্গ যথা, ত্বক ও ফুসফুসের সংযোগসাধন করিয়া এই তন্ত্র দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ বজায় রাখিতে সাহায্য করে।

(৫) ইহার সাহায্যে হরমোন নামক দেহের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া হয়।

(৬) এই সংবহন তন্ত্র আমাদিগকে বিভিন্ন প্রকার রোগ জীবাণুর হাত হইতে রক্ষা করে।

(৭) দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে যাহাতে অধিক রক্তপাতে আমাদের কোন ক্ষতি না হয় সেইজন্য এই সংবহন তন্ত্রের সাহায্যেই ঐ ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায়। এইরূপে ইহা আমাদের দেহকে অধিক রক্তপাতের হাত হইতে রক্ষা করে।

আমাদের হৃৎপিণ্ডটিই (Heart) এই সংবহন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। ইহা ছাড়া রক্ত (Blood) নামক একটি লাল তরল পদার্থ এই তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই তরলে দ্রবীভূত করিয়াই বিভিন্ন দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। হৃৎপিণ্ডটি একটি পাম্পের ন্যায় এই রক্তকে বিভিন্ন স্থানে পরিচালনা করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া ধমনী (Arteries), শিরা (Veins) এবং জালকশ্রেণী (Capillaries) নামক কতগুলি পাইপ লাইনও এই সংবহন তন্ত্রের অঙ্গ। এই পাইপ লাইনগুলির মধ্য দিয়াই রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বিভিন্ন স্থানে পেঁছিয়া থাকে এবং ঐ সকল স্থান হইতে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। আমাদের দেহের দূষিত পদার্থসমূহ প্রধানতঃ শিরার সাহায্যে পরিবাহিত হইলেও সমস্ত দূষিত পদার্থই এই শিরার দ্বারা পরিবাহিত হয় না। দূষিত পদার্থের কিছু অংশ অন্য এক প্রকার পাইপ লাইনের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি প্রধান শিরায় গিয়া উপস্থিত হয়। এই প্রকার পাইপ লাইনের নাম লসিকানালী (Lymphatics)। ইহাও রক্ত সংবহন তন্ত্রের অন্তর্গত।
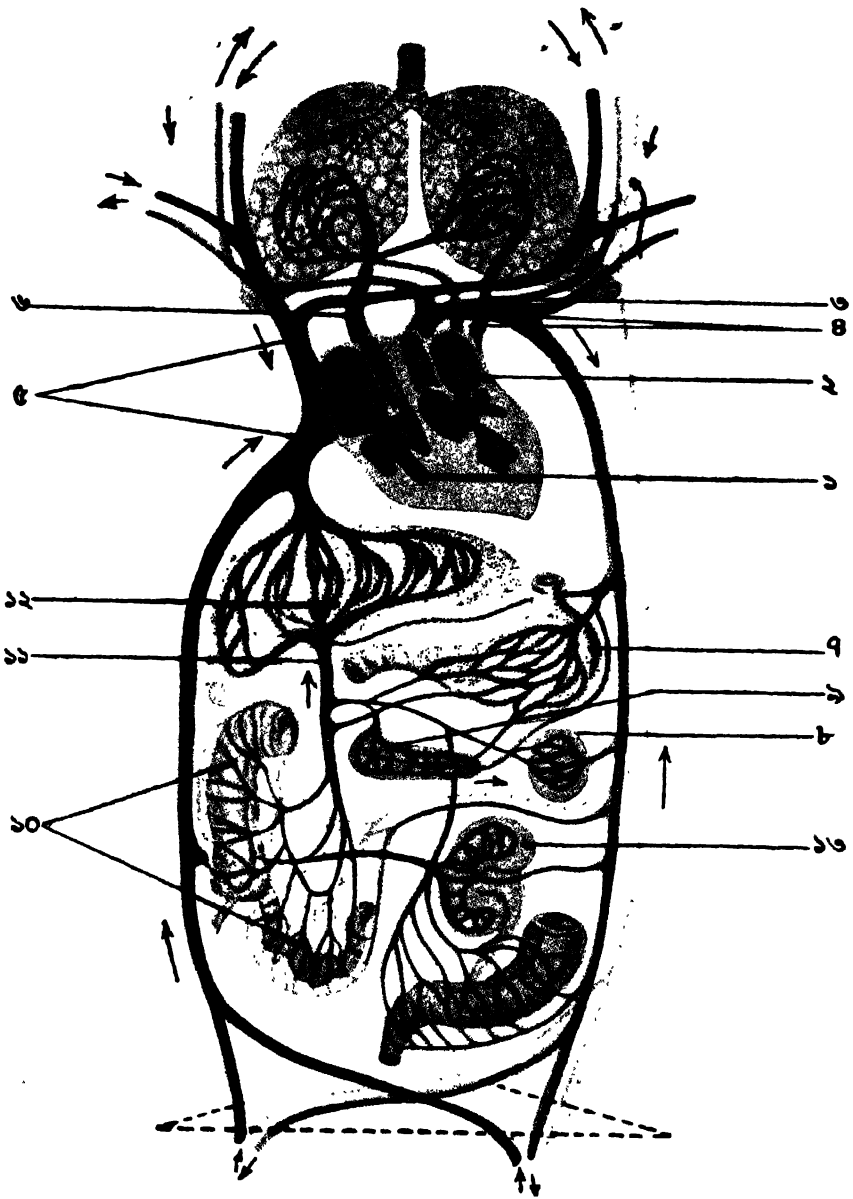
রক্ত ও লসিকা সংবহনের চিত্র

লাল রং—ধমনী বাহিত রক্ত। নীল রং—শিরা। বেগুনি রং—পোর্টাল বা যকৃতের শিরা। পীত রং—লসিকা নালী।

১। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণার্ধ ২। হৃৎপিণ্ডের বাম অর্ধ ৩। মহাধমনী ৪। পালমনারি শিরা ৫। উচ্চ ও নিম্ন মহাশিরা ৬। পালমনারি ধমনী ৭। পাকস্থলী ৮। প্লীহা ৯। অগ্ন্যাশয় ১০। অন্ত্র ১১। পোর্টাল শিরা ১২। যকৃত ১৩। বৃক্ক

রক্ত (Blood) ঃ একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের দেহে সাধারণতঃ ৬ হইতে ৮ কোয়ার্ট (Quarts) রক্ত থাকে। খালি চোখে রক্ত সমসত্ত্ব (Homogeneous) বলিয়া মনে হইলেও আসলে ইহা অসমসত্ত্ব (Heterogeneous)। বাতাসের সংস্পর্শে রক্ত সহজেই জমাট বাঁধিয়া যায়। কিন্তু রক্তের সহিত কিছুটা অক্সালেটের জলীয় দ্রবণ মিশাইলে উহা আর জমাট বাঁধে না। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে উপরে জলের মত একটি স্বচ্ছ তরল পদার্থ এবং পাত্রের নীচে কতগুলি কণিকা থিতাইয়া পড়িতে দেখা যায়। উপরের এই তরল পদার্থটিকে রক্ত রস (Plasma) বলে। দেহে যতটা রক্ত আছে তাহার মধ্যে অর্ধেকের চেয়েও বেশী এই রক্তরস, বাকী অংশ ঐ কণিকাসমূহ। কণিকাগুলি আবার তিন প্রকারের লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা এবং অনুচক্রিকা। **সুতরাং রক্ত লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা, অনুচক্রিকা এবং রক্তরস এই চারিটি** উপাদানে গঠিত। ইহারা বিভিন্ন প্রকার কাজ করিয়া থাকে।

শ্রেণীবিভাগ ঃ কোন কারণে আমাদের শরীরে রক্তের অভাব হইলে আমরা অন্য লোকের শরীর হইতে রক্ত গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু যে-কোন লোকের রক্তই অন্য যে-কোন লোকের দেহে দেওয়া যায় না। কারণ সকল মানুষের রক্ত একই রকম নয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এক জাতীয় জন্তুর লোহিত কণিকা অপর জাতীয় রক্তমস্তু বা সিরামের (Serum) সংস্পর্শে আসিলে পিণ্ডত্ব দোষ (Agglutination) অর্থাৎ লোহিত কণিকাগুলি একত্রে মিলিত হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায়। ইহা রক্তের জমাট বাঁধা (coagulation) নহে। খানিকটা তাজা রক্ত একটি পাত্রে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে দেখিবে যে রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে (coagulation)। রক্তের লাল জমাট অংশটুকু ছাড়া ইহাতে ঈষৎ হরিদ্রাভ একটি তরল পদার্থ দেখিতে পাইবে। এই তরল পদার্থটিকে রক্তমস্তু (Serum) বলে। রক্তের লোহিত কণিকায় একপ্রকার পদার্থ (Agglutinogen) থাকে যাহা অন্য প্রাণীর রক্তমস্তুর সংস্পর্শে জমিয়া যায়। এই পদার্থটি A এবং B দুই প্রকারের হইতে পারে। রক্তমস্তুর মধ্যেও অন্য একপ্রকার পদার্থ (Agglutinin) থাকে যাহা লোহিত কণিকার A এবং Bকে জমাইতে পারে। ইহাও α (আলফা) এবং β (বিটা) এই দুই প্রকারের হইতে পারে। সুতরাং রক্তের উপর রক্তমস্তুর α এবং β এই দুই প্রকার উপাদানের ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া রক্তকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

(১) O গ্রুপ রক্ত—যে রক্তের লোহিত কণিকা রক্তমস্তুর α অথবা β উপাদানের দ্বারা জমাট বাঁধে না (not agglutinated)।

(২) A গ্রুপ রক্ত—যে রক্তের লোহিত কণিকা রক্তমস্তুর α উপাদানের দ্বারা জমাট বাঁধে।

(৩) B গ্রুপ রক্ত—যে রক্তের লোহিত কণিকা রক্তমস্তুর β উপাদানের দ্বারা জমাট বাঁধে।

(৪) AB গ্রুপ রক্ত—যে রক্তের লোহিত কণিকা রক্তমস্তুর α এবং β উভয় উপাদানের দ্বারাই জমাট বাঁধে।

আবার রক্তে এই সকল উপাদানের উপস্থিতির প্রকারভেদে চারি প্রকারের দাতা এবং চারি প্রকারের গ্রহীতা হইতে পারে।

(১) প্রথম শ্রেণী—যাহাদের লোহিত কণিকায় A এবং B আছে কিন্তু রক্তমস্তুতে α এবং β নাই।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণী—যাহাদের লোহিত কণিকায় A আছে এবং রক্তমস্তুতে β আছে।

(৩) তৃতীয় শ্রেণী—যাহাদের লোহিত কণিকায় B এবং রক্তমস্তুতে α আছে।

(৪) চতুর্থ শ্রেণী—যাহাদের লোহিত কণিকায় A এবং B নাই, কিন্তু রক্তমস্তুতে α এবং β আছে।

প্রথম শ্রেণীর লোক সকলের রক্তই গ্রহণ করিতে পারে (Universal recipient) এবং চতুর্থ শ্রেণীর লোক অন্য সকলকেই রক্ত দিতে পারে (Universal donor)। দ্বিতীয় শ্রেণীর রক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং প্রথম শ্রেণীর গ্রাহকের উপযুক্ত এবং গ্রহীতা হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক দ্বিতীয় শ্রেণী এবং চতুর্থ শ্রেণীর রক্ত গ্রহণ করিতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর রক্ত তৃতীয় শ্রেণীর এবং প্রথম শ্রেণীর লোক গ্রহণ করিতে পারে এবং গ্রহীতা হিসাবে তৃতীয় শ্রেণীর লোক তৃতীয় শ্রেণীর এবং চতুর্থ শ্রেণীর রক্ত গ্রহণ করিতে পারে। ইহা ছাড়া এই চারিটি শ্রেণীর রক্ত নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যে আদান-প্রদান করিতে পারে। যেমন, কোন চতুর্থ শ্রেণীর রক্ত অন্য যে কোন চতুর্থ শ্রেণীর গ্রাহককে দেওয়া যাইতে পারে বা চতুর্থ শ্রেণীর গ্রাহক একজন অন্য যে কোন চতুর্থ শ্রেণীর রক্ত গ্রহণ করিতে পারে।

কাজ : রক্ত একটি মৃদু ক্ষার জাতীয় তরল। দেহের মধ্যে ইহা বিভিন্ন প্রকার কাজ করিয়া থাকে। রক্ত-সংবহন তন্ত্রের কাজসমূহ সমস্তই রক্তের দ্বারা সাধিত হয়। (রক্ত-সংবহন তন্ত্রের কাজ দেখ)

রক্তরস (Plasma) : ইহা দেখিতে জলের মত স্বচ্ছ এবং কিছুটা ঘন। রক্তরসের শতকরা ৯০ ভাগই জল এবং অবশিষ্ট দশ ভাগ কঠিন পদার্থ। কঠিন দ্রব্যাদির মধ্যে অ্যালবুমিন, ফাইব্রিনোজেন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের প্রোটিন জাতীয় পদার্থ উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রোটিন রক্তের চাপ বজায় রাখিতে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রকারের ধাতব লবণও (যথা, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদির ক্লোরাইড, কার্বোনেট, বাইকার্বোনেট, ফসফেট ইত্যাদি) ইহাতে দ্রবীভূত থাকে। প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ-পদার্থ ইত্যাদি খাদ্যের সার অংশ এবং ফুসফুস হইতে গৃহীত অক্সিজেন গ্যাস এই রক্তরসেই দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ইহা ছাড়া রক্তরসে হরমোন নামক কতকগুলি এনজাইম এবং নানারকম রোগ-প্রতিষেধক পদার্থ দেখা যায়। বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এই রক্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ইহা ছাড়া রক্তরসে হরমোন নামক কতকগুলি এনজাইম এবং নানারকম রোগ-প্রতিষেধক পদার্থ দেখা যায়। বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এই রক্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায় ফুসফুসে বাহিত হয়।

লোহিত কণিকা (Red Corpuscle or Erythrocytes) **:** রক্তের বিভিন্ন প্রকার কণিকার মধ্যে এই লোহিত কণিকার আধিক্যই সর্বাপেক্ষা বেশী। দেখিতে গোল গোল চাকার মতো এবং এত ছোট যে ৩৫০০ লোহিত কণিকা এক লাইনে সাজাইয়া রাখিলে মাত্র এক ইঞ্চি জায়গা জোড়ে। এই সকল কণিকার কোষে কিন্তু নিউক্লিয়াস নাই। খালি চোখে ইহাদের দেখা যায় না। এক বিন্দু রক্তে (One cubic milli-

meter) প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোহিত কণিকা দেখা যায়। রক্তের লাল রঙটি এই লোহিত কণিকার জন্যই। লোহিত কণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক লৌহঘটিত একপ্রকার লাল পদার্থের জন্যই লোহিত কণিকার বর্ণ লাল। অস্থি-মজ্জায় (Bone-marrow) এই সকল কণিকা সৃষ্টি হইয়া থাকে। রক্তের মধ্যে প্রায় ১২০ দিন পর্যন্ত এক একটি কণিকা ঘুড়িয়া বেড়ায়। এই সময় ইহা ফুসফুস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া দেহের বিভিন্ন কোষে পেঁছাইয়া দেয়। কোষ হইতে ফুসফুসে ফিরিয়া যাইবার সময় আবার কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের কিছুটা লইয়া ফুসফুসে ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিবহন করাই এই কণিকার প্রধান কাজ। এইরূপে কাজ করিবার ফলে প্রায় ১২০ দিন পরে এই কণিকাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কাজের অযোগ্য হইয়া পড়ে। তখন প্লীহা (spleen) এই ক্ষয়প্রাপ্ত রক্ত কণিকাগুলি রক্ত হইতে অপসারিত করে। প্রতি সেকেণ্ডে আমাদের দেহ হইতে এইরূপে প্রায় দশ লক্ষ লোহিত কণিকা অপসারিত হইতেছে এবং উহাদের স্থান আবার নূতন কণিকাদ্বারা পূরণ করা হইতেছে।

শ্বেতকণিকা (white corpuscle) ঃ লোহিত কণিকার তুলনায় ইহারা আকারে অনেকটা বড় এবং সংখ্যায়ও অনেক কম। নিউক্লিয়াস এবং আকারের তরতম্য হেতু ইহাদের মধ্যে প্রকারভেদ দেখা যায়। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রায় ৮০০০ শ্বেতকণিকা থাকে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রক্তে ইহার সংখ্যা কিছু কম থাকে। বিভিন্ন প্রকার শ্বেতকণিকার মধ্যে লিওকোসাইট (Leucocytes) এবং লিম্ফোসাইট (Lymphocytes) এই দুই প্রকার কণিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লিওকোসাইট শ্বেতকণিকা অস্থি-মজ্জায় সৃষ্টি হইয়া থাকে। লিম্ফোসাইটের জন্মস্থান ভিন্ন। ইহারা লসিকাকলায় (Lymph nodes) উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্বেতকণিকা আমাদের দেহের মধ্যে পাহারাওয়ালার কাজ করিয়া থাকে। হাওয়া, মাটি, জল, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদিতে অসংখ্য জীবাণু বাস করে। এই সকল জীবাণু যদি কোন প্রকারে আমাদের রক্তে ঢুকিয়া পড়ে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শ্বেতকণিকা ঐ সকল জীবাণু ঘিরিয়া উহাদের মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। যুদ্ধে উভয় পক্ষেই হতাহত হয়। যুদ্ধশেষে শ্বেতকণিকার জয় হইলে আমরা সুস্থ থাকি এবং অপর পক্ষের জয় হইলে জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। দেহের কোন কাটা অংশ পাকিয়া গেলে উহাতে পুঁজ (Pus) জমা হইতে দেখিয়া থাকিবে। জীবাণু এবং শ্বেতকণিকার মধ্যে যুদ্ধে মৃত জীবাণু, শ্বেতকণিকা এবং ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ-কোষ কলা রসের (Tissue fluid) সহিত একত্রিত হইয়া এই পুঁজের সৃষ্টি করে। সুতরাং দেহকে বিভিন্ন রোগ জীবাণুর হাত হইতে রক্ষা করাই শ্বেতকণিকার প্রধান কাজ। ইহা ছাড়া শ্বেতকণিকা মাঝে মাঝে নষ্ট কলা পুনর্গঠনে (Tissue repaid) এবং রক্ত জমাট বাঁধিতেও সাহায্য করে। কিছুদিন কাজ করিবার ফলে যখন শ্বেতকণিকাগুলির কার্যক্ষমতা কমিয়া যায় তখন সেই ক্ষয়িষ্ণু শ্বেতকণিকা প্লীহা এবং যকৃতের মধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অনুচক্রিকা (Platelets) ঃ এইগুলি আকাকে অতি ছোট এবং রক্তের মধ্যে অনেকগুলি একত্রিত হইয়া পুঞ্জীভূত অবস্থায় থাকে। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রায় ২,৫০,০০০ অনুচক্রিকা দেখা যায়। অস্থির লোহিত মজ্জা এবং প্লীহার মধ্যে এই সকল কণিকা সৃষ্টি হইয়া থাকে। রক্ত জমাট (Blood clotting) বাঁধিবার জন্য এই

অনুচক্রিকার প্রয়োজন হয়। ক্ষত স্থানে ইহারা শ্বেতকণিকার সহিত একত্রিত হইয়া ক্যালসিয়ামের উপস্থিতিতে রক্তরসের প্রোথ্রম্বিন নামক উপাদানকে থ্রম্বিনে রূপান্তরিত করে। এই থ্রম্বিন রক্তরসের ফাইব্রিনোজেন প্রোটিন হইতে ফাইব্রিন প্রস্তুত করে। ইহার ফলে কণিকাগুলি ঐ ক্ষতস্থানে জড় হইয়া রক্ত জমাট করিয়া ফেলে। ইহারই নাম তঞ্চন প্রক্রিয়া (Coagulation)।

মাঝে মাঝে এই তঞ্চন প্রক্রিয়া রক্তনালীর (Blood vessel) মধ্যেই সংঘটিত হইয়া থাকে। কোন কারণে রক্তনালীর গাত্র বিধ্বস্ত হইলে ঐ নালীর মধ্যেই রক্ত উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় জমাট বাঁধিয়া যায়। মস্তিষ্ক, ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ডের কোন ক্ষুদ্র ধমনীতে এইরূপে রক্তজমাট বাঁধিলে আমাদের অকস্মাৎ মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে এবং এই অবস্থাকেই থ্রম্বোসিস (Thrombosis) বলে।

হৃৎপিণ্ড (Heart) ঃ রক্ত-সংবহন তন্ত্রের এইটিই প্রধান অঙ্গ। ইহার কাজ রক্তকে পাম্প করিয়া রক্তনালীর মধ্য দিয়া দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া।

অলিন্দের সংকোচনে রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করিতেছে | নিলয়ের সংকোচনে রক্ত মহাধমনী ও ফুসফুসের ধমনীতে প্রবেশ করিতেছে

ইহা দেখিতে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, আড়াই ইঞ্চি চওড়া এবং আড়াই ইঞ্চি পুরু একটি পেশীময় থলির মত। বুকের বাম দিকে বক্ষগহ্বরে এই হৃৎপিণ্ডটি অবস্থিত। অন্যান্য দেহযন্ত্রের সহিত যাহাতে ইহার কোন রকম আঘাত না লাগে সেইজন্য ইহা একটি তরলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। বাহিরের আঘাত এই তরলেই প্রতিহত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড এবং ইহার চারিদিকে অবস্থিত এই তরল হৃদ্ধরাকলা (Pericardium) নামক একটি বিশিষ্ট কুঠুরিতে (Chamber) এই বক্ষ-পঞ্জর অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডের উপরের দিকে অপেক্ষাকৃত চওড়া, তলার দিকে ইহা ক্রমান্বয়ে সরু হইয়া একটি কোণের আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। উপরের চওড়া অংশে দুইটি এবং নীচের সরু অংশে দুইটি মোট চারিটি কক্ষ এই হৃৎপিণ্ডে দেখা যায়। উপরের কক্ষ দুইটিকে অলিন্দ (Auricle) এবং নীচের কক্ষ দুইটিকে নিলয় (Ventricle) বলে। ডান পাশের অলিন্দ ডান পাশের নিলয়ের সঙ্গে একটি কপাটকের (Valve) দ্বারা যুক্ত। এই কপাটকটি কেবলমাত্র নিলয়ের দিকেই খুলিতে পারে। অর্থাৎ এই কপাটকের সাহায্যে রক্ত কেবলমাত্র অলিন্দ

হইতে নিলয়ের দিকেই যায় ; নিলয় হইতে অলিন্দে ফিরিয়া যাইতে পারে না। বাম দিকেও অনুরূপ একটি কপাটিকা উপরের অলিন্দ এবং নীচের নিলয়ের মধ্যে বর্তমান এবং ইহার সাহায্যে রক্ত কেবলমাত্র অলিন্দ হইতে নিলয়ের দিকেই যাইতে পারে। ডানদিকের অলিন্দ এবং নিলয় বাম দিকের অলিন্দ এবং নিলয় হইতে একটি পেশীময় পর্দা দ্বারা লম্বালম্বিভাবে সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত। উপরের অলিন্দ দুইটিতে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে শিরার সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। নীচের নিলয় দুইটি এই রক্ত ধমনীর সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশে পেঁছাইয়া দেয়। ডান দিকের অলিন্দে দুইটি মহাশিরা আসিয়া একত্রে মিশিয়াছে। একটি মহাশিরা দেহের ঊর্ধ্বাংশ হইতে দূষিত রক্ত বহন করিয়া আনে। ইহাকে ঊর্ধ্ব মহাশিরা (Superior Venae Cavae) বলে। অপরটি দেহের নিম্নাংশ হইতে দূষিত রক্ত বহন করিয়া আনে। ইহাকে নিম্ন-মহাশিরা (Inferior Venae Cavae) বলে। ডান দিকের অলিন্দ হইতে এই দূষিত রক্ত ডান দিকের নিলয়ে গমন করে। এই নিলয় হইতে দূষিত রক্ত ফুসফুস ধমনীর (Pulmonary artery) সাহায্যে ফুসফুসে যাইয়া উপস্থিত হয়। নিলয় হইতে ফুসফুস ধমনী বাহির হইয়া দুইটি অংশে বিভক্ত হয় এবং এই দুইটি শাখা দক্ষিণ ও বাম ফুসফুস ধমনীরূপে যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম ফুসফুসে চলিয়া যায়। এইখানে রক্ত বিশোধিত হইয়া ফুসফুসের চারিটি শিরার (Pulmonary Veins) সাহায্যে বাম অলিন্দে যাইয়া উপস্থিত হয়। বাম অলিন্দ হইতে এই বিশোধিত রক্ত কপাটক পথে নীচের নিলয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বাম নিলয় হইতে মহাধমনী (Aorta) বাহির হইয়া বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সাহায্যে দেহের সকল অংশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বাম নিলয় হইতে রক্ত এই মহাধমনীর সাহায্যে দেহের সকল অংশে প্রবাহিত হয়। প্রতি হৃদ্স্পন্দনে প্রায় চার আউন্স রক্ত এই মহাধমনীতে প্রবেশ করে। রক্ত যাহাতে মহাধমনী হইতে ফিরিয়া নিলয়ে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য উভয়ের সংযোগস্থলে অর্ধচন্দ্রাকার (Semi-lunar) কপাট আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ডান দিকের অলিন্দ এবং নিলয়ে দূষিত রক্ত এবং বাম দিকের অলিন্দ এবং নিলয়ে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হয়। সমগ্র হৃৎপিণ্ডটি এক প্রকার বিশিষ্ট মাংসপেশী দ্বারা গঠিত। এই মাংসপেশী খুব সবল এবং ইহার দ্রুত সংকুচিত হইবার ক্ষমতা আছে। অলিন্দ অপেক্ষা নিলয়ের গাত্র-প্রাচীর অধিক পুরু।

ধমনী ও শিরা (Arteries and veins) : হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তপ্রবাহ যে পাইপ লাইনের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশে লইয়া যাওয়া হয় তাহাদের ধমনী (Arteries) বলা হয়। হৃৎপিণ্ড হইতে এইরূপ দুইটি প্রধান ধমনী বাহির হইয়াছে। ইহাদের একটি ডান দিকের নিলয় হইতে বাহির হইয়া ফুসফুসের দিকে গিয়াছে। ইহাকে ফুসফুস ধমনী বলে। অপরটি বাম দিকের নিলয় হইতে বাহির হইয়া দেহের অন্যান্য অংশে গমন করিয়াছে। ইহাকেই মহাধমনী বলে। এই দুইটি প্রধান ধমনী প্রথমে কতকগুলি শাখা ধমনীতে এবং প্রত্যেকটি শাখা ধমনী আবার কতকগুলি প্রশাখা ধমনীতে বিভক্ত হইয়া দেহের প্রতিটি অংশে বিস্তৃত হইয়া আছে। প্রতিটি প্রশাখা ধমনী অবশেষে অতি সরু সরু কতকগুলি জালকে (Capillaries) বিভক্ত হইয়াছে। হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা হইয়া অবশেষে এই জালকে আসিয়া উপস্থিত হয় ; এই জালকের মধ্য দিয়াই রক্তের সহিত একদিকে বিভিন্ন দেহকোষের এবং অন্যদিকে

ফুসফুসস্থিত বায়ুর সহিত আদান-প্রদান ঘটিয়া থাকে। জালক শ্রেণীর অপর প্রান্ত একত্রিত হইয়া প্রথমে প্রশাখা শিরা (Veinlets) গঠন করে। কয়েকটি প্রশাখা শিরা মিলিত হইয়া একটি শাখা শিরা এবং কতগুলি শাখা শিরা একত্রিত হইয়া একটি মহাশিরা গঠিত হয়। মহাশিরা অবশেষে হৃৎপিণ্ডে আসিয়া মিলিত হয়। ডান দিকের অলিন্দে এইরূপ দুইটি মহাশিরা (ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন) এবং বাম দিকের অলিন্দে এইরূপ চারিটি মহাশিরা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। শিরা এবং মহাশিরাপথে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে হৃৎপিণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইখানে লক্ষ্য করিবে যে ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন মহাশিরা দ্বারা দেহের দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু ফুসফুস মহাশিরা (Pulmonary Vein) দ্বারা ফুসফুস হইতে বিশুদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। সুতরাং শিরাপথে বিশুদ্ধ এবং দূষিত উভয় প্রকার রক্তই প্রবাহিত হয়। অনুরূপভাবে মহাধমনীপথে বিশুদ্ধ রক্ত পরিচালিত হইলেও ফুসফুস ধমনীপথে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয়।
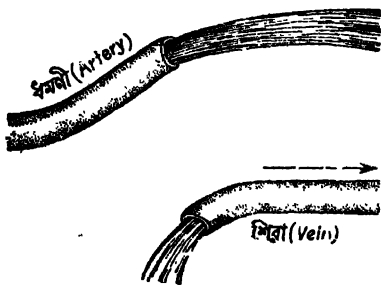
ধমনীর গাত্র-প্রাচীর শিরার গাত্র-প্রাচীর অপেক্ষা মোটা। ধমনী হৃৎপিণ্ডের ন্যায় স্পন্দিত (Pulse) হইয়া রক্তকে সামনে ঠেলিয়া দিতে পারে। এই জন্যই ধমনী কাটিয়া গেলে ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির হয়। কিন্তু শিরার কোন স্পন্দন (Pulse) নাই এবং ইহা রক্তকে সামনে ঠেলিয়া দিতে পারে না। এইজন্যই শিরা ছিন্ন হইলে ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির না হইয়া রক্ত গড়াইয়া পড়ে। মাংস-পেশীর চাপে রক্ত শিরার মধ্য দিয়া হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়। এক জায়গায় অনেকক্ষণ নিশ্চল ভাবে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিলে লক্ষ্য করিবে যে পায়ের পাতা একটু ফুলিয়া যায়। কারণ পায়ের মাংসপেশী নিশ্চল থাকায় রক্ত পা হইতে উপরের দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। এইজন্যই পা তখন ফুলিয়া যায়। রক্ত যাহাতে গড়াইয়া পিছনে যাইতে না পারে এইজন্য শিরার মধ্যে কপাটক থাকে। ঐ কপাটকের মধ্য দিয়া রক্ত হৃৎপিণ্ডের দিকে প্রবাহিত হইতে পারে। কিন্তু হৃৎপিণ্ড হইতে শিরার মধ্য দিয়া উল্টাদিকে প্রবাহিত হইতে পারে না।

(উপরে) ধমনী পথে ফিনকি দিয়া রক্ত পড়িতেছে
(নীচে) কাটা শিরা হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে

জালক শ্রেণী (Capillaries) : ধমনীর মধ্য দিয়া রক্ত খাদ্যের সারাংশ এবং অক্সিজেন বহন করিয়া আনে। এইজন্য ধমনীর রক্ত লাল টকটকে। কিন্তু শিরার রক্ত লালচে বেগুনী রঙের। কারণ শিরার রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি দেহের আবর্জনা ও অসার পদার্থ থাকে। ধমনীর রক্ত উহার অক্সিজেন এবং খাদ্য-দ্রব্যাদি কলাকোষে (Tissue cells) পৌঁছাইয়া কলা-কোষের কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া ইত্যাদি আবর্জনা গ্রহণ করিয়া শিরার মধ্যে প্রবেশ করে। রক্তের এই পরিবর্তন যেখানে সাধিত হয় তাহাকেই জালক বলে। জাহাজ যেমন বন্দরে আসিয়া তাহার মালপত্র নামাইয়া আবার নতুন মালপত্রে তাহা পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া যায়, তেমনি এই জালক শ্রেণী আমাদের দেহে এক একটি বন্দরের মত। রক্ত এইখানে তাহার অক্সিজেন ইত্যাদি কতকগুলি উপাদান ত্যাগ করিয়া আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড

ইত্যাদি নূতন প্রকার উপাদানে উহা পূর্ণ করিয়া অন্য পথে ফিরিয়া যায়। জালকের একপ্রান্ত ধমনীর সহিত এবং অপর প্রান্ত শিরার সহিত যুক্ত। জালকগুলি কলাকোষের চারিদিকে উহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে। এইজন্যই কলাকোষ এবং জালকের মধ্যে আদান-প্রদান সহজেই হইতে পারে। এক একটি জালক অতি ক্ষুদ্র। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মিলিমিটার এবং ব্যাস প্রায় ০'০১ মিলিমিটার। আমাদের দেহের সমস্ত জালকগুলি যদি পর পর একটির সহিত অন্য একটি জোড়া দেওয়া হয় তবে প্রায় ৬২,০০০ মাইল দীর্ঘ একটি জালক প্রস্তুত করা যায়। সুতরাং আমাদের দেহে জালক শ্রেণী কত ঘনভাবে সন্নিবদ্ধ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আমাদের মাংসপেশীর (skeletal muscle) এক বর্গ ইঞ্চি জায়গায় প্রায় ১৫,৬২,৫০০ জালক বর্তমান। জালকের গাত্র-প্রাচীর খুব পাতলা (Thin), এত পাতলা যে উহার মধ্য দিয়া খাদ্যদ্রব্যের-সারাংশ, অক্সিজেন, কিছু কিছু প্রোটিন, ধাতব লবণ, জল এমন কি শ্বেত কণিকাও বাহির হইয়া যাইতে পারে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় লোহিত কণিকা (Red corpuscle) ইহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে না। জালক এবং কলাকোষের (Tissue cells) মধ্যে খাদ্যদ্রব্য এবং অসার পদার্থের আদান-প্রদান কিন্তু একেবারে সরাসরি ঘটে না। কলাকোষগুলি একেবারে নিরেট নয়। উহাদের মধ্যে অল্প অল্প ফাঁক (Tissue spaces) থাকে। এই ফাঁকগুলি একপ্রকার তরলে পূর্ণ থাকে। এই তরলকে কলারস (Tissue fluid) বলে। প্রকৃত পক্ষে কলাকোষগুলি এই কলারসেই নিমজ্জমান থাকে। জালক শ্রেণী কলাকোষের একেবারে গা ঘেঁষিয়া না থাকিয়া এই কলারসের মধ্যেই বিস্তৃত থাকে। রক্তের চাপে জালক শ্রেণীর গাত্র-প্রাচীরের মধ্য দিয়া জল, ধাতব লবণ, গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, অক্সিজেন ইত্যাদি বাহির হইয়া কলাকোষের মধ্যে অবস্থিত খালি জায়গায় (Tissue spaces) সংগৃহীত হয়। এইরূপে রক্ত হইতেই কলারসের সৃষ্টি হয়। কলাকোষগুলি কলারসে নিমজ্জিত বলিয়া কোষ-প্রাচীরের (cell wall) মধ্য দিয়া কলারসের অক্সিজেন, গ্লুকোজ ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য সহজেই কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া ইত্যাদি আবর্জনা এবং অসার পদার্থ কোষ হইতে কলারসে বাহির হইয়া আসে। এখন জালকের যে প্রান্ত শিরার সঙ্গে যুক্ত সেই প্রান্ত কলারস হইতে কিছু কিছু জল, ধাতব লবণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া ইত্যাদি আবার শোষণ করিয়া শিরার মধ্যে পরিচালিত করে; এইরূপে জালক শ্রেণীর ধমনী-প্রান্ত হইতে খাদ্যদ্রব্য, জল, অক্সিজেন ইত্যাদি বাহির হইয়া কলারসের সৃষ্টি করে এবং উহাদের শিরার প্রান্তদ্বারা আবার জল, ধাতব লবণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি শোষিত হইয়া শিরার মধ্যে পরিচালিত হয়। কলারস হইতে সবটুকু অসার এবং আবর্জনা জালক শ্রেণী গ্রহণ করিতে পারে না। অবশিষ্ট অসার পদার্থ অন্য এক প্রকার প্রণালী দ্বারা সংগৃহীত হইয়া শেষ পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি একটি শিরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এই অন্য প্রকার প্রণালীই লসিকা প্রণালী (Lymphatic system) নামে পরিচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লসিকা প্রণালী কলারস হইতে জল, ধাতব লবণ, প্রোটিন, শ্বেত কণিকা ও অসার পদার্থ ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। লসিকা প্রণালীর মধ্যস্থিত এই তরলকে লসিকা (Lymph) বলে। অনেকে লসিকা এবং কলারসের মধ্যে কোন পার্থক্য না করিয়া উভয়কেই লসিকা নামে অভিহিত করেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লসিকানালী মিলিত হইয়া একটি বড় লসিকা সৃষ্টি করে। এই বড় লসিকা নালীগুলি অবশেষে একত্রিত

হইয়া গলদেশে বড় শিরার মধ্যে প্রবেশ করে। লসিকা নালীগুলিকে শিরার সহিত তুলনা করা যায়। শিরার মত এই সকল লসিকা নালীতেও কপাটক থাকে এবং রক্ত
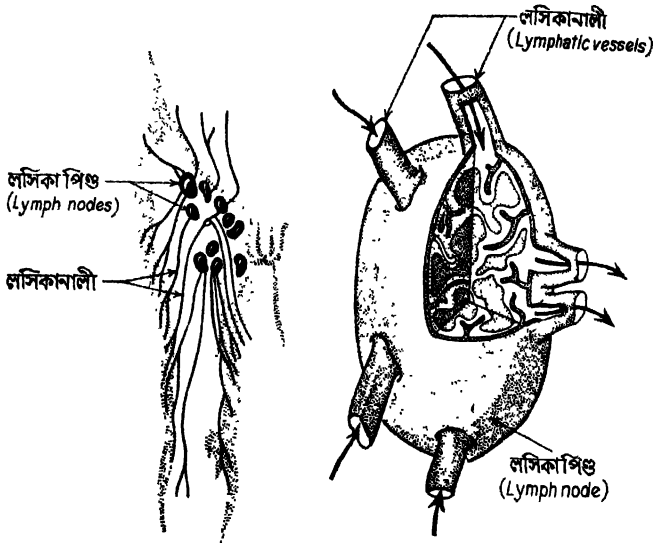
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে হৃৎপিণ্ডের দিকেই প্রবাহিত হয়। শিরার মত ইহাদেরও রক্ত পরিচালনের ক্ষমতা নাই, মাংসপেশীর গতির উপরেই লসিকা প্রণালীতে রক্তের প্রবাহ নির্ভর করে। তবে লসিকা প্রণালীগুলি উহাদের গতিপথে কতকগুলি লসিকাপিণ্ডের (Lymph nodes) মধ্য দিয়া যায়। এই সকল লসিকাপিণ্ড ছাঁকনির (Filter) ন্যায় কাজ করে এবং রক্তকে জীবাণু এবং বিষের হাত হইতে রক্ষা করে।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও রক্ত সঞ্চালন : এখন আমরা হৃৎপিণ্ড কিভাবে কাজ করে তাহা লক্ষ্য করিব। হৃৎপিণ্ডটি এক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র; কাহারও উপর ইহার ক্রিয়া নির্ভর করে না। সমস্ত শিরা, ধমনী ও স্নায়ু (Nerve) হইতে হৃৎপিণ্ডটি বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং উহার মধ্যস্থ সমস্ত রক্ত বাহির করিয়া যদি উহা লবণ জলে পূর্ণ করিয়া ঐ জলে ডুবাইয়া রাখা যায় তাহা হইলেও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পূর্বে যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে থাকিবে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন (Beat) বলিতে আমরা কি বুঝি? তোমরা বুকে কান পাতিয়া থাকিলে হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুক শব্দ শুনিতে পাইবে। এই ধুক ধুক শব্দকে হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি (Heart sound) বলা হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রতি স্পন্দনে এইরূপ দুইটি ধুক ধুক শব্দ সৃষ্টি হইয়া থাকে। একটিকে প্রথম হৃদ্ধ্বনি (First heart sound) এবং অপরটিকে দ্বিতীয় হৃদ্ধ্বনি (Second heart sound) বলে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ যে শরীর অসুস্থ হইলে চিকিৎসকেরা হাতের কব্জির মধ্যে একটি ধমনী চাপিয়া ধরিয়া দেহের অসুস্থতা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ঐ ধমনীটিও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে স্পন্দিত হইতে থাকে। সুতরাং প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ড এবং ধমনীর স্পন্দনের সংখ্যা সমান। সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক লোকের হৃৎপিণ্ড এবং ধমনী প্রতি মিনিটে প্রায় ৭২ বার স্পন্দিত হইয়া থাকে।

সুতরাং এই সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি অসুস্থতার লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়। ধমনীর স্পন্দন হইতে চিকিৎসকেরা হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারেন। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এবং বিকোচনের ফলেই এই স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। হৃৎপিণ্ড দুইটি অলিন্দ এবং দুইটি নিলয় লইয়া গঠিত। উপরের অলিন্দেই প্রথম স্পন্দন আরম্ভ হইয়া নীচের নিলয়ে ছড়াইয়া পড়ে। প্রতি মিনিটে ৭২ বার স্পন্দন হইলে প্রতি স্পন্দনে প্রায় ০'৮ সেকেণ্ড সময় লাগে।

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে ৭০-৮০ বার স্পন্দিত হইয়া থাকে। শিশু ও মেয়েদের স্পন্দনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। দুই বৎসরের শিশুদের মিনিটে ১০০-১৪০ বার স্পন্দন হইয়া থাকে। অতি বৃদ্ধাবস্থা ব্যতীত বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্পন্দনের সংখ্যাও হ্রাস পাইতে থাকে। প্রৌঢ়াবস্থায় ৬০-৭০ বার হৃদ্‌স্পন্দন হইয়া থাকে। আরও অধিক বয়সে ৭৫-৮০ বার স্পন্দন হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইলে স্পন্দনের সংখ্যা কমিয়া যায়। অধিক শারীরিক পরিশ্রমে, ভয়ে, উৎকণ্ঠায় বা অন্য কোন মানসিক বিপর্যয়েও হৃদ্‌স্পন্দনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য বা অক্সিজেনের হ্রাস ঘটিলেও স্পন্দনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে হৃদ্‌স্পন্দনের তালে তালে ধমনীও স্পন্দিত হইতে থাকে। ধমনীর এই স্পন্দন কি ভাবে উৎপন্ন হয় এখন তাহাই লক্ষ্য করিব। বাম নিলয় হইতে রক্ত যখন অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটক খুলিয়া মহাধমনীতে হঠাৎ সজোরে প্রবেশ করে তখন ধমনীর প্রাচীর প্রসারিত হইয়া ঐ রক্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ধমনীর প্রাচীর স্থিতিস্থাপক (Elastic) বলিয়া পরমুহূর্তে উহা সংকুচিত হয়। ফলে ঐ স্থানের রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটক এই চাপে বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং রক্ত এই চাপে কিছুটা সামনের দিকে অগ্রসর হয়। ধমনী-প্রাচীরের এইরূপ প্রসারণ ও সংকোচনের ফলেই নাড়ীর স্পন্দন (Pulse) উৎপন্ন হইয়া থাকে। পর্যায়ক্রমে নাড়ীর এইরূপ স্পন্দনেই রক্ত ধমনীর মধ্য দিয়া দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছিয়া থাকে।

রক্তের চাপ ঃ ধমনীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার কালে রক্ত ধমনীর প্রাচীরে আঘাত করিয়া থাকে। রক্তস্রোত ঐ প্রাচীরে যে পরিমাণ শক্তিতে আঘাত করিয়া প্রবাহিত হয় তাহাকেই **রক্তের চাপ** (Blood pressure) বলে। প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা দ্বারাই ধমনীর অভ্যন্তরে রক্তের স্বাভাবিক চাপ রক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হইয়া গেলে রক্তের চাপও বৃদ্ধি পায়। একই বয়সের পুরুষ এবং নারীর রক্তের চাপ সমান নয়। সাধারণতঃ পুরুষের রক্তের চাপ নারীর চাপ অপেক্ষা ১০-১৫ মিলিমিটার বেশী থাকে। জন্মের সময় শিশুর রক্তের চাপ ৭০-৭৫ মিলিমিটার থাকে এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ চাপ বৃদ্ধি পাইয়া পরিণত বয়সে উহা প্রায় ১২০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের স্বাভাবিক (Normal) রক্তের চাপ উহার বয়সের অর্ধেকের সহিত ১০০ যোগ করিলেই পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনে নানা কারণে রক্তের চাপ কমবেশী হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা বা গরম জলে স্নান করিলে রক্তের চাপ কিছু বাড়িয়া থাকে। খাদ্য গ্রহণের পর অথবা জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া করিলেও রক্তের চাপ বাড়িতে দেখা যায়। মানসিক চিন্তা, উৎকণ্ঠা প্রভৃতিতে রক্তের

চাপ বৃদ্ধি পায়। মেয়েদের ঋতুকালে ইহার হ্রাস এবং গর্ভাবস্থায় ও প্রসবকালে ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এবার হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত কোন্ পথে দেহের বিভিন্ন অংশে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং কিভাবে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে তাহা দেখা যাউক।

চিত্রে রক্তের এই যাতায়াতের পথ দেখান হইল। একমাত্র ফুসফুস ব্যতীত দেহের অন্যান্য সকল অংশ হইতে দূষিত রক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি দেহের আবর্জনা বহন করিয়া ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরাপথে দক্ষিণ অলিন্দ এবং নিলয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে নিলয়ের সংকোচনের ফলে এই রক্ত ফুসফুসের ধমনীপথে দুইটি ফুসফুসে যাইয়া উপস্থিত হয়। ফুসফুসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে (alveoli) অসংখ্য জালক (capillaries) থাকে। এই জালকের সাহায্যে রক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যাগ করিয়া বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে। পরে ফুসফুসের শিরাপথে বাম অলিন্দে আসিয়া উপস্থিত হয়। ডান অলিন্দ হইতে ফুসফুস হইয়া আবার বাম অলিন্দে রক্তের এই প্রবাহকে Pulmonary circulation বলে।

বাম অলিন্দ হইতে রক্ত বাম নিলয়ে গমন করে এবং সেখান হইতে নিলয়ের সংকোচনের ফলে মহাধমনীতে (Aorta) প্রবেশ করে। মহাধমনী হইতে অনেক শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া মস্তিষ্ক, হাত, পা, বুক, যকৃত, পাকস্থলী, অন্ত্র ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন অংশে গিয়াছে। একমাত্র ফুসফুসেই কোন শাখা প্রশাখা মহাধমনী হইতে গমন করে নাই। সুতরাং মহাধমনীর পথে রক্ত ফুসফুস ব্যতীত দেহের সকল অংশে আসিয়া উপস্থিত হয়। মহাধমনীর রক্ত অক্সিজেনের জন্য লাল টকটকে। দেহের বিভিন্ন অংশে এই অক্সিজেন ছাড়িয়া রক্ত ঐ সকল স্থান হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড্ ইত্যাদি আবর্জনা গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন শিরাপথে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরায় আসিয়া মিলিত হয় এবং সেখান হইতে ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। অক্সিজেনের অভাব এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতির জন্য শিরার রক্ত লালচে বেগুনী। রক্তের এই প্রবাহকে Systemic circulation বলে।

Systemic circulation-এ একটি রক্তপ্রবাহ পাকস্থলী, অন্ত্র, প্লীহা, অগ্ন্যাশয় ও যকৃত পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে নিম্ন মহাশিরাতে আসিয়া মিলিত হয়। এইজন্য উক্ত প্রবাহকে দুই প্রস্থ জালক শ্রেণীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে হয়। পাকস্থলী, অন্ত্র, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা ইত্যাদির জালক শ্রেণীর মধ্য দিয়া ধমণীর রক্ত প্রবাহিত হইয়া পরে একটি শিরাপথে আসিয়া মিলিত হয়। ইহাকে Portal শিরা বলে। এই রক্ত খাদ্যদ্রব্যের-সারাংশ, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি বহন করিয়া দ্বিতীয়বার যকৃতের জালক শ্রেণীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এখানে এই জালক শ্রেণীর মধ্য দিয়া রক্তের সহিত যকৃতের আদান-প্রদান ঘটে। খাদ্যের অতিরিক্ত গ্লুকোজ যাহা রক্ত অন্ত্র হইতে বহন করিয়া আনিয়াছে—এইখানে গ্লাইকোজেনরূপে জমা হইয়া থাকে। যকৃত হইতে রক্ত এইবার নিম্ন মহাধমনীপথে ডান অলিন্দে ফিরিয়া যায়। Systemic circulation-এর অন্য সব জায়গায় রক্ত কেবলমাত্র একপ্রস্থ জালকের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হয়। এইজন্য রক্তের এই প্রবাহটিকে Portal System বলে।

আমাদের দেহের সর্বত্রই কিন্তু রক্তের প্রবাহ সব সময় সমান থাকে না। কোন সময় রক্ত কোন একটি অঙ্গে অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হয়। আবার অন্য সময় হয়ত ঐ

স্থানে রক্তের প্রবাহ অনেক কমিয়া যায়। কোন অঙ্গের প্রয়োজন অনুসারেই ঐ অঙ্গে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ স্থির হইয়া থাকে। যখন একটি অঙ্গ খুব কর্মব্যস্ত থাকে তখন উহাতে রক্তের প্রয়োজন বেশী হয়। ফলে দেহের অন্যান্য অংশ হইতে রক্ত ঐ অঙ্গের দিকে প্রবাহিত হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। আহারের পর আমাদের সকলেরই একটু ঘুমের ভাব আসে। আমাদের মস্তিষ্কটি তখন অলস হইয়া পড়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ মস্তিষ্ক চালনার কোন কাজ তখন আমরা করিতে পারি না। ইহার কারণ কি? পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা পরিপাক করিবার জন্য সেখানে বিভিন্ন কোষগুলি সক্রিয় হইয়া উঠে। তখন ঐ অংশে রক্তের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। ফলে মস্তিষ্ক হইতে রক্ত পাকস্থলীর দিকে প্রবাহিত হয়। মস্তিষ্কে এই সময় রক্তের প্রবাহ মন্দীভূত হয় বলিয়া আমাদের ঘুম পায় এবং তখন আমরা কোন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার কাজ করিতে পারি না।

শ্বসন-তন্ত্র
(Respiratory System)

জীবন ধারণের জন্য আমাদের যে শক্তির (Energy) প্রয়োজন তাহা আমরা খাদ্যদ্রব্য হইতেই পাইয়া থাকি। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে লুক্কায়িত এই শক্তি পাইতে হইলে আবার অক্সিজেনের প্রয়োজন। অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য হইতে এই শক্তি আমাদের দেহে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বায়ুর (Air) মধ্যে অক্সিজেন আছে এবং আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আমরা বায়ু হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকি। এই কারণেই আমাদের জীবন ধারণের জন্য বায়ু এত প্রয়োজন। আবার আমাদের দেহের বিভিন্ন কোষে (cell) খাদ্যদ্রব্যের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং জলও উৎপন্ন হয়। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস অধিক পরিমাণে দেহের মধ্যে জমিতে থাকিলে শরীরের ক্ষতি হয়। এইজন্য এই গ্যাস অনবরতই দেহ হইতে অপসারণ করা প্রয়োজন। এই শ্বসন তন্ত্রের সাহায্যেই দেহের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ এবং অপ্রয়োজনীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং কিছু জলীয় বাষ্প ত্যাগ করা হইয়া থাকে। এই তন্ত্রে থাকে বক্ষগহ্বর তন্মধ্যে দুইটি ফুসফুস, মধ্যচ্ছদা ও শ্বসনের নানা মাংসপেশী।

শ্বসন-ক্রিয়া (Respiration): আমরা শ্বসন ক্রিয়া বলিতে সাধারণতঃ প্রশ্বাসের (Inspiration) সঙ্গে ফুসফুসে কিছু বায়ু গ্রহণ এবং পরমুহূর্তে নিঃশ্বাসের (expiration) সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুস হইতে কিছু বায়ু ত্যাগই বুঝিয়া থাকি। আসলে কিন্তু ইহা শ্বসন ক্রিয়া নয়। ইহা শ্বসন ক্রিয়ার একটি অংশ মাত্র। ইহাকে **বাহ্যিক শ্বসন-ক্রিয়া** (External respiration) বা সাধারণভাবে breathing বলে। বাহ্যিক শ্বসন ক্রিয়ায় ফুসফুস হইতে অক্সিজেন জালকের (capillaries) মধ্য দিয়া রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্ত হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ফুসফুসের মধ্য দিয়া বাহিরে অপসারিত হয়। ফুসফুস এবং জালকের মধ্যে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড

গ্যাসের এরূপ আদান-প্রদানই **বাহ্যিক শ্বসন-ক্রিয়া** নামে পরিচিত। ফুসফুস ছাড়া দেহের বিভিন্ন কোষে ও রক্তের সহিত এইরূপ অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ফুসফুস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া রক্ত দেহের বিভিন্ন কোষে যাইয়া উপস্থিত হয়। তথায় জালক এবং কোষের সূক্ষ্ম প্রাচীরের মধ্য দিয়া অক্সিজেন গ্যাস কোষের মধ্যে চলিয়া যায় এবং কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ঐ প্রাচীরের মধ্য দিয়া রক্তে আসিয়া পেঁছায়। কোষ এবং রক্তের মধ্যে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের এই আদান-প্রদানকে **অভ্যন্তরীণ শ্বসন-ক্রিয়া** (Internal respiration) বলে। রক্ত ঐ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরে ফুসফুসে লইয়া বাহ্যিক শ্বসন-ক্রিয়া দ্বারা বাহিরে পরিত্যাগ করে।

সুতরাং শ্বসন-ক্রিয়া বলিতে বায়ু হইতে ফুসফুসের সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া ঐ অক্সিজেন রক্তের মাধ্যমে বিভিন্ন কোষে (cell) পেঁছাইয়া দেওয়া এবং বিভিন্ন কোষ হইতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস রক্তের সাহায্যে গ্রহণ করিয়া ফুসফুসের মাধ্যমে বাহিরে পরিত্যাগ করা বুঝায়।
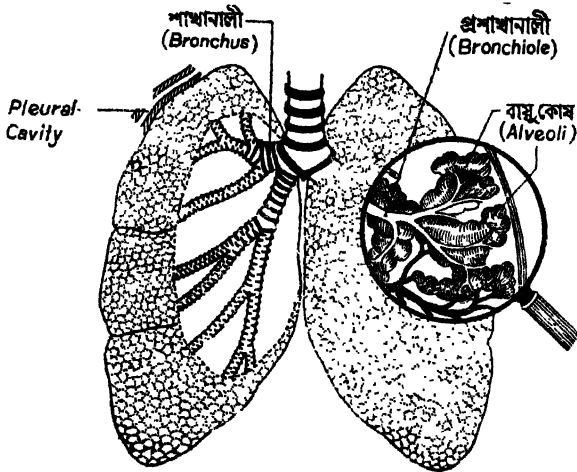
ফুসফুসের অবস্থান ও গঠন : আমাদের বক্ষপঞ্জরের (Ribs) ঠিক নীচে একটি পেশীময় পরদা দ্বারা আমাদের দেহ-গহ্বরকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই পরদাটিকে মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) বলে। মধ্যচ্ছদার উপরের অংশকে বক্ষ-গহ্বর (Chest or thoracic cavity) এবং নীচের অংশকে উদর-গহ্বর (Abdominal cavity) বলে। বক্ষ-গহ্বরেই ফুসফুস (Lungs) এবং হৃদ্‌যন্ত্র দেহের পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্যই প্রকৃতি উহাদের বক্ষপঞ্জরের খাঁচার মধ্যে অতিযত্নে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। এই বক্ষ-গহ্বরে দুই পাশে দুইটি ফুসফুস অবস্থিত। ডান পাশের ফুসফুসের তিনটি অংশ এবং বাম পাশের ফুসফুসের দুইটি অংশ আছে। প্রত্যেকটি অংশ আবার অসংখ্য ছোট ছোট বায়ু কোষ (Air-sacs called alveoli) দ্বারা গঠিত। অসংখ্য জালক (capillaries) এই সকল বায়ুকোষগুলিকে ঘিরিয়া আছে।

ফলে বায়ুকোষে গৃহীত বায়ুর সঙ্গে জালকের রক্তের আদান-প্রদান সহজেই হইতে পারে। প্রত্যেকটি ফুসফুসের বাহিরের দিকে একটি পাতলা জলসিক্ত আবরণ আছে। এই আবরণটিকে ফুসফুস-ধরা-কলা (Pleurum) বলে। ফুসফুসের উপরে এবং চারি পাশে আমাদের দেহ-প্রাচীর এবং নীচে মধ্যচ্ছদা (Diaphragm)। এই দেহ-প্রাচীর এবং মধ্যচ্ছদার ভিতরের গায়ে অনুরূপ একটি ফুসফুস-ধরা-কলার পাতলা আবরণ আছে। এই দুইটি ফুসফুস-ধরা-কলার অভ্যন্তরীণ অংশটুকু (Pleural cavity) বায়ু-নিরুদ্ধ অর্থাৎ বাহির হইতে বায়ু ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার মধ্যে একটি তৈলাক্ত তরলের (Lubricating liquid) আবরণ দেখা যায়। বাহির হইতে নাসিকার দুইটি ছিদ্রপথেই সাধারণতঃ আমরা বায়ু ফুসফুসের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি। নাসাপথের প্রথমেই কতকগুলি লোম দেখা যায়। এইগুলি সর্বদাই
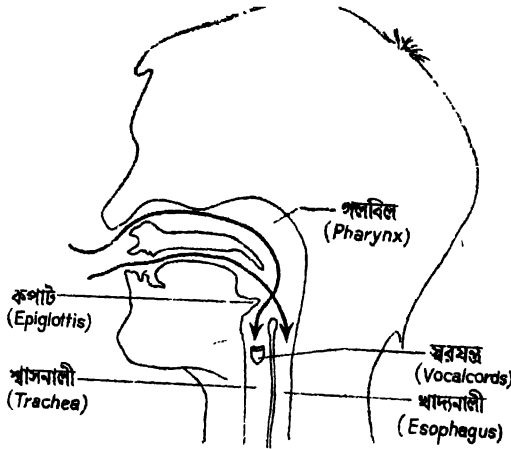
ভিজা থাকে বলিয়া বায়ুর সঙ্গে ধূলিকণা ইত্যাদি প্রবেশ করিলে উহা ঐ লোমের সঙ্গে আটকাইয়া যায়। যেখানে লোমগুলি শেষ হইয়াছে সেখান হইতে ভিতরের দিকে নাসাপথের গায়ে কতকগুলি ভাঁজ দেখা যায় এবং উহার উপরে একটি পাতলা আবরণ (Mucous membrane) থাকে। নাসাপথের এই অংশটুকু ফুসফুসগামী বায়ুকে গরম ও ভিজা রাখে। ফুসফুসকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখিতে হইলে ঈষৎ গরম ও ভিজা বা আর্দ্র বায়ুই উহার মধ্যে প্রবেশ করা দরকার। ঠাণ্ডা ও শুষ্ক বায়ু ফুসফুসের পক্ষে ক্ষতিকর। আমরা বাহির হইতে শুষ্ক ও ঠাণ্ডা বায়ু গ্রহণ করিলেও নাসাপথের এই অংশে আসিয়া উহা উপযুক্তভাবে উষ্ণ ও আর্দ্র হইয়াই ফুসফুসে প্রবেশ করে। নাসাপথের এই অংশ অতিক্রম করিয়া বায়ু যেখানে প্রবেশ করে তাহাকে গলবিল (Pharynx) বলে। এই গলবিলের শেষ প্রান্তে পাশাপাশি দুইটি টিউব বা নালী দেখা যায়। সামনের দিকেরটি শ্বাস-নালী (Trachea) এবং পিছনেরটিকে খাদ্য-নালী (Esophagus) বলে। গলবিল হইতে বায়ু এই শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে। শ্বাসনালীর উপরের অংশটি (Larynx) একটু বিশেষভাবে গঠিত। এই অংশেই বায়ুর এক প্রকার কম্পনের দ্বারা আমাদের স্বরের (Voice) সৃষ্টি হয়। শ্বাসনালীর মুখটি

খাইবার সময় নিজে হইতেই একটি কপাটের (Epiglottis) দ্বারা বন্ধ হইয়া যায় যেন কোন খাদ্য-দ্রব্য ঐ নালীর মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। সামান্য একটু খাদ্য-কণাও যদি অসাবধানতার জন্য উহার মধ্যে প্রবেশ করে তাহা হইলে ফুসফুস হইতে বায়ু প্রবলবেগে উহা ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে। ইহাকেই আমরা 'বিষম লাগা' বলি। এই শ্বাসনালীটি বক্ষ-পঞ্জরের প্রথম হাড় জোড়ার নীচে দুইটি শাখানালীতে (Bronchi) বিভক্ত হইয়া দুই-পাশে দুইটি ফুসফুসে প্রবেশ করিয়াছে। প্রত্যেকটি শাখানালী আবার অসংখ্য সরু সরু প্রশাখানালীতে (Bronchioles) বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকটি বায়ুকোষে (Alveoli) পেঁছিয়াছে। সুতরাং শ্বাসনালী হইতে বায়ু শাখানালী, প্রশাখানালী হইয়া অবশেষে বায়ুকোষে পেঁছে। বায়ু প্রবেশের ফলে ফুসফুস দুইটি ফুলিয়া উঠে আবার বায়ু বাহির হইয়া গেলে চুপসিয়া যায়। শাখাপ্রশাখার সহিত ফুসফুসটিকে বড় একগুচ্ছ আঙুরের মত দেখায়। এক একটি আঙুর যেন এক একটি বায়ুকোষ।

ফুসফুসের ক্রিয়া ঃ সাধারণ লোকের ধারণা ফুসফুস নিজেই বাহির হইতে বায়ু গ্রহণ করে এবং পরমুহূর্তে আবার উহা পরিত্যাগ করে। আসলে কিন্তু ফুসফুসের বায়ু গ্রহণ করিবার বা উহা ত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই। বক্ষপ্রাচীরের পেশী এবং নীচের মধ্যচ্ছদার দ্বারাই এই কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় মধ্যচ্ছদা একটু উপরের দিকে ফুলিয়া থাকে এবং উহা দেখিতে অনেকটা গম্বুজাকৃতি (Dome-shaped)। মধ্যচ্ছদার পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইলে উহার উপরের উত্তল অংশ নীচের দিকে নামিয়া আসিয়া প্রায় অনুভূমিক (horizontal) হইয়া যায়। ইহার ফলে বক্ষ-গহ্বরের উপর-নীচ বা লম্বালম্বি বরাবর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। আবার আমাদের বক্ষ-পঞ্জরের হাড়গুলির এক প্রান্ত পিছনে মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। মেরুদণ্ডের সংযোগস্থল হইতে সামনের দিকে প্রসারিত হইবার সময় ইহারা একেবারে অনুভূমিক (horizontal) ভাবে না থাকিয়া একটুখানি নীচের দিকে হেলিয়া থাকে। বক্ষপ্রাচীরের পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইলে বক্ষপঞ্জরের অস্থিসমূহের সামনের প্রান্ত উপরের দিকে উঠিয়া উহারা প্রায় অনুভূমিক হইয়া যায়। ইহার ফলে বক্ষগহ্বরের বুক ও পিঠ বরাবর দৈর্ঘ্য (Depth) এবং ডাইনে-বায়ে পাশাপাশি দৈর্ঘ্য (Breadth) বৃদ্ধি পায়। গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করিলে আমাদের সকলেরই যে দুই-তিন ইঞ্চি বুকের ছাতি (Chest) বৃদ্ধি পায়, ইহাই তাহার কারণ। মধ্যচ্ছদা এবং বক্ষপ্রাচীরের পেশীসমূহের একই সঙ্গে সঙ্কোচনের ফলে এইরূপে উপর-নীচে এবং পাশাপাশি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়। বক্ষগহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসেরও আয়তন বৃদ্ধি পায়। ফুসফুসের আয়তন (volume) বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উহার মধ্যস্থিত বায়ুর চাপ কমিয়া যায় (বয়েলের সূত্রানুসারে)। কিন্তু বাহিরের বায়ুর চাপের কোন রকম পরিবর্তন না হওয়ায় উহার চাপ ফুসফুসের বায়ুর চাপ অপেক্ষা অধিক থাকে। বাহিরের বায়ু আমাদের নাসাপথ ও শ্বাসনালী দ্বারা ভিতরের ফুসফুসের বায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় এই উচ্চ চাপের বায়ু প্রকৃতির নিয়মানুসারে ফুসফুসের নিম্নচাপ বায়ুর দিকে অগ্রসর হয় (কোন গ্যাস বা বায়ু সর্বদাই উচ্চ চাপের দিক হইতে নিম্ন চাপের দিকে প্রবাহিত হয়)। এই প্রক্রিয়াকেই আমরা প্রশ্বাস বলিয়া থাকি। মধ্যচ্ছদা নীচের দিকে নামিয়া যাওয়ায় উদর-গহ্বরে (Abdo-

minal cavity) চাপ পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে পেট ফুলিয়া উঠে। এই জন্যই আমরা যখন প্রশ্বাস গ্রহণ করি তখন পেটও ফুলিয়া উঠে। বায়ু এইরূপে ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মধ্যচ্ছদা এবং বক্ষপ্রাচীরের পেশীসমূহের
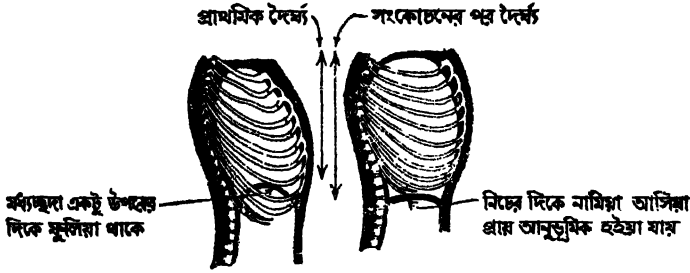
মধ্যচ্ছদার পেশী সংকোচনের ফলে বক্ষঃগহ্বরের উপর-নীচ লম্বালম্বি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়
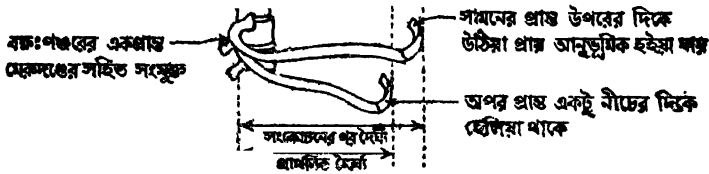
পেশী সংকোচনের ফলে বক্ষঃগহ্বরের বুক ও পীঠ বরাবর দৈর্ঘ্য (Depth) বৃদ্ধি পায়
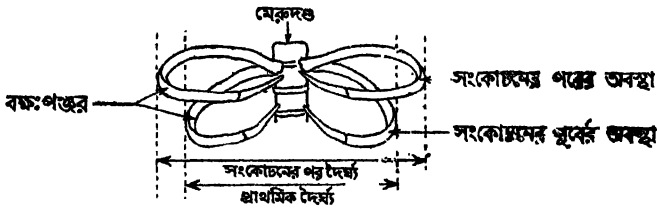
পেশী সংকোচনের ফলে ডাইনে বায়ে পাশাপাশি দৈর্ঘ্য (Breadth) বৃদ্ধি পায়

সঙ্কোচন দূর হয়। ফলে মধ্যচ্ছদা আবার উপরের দিকে উঠিয়া যায় এবং বক্ষপঞ্জরের অস্থিসমূহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। ফলে বক্ষগহ্বর তথা ফুসফুসের আয়তন কমিয়া যায়। আয়তন কমিয়া যাওয়ায় ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর চাপ এবার বাহিরের বায়ুর চাপের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। ফলে ফুসফুস হইতে কিছুটা বায়ু বাহিরের নিম্নচাপের দিকে বাহির হইয়া যায়। ইহাকেই আমরা নিঃশ্বাস বলি। মধ্যচ্ছদা এবার উপরের দিকে উঠিয়া যাওয়ায় উদর-গহ্বরের চাপ কমিয়া যায় এবং পেটও নামিয়া চুপসিয়া

যায়। সুতরাং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে পেটও তালে তালে নামা-উঠা করে। পেটের এরূপ ওঠা নামাকে abdominal breathing বলে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ লোকের ফুসফুসে ৪½ লিটার বায়ু ধরিতে পারে। কিন্তু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সাধারণতঃ ৫০০ সি. সি. বায়ুই আদান-প্রদান হইয়া থাকে। আমরা খুব গভীরভাবে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াও ফুসফুসের সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া দিতে পারি না। আমরা মরিয়া গেলেও প্রায় এক লিটারের মত বায়ু আমাদের ফুসফুসে থাকিয়া যায়।

অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আদান-প্রদান: ফুসফুসের প্রত্যেকটি বায়ুকোষের চারিপাশে অসংখ্য জালক (Capillaries) ঘিরিয়া আছে। জালক এবং বায়ুকোষের (alveoli) পাতলা গাত্রাবরণ ভেদ করিয়া রক্ত হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস অনায়াসেই ফুসফুসে এবং পরে ফুসফুস হইতে শ্বাসনালীর সাহায্যে নিঃশ্বাসের সহিত বাহিরে চলিয়া যায়। অনুরূপভাবে প্রশ্বাসের সহিত যে অক্সিজেন ফুসফুসে আসে তাহাও বায়ুকোষ এবং জালকের গাত্রাবরণ ভেদ করিয়া রক্তে গিয়া উপস্থিত হয়। রক্তের লাল রঙটি উহার রক্ত কণিকার জন্য (Red blood corpuscle)। এক একটি রক্ত কণিকায় কয়েক লক্ষ করিয়া হিমোগ্লোবিন (Hemoglobin) নামক এক প্রকার প্রোটিন থাকে। রক্ত কণিকার রঙটি আসলে এই হিমোগ্লোবিনেরই জন্য। প্রত্যেকটি হিমোগ্লোবিনেই লৌহ কণিকা থাকে। এই লৌহ কণিকা সহজেই অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যেকটি হিমোগ্লোবিনকে অক্সি-হিমোগ্লোবিনে পরিণত করে।

হিমোগ্লোবিন + অক্সিজেন ⇌ অক্সি-হিমোগ্লোবিন। একটি হিমোগ্লোবিন চারিটি অক্সিজেনের অণুর (Molecule) সহিত মিলিত হইয়া একটি অক্সি-হিমোগ্লোবিনের অণু গঠন করে। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে একটি রক্ত কণিকা কত লক্ষ লক্ষ অক্সিজেন অণু শোষণ করিতে পারে। প্রত্যেকটি রক্ত কণিকার এইরূপ অদ্ভুত অক্সিজেন গ্যাস শোষণ করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই ফুসফুস হইতে অত সহজেই প্রচুর অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করিতে পারে। রক্তের জলীয় অংশে খুব সামান্য অক্সিজেনই দ্রবীভূত হইতে পারে। রক্ত কণিকা না থাকিলে আমাদের দেহের অক্সিজেনের চাহিদা কখনই পূরণ হইত না।

ফুসফুসের অক্সিজেন অক্সি-হিমোগ্লোবিনরূপে (Oxy-hemoglobin) রক্তের মাধ্যমে অবশেষে বিভিন্ন কোষে (Cell) আসিয়া পেঁছায়। প্রত্যেকটি কোষের চারিপাশে আবার জালকশ্রেণী ঘিরিয়া আছে। রক্তের অক্সি-হিমোগ্লোবিন এখানে আসিয়া ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহা হইতে হিমোগ্লোবিন এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন জালক এবং কোষের পাতলা গাত্রাবরণ ভেদ করিয়া কোষের মধ্যে চলিয়া যায় এবং হিমোগ্লোবিন রক্তেই থাকিয়া যায়। অক্সি-হিমোগ্লোবিন দেখিতে লাল টকটকে, কিন্তু হিমোগ্লোবিন একটু কালচে মত। এইজন্যই অক্সিজেন চলিয়া যাওয়ার পর জালকের রক্ত একটু নীলাভ রঙ ধারণ করে। এইরূপে অক্সিজেন গ্যাস হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে ফুসফুস হইতে বিভিন্ন কোষে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিপাকের (Metabolism) ফলে কোষে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জল উৎপন্ন হয় তাহা এই সময় কোষ ও জালকের গাত্রাবরণ ভেদ করিয়া রক্তে আসিয়া পেঁছায়। রক্তে এই জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড

গ্যাস মিলিত লইয়া কার্বনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। রক্তে এই কার্বনিক অ্যাসিডের আধিক্য ঘটিলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং দুইটি উপায়ে এই কার্বনিক অ্যাসিড প্রশমিত হইয়া থাকে। রক্তের জলীয় অংশে (Plasma) ধাতব লবণ ও প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিন ও ধাতব লবণ কিছু কার্বনিক অ্যাসিডের অ্যাসিডভাব নষ্ট করিয়া উহাকে বাই কার্বনেট-এ রূপান্তরিত করে। রক্তের হিমোগ্লোবিন ও ধাতব লবণের সহায়তায় অবশিষ্ট কার্বনিক অ্যাসিড বাই-কার্বনেট-এ পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রোটিন এবং ধাতব লবণের সহায়তায় রক্তের স্বাভাবিক মৃদু ক্ষারীয় ভাব বজায় থাকে এবং কোষ হইতে প্রাপ্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাই-কার্বনেটরূপে (Bi-carbonate) ফুসফুসে প্রেরিত হয়। ফুসফুসে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাই-কার্বনেট ভাঙ্গিয়া আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং শ্বাসনালীর দ্বারা বাহিরে অপসারিত হয়। সুতরাং কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের কিছুটা রক্তের জলীয় অংশের (Plasma) প্রোটিন এবং ধাতব লবণ দ্বারা এবং অবশিষ্ট অংশ হিমোগ্লোবিন এবং ধাতব লবণ দ্বারা বাই-কার্বনেটরূপে কোষ হইতে ফুসফুসে প্রেরিত হয়।

রেচন তন্ত্র
(Excretory System)

খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিবার পর ইহা পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া রক্তের মধ্যে শোষিত হয়। সমস্ত খাদ্যদ্রবই কিন্তু ক্ষুদ্রান্ত হইতে রক্তের মধ্যে শোষিত হয় না। যে সকল খাদ্য-দ্রব্যের পরিপাক হয় না তাহা পড়িয়া থাকে। ইহার সঙ্গে থাকে পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, পিণ্ডাশয়, যকৃত ও অগ্ন্যাশয় হইতে নিঃসৃত এন্‌জাইম ও অন্যান্য পদার্থ। তাছাড়া অন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার জীবাণুও দেখা যায়। এই জীবাণু ঐ সকল অবশিষ্ট খাদ্য-দ্রব্য পচাইয়া নানা প্রকার পদার্থের সৃষ্টি করে। অন্ত্রের এই অবশিষ্ট পদার্থ একত্রে মল (Feces) নামে পরিচিত। দেহের পক্ষে এই মল ক্ষতিকারক। বৃহদন্ত্রের সাহায্যে এই মল দেহ হইতে অপসারণ করা হয়।

খাদ্যদ্রব্যের যে অংশটুকু রক্তের মধ্যে শোষিত হয় তাহা দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হয়। দেহের বিভিন্ন কোষ (cell) এই খাদ্য-দ্রব্য হইতে নিজেদের ক্ষয় পূরণ, পুষ্টি সাধন ও শক্তি আহরণ করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে উহারা দেহের অনিষ্টকর কতগুলি পদার্থেরও সৃষ্টি করিয়া থাকে। কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস (carbon dioxide gas), ইউরিয়া (urea), ইউরিক অ্যাসিড (uric acid), ক্রিয়েটিনিন (creatinine), ধাতব লবণ (inorganic salts), জল ইত্যাদি এই শ্রেণীর পদার্থ। এই সকল অনিষ্টকর পদার্থের মধ্যে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ও কিছু জলীয় বাষ্প আবার নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসের সাহায্যে আমরা পরিত্যাগ করি। ধাতব লবণের কিছু অংশ জলে দ্রবীভূত হইয়া ঘামের সহিত ত্বকের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু ইউরিয়া ইত্যাদি নাইট্রোজেনঘটিত বিষাক্ত পদার্থ ও অন্যান্য দ্রবণীয় (soluble) দূষিত পদার্থের অধিকাংশই জলের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় মূত্রাকারে বৃক্কের (Kidney) সাহায্যে অপসারণ করা হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চারিটি বিভিন্ন যন্ত্রের (Organs) সাহায্যে দেহে উৎপন্ন আবর্জনা ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি দেহ হইতে অপসারিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ত্বকের

কাজের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা কম। নিম্নে এই চারিটি দেহযন্ত্র এবং উহাদের সাহায্যে যে সকল পদার্থ অপসারিত হয় তাহা দেওয়া হইল।

Organs	যে সকল পদার্থ অপসারণ করা হয়।
বৃক্ক (Kidneys)	জল ও জলে দ্রবণীয় ধাতব লবণ এবং অন্যান্য পদার্থ। প্রোটিন হইতে উৎপন্ন ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি নাইট্রোজেনঘটিত দূষিত পদার্থ প্রধানতঃ ইহার সাহায্যেই অপসারিত হয়।
ফুসফুস (Lungs)	কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প ফুসফুসের সাহায্যে অপসারণ করা হয়।
ত্বক্ (Skin)	জল ও ধাতব লবণ ঘামের সহিত অপসারণ করা হয়।
বৃহদন্ত্র (Large Intestine)	মল, খাদ্যের অবশিষ্টাংশ, পিত্তজাত রঙিন পদার্থ (Bile pigments), জল, ধাতব লবণ ইত্যাদি মলের সহিত বাহির হইয়া যায়।

রেচন প্রক্রিয়ায় যকৃতের গুরুত্বও কম নয়। অপ্রয়োজনীয় নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ যকৃতের সাহায্যে ইউরিয়ায় রূপান্তরিত হইয়া অপসারণের জন্য বৃক্কে প্রেরিত হয়। রক্তের হিমোগ্লোবিন ধ্বংস হইলে যকৃত রক্ত হইতে উহা গ্রহণ করিয়া bile pigment-এ পরিণত করে এবং উহা পিত্তের সহিত অন্ত্রে নির্গমনের জন্য পাঠাইয়া দেয়। পরে মলের সহিত এই bile pigment দেহ হইতে অপসারিত হয়।

অবস্থান ঃ রেচন তন্ত্র একজোড়া বৃক্ক (Kidney), মূত্রাশয় (Urinary bladder), বৃক্ক ও মূত্রাশয় সংযোগকারী দুইটি টিউব (Ureters) এবং মূত্রাশয় হইতে মূত্র বহির্গমনের জন্য উহার সহিত সংযুক্ত অপর একটি টিউব (Urethra) দ্বারা গঠিত।

বৃক্ক দুইটি পেটের মধ্যে মেরুদণ্ডের দুই দিকে অবস্থিত। এক একটি বৃক্ক দেখিতে সিমের (Bean) মত ; এক ধার একটু অবতল এবং অপর ধার উত্তল। ইহা আমাদের হাতের মুঠি (Fist) অপেক্ষা আকারে সামান্য বড়। প্রত্যেক বৃক্কের অবতল অংশ হইতে একটি করিয়া টিউব বাহির হইয়া নীচে মূত্রাশয়ে গিয়া মিশিয়াছে। এই টিউবকে ইউরেটার বলে। মূত্রাশয় একটি ফাঁপা মাংসপিণ্ড। ইহার মধ্যে মূত্র আসিয়া জমা হয় এবং প্রায় ৩০০-৪০০ সি.সি. মূত্র ইহার মধ্যে জমা হইতে পারে। এই মূত্রাশয়ের সহিত আরেকটি টিউব সংযুক্ত আছে। ইহাকে ইউরেথ্রা বলে। ইহার সাহায্যেই মূত্রাশয় হইতে মূত্র বাহিরে অপসারিত হয়।

বৃক্কের গঠন ও দূষিত পদার্থ রেচন ঃ বৃক্কের যে স্থান হইতে ইউরেটার নামক টিউবটি বাহির হইয়াছে তাহার ঠিক উপরেই রেনাল ধমনী ও শিরা বৃক্ক-মধ্যে প্রবেশ

করিয়া অসংখ্য শাখা, প্রশাখা এবং অবশেষে জালকে (Capillaries) বিভক্ত হইয়াছে। দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে রক্ত দূষিত পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় গ্রহণ করিয়া অবশেষে এই বৃক্কে শোধনের জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। সমস্ত বৃক্কটি অসংখ্য সরু সরু টিউবের (tubules) সমষ্টি মাত্র। ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বাহিরের অংশকে কর্টেক্স (Cortex) এবং ভিতরের মাঝামাঝি স্থানকে মেডুলা (Medulla) বলে। ইহা ছাড়া ইউরেটার নামক টিউবটি যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছে তাহা দেখিতে অনেকটা ফানেলের মত। এই ফানেলাকৃতি অংশকে পেলভিস (Pelvis) বলে। এই সকল সরু টিউবের এক প্রান্তে বাল্বের মত একটি স্ফীত অংশ আছে। এই স্ফীত অংশটিকে বোওম্যান ক্যাপসুল (Bowman's capsule) বলে। ইহা বৃক্কের বহিরাবরণ কর্টেক্সে অবস্থিত।

বৃক্ক
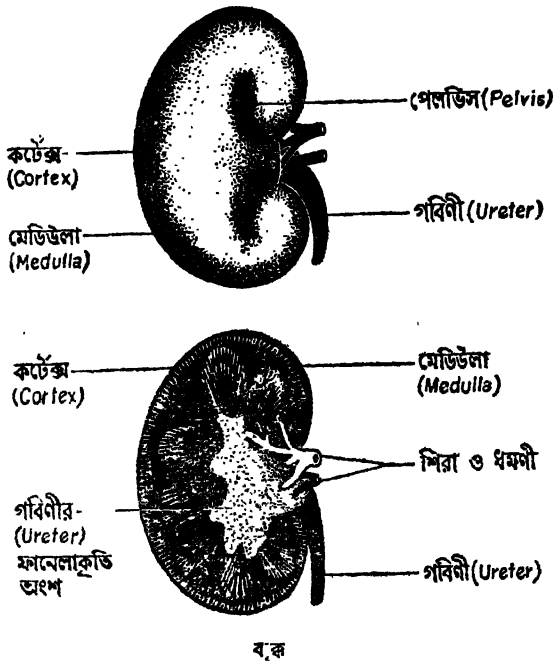
এই ক্যাপসুলের মধ্যে ধমনীর অসংখ্য জালক (Capillaries) বর্তমান এবং এই সকল জালক গ্লোমেরিউলাস (Glomerulus) নামে পরিচিত। ক্যাপসুলের পরেই সরু টিউবগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া কয়েক বার ঘুরিয়া অবশেষে মেডুলা স্থানে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত মোটা মোটা টিউবে আসিয়া মিশিয়াছে। এক একটি মোটা টিউবের সঙ্গে এইরূপ অনেক সরু সরু টিউব আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই সকল মোটা টিউবগুলি আবার ইউরেটারের ফানেলাকৃতি মুখের সহিত সংযুক্ত। সরু টিউবগুলি যে পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে তাহার চারিপাশে উহাদের ঘিরিয়া অসংখ্য জালক অবস্থান করিতেছে। বৃক্ক ধমনীর মধ্য দিয়া দূষিত রক্ত প্রথমে এই সকল বোওম্যান ক্যাপসুলে আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্যাপসুলের অন্তর্গত জালকের (গ্লোমেরিউলাস) পাতলা গাত্র-

প্রাচীর ও ক্যাপসুলের ভিতরের গাত্রপ্রাচীরের মধ্য দিয়া ছাঁকন প্রক্রিয়ায় (Filtration) রক্তের মধ্যে অবস্থিত দূষিত পদার্থসমূহ, গ্লুকোজ, ধাতব লবণ ইত্যাদি জলের সহিত সরু টিউবের মধ্যে চলিয়া যায়। গ্লোমেরিউলাসের গাত্রপ্রাচীরের মধ্য দিয়া রক্ত কণিকা ও প্রোটিন জাতীয় পদার্থ যাইতে পারে না। সুতরাং ক্যাপসুলের এই ছাঁকন প্রক্রিয়ায় রক্ত দূষিত পদার্থ হইতে মুক্ত হইলেও উহাতে গ্লুকোজ ও প্রয়োজনীয় ধাতব লবণের হ্রাস ঘটে। কিন্তু ঐ সরু টিউবের মধ্য দিয়া যখন গ্লুকোজ, ধাতব লবণ ও দূষিত পদার্থসমূহ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় ক্রমান্বয়ে অপর প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন ঐ টিউবের গাত্রপ্রাচীর ঐ সকল ধাতব লবণ, গ্লুকোজ অধিকাংশ জল শোষণ করিয়া পুনরায় রক্তে ফিরাইয়া দেয়। সুতরাং টিউবের অপর প্রান্তে যখন উহা বড় টিউবে আসিয়া পেঁছে তখন ঐ জলীয় দ্রবণে শুধু দূষিত ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থসমূহই
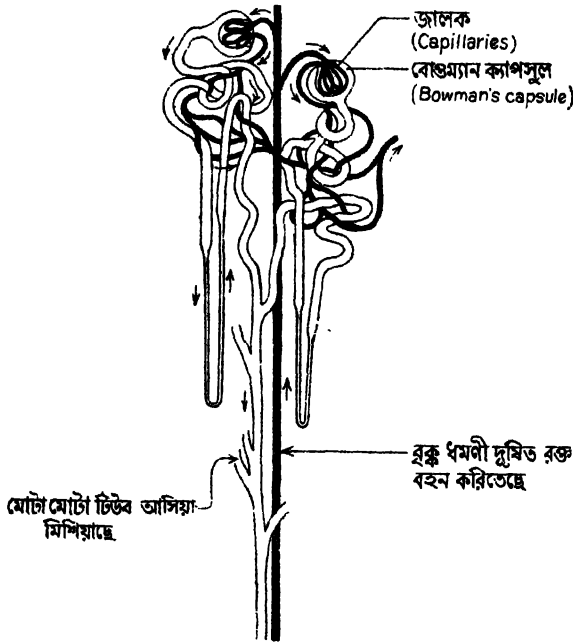
বৃক্কটি কতকগুলি সরু সরু টিউবের সমষ্টি মাত্র

থাকে এবং এই দ্রবণকেই মূত্র (Urine) নামে অভিহিত করা হয়। এইরূপে অসংখ্য সরু সরু টিউবের মধ্য দিয়া মূত্র আসিয়া বড় টিউবে পেঁছিলে উহা ঐ টিউব হইতে গবিনীর (Ureter) মুখে ফানেলাকৃতি অংশে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখান হইতে মূত্র গবিনীর সাহায্যে মূত্রাশয়ে গিয়া জমা হয়। এই মূত্রাশয়ে মূত্রের আধিক্য ঘটিলে

মূত্রাশয়ের চাপে উহা নীচের মূত্রনালীর (urethra) মধ্য দিয়া বাহিরে অপসারিত হয়। মূত্রাশয় ও মূত্রনালীর সংযোগস্থলে একটি ভালব (valve) বা কপাট আছে। মূত্রাশয়ে
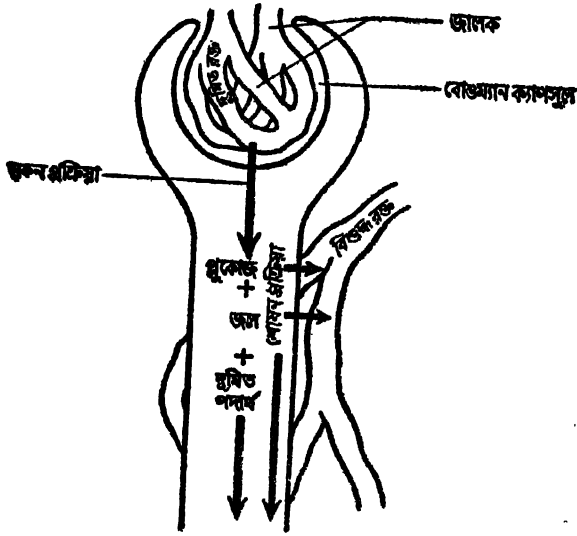
ক্যাপসুলের মধ্যে বিশুদ্ধ রক্ত প্রস্তুত হইতেছে

চাপের আধিক্য হইলে ঐ ভালব খুলিয়া মূত্রনালীতে প্রবেশ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ ভালবের মুখ বন্ধ থাকে।

স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভতন্ত্র
(Nervous System)

স্নায়ুতন্ত্র কাহাকে বলে? তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ যে হাতে আগুনের সেকা লাগিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আগুন হইতে হাত সরাইয়া লই। কিন্তু কাহার হুকুমে হাত সরাইয়া লওয়া হয় এবং কোথা হইতে এই হুকুম আসিল তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ভাল খাদ্যদ্রব্য দেখিলে অথবা উহাদের গন্ধে আমাদের মুখে লালা নিঃসৃত হয়। দেখা কাজটা চোখের এবং ঘ্রাণের কাজটা নাকের। তাহা হইলে মুখে লালা নিঃসৃত হয় কেন? নিশ্চয়ই এই দেখা এবং ঘ্রাণের সহিত লালা নিঃসরণের একটা কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে। তাহা হইলে এই কার্য-কারণের যোগাযোগ সাধন হইতেছে কি প্রকারে? আবার ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার গায়ে মশায় কামড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত অবস্থায়ই তোমার হাত ঐ স্থানে মশা তাড়াইতে চলিল। কি করিয়া খবর পাইল এবং কাহার আদেশে সে মশা তাড়াইতে চলিল? এইরূপে আমাদের দৈনন্দিন গতিবিধি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে আমাদের হাত, পা ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির কাজ যেন

কোথা হইতে সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সেখানে যেমন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে দ্রুত খবর লইয়া যাওয়া হয় তেমনি সেখান হইতে দ্রুত আদেশ বহন করিয়া দেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গে তাহা পেঁছাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে দেহের মধ্যে দ্রুত খবরাখবর বহন করিয়া অবস্থানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করাই স্নায়ুতন্ত্রের কাজ। দেহের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্রটিকে টেলিগ্রাফ বিভাগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ এবং সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) ইহার হেড-অফিস ও দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ইহার শাখা অফিস। স্নায়ুগুলি (nerves) হেড-অফিসের সহিত শাখা-অফিসের সংযোগকারী তার এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি সংবাদ সংগ্রহ কেন্দ্র। দেহের পেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি এই অফিসের আজ্ঞাবহ বাহন। হাতে আগুনের সেকা লাগা, ভাল খাবার দেখা বা উহার গন্ধ পাওয়া কিংবা গায়ে মশার কামড় ইত্যাদি খবর সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কে এবং সুষুম্নাকাণ্ডে উপস্থিত হয় এবং এই হেড-অফিস হইতে আবার সঙ্গে সঙ্গেই হাত সরাইয়া লইবার, মুখে লালা নিঃসরণের এবং হাতের দ্বারা মশা তাড়াইবার হুকুম আসিয়া পেঁছে। তাই ঐ সকল অঙ্গের এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সুতরাং যে তন্ত্রের সাহায্যে আমরা দেখি, শুনি ঘ্রাণ বা স্বাদ গ্রহণ করি অথবা স্পর্শ, বেদনা, ঠাণ্ডা, গরম ইত্যাদি অনুভব করি, ভালমন্দ বিবেচনা করি কিংবা সুখ-দুঃখ টের পাই এবং কখনও সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে আবার কখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি চালনা করি তাহারই নাম স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভতন্ত্র।

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ঃ মস্তিষ্ক বা মগজ এবং সুষুম্নাকাণ্ড স্নায়ুতন্ত্রের হেড-অফিস তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড হইতে কতগুলি মোটা মোটা স্নায়ু (Nerve) সুতার ন্যায় বাহির হইয়া ঐগুলি আবার কতগুলি সরু সরু স্নায়ু সুতায় বিভক্ত হইয়া হাত-পা, চোখ, নাক, মুখ ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন অঙ্গে আসিয়া শেষ হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত এই সকল স্নায়ু (Nerves) সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord) এবং মস্তিষ্ক বা মগজ (Brain) লইয়াই স্নায়ুতন্ত্রটি গঠিত।

স্নায়ু ঃ স্নায়ুতন্ত্রটি আগাগোড়াই কতকগুলি বিশেষ ধরনের কোষের দ্বারা গঠিত। এই কোষগুলিকে স্নায়ুকোষ (Nerve cells) বা নিউরন (Neuron) বলে। আমাদের হাত-পা, ত্বক্ ইত্যাদি বিভিন্ন ইন্দ্রিয় হইতে মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডে খবর বহিয়া আনা এবং এখান হইতে আবার ইন্দ্রিয়ে খবর পেঁছাইয়া দেওয়ার কাজ কিন্তু একই স্নায়ুদ্বারা হয় না। যে সকল স্নায়ুদ্বারা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি হইতে হেড-অফিসে খবর লইয়া যাওয়া হয়, তাহাদের সংবেদীয় স্নায়ু (Sensory or afferent Nerve) বলে। এই সংবেদীয় স্নায়ু যে কোষ দ্বারা গঠিত তাহাদের সংবেদীয় নিউরন (Sensory neuron) বলে। আবার মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড হইতে খবর যে সকল স্নায়ু দ্বারা দেহের বিভিন্ন অঙ্গে লইয়া যাওয়া হয় তাহাদের চেষ্টিয় স্নায়ু (efferent or Motor Nerve) বলে এবং এই সকল স্নায়ু চেষ্টিয় নিউরন (efferent Neuron or Motor Neuron) দ্বারা গঠিত। একটি চেষ্টিয় নিউরন (Motor Neuron)-এর ছবি দেখ। নিউরনের যে অংশে উহার নিউক্লিয়াসটি থাকে তাহাকে সেল বডি (Cell body) বলে। এই সেল বডির একটি অংশ হইতে একটি সরু সুতার ন্যায় রজ্জু বাহির হইয়াছে। এইটি বেশ লম্বা—৮।১০ ফুট বা তাহারও অধিক হইতে পারে। উহার শেষপ্রান্ত অনেকগুলি সরু সরু অংশে বিভক্ত থাকে। এই লম্বা সরু রজ্জুটিকে অ্যাক্সন

(Axon) বলে। এই অ্যাক্সনটির অধিকাংশ অংশই আবার অন্য একপ্রকার কোষের দ্বারা আবৃত থাকে। এই দ্বিতীয় প্রকার কোষগুলি শেথ কোষ (Sheath cells) নামে পরিচিত। কোষের উপরে মায়েলিন (Myeline) নামক চর্বির একটি সাদা আবরণ থাকে। এই মায়েলিনের জন্যই অ্যাক্সনটি দেখিতে শ্বেতবর্ণ। সেল বডির অন্যান্য অংশ হইতে আরও কতগুলি ছোট ছোট অংশ বাহির হয় এবং এই সকল উদ্গত অংশগুলি আবার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত থাকে। এইগুলিকে ডেনড্রাইট (Dendrite) বলে। সুতরাং এক একটি চেষ্টীয় নিউরন সেল বডি, অ্যাক্সন এবং কতগুলি ডেনড্রাইট লইয়া গঠিত। চেষ্টীয় নিউরনের সেলবডি এবং ডেনড্রাইট সাধারণতঃ মস্তিষ্ক অথবা সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে থাকে। উহার অ্যাক্সনটি ঐ হেড অফিস হইতে প্রসারিত হইয়া দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড হইতে খবর এই অ্যাক্সনের সাহায্যে বিভিন্ন অঙ্গে লইয়া যাওয়া হয়।

চেষ্টীয় নিউরন
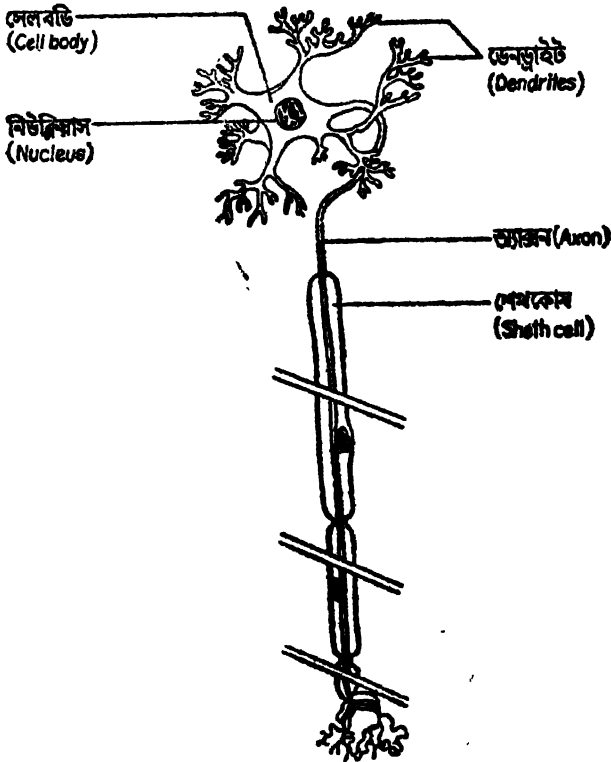
সংবেদীয় নিউরন (Sensory Neuron)ও একটি কোষ এবং ইহার নিউক্লিয়াসটি উহার সেল বডির মধ্যে অবস্থিত। এই সেল বডি হইতে একটি লম্বা ও একটি ছোট (short) সরু সুতার ন্যায় অংশ বাহির হয়। লম্বাটিকে অ্যাক্সন এবং ছোটটিকে

ডেনড্রাইট বলে। অ্যাক্সন এবং ডেনড্রাইট উভয়ের শেষপ্রান্ত কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত থাকে। সংবেদীয় নিউরনের অ্যাক্সনের প্রান্তটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের (হাত, পা, চোখ, নাক, ত্বক্‌ ইত্যাদি) কোষের সহিত যুক্ত থাকে এবং ডেনড্রাইট মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে থাকে। উহার সেল বডিটি কিন্তু মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে থাকে না। সমস্ত সংবেদীয় নিউরনের সেল বডি মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের বাহিরে উহাদের কাছাকাছি একটি জায়গায় দলবদ্ধভাবে থাকে। এই জায়গাকে গ্যাংলিয়ন (Ganglion) বলে। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে খবর গ্রহণ করিয়া সংবেদীয় নিউরন মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডে পেঁছাইয়া দেয়।

সংবেদীয় নিউরন এবং চেষ্টিয় নিউরনের কতগুলি অ্যাক্সন একত্রিত হইয়া একটি স্নায়ু (Nerve) গঠিত হয়। অ্যাক্সনগুলি মায়েলিনের (Myelin) সাদা আবরণে আবৃত থাকে বলিয়া স্নায়ুগুলিও দেখিতে সাদা হয়। সুতরাং এক একটি স্নায়ু একগুচ্ছ অ্যাক্সনের সমষ্টি মাত্র এবং ইহাতে সাধারণতঃ সংবেদীয় এবং চেষ্টিয় উভয় প্রকার নিউরনের অ্যাক্সনই বর্তমান। একটি স্নায়ুর সংবেদীয় নিউরনের অ্যাক্সনগুলি, ত্বক্‌, চোখ, নাক ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের কোষের সহিত যুক্ত থাকিয়া সংবাদ গ্রহণ করে এবং ঐ একই স্নায়ুর চেষ্টিয় অ্যাক্সনের প্রান্তসমূহ পেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি আজ্ঞাবহ অঙ্গের কোষের সহিত যুক্ত থাকিয়া মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের আদেশ ঐ সকল অঙ্গে পেঁছাইয়া দেয়। সুতরাং একটি স্নায়ুর মধ্য দিয়া উভয় দিকেই খবরাখবর যাতায়াত করিতে পারে।

সুষুম্নাকাণ্ড ঃ স্নায়ুগুলির অপরপ্রান্ত সুষুম্নাকাণ্ডে আসিয়া শেষ হইয়াছে। সুষুম্নাকাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইবার সময় সরু সরু স্নায়ুগুলি মিলিত হইয়া এক একটি মোটা স্নায়ুতে পরিণত হয়। এইরূপ কয়েকটি মোটা স্নায়ু মিলিত হইয়া অবশেষে মেরু স্নায়ু (Spinal nerves) নামে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া সুষুম্নাকাণ্ডে আসিয়া মিলিত হয়। সুষুম্নাকাণ্ডের বুক ও পিঠের দিক হইতে গাছের ডাল-পালার ন্যায় এইরূপ ৩১ জোড়া মেরু স্নায়ু বাহির হইয়া হাতে, বুকে, পিঠে এবং পেটে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মেরুদণ্ডের মধ্যে স্নায়ুকোষের মোটা গুচ্ছ আছে। এই গুচ্ছ নীচে বস্তি প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উপরে মগজের মধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এখানে মস্তিষ্কের করোটির ছিদ্র দিয়া আবার নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মেরুদণ্ডের মধ্যে বস্তি প্রদেশ হইতে মগজ পর্যন্ত স্নায়ুকোষের এই গোছাকেই সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord) বলে। ইহা প্রায় ১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং একটি আঙ্গুলের মত মোটা।

সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে (Cross section) দুই প্রকারের কলা (Tissue) দেখা যায়। মধ্যস্থানে একটি সরু ছিদ্রর চারিদিকে ধূসর বর্ণের কলা (Gray Matter) এবং উহার চারিদিকে শ্বেতবর্ণের কলা (White Matter)। ধূসর বর্ণের অংশটুকু দেখিতে অনেকটা প্রজাপতির ন্যায় (Butterfly-like pattern)। সুষুম্নাকাণ্ডের মাঝের ঐ প্রজাপতিসদৃশ অংশটুকু সেল বডি, ডেনড্রাইট এবং মায়েলিনহীন অ্যাক্সন দ্বারা গঠিত। তাই উহা দেখিতে ধূসর বর্ণের। ধূসরবর্ণের চারিদিকের সাদা অংশটুকু মায়েলিন-যুক্ত অ্যাক্সন দ্বারা গঠিত। মায়েলিনের জন্য উহা দেখিতে সাদা। সুতরাং সমস্ত সুষুম্নাকাণ্ডটি কতকগুলি স্নায়ু কোষের সমষ্টিমাত্র।

কাজঃ মাথার নীচে শরীরের বিভিন্ন অংশ হাত, পা, ত্বক্ ইত্যাদি হইতে স্পর্শ, বেদনা, উত্তাপ প্রভৃতি অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া এবং পেশীর সংকোচন সৃষ্টি করা এই সুষুম্নাকাণ্ডের কাজ। ইহার সাহায্যে কখনও কখনও শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্ত-চলাচলও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। লালা গ্রন্থি হইতে লালা নিঃসরণ, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সংখ্যাবৃদ্ধি, পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিকোচন, রক্ত-নালীর সংকোচন ইত্যাদি কাজ ইহার সাহায্যে হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া মল-ত্যাগ, মূত্র-ত্যাগ, প্রসব ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রও এই সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থিত।

মস্তিষ্কঃ মস্তিষ্ক বা মগজটি মাথায় করোটির মধ্যে অবস্থিত। ইহার গড়পড়তা ওজন প্রায় ৪৯ আউন্স। মস্তিষ্কের আবার কতগুলি অংশ আছে—(১) গুরুমস্তিষ্ক (cerebrum), (২) থ্যালামাস ও অধস্থ্যালামাস (Thalamus or hypothalamus), (৩) মধ্য মস্তিষ্ক (Mid-brain), (৪) মস্তিষ্ক যোজক (Pons), (৫) লঘু মস্তিষ্ক (Cerebellum) এবং সুষুম্নাশীর্ষক (Medulla oblongata)। মস্তিষ্কের এই বিভিন্ন অংশ হইতে ১২ জোড়া স্নায়ু বাহির হইয়া মাথা এবং ঘাড়ের বিভিন্ন অংশে গিয়াছে। এই স্নায়ুগুলিকে করোটি স্নায়ু (Cranial) Nerves) বলে।

গুরুমস্তিষ্কঃ মস্তিষ্কের মধ্যে এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা বড় এবং প্রধান। মস্তিষ্কের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া ইহা অবস্থিত। ইহা দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অংশ
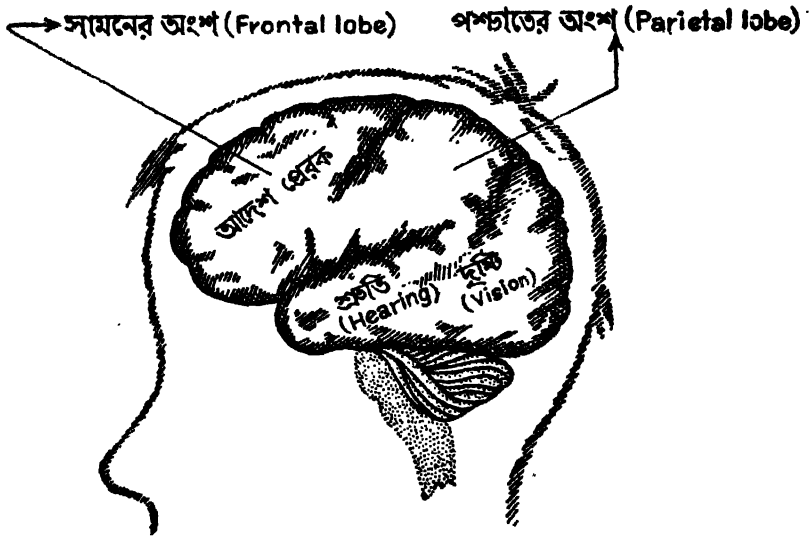
গুরুমস্তিষ্ক
(Cerebrum)

কতগুলি গভীর খাঁজের দ্বারা কতকগুলি পিণ্ডে (Lobes) এবং প্রত্যেকটি পিণ্ড আবার কতকগুলি অগভীর খাঁজের দ্বারা কতকগুলি ছোট ছোট পিণ্ডকে (Gyri) বিভক্ত হইয়া

আছে। এই সকল পিণ্ডকের কোনটি চিন্তাশক্তি, কোনটি দৃষ্টিশক্তি, কোনটি ঘ্রাণশক্তি ইত্যাদির কেন্দ্র। এক কথায় বলিতে গেলে গুরুমস্তিষ্কই দেহের প্রকৃত কর্তা। ইহার অগোচরে বা আদেশ ব্যতীত খুব সামান্য ক্রিয়াই ঘটিতে পারে। যাহার গুরুমস্তিষ্কের পিণ্ডকের সংখ্যা যত বেশী তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিও তত প্রখর। শিশুদের মস্তিষ্কে পিণ্ডকের সংখ্যা অনেক কম। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে পিণ্ডকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি বাড়াইতে পারা যায়। গুরুমস্তিষ্কের পশ্চাতের অংশই বিভিন্ন ইন্দ্রিয় হইতে সংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকে। এইখানেই শ্রুতিকেন্দ্র, দর্শনকেন্দ্র ইত্যাদি অবস্থিত। গুরুমস্তিষ্কের সামনের অংশ হইতে আদেশ দেওয়া হয়।

থ্যালামাস ও অধস্থ্যালামাস ঃ মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশগুলি গুরুমস্তিষ্কের নিম্নদিক হইতে সুষুম্নাকাণ্ড পর্যন্ত স্থানে পর পর অবস্থিত। গুরুমস্তিষ্কের ঠিক নীচেই ধূসর রঙের বড় অংশটিকে থ্যালামাস বলে। থ্যালামাসের ঠিক নীচে অধস্থ্যালামাস অবস্থিত। থ্যালামাসের সাহায্যে আমরা খুব গরম, খুব ঠাণ্ডা বা তীব্র বেদনা ইত্যাদি গভীর অনুভূতিগুলি অনুভব করিয়া থাকি। ক্রোধ, লজ্জা, অনুরাগ ইত্যাদি মানসিক উত্তেজনাগুলিও থ্যালামাসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আত্মরক্ষা বা নিজেকে
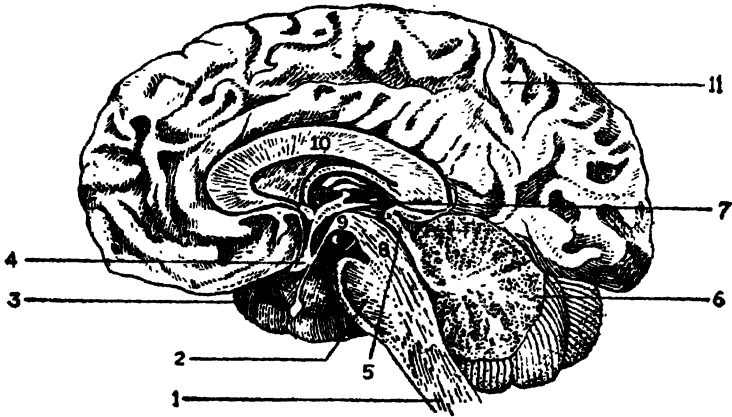
লম্বালম্বিভাবে কাটা মস্তিষ্ক—(1) সুষুম্নাশীর্ষ : (2) উষ্ণীষক ; (3) পিঠুইটারি গ্রন্থি ; (4) অক্ষিস্নায়ু ; (5) মধ্য মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগ ; (6) সেরিবেলাম ; (7) থ্যালামাস ; (8) মধ্য-মস্তিষ্ক ; (9) থ্যালামাসের নিম্নাঞ্চল ; (10) কর্পাস ক্যালোসাম ; (11) গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স।

রক্ষা করিবার জন্য অপরকে আক্রমণ করা এই কাজগুলি পরাসমব্যথী (Parasympathetic) এবং সমব্যথী (Sympathetic) স্নায়ু দ্বারা সম্পন্ন হয়। অধস্থ্যালামাস এই পরাসমব্যথী এবং সমব্যথী স্নায়ু দুইটির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে। নিদ্রা ও দেহের তাপ সংরক্ষণের ব্যাপারেও অধস্থ্যালামাস প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া স্নেহ ও শর্করা জাতীয় উপাদানের বিপাকক্রিয়া ইহার সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

মধ্য-মস্তিষ্ক ঃ থ্যালামাস এবং অধস্থ্যালামাসের ঠিক নীচেই এই অংশটি অবস্থিত। ইহার উপরের দিকে গুরুমস্তিষ্ক, থ্যালামাস ও অধস্থ্যালামাস এবং নীচের দিকে মস্তিষ্ক যোজক ও লঘুমস্তিষ্ক। ইহার পিছন দিকে চারিটি ঢিবি আছে। ইহাদের পিণ্ডচতুষ্টয় (Corpora quadrigemina) বলে। উপরের পিণ্ড দুইটিকে নিম্নদৃষ্টি বলে। কারণ চোখে হঠাৎ তীব্র আলো পড়িলে চোখ যে ছোট হইয়া বা বুজিয়া আসে তাহা এই দুইটি ঢিবির ক্রিয়ার জন্য। নিম্নপিণ্ড দুইটি নিম্নশ্রুতিকেন্দ্র নামে পরিচিত, কারণ ইহারা শ্রুতিবহ তন্তুগুলির বিরতি স্থানরূপে কাজ করে। মধ্য মস্তিষ্কের লোহিত নিউক্লিয়াস (Red Nucleus) এবং কৃষ্ণোপাদান (Substantia nigra) নামক দুইটি সুস্পষ্ট অংশ আছে। লোহিত নিউক্লিয়াসের সাহায্যে পেশীর কতগুলি বিশিষ্ট সঞ্চালনক্রিয়া সাধিত হয়। নৃত্য, ব্যায়াম ইত্যাদি ক্রিয়াতে আমাদের পেশীর নিপুণ সঞ্চালন প্রয়োজন। কৃষ্ণোপাদান এই সকল পেশীর সঞ্চালন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে।

মস্তিষ্ক যোজক ঃ মধ্যমস্তিষ্কের নীচে এই অংশটি অবস্থিত। ইহা মধ্যমস্তিষ্কের সহিত সুষুম্নাশীর্ষক ও লঘু মস্তিষ্কের যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকে। ইহা নাসিকা এবং বাক্‌যন্ত্রের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে। আহার করিবার সময় মুখের এবং গলাধঃকরণের সময় গলার পেশীগুলিও ইহার সাহায্যে ক্রিয়া করিয়া থাকে।

লঘু মস্তিষ্ক ঃ ইহা মস্তিষ্ক যোজক, সুষুম্নাশীর্ষক ও মধ্য মস্তিষ্কের মধ্যে যোগা-যোগ রক্ষা করিয়া চলে। হাঁটা-চলা, দৌড়ান বা কোন প্রকার শারীরিক কাজে আমাদের দেহের বিভিন্ন অংশের পেশী কাজ করিয়া থাকে। এই সকল পেশীর কার্যের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করাই লঘু মস্তিষ্কের কাজ। পেশীর স্বভাবিক সংকোচনও ইহার সাহায্যে ঘটিয়া থাকে।

সুষুম্নাশীর্ষক ঃ ইহা ঠিক মস্তিষ্ক যোজকের নীচে এবং সুষুম্নাকাণ্ডের উপরে অবস্থিত। এই অংশটি হৃদ্‌স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস, ধমনী সংকোচন, লালানিঃসরণ, বমন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই অংশটিতে আঘাত লাগিলে সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা লোপ পায় এমন কি গুরুতর আঘাতে মৃত্যুও ঘটিতে পারে। যকৃতে যে কার্বোহাইড্রেট গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয় তাহা এই কেন্দ্র হইতে নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যাঙ ও অন্যান্য ইতর প্রাণীর এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

করোটি স্নায়ু (Cranial Nerves) **ঃ** মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হইতে যে বার জোড়া স্নায়ু বাহির হইয়া করোটির ছিদ্রপথে চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, মুখমণ্ডল, কর্ণ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, অন্ত্র ইত্যাদিতে গিয়া শেষ হইয়াছে ইহাদের করোটি স্নায়ু বলে।

স্নায়ু-তন্ত্রের ক্রিয়াপ্রণালী ঃ দেহের মধ্যে স্নায়ুর জাল কিভাবে ছড়াইয়া আছে তাহা বলা হইয়াছে এবং তাহাদের কাজ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু স্নায়ুগুলি নিজেরাই বাহির হইতে খবর সংগ্রহ করে না বা মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের আদেশে কার্য করে না। বিভিন্ন খবরাখবর পরিবহন করিবার কাজটুকুই স্নায়ুতন্ত্রের। খবর সংগ্রহ ও আদেশ পালনের জন্য বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, মাংসপেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি রহিয়াছে। সুতরাং একটি কাজ সুসম্পন্ন করিতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, স্নায়ুতন্ত্র, পেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি একযোগে কাজ করিয়া থাকে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। মনে কর, তোমার ডান পায়ের আঙ্গুলে একটি পোকায় কামড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে তুমি ডান পাখানা সরাইয়া ফেলিবে। পোকাটি তোমার পায়ের চামড়া বা ত্বকে কামড়াইল। চামড়া বা ত্বক চারি

প্রকারের কোষে গঠিত। ইহাদের কোনটি ঠাণ্ডা, কোনটি গরম, কোনটি স্পর্শ আবার কোনটি বেদনা অনুভব করিতে পারে। দেহের সর্বত্রই এই চারি প্রকারের কোষ ছড়াইয়া আছে। তাই আমরা দেহের সব জায়গায়ই এই চারি প্রকারের অনুভূতি গ্রহণ করিতে পারি। বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেয় বলিয়া ইহাদের গ্রাহক কোষ (Receptor cells) বলে। পোকার কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানের বেদনা-অনুভূতির গ্রাহককোষে উত্তেজনার সৃষ্টি হইবে। আবার প্রত্যেকটি গ্রাহককোষের সঙ্গে স্নায়ুর একপ্রান্ত সংযুক্ত থাকে। সুতরাং গ্রাহককোষের উত্তেজনা সংবেদীয় স্নায়ুর দ্বারা সুষুম্নাকাণ্ডে পরিচালিত হয়। সংবেদীয় স্নায়ুর সেল বডি এবং ডেনড্রাইট সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে থাকে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এবার এই উত্তেজনা সংবেদীয় স্নায়ু হইতে সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থিত adjustor নিউরনের সাহায্যে চেষ্টিয় স্নায়ুতে পরিবাহিত হয়। Adjustor নিউরনগুলি সংবেদীয় এবং চেষ্টিয় নিউরনের মধ্যে ডেনড্রাইটের মাধ্যমে যোগসাধন করে।

স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic nervous system): এই পর্যন্ত যে স্নায়ুর কথা বলা হইতেছে তাহারা সকলেই মস্তিষ্ক অথবা সুষুম্নাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন। মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডই এই সকল স্নায়ুর কার্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই সকল স্নায়ু ছাড়াও দেহের মধ্যে অন্য এক প্রকারের স্নায়ু আছে যাহারা মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাইরে। এই জাতীয় স্নায়ু-তন্ত্রকে স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র বলে। দেহের মধ্যে কোন প্রকার আকস্মিক উত্তেজনার কারণ ঘটিলে তাহার প্রতিবিধান করাই এই স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ। এই স্নায়ুতন্ত্রটিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) সমব্যথী স্নায়ু (Sympathetic Nerves) এবং (২) পরাসমব্যথী স্নায়ু (Parasympathetic Nerves)। ইহার প্রত্যেকটি বিভাগ কতগুলি স্নায়ুগ্রন্থি (Ganglion) অন্তর্মুখ এবং বহির্মুখ স্নায়ু লইয়া গঠিত। চক্ষু, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃত, প্লীহা, অন্ত্র, বৃক্ক, মূত্রাশয় প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের দুইপ্রকার স্নায়ুরই প্রভাবাধীন। দেহরক্ষার ব্যাপারে সমব্যথী স্নায়ু সর্বদাই অপরকে আক্রমণ করিয়া শক্তির অপচয় করিয়া থাকে। পরাসমব্যথী স্নায়ু বিপরীতভাবে ক্রিয়া করে। সে শক্তির অপচয় বন্ধ করিয়া দেহের ক্ষয় পূরণের দ্বারা দেহকে অপরের আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা দেহের জলীয় অংশের সাম্য রক্ষা করা হয়। ইহা ছাড়া কতগুলি পরাসমব্যথী স্নায়ু মল-মূত্র-ত্যাগ এবং সন্তান প্রসবেও সাহায্য করে। পরীক্ষা দ্বারা আজকাল স্থির হইয়াছে যে স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের উপর মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকিলেও পরোক্ষভাবে মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ: আমাদের দেহের স্নায়ুতন্ত্রকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড এবং ইহাদের প্রভাবাধীন যে সকল স্নায়ু তাহাদের লইয়া একটি বিভাগ গঠিত। এই বিভাগটিকে মেরুমস্তিষ্ক তন্ত্র (Cerebro-spinal system) বলে। ইহা ছাড়া যে সকল স্নায়ু মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাহিরে তাহাদের লইয়া দ্বিতীয় বিভাগটি গঠিত। ইহাকে স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic system) বলে। মেরুমস্তিষ্ক তন্ত্রটিকে আবার দুইটি ভাগে ভাগ করা

হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড লইয়া স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশটুকু গঠিত তাহাকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous system) বলে। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড হইতে খবরাখবর দেহের বিভিন্ন অংশে যে স্নায়ু দ্বারা বহন করা হয় এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে মস্তিষ্কে এবং সুষুম্নাকাণ্ডে যাহাদের সাহায্যে খবরাখবর আনয়ন করা হয়, এই উভয় প্রকার স্নায়ু লইয়া বহিরাংশীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral Nervous system) গঠিত।

বহিরাংশীয় স্নায়ুগুলির আবার দুইটি ভাগ আছে—(১) করোটি স্নায়ু (Cranial Nerves)। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হইতে মোট ১২ জোড়া এইরূপ স্নায়ু বাহির হইয়াছে। (২) মেরুস্নায়ু (Spinal Nerves)। সুষুম্নাকাণ্ড হইতে ৩১ জোড়া এইরূপ স্নায়ু বাহির হইয়া দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তৃত হইয়া আছে।
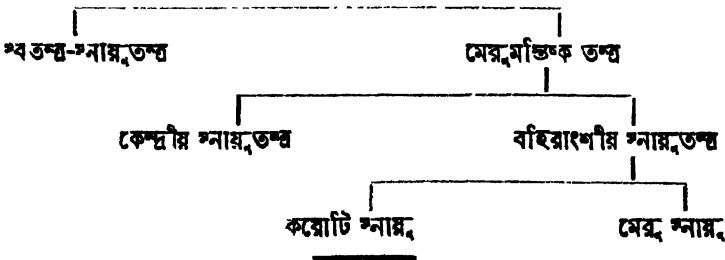
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র
(Endocrine System)

দেহের বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থি হইতে বিভিন্ন প্রকারের রস অনবরতই নিঃসৃত হইতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রস কতকগুলি প্রণালীদ্বারা (duct) তাহাদের নিজ নিজ ক্রিয়াস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ পাচন-তন্ত্রে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাকের জন্য যে লালা লালা-গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হয় তাহা কতকগুলি প্রণালী দ্বারাই মুখগহ্বরে লইয়া যাওয়া হয়। অনুরূপভাবে পাকস্থলীতেও কতকগুলি রস পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যের জন্য বিভিন্ন প্রণালীদ্বারা ঐস্থানে নীত হইয়া থাকে। লালা-গ্রন্থি ইত্যাদির ন্যায় যে সকল গ্রন্থির রস নির্দিষ্ট প্রণালী সাহায্যে প্রবাহিত হয় তাহাদের **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** (exocrine glands) বলে। প্রথমে ধারণা ছিল যে রস-নিঃস্রাবী সকল গ্রন্থিরই প্রণালী (duct) আছে এবং এই প্রণালী দ্বারাই ঐ রস দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। বিজ্ঞানী ক্লড বার্নার্ডই (Claude Bernard) প্রথমে লক্ষ্য করেন যে আমাদের দেহের মধ্যে এমন কতকগুলি গ্রন্থি আছে যাহাদের এই ধরনের রস পরিবহনের জন্য কোনও প্রণালী নাই। ঐ সকল গ্রন্থির রস সরাসরি রক্তের মধ্যে এবং লসিকায় (lymph) নিঃসৃত হইয়া দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। এইজন্য এই সকল গ্রন্থিকে তিনি **প্রণালীবিহীন গ্রন্থি** (ductless glands) বলেন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে এই প্রকারের সকল গ্রন্থিই প্রণালীবিহীন নয়। যেমন; অগ্ন্যাশয় (Pancreas) এই প্রকারের একটি গ্রন্থি হইলেও ইহার প্রণালী আছে। অগ্ন্যাশয়ের একটি অংশ হইতে রস প্রণালী সাহায্যে পরিবাহিত হয়। আবার অন্য আরেকটি অংশ হইতে রস সরাসরি রক্তে নিঃসৃত হয়। এইজন্য এখন এই সকল গ্রন্থিকে 'প্রণালীবিহীন গ্রন্থি' না বলিয়া **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** (endocrine glands) বলা হয়। গ্রীক ভাষায় endo মানে অন্ত এবং crino মানে ক্ষরণ। অগ্ন্যাশয়ের দুইটি অংশ আছে—একটি অংশ অন্তঃক্ষরা এবং অপরটি বহিঃক্ষরা। নিম্নে প্রধান প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের নাম দেওয়া হইল।

1. পিনিয়াল গ্রন্থি ; 2. পিটুইটারি গ্রন্থি ; 3. থাইরয়েড গ্রন্থি ; 4. থাইমাস গ্রন্থি ; 5. এড্রিন্যাল গ্রন্থি ; 6. অগ্ন্যাশয় ; 7. যৌন গ্রন্থি।
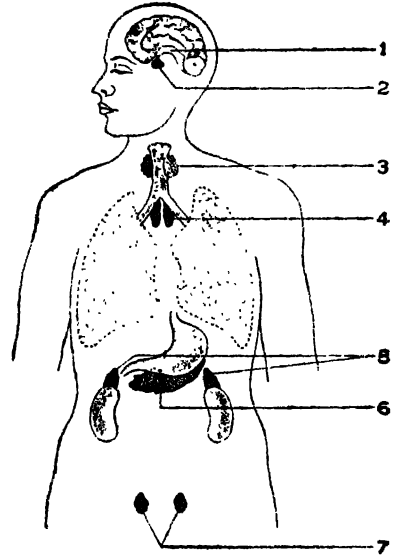
(১) পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland or epiphysis); (২) পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland or hypophysis), (৩) থাইরয়েড বা গলগ্রন্থি (Thyroid glands), (৪) প্যারা-থাইরয়েড বা উপগল গ্রন্থি (Parathyroid glands), (৫) থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland) ও এড্রিন্যাল বা কটিগ্রন্থি (Adrenal or Suprarenal glands), (৬) অগ্ন্যাশয় (Pancreas), (৭) যৌন গ্রন্থি (Gonads or testes and ovaries)।

এই সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি লইয়া অন্তঃক্ষরণতন্ত্র গঠিত। এই সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের রস স্নায়ুতন্ত্রের উপর অদ্ভুত উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া উহার ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া ষ্টার্লিং (Starling) এই রসকেই হরমোন (Hormone) নাম দিয়াছিলেন। ইংরাজী হরমোন কথাটি গ্রীক শব্দ 'হরমাও' (Harmao) হইতে উদ্ভূত। এই 'হরমাও' কথাটির অর্থ হইতেছে 'আমি উত্তেজনা সৃষ্টি করি' বা 'আমি জাগ্রত করি'। অতি সামান্য পরিমাণ হরমোনই সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন। উহারা জৈবিক অনুঘটকের ন্যায় কাজ করিয়া থাকে। হরমোনের রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে উহারা প্রধানতঃ প্রোটিন জাতীয় যৌগ। অধুনা রসায়নাগারে অনেক হরমোন প্রস্তুত হইয়া থাকে। আবার কোন কোন হরমোনের রাসায়নিক প্রকৃতি এখনও সঠিকরূপে জানা যায় নাই।

পিটুইটারি গ্রন্থি
(Pituitary gland or Hypophysis)

অবস্থান : এই গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের নিম্নদেশে চক্ষুর স্নায়ুর নির্গমন পথের অনতিদূরে একটি ডিম্বাকৃতি অস্থিময় ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। এই গ্রন্থিটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :—

(১) পুরোভাগ (Pars anterior)
(২) মধ্যভাগ (Pars intermedia)
(৩) পশ্চাৎভাগ (Pars posterior)

এই তিনটি অংশের মধ্যে পুরোভাগটি বিশেষভাগে উল্লেখযোগ্য; কারণ এই অংশ হইতে উৎপন্ন হরমোনসমূহ শরীরের অন্যান্য অংশ হইতে নিঃসৃত হরমোনসমূহের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই জন্যই শরীর সুস্থ রাখিতে সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের মধ্যে এই পিটুইটারি গ্রন্থিটির গুরুত্ব সর্বাধিক।

উৎপন্ন হরমোনসমূহ : পিটুইটারি গ্রন্থি হইতে একাধিক হরমোন উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুরোভাগ হইতে উৎপন্ন হরমোনসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) দেহবৃদ্ধিকারক হরমোন (Growth hormone), (২) গলগ্রন্থিউত্তেজক হরমোন (Thyroid stimulating hormone [TSH]), (৩) কটিগ্রন্থি-উত্তেজক হরমোন (Adrencoorticotropic hormone [ACTH]) (৪) যৌনগ্রন্থি উত্তেজক হরমোন (Follicle stimulating hormone [FSH] and luteinising hormone [LH]); (৫) দুগ্ধবর্ধক হরমোন (Prolactin) ও (৬), এড্রিনো-কর্টিকো হরমোন (Adreno-corticotropic)।

পিটুইটারির পশ্চাৎ ভাগ হইতে তিনটি হরমোন নিঃসৃত হয়। (১) পিট্রেসিন (Pitressin), (২) অক্সিটোসিন বা পিটোসিন (Oxytocin or Pictocin) এবং (৩) বহুমূত্র প্রতিষেধক হরমোন (Antidiuretic factor)। বর্তমানে নানা গবেষণা দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে পশ্চাৎ ভাগ হইতে এই তিনটি হরমোনের পরিবর্তে

কেবলমাত্র একটি হরমোনই নিঃসৃত হয় এবং এই হরমোনটি অক্সিটোসিন ও ভেসোপ্রেসিন (Oxytocin and vesopressin) নামক দুইটি উপাদানে গঠিত। ইহা ছাড়া পশ্চাৎ-ভাগ হইতে বহুমূত্র (Diabetes insipidus) প্রতিষেধক একপ্রকার হরমোনও (Anti-diuretic factor) উৎপন্ন হয়। বৃক্ক হইতে জল শোষণে ইহা সহায়তা করে।

মধ্যভাগ হইতে ইণ্টারমেডিন (Intermedin) নামক একটি হরমোন নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। ইহার প্রভাব এখনও সঠিকরূপে নির্ণয় করা হয় নাই।

(১) পিটুইটারির পুরোভাগ হইতে নিঃসৃত হরমোন দেহের বিভিন্ন অংশের সুসমঞ্জস বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে। (২) ইহা ছাড়া গলগ্রন্থিতে (Thyroid) উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া উহার হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করাও এই হরমোনের (TSH) একটি কাজ। (৩) ইহা ছাড়া কটিগ্রন্থি (Adrenal gland)-নিঃসৃত হরমোনের ক্রিয়াও এই জাতীয় একটি হরমোনের (ACTH) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাস প্রয়োগে যে এডিসন্স্ রোগের (Addison's disease) উপশম হয় তাহাই ইহার প্রমাণ। (৪) এই পুরোভাগ হইতে উৎপন্ন অপর দুইটি হরমোন (FSH & LH) স্ত্রী এবং পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহাদের প্রভাবে ডিম্বাধারে (Ovary) ডিম্বাণুর যথাযথ বৃদ্ধি, মাসিক ঋতুর নিয়মিত আবির্ভাব এবং অন্যান্য যৌন হরমোনের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহারা পুরুষের অণ্ডকোষে (testes) শুক্রকীট সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এই পিটুইটারি হইতে নিঃসৃত প্রোল্যাক্‌টিন (Proclactin) গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে নারীর স্তনে দুগ্ধ ক্ষরণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। (৫) রক্তের চাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য এই পিটুইটারি হইতে উৎপন্ন পিট্রেসিন হরমোনটির কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (৬) অক্সিটোসিন জরায়ু সংকোচনের কাজে বিশেষ উপযোগী। এইজন্য প্রসবকালে এই হরমোন ব্যবহার করা হয়। (৭) এক প্রকার শর্করাবিহীন বহুমূত্র (Diabetes insipidus) রোগের চিকিৎসায়ও পশ্চাৎভাগের নির্যাস প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

অতিরিক্ত কার্যকলাপ : শৈশবে যদি পিটুইটারি গ্রন্থির ক্রিয়াশীলতা (activities) অতিশয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অতিকায়ত্ব রোগ (gigantism) দেখা দেয়। এই রোগে শিশুর দেহের অস্থি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং শীঘ্রই সে দানবাকৃতি লাভ করে। এই প্রকার লোকের উচ্চতা ৮-৯ ফুট পর্যন্ত হইতে পারে। ইহাতে বিপাক শক্তি (metabolism) বৃদ্ধি পায় এবং বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি হয়। ইহাদের প্রজনন শক্তিও নষ্ট হইয়া যায়। বয়স্ক লোকের দেহে এই গ্রন্থির অতিরিক্ত কার্যকলাপের জন্য এক্রোমেগালি (acromegaly) রোগ দেখা দেয়। ইহাতে বয়স্ক লোকদের হাত, পা, নাক, কান, চিবুক, ঠোঁট ইত্যাদি অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে তাহার মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া দেখিতে অনেকটা বনমানুষের মত হয়। ইহা ছাড়া এই গ্রন্থির অতি ক্রিয়াশীলতার জন্য কুশিং রোগও দেখা দিতে পারে। নিতম্ব ও মুখ-মণ্ডলে চর্বির আধিক্য, হাত, পা এবং মুখের কালচে ভাব, কেশ বহুলতা ইত্যাদি এই রোগের লক্ষণ।

অপ্রতুল কার্যকলাপ ঃ পিটুইটারি গ্রন্থিটি শৈশবে যথোপযুক্তভাবে সক্রিয় না হইলে বামনত্ব (Dwarfism) প্রাপ্তি ঘটিতে পারে। ইহাতে দেহের কোন বৃদ্ধি হয় না। যৌবনাগমে এই সকল লোকের দেহে যৌবনের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। ছেলেদের দাঁড়ি গোঁফ, স্বর-ভঙ্গ ইত্যাদি এবং মেয়েদের স্তনবৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণসমূহ এই সকল বামনদের দেহে প্রকাশ পায় না। ইহা ছাড়া গ্রন্থিটির অপ্রতুল ক্রিয়াশীলতার জন্য দেহ শীর্ণ হইয়া শুকাইয়া গেলে তাহাকে সাইমণ্ড রোগ বলে। পিটুইটারির পুরোভাগ এবং পশ্চাদভাগ উভয়ের অক্ষমতার জন্য ফ্রলিক রোগ (Frolich's Syndrome) নামক এক প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহা অল্প বয়সেই হইয়া থাকে। ইহাতে দেহের যথাযথ

দেহের উপর পিটুইটারি গ্রন্থির প্রভাব। মধ্যস্থলে—গড়পড়তা উচ্চতাবিশিষ্ট লোক।
বামে—পিটুইটারির অতিরিক্ত কার্যকলাপের ফলে অতিকায় ব্যক্তি।
দক্ষিণে—পিটুইটারির অপ্রতুল কার্যকলাপের ফলপ্রসূত বামন।

বৃদ্ধি হয় না এবং মুখ ও চোখের ভাব হাবার মতো হয়। যৌবনের লক্ষণসমূহ দেহে বেশী বয়সে দেখা দেয়।

গলগ্রন্থি বা থাইরয়েড গ্রন্থি

(Thyroid glands)

অবস্থান ঃ ইহা গ্রীবাদেশে বাগ্‌যন্ত্রের থাইরয়েড অস্থির কিছু নীচে অবস্থিত —দেখিতে একটি থলির মত। এই থলির মধ্যে একটি আঠাল তরল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই তরল পদার্থের মধ্যেই থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন থাকে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির গলগ্রন্থির গড়পড়তা ওজন প্রায় ২৫ গ্রাম হয়। রক্ত নানা শাখা-প্রশাখায় অধিক পরিমাণে এই গ্রন্থির মধ্যে প্রবাহিত হয়।

হরমোন ও কাজ ঃ গলগ্রন্থি হইতে যে হরমোনটি নিঃসৃত হয় তাহাকে থাইরোক্সিন (Thyroxine) বলে। আয়োডিন থাইরোক্সিনের একটি প্রধান উপাদান। এইজন্যই

১নং চিত্র—গ্রেভস রোগক্রান্ত মহিলা। ২নং চিত্র—এই মহিলাটির থাইরয়েড গ্রন্থি আংশিক অপসারণের পরের অবস্থা।

খাদ্যে আয়োডিনের অভাব হইলে দেহে এই হরমোনেরও অভাব লক্ষিত হয়। থাইরোক্সিন প্রধানতঃ দেহের বিপাক (metabolism) ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া থাকে।

অতিরিক্ত কার্যকলাপ (Hyperactivity) **ঃ** কোন কোন ব্যক্তির গলগ্রন্থিটি বৃদ্ধি পাইয়া অধিক পরিমাণে হরমোন উৎপন্ন করে। ফলে ঐ ব্যক্তির অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। সে অনিদ্রায় ভুগিতে থাকে এবং মেজাজ রুক্ষ ও খিটখিটে হয়। এই অতিরিক্ত সক্রিয়তার একটি কুফল গ্রেভ্‌স্ রোগ (Graves diseasc)। এই রোগে গলগ্রন্থি বৃদ্ধি পায় এবং চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিকভাবে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন তীব্র ও দ্রুত হয়। দেহ দ্রুত ক্ষয় হয় এবং তাপ বৃদ্ধি পায়। হাত-পায়ের অতি সূক্ষ্ম কম্পন দেখা দেয় এবং বহুমূত্র রোগ হয়।

চিকিৎসা ঃ গলগ্রন্থির এই প্রকার অতিরিক্ত কার্যকলাপ ঐ গ্রন্থির অধিকাংশ (প্রায় আট ভাগের সাত ভাগ) কাটিয়া বাদ দিলে উপকার পাওয়া যায়। বর্তমানে অবশ্য এই প্রকার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রপিল ও মেথিল থায়ো-ইউরেসিল (propyl and methyl thiouracil) ঔষধ প্রয়োগে আজকাল এই রোগ দূর করা যায়।

অপ্রতুল কার্যকলাপ (hypoactivity) **ঃ** আয়োডিন গলগ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের একটি উপাদান। সুতরাং খাদ্যে আয়োডিনের অভাব হইলে দেহে হরমোনের উপাদান

কমিয়া যাইবে। খাদ্য এবং পানীয় জলে যে সামান্য পরিমাণ আয়োডিন থাকে তাহাই গলগ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যকলাপের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু কোন কোন অঞ্চল যথা, উরাল, ককেসাস; মধ্য এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের মাটি এবং জলে আয়োডিনের পরিমাণ এত অল্প যে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের দেহে আয়োডিনের অভাব দেখা দেয়। ফলে গলগ্রন্থির কোষগুলি আকৃতিতে বৃদ্ধি পায় এবং উহার মধ্যস্থিত তরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থলিটি বড় হইয়া ফুলিয়া উঠে। এই অসুস্থ গ্রন্থির ওজন ৪।৫ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হইতে পারে। এই অবস্থাকে গলগণ্ড রোগ (Goitre) বলে। প্রতিদিন খাদ্যের সহিত ০·২ গ্রাম করিয়া আয়োডিন মিশ্রিত লবণ (Sodium iodide) খাইতে দিলে দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই রোগের উপশম হইয়া থাকে।

গলগ্রন্থির অপ্রতুল কার্যকলাপের জন্য শিশুদের ক্রেটীনিজম্ (Cretinism) নামক রোগ হইতে দেখা যায়। ইহার ফলে শিশুদের দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানা প্রকার বিকৃতি দেখা দেয়। দেহের চামড়া পুরু হয় এবং জিহ্বা বড় হইয়া মুখের বাহিরে ঝুলিয়া থাকে। আঙ্গুলগুলি মোটা এবং ছোট ছোট হয়। এই সকল শিশুর বয়স বৃদ্ধি পাইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেও যৌবনের কোন লক্ষণই ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না। অর্থাৎ ছেলেদের গোঁফ, দাঁড়ি ইত্যাদি এবং মেয়েদের স্তনবৃদ্ধি, রজো-দর্শন ইত্যাদি দেখা যায় না। এই সকল শিশুদের বুদ্ধি-বৃত্তি অত্যন্ত কম থাকে এবং দেখিতে হাবার মতো হয়।

পরিণত বয়সে এই গ্রন্থির অক্ষমতার জন্য মিক্সিডিমা (Myxoidema) নামক এক প্রকার শোথরোগ দেখা দেয়। ইহাতে চোখ, মুখ ফুলিয়া উঠে এবং মাথার ও ভুরুর অধিকাংশ চুল উঠিয়া যায়, প্রজনন শক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং মেয়েদের ঋতু বন্ধ হইয়া যায়; চোখে বুদ্ধিমত্তার অভাব এবং আলস্য ও ঘুমের ঢুলুঢুলু ভাব দেখা যায়।

চিকিৎসা: ক্রেটিনিজম এবং মিক্সিডিমা রোগ গলগ্রন্থি নির্যাস (extract) খাওয়াইয়া অথবা থাইরোক্সিন্ হরমোনের চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য করা যাইতে পারে।

কটিগ্রন্থি বা এড্রিন্যাল গ্রন্থি
(The Adrenals)

অবস্থান: মানবদেহে দুই পাশে দুইটি বৃক্কের (Kidney) উপরে এই গ্রন্থিদ্বয় অবস্থিত। এইজন্যই ইহাদের কটিগ্রন্থি বলে। বামদিকের গ্রন্থিটি আকারে অপেক্ষাকৃত একটু বড়। প্রত্যেক গ্রন্থির আবার দুইটি সুস্পষ্ট অংশ আছে—(১) বহির্ভাগ (cortex) এবং (২) কেন্দ্রীয় ভাগ (medulla)।

হরমোন: কটিগ্রন্থির অংশের মধ্যে বহির্ভাগই (cortex) জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা হয়। এই অংশ হইতে একাধিক হরমোন নিঃসৃত হয়। বহির্ভাগের নির্যাস (extract)—যাহার মধ্যে ঐ অংশের সকল হরমোনসমূহই বর্তমান থাকে—তাহাকে কর্টিন (cortin) বলা হয়। কেন্দ্রীয় বা মধ্যভাগে দুইটি হরমোন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা এড্রিনেলিন বা এপিনেফ্রিন (Adrenalin or epinephrine) এবং নরএড্রিনেলিন বা নরএপিনেফ্রিন (noradrenalin or norepinephrine)।

কাজ ঃ (১) গ্রন্থির বহির্ভাগের ক্রিয়ার ফলে দেহের পেশীসমূহের শক্তি ও সংকোচন ক্ষমতা রক্ষা পায়। (২) ইহা দেহের জলীয় অংশের এবং ধাতব লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে। (৩) ইহার সাহায্যে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। (৪) স্ত্রী-পুরুষের যৌনগ্রন্থিদ্বয়ের বৃদ্ধি এবং বিকাশ এই গ্রন্থি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ঃ (১) গ্রন্থির কেন্দ্রীয় ভাগ হইতে উৎপন্ন এড্রিনেলিন নামক হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক হরমোন হিসাবে একটি উপকারী ঔষধ। (২) ইহার সাহায্যে হাঁপানী রোগীর শ্বাসকষ্টের উপশম হয়। (৩) রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ এই হরমোনের প্রয়োগে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। (৪) রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ইহা রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। (৫) ইহার প্রয়োগে লালাগ্রন্থির নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়। এড্রিনেলিনকে জরুরী-কালীন হরমোন (Emergency Hormone)-ও বলে। কারণ ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি দেহের জরুরী অবস্থায় এই হরমোনটি রক্তে অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া দেহকে ঐ জরুরী অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলে।

যৌন গ্রন্থি
(Gonads)

অবস্থান ঃ অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের মত এই যৌন গ্রন্থি স্ত্রী এবং পুরুষের দেহে একই জায়গায় অবস্থিত নয়। পুরুষের লিঙ্গের নীচে চামড়ার একটি থলির মত আছে। এই থলির মধ্যে দুইদিকে দুইটি প্রায় গোল মাংসপিণ্ড আছে। ইহাদের **অণ্ডকোষ** (testes) বলে। এই অণ্ডকোষ দুইটিই পুরুষের যৌনগ্রন্থি। পুরুষের যৌনগ্রন্থিদ্বয় যেমন নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকে মেয়েদের যৌনগ্রন্থি কিন্তু সেই রকম নয়। ইহা জরায়ুর কিঞ্চিৎ উপরে দুই পাশে অবস্থিত এবং **ডিম্বাধার** (ovaries) নামে পরিচিত। ইহারাও সংখ্যায় দুইটি। একটি টিউবের মধ্য দিয়া ডিম্বাধার হইতে ডিম্ব বা ডিম্বাণু (ovum) জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে।

হরমোন ঃ পুরুষের অণ্ডকোষ হইতে একাধিক হরমোন নিঃসৃত হয়। ইহাদের মধ্যে দুইটি হরমোনই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—(১) **টেস্টোস্টেরন** (Testosterone) এবং (২) **এণ্ড্রোস্টেরন** (Androsterone)। শেষোক্ত হরমোনটি মেয়েদের মূত্রের মধ্যেও কখনও কখনও দেখা যায়। তবে মেয়েদের মধ্যে উহা ডিম্বাধারে উৎপন্ন হয় না।

মেয়েদের ডিম্বাধার হইতে উৎপন্ন উল্লেখযোগ্য দুইটি হরমোন হইল—(১) **ইস্ট্রোজেন** (Estrogen) এবং (২) **প্রজেস্টেরন** (Progesterone)। ইস্ট্রোজেন ডিম্বাধারের গ্রাফিয়ান ফলিক্ল হইতে উৎপন্ন হয়। ডিম্বাণু নির্গত হইবার পর ঐ গ্রাফিয়ান ফলিক্ল-এ পীত বর্ণের কর্প্যসল্যুটিয়ামের সৃষ্টি হয়। এই কর্প্যসল্যুটিয়াম হইতেই প্রজেস্টেরন উৎপন্ন হয়।

কাজ ঃ পুরুষের মধ্যে টেস্টোস্টেরন হরমোনটি পিটুইটারি গ্রন্থিনিঃসৃত যৌনগ্রন্থি উত্তেজক হরমোনের সহায়তায় শুক্রোৎপাদনে সাহায্য করে। (২) এন্ড্রোস্টেরন প্রধানতঃ যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা জননেন্দ্রিয়গুলির বৃদ্ধি এবং যৌবনের লক্ষণসমূহ বিকশিত করে। (৩) এই গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত এবং যৌনশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেহ ও মনের স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া থাকে।

(১) যৌবনের প্রারম্ভ হইতে ঋতু বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ডিম্বাধার হইতে প্রতিমাসে একটি বা একাধিক ডিম্বাণু (Ovum) বাহির হয়। (২) ডিম্বাধারনিঃসৃত হরমোনের (প্রোজেস্টেরন) সাহায্যে ভ্রূণ জরায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উপযুক্ত স্থানে সংলগ্ন হয় এবং সেইস্থানে গর্ভফুলের সৃষ্টি হইতে থাকে। এই হরমোনের প্রভাবেই গর্ভকালে অন্য ডিম্বাণুর সৃষ্টি হয় না এবং ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। ভ্রূণের পরিপুষ্টি এবং স্তনের আনুষঙ্গিক পরিবর্তনও এই হরমোনের প্রভাবের ফল। (৩) অন্য একটি হরমোনের (ইস্ট্রোজেন) প্রভাবে যৌবন সমাগমে নারীর যোনি প্রদেশ এবং গর্ভাশয়ের বৃদ্ধি হেতু রজোদর্শন হইয়া থাকে এবং নারীদেহের অন্যান্য লক্ষণগুলিও প্রকাশ পায়।

অতিরিক্ত কার্যকলাপের ফল : শিশুকালে এই গ্রন্থির অত্যধিক সক্রিয়তার ফলে পুরুষের দেহে অকালে যৌবনের বিকাশ হয়। আকৃতি এবং প্রকৃতিতে অল্প বয়সেই তাহাতে পরিণত বয়সের লক্ষণ (অকালবার্ধক্য) দেখা যায়। যৌবনাবস্থায় এই গ্রন্থির অতিশয় সক্রিয়তা হেতু প্রথমে দেহ ও মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অচিরেই সমগ্রদেহ অবসন্ন হইয়া এলাইয়া পড়ে।

মেয়েদের অল্প বয়সে এই গ্রন্থির ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পাইলে তাড়াতাড়ি দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে এবং যৌবনের সমস্ত লক্ষণসমূহ (যথা, রজোদর্শন, জননেন্দ্রিয়ের পরিণতি, কেশোদ্গম, কামভাবের উদ্রেক, ইত্যাদি) অল্প বয়সেই দেখা দেয়। যৌবনে এই অবস্থা ঘটিলে অতিরিক্ত কামেচ্ছা হয় এবং পরে সাধারণ দৌর্বল্য ও বন্ধ্যাত্ব ঘটে।

অপ্রতুল কার্যকলাপের ফল : শৈশবে ছেলেদের এই গ্রন্থির অক্ষমতা দেখা দিলে শরীর বেঁটে এবং মেদবহুল হয়। যৌন অঙ্গগুলি ছোট থাকে এবং দেহে কেশের অভাব হয়। যৌবনে এই অবস্থার জন্য কামেচ্ছা ও প্রজনন শক্তি কমিয়া যায় এবং বন্ধ্যাত্ব জন্মে।

মেয়েদের অল্পবয়সে এই গ্রন্থির অক্ষমতার জন্য যৌবনের লক্ষণগুলি বিলম্বে দেখা দেয় এবং মেদবহুল হইয়া পড়ে। যৌবনে এই অবস্থার জন্য অনিয়মিতভাবে ঋতুস্রাব হইতে থাকে এবং পরিমাণে কম হয়। কখনও কখনও ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায় এবং বন্ধ্যাত্ব ঘটে।

অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি

অগ্ন্যাশয়ের যে অংশে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি দেখা যায় সেই অংশটিকে দ্বৈপিক অংশ (cell-islets of Langerhlans) বলে। এই দ্বৈপিক অংশ হইতে ইনসুলিন (insulin) নামক হরমোন উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ইনসুলিন দেহের কার্বোহাইড্রেট বিপাকে সহায়তা করে। ইহার অভাবে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং মূত্রের সহিত অধিক পরিমাণে এই শর্করা বাহির হইয়া যায়। ইহাতে অতি তৃষ্ণা, অতি ক্ষুধা, পেশী দৌর্বল্য প্রভৃতি দেখা যায়। এই অবস্থাকে মধুমেহ নামক একপ্রকার বহুমূত্র রোগ (Diabetes mellitus) বলে। আজকাল ইনসুলিন বিশুদ্ধভাবে গবেষণাগারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মধুমেহ রোগীকে ইনজেকসেন করিলে উপকার পাওয়া যায়। ইনসুলিন খাইতে দিলে রোগের উপশম হয় না।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি

গলগ্রন্থি বা থাইরয়েড গ্রন্থির সহিত সংলগ্ন চারিটি প্যারাথাইরয়েড বা উপগলগ্রন্থি দেখা যায়। আকারে এই সকল উপগলগ্রন্থি এক একটি গোটা ছোলার মত। এই গ্রন্থি হইতে প্যারাথর্মোন (Parathormone) নামে হরমোন নিঃসৃত হয়। এই হরমোন প্রধানতঃ রক্তের ক্যালসিয়ামের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে। এই গ্রন্থির অতি ক্রিয়াশীলতার ফলে রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ক্ষুধামান্দ্য, নিদ্রালুতা এবং রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধিও এই অবস্থায় দেখা যায়। অপরপক্ষে উপগলগ্রন্থির নিষ্ক্রিয়তা হেতু রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমিয়া যায়। ফলে পেশীগুলির কম্পন ও অনবরত সংকোচন ঘটে। এই অবস্থাকে টিটানি রোগ (tetany) বলে। টিটানি রোগে উপগল-গ্রন্থির নির্যাস, ক্যালসিয়াম গঠিত লবণ এবং ভাইটামিন 'ডি' প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। উপগলগ্রন্থির অতিরিক্ত কার্যকলাপের ফলে রক্তে ক্যালসিয়ামের আধিক্য ঘটে। ফলে অস্থি ও পেশীর অসুস্থতাজনিত এক প্রকার রোগ সৃষ্টি হয়। ইহাকে ভন রেক্‌লিং-হাউসেন রোগ (Von Reckling hausen's disease) বলে।

থাইমাস্ গ্রন্থিটি (Thymus gland) গ্রীবামূলে অবস্থিত। জন্ম হইতে যৌবন-কাল অবধি এই গ্রন্থিটি দেখা যায়। যৌবনপ্রাপ্তির পর ধীরে ধীরে উহার বিলুপ্তি ঘটে। সম্ভবত যৌবনে যৌবনগ্রন্থির অন্তঃক্ষরণের জন্যই উহার বিলোপ হয়। থাইমাস গ্রন্থির একটি বিশিষ্ট হরমোন হইতেছে থাইমোক্রাইসিন (thymocrysin)। উহার দ্বারা যৌবনলক্ষণগুলি দ্রুত পরিণতি লাভ করে। ভ্রূণাবস্থায় লিঙ্গভেদ এবং যৌবনা-বস্থার লক্ষণগুলির বিকাশ আরম্ভ হয় এই থাইমাস গ্রন্থির প্রভাবে।

মাথার মধ্যে পিটুইটারি গ্রন্থির কাছেই আরও একটি ডিম্বাকৃতি ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে ইহাকে পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland) বলে। এই গ্রন্থির কাজ সম্বন্ধে এখনও কোন সুস্পষ্ট ধারণা হয় নাই। তবে বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়ার মধ্যে সাম্য রক্ষা করা ইহার একটি কাজ।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক : প্রতিটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি রক্তের মধ্যে তাহার নিজ নিজ হরমোনের ক্ষরণ করিয়া পরিপাক ক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই কাজ করিবার সময় উহারা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এইভাবে তাহাদের নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। পিটুইটারি হইতে নিঃসৃত যৌনগ্রন্থি উত্তেজক হরমোন যৌনগ্রন্থির কার্যকলাপ বাড়াইয়া দেয়। পিটুইটারি গ্রন্থি অপসারণ করিলে যৌনগ্রন্থির ক্রিয়া মন্দীভূত হয়। আবার যৌনগ্রন্থি হইতে উৎপন্ন হরমোন পিটুইটারি গ্রন্থির কার্যকলাপ কমাইয়া থাকে। থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকলাপ পিটুইটারি গ্রন্থির হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং থাইরয়েড গ্রন্থি ও যৌনগ্রন্থিসমূহ পরস্পরের উপর কাজ করিয়া থাকে। এইরূপে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের কার্যকলাপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলিয়া কোন একটি গ্রন্থি বিনষ্ট হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থিসমূহের কার্যকলাপও ব্যাহত হইবে এবং জীবদেহে এক জটিল বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের ক্ষরণ স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগামী কোনও স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত হইলে ঐ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হইতে অধিক হরমোন নিঃসৃত হয়। যেমন ভেগাস স্নায়ু উত্তেজিত হইলে রক্তে ইনস্যুলিনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়।

হরমোনের ব্যবহারিক প্রয়োগ : অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও উহা হইতে নিঃসৃত বিভিন্ন হরমোনের ক্রিয়াকলাপ সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করিবার পর আজকাল উহা চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছে। থাইরয়েড গ্রন্থি বা গলগ্রন্থির নিষ্ক্রিয়তার জন্য সঞ্জাত কোন ব্যাধি এখন অনায়াসেই ঐ গ্রন্থিচূর্ণ সেবনে আরোগ্য করা যায়। যে সকল মেয়ে তাহাদের যৌন অঙ্গের যথাযথ বৃদ্ধির অভাবে সন্তান ধারণে অক্ষম তাহাদের উপরে হরমোনের চিকিৎসায় সুফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া বৃদ্ধের দেহে নব-যৌবনের সৃষ্টিও এই হরমোন চিকিৎসায় সম্ভবপর।

আজকাল হরমোনের ব্যবহার অর্থনৈতিক কারণেও করা হইতেছে। হরমোন প্রয়োগে পশুর আকৃতি বড় করিয়া উহাতে মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া মাংসে চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেও হরমোনের ব্যবহার করা যাইতে পারে। হাঁস এবং মুর্গীর ডিমের উন্নতি বিধানেও হরমোন প্রয়োগ করা যায়। পশুর গর্ভধারণ ক্ষমতা, পালক ও পশমের বৃদ্ধিও হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। দুর্দান্ত ষাঁড়ের যৌনগ্রন্থি অপসারণ করিলে উহা শান্ত ও অনুগত হইয়া পড়ে। তখন অনায়াসেই উহাকে কৃষিকার্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রাচীন কালেও এই পদ্ধতি অবলম্বনে ষাঁড় দ্বারা কৃষিকার্য করা হইত।

প্রধান প্রধান হরমোন, উহাদের উৎপত্তি, কাজ ইত্যাদি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল

গ্রন্থি	হরমোন	কাজ	অপ্রতুল কার্যকলাপের ফল	অতিরিক্ত কার্যকলাপের ফল
পিটুইটারি (Pituitary)	(১) পুরোভাগ হইতে :—			
	(ক) দেহবৃদ্ধিধারক হরমোন। (Growth hormone)	দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে।	বামনত্ব (Dwarfism)	অতিকায় (Gigantism), এক্রোমেগালি (acromegaly)
	(খ) গলগ্রন্থি উত্তেজক হরমোন (T. S. H)।	গলগ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রিত করে।		
	(গ) যৌনগ্রন্থি উত্তেজক হরমোন (F S H and L H)।	যৌনগ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রিত করে।		
	গ) দুগ্ধবর্ধক হরমোন (Prolactin)।	স্তনে দুগ্ধের সৃষ্টি করে।		
	(ঙ) এড্রিনো-কর্টিকো হরমোন (Adreno-corticotropic)	দেহের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।		
	(২) পশ্চাংভাগ হইতে :—			
	(ক) ইন্টারমেডিন (Intermedin)			
	(৩) মধ্যভাগ হইতে :—			
	(ক) ভেসোপ্রেসিন (Vesopressin)	ধমনীর পেশীতে ক্রিয়া করিয়া রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে।		
	(খ) অক্সিটোসিন (Oxytocin)	জরায়ুর সংকোচন নিয়ন্ত্রিত করে।		
	(গ) বহুমূত্র প্রতিরোধক হরমোন। (Antidiuretic factor)	বৃক্ক হইতে জল শোষণে সহায়তা করে।	এক প্রকার শর্করাবিহীন বহুমূত্র রোগ (Diabetes insipidus)।	

প্রধান প্রধান হরমোন, উহাদের উৎপত্তি, কাজ ইত্যাদি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল।

গ্রন্থি	হরমোন	কাজ	অপ্রতুল কার্যকলাপের ফল	অতিরিক্ত কার্যকলাপের ফল
গলগ্রন্থি (Thyroid)	থাইরোক্সিন (Thyroxine)	দেহের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে।	শৈশবে ক্রেটিনিজম (Cretinism) এবং পরিণত বয়সে মিক্সিডিমা (Myxoedema) রোগ।	গ্রেভস রোগ (Graves' disease)
উপগলগ্রন্থি (Parathyroid)	প্যারাথর্মোন (Parathormone)	ক্যালসিয়ামের বিপাক নিয়ন্ত্রিত করে।	টিটানি রোগ (Tetany)	ভন রেকলিং-হাউসেন রোগ (Von Reckling-hausen's disease)
থাইমাস (Thymus)	থাইমোক্রাইসিন (Thymocrysin)	ভ্রূণাবস্থায় লিঙ্গভেদ ও যৌবনে যৌবন লক্ষণগুলির আরম্ভ ইহার সাহায্যে ঘটে।		
অগ্ন্যাশয় (Pancreas)	ইনস্যুলিন (Insulin)	কার্বোহাইড্রেট, বিপাক-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে।	মধুমেহ নামক বহুমূত্র রোগ (Diabetes mellitus)	মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, স্নায়বিক দৌর্বল্য।
কটিগ্রন্থি (Adrenals)	১। কর্টিন (Corticoids) ২। এড্রিনেলিন বা এপিনেফ্রিন (Adrenalin or epinephrine)	১। দেহের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখে। ২। বিপাক-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। হৃৎপিণ্ডে উত্তেজনা সৃষ্টি, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি। দেহে ক্রোধ, ভয়, ইত্যাদি জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে রক্তে অধিক পরিমাণে এই হরমোন নিঃসৃত হইয়া শরীরকে ঐ অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলে।	এডিসনস্ রোগ (Addison's disease) কিছু নাই।	অতিকায় মানবশিশু এবং পুরুষালি মেয়ে সৃষ্টি। অপ্রয়োজনীয় জরুরী অবস্থার অবসান।

প্রধান প্রধান হরমোন, উহাদের উৎপত্তি, কাজ ইত্যাদি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল।

গ্রন্থি	হরমোন	কাজ	অপ্রতুল কার্যকলাপের ফল	অতিরিক্ত কার্যকলাপের ফল
ডিম্বাধার (Ovaries)	১। ইস্ট্রোজেন (Estrogen) ২। প্রোজেস্টেরন (Progesterone)	১। দেহ ও মনে যৌবনের বিকাশ সাধন করে ২। ডিম্বাণুস্ফোটন ও ঋতুস্রাব নিয়ন্ত্রণ করে। গর্ভস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধি ও স্তনের দুগ্ধ ক্ষরণ কাজ নিয়ন্ত্রিত করে।	১। দৈহিক ও মানসিক অপরিণত অবস্থা বা অপূর্ণতা ২। গর্ভধারণ ক্ষমতা হ্রাস।	
অণ্ডকোষ (Testes)	টেস্টোস্টেরন ও এন্ড্রোস্টেরন (Testosterone and Androsterone)	জননেন্দ্রিয়ের কাজ নিয়ন্ত্রিত করে।	যৌন অঙ্গসমূহের অপরিণতি ও যৌবন লক্ষণের অপূর্ণ বিকাশ।	অল্পবয়সে যৌবনের বিকাশ ও অকালবার্ধক্য

কয়েকটি অত্যাবশ্যক গ্রন্থি

(Essential glandular organs)

আমাদের দেহে দুইপ্রকার গ্রন্থি (glands) দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার গ্রন্থি প্রণালীযুক্ত এবং এই সকল গ্রন্থির রস এই প্রণালীর সাহায্যে নিজ নিজ ক্রিয়াস্থানে নীত হয়। লালাগ্রন্থি হইতে নিঃসৃত লালা মুখের মধ্যে লালাগ্রন্থির প্রণালীর সাহায্যে লইয়া যাওয়া হয়। অনুরূপভাবে অগ্ন্যাশয়ের রসও উহার প্রণালীর সাহায্যে অন্ত্রের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে। সুতরাং লালাগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয়ের গ্রন্থি প্রণালীযুক্ত গ্রন্থি। যকৃত, স্তন ইত্যাদিও প্রণালীযুক্ত। প্রণালীবিহীন গ্রন্থির রস রসাসার রক্তের মধ্যে পরিচালিত হয়। পিটুইটারি, থাইরয়েড ইত্যাদি এই জাতীয় গ্রন্থি। ইহাদের নিঃসৃত রসকে হরমোন বলে। প্রণালীবিহীন গ্রন্থি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে হরমোন অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

এখানে যকৃৎ (liver) এবং প্লীহা (spleen) এই দুইটি অত্যাবশ্যক গ্রন্থি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। যকৃতের ন্যায় প্লীহার অনুরূপ কোন প্রণালী না থাকিলেও এই গ্রন্থি দেহের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের নীচে একটি পর্দা দ্বারা আমাদের দেহগহ্বর দুইটি ভাগে বিভক্ত। উপরের অংশকে বক্ষ-গহ্বর (Thoracic cavity) এবং নীচের অংশকে উদর গহ্বর (Abdominal cavity) বলে। এই উদর-গহ্বরে উপরে ডান দিকে যকৃৎ এবং বামদিকে প্লীহা অবস্থিত। যকৃৎই দেহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গ্রন্থি। যকৃৎ ও প্লীহার কার্যাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) **রক্তসংক্রান্ত কার্যাবলী :** ভ্রূণাবস্থায় প্লীহা এবং যকৃতে লোহিত কণিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। লোহিত কণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিন এবং রক্তরসের ফ্লাই-ব্রিনোজেন নামক প্রোটিন যকৃতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতে পুরাতন ও বিকৃত রক্তকণিকার বিনাশ ঘটে এবং হিমোগ্লোবিন হইতে মুক্ত লোহ এই দুইটি গ্রন্থিতেই সঞ্চিত থাকে। উভয় গ্রন্থিতেই প্রচুর পরিমাণে রক্ত পরিচালিত হয়। ফলে উহারা হৃৎপিণ্ডকে অতিরিক্ত রক্তের চাপ হইতে রক্ষা করে। প্লীহাতে জীবাণু ও বিষের প্রতিষেধক বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং যকৃতে প্রোথ্রম্বিন বিরোধী দ্রব্য প্রস্তুত হয়। প্লীহা ছাঁকনির মত রক্তকে ছাঁকিয়া জীবাণু ও অনিষ্টকর বস্তুর হাত হইতে মুক্ত করে।

(২) **বিপাকঘটিত ক্রিয়া :** খাদ্যের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রোটিন থাকিলে অতিরিক্ত প্রোটিন যকৃতে আসিয়া ভাঙিয়া ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিন ইত্যাদি নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থে পরিণত হইয়া পরিশেষে মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়। খাদ্যের গ্লুকোজ যকৃতে আসিয়া গ্লাইকোজেনে পরিণত হইয়া সেখানে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকে। ইহা ছাড়া যকৃতে স্নেহজাতীয় পদার্থ হইতে কার্যশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যকৃতের চর্বিতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' সঞ্চিত থাকে। খাদ্যের কেরোটিন নামক পদার্থ হইতে দেহের মধ্যে ভাইটামিন 'এ' উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেরোটিনের এই পরিবর্তন যকৃতের মধ্যেই সাধিত হইয়া থাকে।

(৩) **দেহ-রক্ষা-সংক্রান্ত কার্য :** রক্তপাতে, কার্বন-মনঅক্সাইডের বিষক্রিয়ায় বা অন্য কোন কারণে রক্তে লোহিত কণিকার অভাব হইলে প্লীহাই তাহার সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে প্রচুর পরিমাণে লোহিত কণিকা রক্তস্রোতে পাঠাইয়া ঐ সংকটমুহূর্তে দেহকে রক্ষা করিয়া থাকে। যকৃৎও নানাভাবে দেহকে বিষক্রিয়ার হাত হইতে রক্ষা করে। অজীর্ণ প্রোটিন জাতীয় পদার্থ হইতে জীবাণু দ্বারা অন্দ্রে, ইণ্ডল, স্কেটল, ফিনল, ক্রিজল ইত্যাদি অপকারী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল দ্রব্য রক্তকে দূষিত করে। রক্তমধ্যস্থিত এই সকল অপকারী পদার্থ যকৃতে সালফিউরিক অ্যাসিড অথবা গ্লাই-কোরোনিক অ্যাসিডের সাহায্যে নির্দোষ যৌগিক পদার্থে পরিণত হইয়া দেহকে ঐ সকল অপকারী পদার্থের বিষক্রিয়া হইতে রক্ষা করে।

যকৃৎ ও প্লীহা এই দুইটি গ্রন্থির মধ্যে যকৃৎ সুস্থ জীবন যাপনের জন্য অত্যাবশ্যক। প্লীহা কিন্তু যকৃতের ন্যায় অত্যাবশ্যক নয়, কারণ প্লীহাকে কাটিয়া দেহ হইতে উৎপাটিত করিলেও দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে কোন অসুবিধা হয় না।

2. স্বাস্থ্য
(Hygiene)

a. **বায়ু—উহার গঠন, অবিশুদ্ধি ও বায়ু-সঞ্চালন (Air—its composition, impurities, ventilation)**

পৃথিবীর চারিদিকে একটি গ্যাসীয় আবরণ আছে। ইহাকেই বলে বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে ইহা পৃথিবীর সঙ্গে লাগিয়া আছে এবং পৃথিবীর সর্বত্রই বায়ু রহিয়াছে। মাছ যেমন সর্বদা জলে বিচরণ করে, আমরাও তেমনি এই বায়ু-সমুদ্রে ডুবিয়া আছি। জীবন ধারণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হইল বায়ু, কারণ, মানুষ খাদ্য এবং জল ব্যতীত যদিও বা কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বায়ু ব্যতীত কয়েক মুহূর্তও বাঁচিতে পারে না। বায়ু একটি মিশ্র জড় পদার্থ। ইহা আমরা চোখে দেখি না বটে তবে অনুভব করিতে পারি। বায়ুর কোন বর্ণ কিংবা আকৃতি নাই এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহার কোন গন্ধও নাই।

বায়ুর গঠন বা উপাদান : বায়ু একাধিক উপাদানে গঠিত। বায়ুর উপাদান-গুলির মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্পই প্রধান। আয়তন হিসাবে বায়ুর সংগঠন নিম্নরূপ :—

অক্সিজেন	শতকরা	২০·৬০ ভাগ
নাইট্রোজেন	,,	৭৭·১৬ ,,
কার্বন ডাই-অক্সাইড	,,	·০৪ ,,
জলীয় বাষ্প	,,	·৮০ ,,

এতদ্ব্যতীত বায়ুতে সামান্য পরিমাণে আর্গন, ক্রিপটন, নিয়ন, জেনান, হিলিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস মিশ্রিত থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থান অনুযায়ী বায়ুতে আবার নানাপ্রকার গ্যাস, ধূলিকণা ও জীবাণু দেখা যায়।

অক্সিজেন : আয়তন অনুযায়ী বায়ুর প্রায় ⅕ অংশ হইল অক্সিজেন।

বায়ুতে অক্সিজেনের উপস্থিতি বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া বায়ুতে রাখিলে উহা জ্বলিতে জ্বলিতে অবশেষে নিঃশেষ হইয়া যায়। বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যেই এই দহনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বায়ুতে অক্সিজেন না থাকিলে মোমবাতিটি জ্বলিতে পারিত না। এইরূপ যে কোন বস্তুর দহনই বায়ুতে অক্সিজেনের উপস্থিতি নির্দেশ করে।

অক্সিজেনের কাজ : অক্সিজেনের সাহায্যে আমাদের দহনক্রিয়া ও শ্বাসক্রিয়া চলে। আমরা প্রতিদিন যে জ্বালানী খাদ্য গ্রহণ করি, রক্তের সঙ্গে তাহা দেহকোষে নীত হয় এবং অক্সিজেন ফুসফুসে গিয়া রক্তের সঙ্গে মেশে এবং দেহকোষে গিয়া ঐ খাদ্য জ্বালায়। তারপর তাপ ও শক্তি উৎপাদন করিয়া আবার নিঃশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসরূপে বাহির হইয়া আসে।

নাইট্রোজেন : আয়তন হিসাবে বায়ুর প্রায় ⅘ অংশ নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। অক্সিজেনের ন্যায় ইহাও একপ্রকার গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থ। ইহার কোন বর্ণ, গন্ধ

বা স্বাদ নাই। বায়ুতে ইহার অবস্থিতি নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়। একটি আবদ্ধ পাত্রে কিছুটা পাইরোগ্যালেটের ক্ষারীয় দ্রবণ মিশ্রিত করিয়া ঝাঁকাইলে ঐ বায়ুর অক্সিজেন গ্যাস সম্পূর্ণরূপে ঐ দ্রবণে দ্রবীভূত হইয়া যাইবে এবং পাত্রে নাইট্রোজেন গ্যাস পড়িয়া থাকিবে। নাইট্রোজেন গ্যাস দাহ্য নয় এবং ইহা দহনেও সাহায্য করে না। সুতরাং অবশিষ্ট গ্যাসে একটি প্রজ্বলিত মোমবাতি রাখিলে উহা নিভিয়া যাইবে। তাছাড়া শুধু নাইট্রোজেন গ্যাসে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াও চলে না। এইজন্য ঐ গ্যাসে ইঁদুর, বিড়াল ইত্যাদি কোন জীবন্ত প্রাণী ছাড়িয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে উহার মৃত্যু ঘটিবে।

নাইট্রোজেনের কাজ ঃ নাইট্রোজেন একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বায়ুতে এই গ্যাসটি অক্সিজেনের দহন ক্ষমতা মন্দীভূত করে। বায়ুতে নাইট্রোজেন না থাকিলে আমাদের শরীর অতি দ্রুত ক্ষয় হইয়া যাইত। বায়ুর এই নাইট্রোজেন হইতে অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড ও সার প্রস্তুত করা হয়।

কার্বন ডাই-অক্সাইড ঃ বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সামান্যই—প্রায় '০৪ ভাগ। তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে স্বচ্ছ চুনের জল একটি বাটিতে করিয়া বায়ুতে খুলিয়া রাখিলে কিছুক্ষণ পরে ঐ চুনের জলের উপর একটি সাদা কঠিন পাতলা আবরণ পড়ে এবং স্বচ্ছ চুনের জল ঘোলা হইয়া যায়। বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড চুনের জলের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বোনেট গঠন করে। এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের জন্যই চুনের জল ঘোলা হয় এবং ঐ সাদা আবরণ গঠিত হয়। নানাভাবে বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড সঞ্চিত হয়। গাছপালা, কয়লা, পেট্রল ইত্যাদি বিভিন্ন কার্বন-ঘটিত যৌগ বায়ুতে পোড়াইলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গঠিত হয়। তাছাড়া আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি তাহা আমাদের দেহের মধ্যে খাদ্য-দ্রব্য পোড়াইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুতে ত্যাগ করি। এইরূপে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রা ছড়াইয়া গেলে উহা আমাদের জীবনধারণের পরিপন্থী হয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে জীবজন্তু বায়ুতে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে গাছপালা ইত্যাদি উদ্ভিদ্ সেই কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতেই তাহাদের খাদ্য প্রস্তুত করে। এইজন্য বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা কখনই বিপজ্জনক অবস্থায় আসিতে পারে না। এইজন্য বাড়ির আশে-পাশে গাছপালা ইত্যাদি থাকা স্বাস্থ্যসম্মত।

জলীয় বাষ্প ঃ বায়ুতে ইহার পরিমাণ থাকা উচিত ১'৪০ ভাগ। এই জলীয় বাষ্পের জন্য বায়ু শীতল থাকে। শীতল বায়ু মনোরম। কিন্তু বায়ুর আর্দ্রতা কিংবা উত্তাপ বাড়িয়া যাওয়া দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। বায়ুর আর্দ্রতা বাড়িয়া গেলে আমাদের ঘাম শুকাইতে চায় না। পরন্তু শুষ্ক বায়ু আমাদের ত্বক্ শুকাইয়া দেয়, ফলে চামড়ার খড়ি উঠিতে থাকে এবং দেহ ফাটিতে শুরু করে।

স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা বায়ুর প্রয়োজন ? আমরা অনবরত প্রশ্বাসের সঙ্গে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করি এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করি। বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে শ্বাসকষ্ট হয় এবং দম আটকাইয়া আসে। পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা যে

কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করি তাহার পরিমাণ যদি প্রতি ঘনফুট বায়ুতে ০·০০০২ ঘনফুটের অধিক হয় তবে ঐরূপ বায়ুতে শ্বাসকষ্ট হয়। সুতরাং ঘরের বায়ুতে নিঃশ্বাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যাহাতে এই সীমা লঙ্ঘন করিতে না পারে সেইজন্য ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এইজন্য প্রতি ঘণ্টায় ঘরে কতটুকু বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত করা প্রয়োজন তাহা $\frac{e}{p}=d$ এই সূত্রটির সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

e = একজন প্রতি ঘণ্টায় যতটুকু কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃশ্বাসের সঙ্গে ত্যাগ করে।

p = প্রতি ঘনফুট বায়ুতে সর্বাধিক যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড সঞ্চিত হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন কষ্ট হয় না (০·০০০২ ঘনফুট)।

d = প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ঘণ্টায় যত ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয়।

প্রতি ঘণ্টায় বায়ুতে আমরা যে কতটুকু কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করি তাহা প্রধানতঃ আমাদের বয়সের উপর নির্ভর করে। একটি শিশুর তুলনায় একজন বয়স্ক লোক অধিক কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। সুতরাং উপরি-উক্ত সংকেত অনুযায়ী $\left(\frac{e}{p}=d\right)$ শিশু অপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তির বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা বেশী। একজন বয়স্ক ব্যক্তি গড়পড়তা প্রতি ঘণ্টায় ০·৬ ঘনফুট কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। সুতরাং $\frac{e}{p}=d$ সূত্রানুযায়ী একজন বয়স্ক ব্যক্তির জন্য প্রতি ঘণ্টায় $\frac{০·৬}{০·০০০২}=৩০০০$ ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয়। একজন বয়স্ক ও সুস্থ ব্যক্তির বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বিজ্ঞানী দ্য-চৌমন্ত (De Choumont) উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

সুস্থ অপেক্ষা অসুস্থ অবস্থায় বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। কারণ অসুস্থ অবস্থায় দেহের মেটাবলিজম বৃদ্ধি পাইবার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। সুতরাং সুস্থ-অবস্থায় একজন ব্যক্তির যতটুকু বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয় অসুস্থ অবস্থায় তাহার প্রয়োজনীয়তা কমপক্ষে $\frac{১}{৪}$ অংশ বৃদ্ধি পায়। একজন সুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তির যদি প্রতি ঘণ্টায় ৩০০০ ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয় তবে ঐ লোক অসুস্থ হইলে তাহার কমপক্ষে $৩০০০+\frac{৩০০০}{৪}$ ঘনফুট বা ৩৭৫০ ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয়।

আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প বায়ুতে ত্যাগ করি তাহাতে উহার গঠন নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্তিত হয়ঃ

	বিশুদ্ধ বায়ু	নিঃশ্বাস বায়ু
অক্সিজেন	২০·৬০	১৬·৪০
কার্বন ডাই-অক্সাইড	·০৪	৪·২৪
নাইট্রোজেন	৭৭·১৬	৭৭·১৬
জলীয় বাষ্প জৈব পদার্থ উত্তাপ	অল্প	বেশী

বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়া গেলে নিঃশ্বাসের কষ্ট দেখা দিতে পারে।

নিঃশ্বাসের দ্বারা বায়ুর যে পরিবর্তন ঘটে তাহা এই :

(ক) নিঃশ্বাসের সহিত আমাদের দেহ হইতে প্রচুর জলীয় বাষ্প নির্গত হয়। এইভাবে বায়ুর আর্দ্রতা বাড়িয়া যায় বলিয়া তখন ত্বক্‌নিঃসৃত ঘাম সহজে শুকাইতে চায় না।

(খ) নিঃশ্বাস বায়ু আবার উষ্ণ বলিয়া বন্ধকক্ষে বায়ুর উষ্ণতা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

(গ) বন্ধকক্ষের বায়ু স্থির এবং উহাতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী বলিয়া বন্ধ বায়ুর সঞ্চারণশীলতা মুক্ত বায়ুর তুলনায় ঢের কম।

(ঘ) উত্তপ্ত সঞ্চালনহীন বায়ুতে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিলে গরম বোধ হয়। শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া দ্রুত শারীরিক ও মানসিক অবসাদ আনে, অতিরিক্ত ভীড়ে মানুষ কখনও মূর্ছা যাইতে পারে।

বায়ুর অবিশুদ্ধি (Impurities) : বায়ুর সাধারণ উপাদান ছাড়াও বায়ুতে নানারকম অবিশুদ্ধি ও দূষিত পদার্থ ঘুরিয়া বেড়ায়। বায়ু দুইটি উপায়ে অবিশুদ্ধ হয় : (১) জীবজন্তু দ্বারা এবং (২) কল-কারখানা ও উনানের ধোঁয়া দ্বারা।

জীবজন্তু দ্বারা : সকল জীবজন্তুই প্রশ্বাসের সঙ্গে বায়ু গ্রহণ করে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। সুতরাং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে।

(ঙ) বায়ুর সর্বাপেক্ষা মারাত্মক অবিশুদ্ধি রোগ-জীবাণু। এই রোগ-জীবাণু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এবং রোগীর দেহ ও জামা-কাপড় হইতে বায়ুতে ছড়াইতে পারে।

কলকারখানা ও উনানের ধোঁয়া দ্বারা : কলকারখানা হইতে নানাপ্রকার দূষিত গ্যাস বায়ুতে ছড়াইয়া পড়ে। সালফার ডাই-অক্সাইড, সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন, ক্লোরিন প্রভৃতি দূষিত গ্যাস এইরূপে বায়ুর সহিত মিশিয়া থাকে। তাছাড়া লোহা তৈরীর কারখানা হইতে কার্বন মনোক্সাইড নামক একটি অতি দূষিত গ্যাস বায়ুতে মিশে। আমরা বাড়ীতে প্রতিদিন যে উনান জ্বালাই তাহাতেও বায়ু দূষিত হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত গ্যাস এই ধোঁয়াতে থাকে।

তাছাড়া গাছ-পালা, লতা-পাতা প্রভৃতি পচিয়াও বায়ু দূষিত হইতে পারে।

স্বাস্থ্যের উপর বিশুদ্ধ বায়ুর প্রভাব

(১) ইহাতে অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে বজায় থাকে। অক্সিজেনের কাজ আমাদের দেহের জ্বালানী খাদ্য দহন করিয়া দেহে তাপ ও শক্তি জোগান। মুক্ত বায়ুর অক্সিজেন আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে চালিত করিয়া হজমশক্তি ও মেটাবলিজম বাড়ায়।

(২) তাছাড়া আবদ্ধ স্থানের বায়ু যেমন স্থির থাকে উন্মুক্ত স্থানের বায়ু তেমন স্থির থাকে না, সর্বদাই প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহমান বায়ুর প্রভাবে দেহের ঘাম বাষ্পে পরিণত হয় এবং দেহ শীতল থাকে। এই সকল কারণে মুক্ত বায়ুতে দেহ সতেজ ও সুস্থ এবং মন প্রফুল্ল থাকে।

সুতরাং যাঁহারা সচরাচর মুক্ত বায়ু সেবন করেন তাঁহারা অপরের তুলনায় দীর্ঘজীবন লাভের অধিকারী হন। অবশ্য রুগ্ন দেহে কিংবা শীতকালে উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান না

করিয়া মুক্তবায়ু সেবন করা উচিত নয়। তাহাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগ হইতে পারে।

বায়ু সঞ্চালন (Ventilation): কোন স্থান হইতে বদ্ধ বায়ুকে অপসারিত করিয়া সেই স্থানে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত করাকে বলে বায়ু সঞ্চালন।

বায়ু সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা: (১) বায়ুর উপাদান চারিটি—অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড নাইট্রোজেন ও জল। ইহাদের মধ্যে বায়ুর অক্সিজেনই আমাদের দেহের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

আমরা প্রশ্বাস বায়ুর সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়িয়া দিই। এই উপাদানটি আমাদের দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। স্বাভাবিক কারণে বায়ুতে পরিমিত পরিমাণ কার্বন থাকে। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার ফলে উহা বাড়িয়া গিয়া বায়ুকে দূষিত করে। বদ্ধ কক্ষের বায়ুতে বায়ু চলাচলের সুযোগ নাই বলিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড অত্যন্ত বেশী উৎপন্ন হয়। তাই এরূপ কক্ষে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিলে শরীরে ক্লান্তি বোধ হয় এবং মাথা ধরা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। যাহারা বহুদিন বদ্ধ কক্ষে বাস করেন অক্সিজেনের অভাবে তাহাদের কর্মক্ষমতা কমিয়া যায়। ক্ষুধামান্দ্য, রক্তাল্পতা, চর্মরোগ ইত্যাদি দেখা দেয়। বাসগৃহে যাহাতে অক্সিজেনের অভাব না ঘটে এইজন্য বায়ু-সঞ্চালন প্রয়োজন।

(২) বায়ুর অন্যতম উপাদান হইল জল। বায়ুতে জলের পরিমাণ থাকা উচিত ১·৪০ ভাগ। এই পরিমাণ জল বায়ুকে শীতল রাখে। বায়ুতে জলের মাত্রা বাড়িয়া গিয়া বায়ুর আর্দ্রতা (humidity) বাড়িতে পারে, আবার জলের মাত্রা কমিয়া গিয়া বায়ু উত্তপ্ত ও শুষ্ক হইয়া উঠিতে পারে। তোমরা জান আমাদের দেহ হইতে সর্বদা ঘাম নিঃসৃত হইতেছে। আর্দ্র বায়ুর জল ধারণের ক্ষমতা নাই বলিয়া বায়ু আর ঘাম শুকাইতে পারে না। বর্ষার গুমোট দিনগুলিতে এইজন্য আমাদের এত কষ্ট হয়। বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া যেরূপ খারাপ সেইরূপ অতিরিক্ত শুষ্ক ও উত্তপ্ত বায়ু ভাল নয়। শুষ্ক বায়ু আমাদের ত্বক্ শুকাইয়া ফেলিতে চায়। শীতকালে এমন কি গ্রীষ্মকালেও কখনও কখনও বায়ু অতিরিক্ত শুষ্ক হইয়া পড়িলে চামড়ায় খড়ি উঠিতে থাকে এবং দেহ ফাটিতে শুরু করে।

নৈসর্গিক কারণে বায়ুর আর্দ্রতা ও উত্তাপ বাড়ে। তাছাড়া প্রশ্বাস বায়ুর সঙ্গে আমরা বায়ুর জলীয় উপাদান কিছুটা টানিয়া লইয়া বায়ুকে উত্তপ্ত ও শুষ্ক করিয়া তুলি। বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিয়া আমরা বায়ুর আর্দ্রতা ও উত্তাপ আংশিকভাবে দূর করিতে পারি।

(৩) বায়ু আরেকভাবে আমাদের ক্ষতি করিতে পারে। বায়ুতে জৈব ধূলিকণা, রোগজীবাণু প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া বায়ু দূষিত হইতে পারে। তারপর ঐ দূষিত বায়ু গ্রহণ করিয়া আমরাও রোগাক্রান্ত হইতে পারি। এই ক্ষেত্রেও বায়ুকে যদি সঞ্চালিত করা যায় তবে জীবাণুবাহিত দূষিত বায়ু দূর হইয়া গিয়া বিশুদ্ধ বায়ু উহার স্থান দখল করিতে পারে।

উপরোক্ত তিনটি কারণে বায়ু-সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়—

(১) বায়ুতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের মাত্রা বজায় রাখিবার জন্য;

(২) বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা দূর করিবার জন্য;

(৩) বায়ুকে জীবাণুমুক্ত রাখিবার জন্য। এক কথায় বায়ুকে বিশুদ্ধ করাই বায়ু-সঞ্চালনের উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালনের মূলনীতি :

স্বাভাবিকভাবে যে বায়ু-সঞ্চালন হয় তাহাকে বলে প্রাকৃতিক বায়ু-সঞ্চালন। কয়েকটি প্রাকৃতিক উপায়ের দ্বারা উহা নিয়ন্ত্রিত হয় :

(১) **বাষ্পীয় সংমিশ্রণ :** বায়ু কতকগুলি বাষ্প বা গ্যাসের সংমিশ্রণ মাত্র। বাষ্পীয় পদার্থের ধর্ম এই যে অপরটির সংস্রবে আসিবামাত্র পরস্পরের সঙ্গে মিশিতে চায় এবং যতক্ষণ না বাষ্পগুলি সমভাবে মিশ্রিত হয় ততক্ষণ এই সংমিশ্রণ ক্রিয়া চলিতে থাকে। ঘরের কোণে একটি ধূপকাঠি জ্বালাইয়া দেখিও যে অপর কোণ হইতেও সেই গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। বায়ুর সংমিশ্রণ ধর্ম আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব এবং এই ধর্মবশে ঘরের দূষিত বায়ু বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুর সঙ্গে মিশিতে চায়।

(২) **বায়ুমণ্ডলে উত্তাপের তারতম্য :** বায়ুমণ্ডলের সকল স্থান সমান উত্তপ্ত থাকে না। বায়ু উত্তপ্ত হইলে হাল্কা ও বিস্তৃত হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং চারিদিককার ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া তাহার স্থান দখল করে।

প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন ও বায়ু-বিশোধন : বায়ুমণ্ডলী অনবরত দূষিত হইয়া বিবিধ প্রাকৃতিক উপায়ে বিশোধিত হইতে থাকে।

(১) **সূর্যালোক :** সূর্যরশ্মির জীবাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে এবং সূর্যের প্রখর তাপে বায়ুর আর্দ্রতা ও দুর্গন্ধ দূর হয়। তাছাড়া সূর্যের উত্তাপে বায়ু উত্তপ্ত হইলে হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া সেই স্থান পূর্ণ করে।

(২) **গাছপালা :** গাছপালাও বায়ু-বিশোধনে সাহায্য করে। গাছপালা বায়ু হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড টানিয়া লইয়া অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়।

(৩) **বৃষ্টি :** বৃষ্টিপাতের ফলে বায়ুস্থিত জীবাণু এবং অন্যান্য ভাসমান পদার্থ ধুইয়া যায় এবং বায়ু বিশুদ্ধ হয়।

৪) **ঝড় :** বেগবান বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বায়ু সঞ্চালিত হইলে দূষিত বায়ু তাড়িত হয় এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেই স্থান পূর্ণ করে। ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত হইলে বায়ুতে 'ওজোনের' (ozone) পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই ওজোন দেহের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

গৃহে প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা :

(১) প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্বদা বাসগৃহের প্রত্যেক কক্ষে প্রশস্ত এবং বৃজু বৃজু জানালা রাখিবে যাহাতে বাহিরের বায়ু একদিক হইতে প্রবেশ করিয়া অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

(২) শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা গৃহের বায়ু সর্বদা উত্তপ্ত হয়। বায়ু উত্তপ্ত হইলে হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। গৃহে বায়ু চলাচলের পথ সুগম করিবার জন্য কক্ষের উপরিভাগে সর্বদা ঘুলঘুলি (ventilator) রাখিবে। শীতের রাত্রে দরজা-জানালা বন্ধ থাকিলেও এই ঘুলঘুলি দিয়া অনায়াসে গৃহের উত্তপ্ত বায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারে।
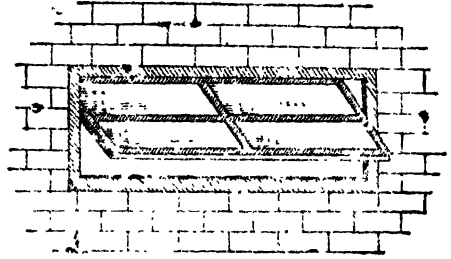
ভেণ্টিলেটর

(৩) বায়ু বিশোধনের জন্য গৃহের চারিপাশে কিছু গাছপালা লাগাইবে।

কৃত্রিম উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন (Artificial ventilation) : যেখানে প্রাকৃতিক বায়ু-সঞ্চালন সম্ভব হয় না সেখানে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয়। জনবহুল স্থানে, কলকারখানা ও খনি অঞ্চলে সর্বদাই কৃত্রিম উপায়ে বায়ু-সঞ্চালনের জন্য তিনটি উপায় গ্রহণ করা যায় :—

(১) **প্লেনাম পদ্ধতি** (Plenum system) : এই পদ্ধতিতে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে প্রেরণ করা যায়।

(২) **ভ্যাকুয়াম পদ্ধতি** (Vacuum system) : বায়ু আকর্ষণকারী পাখা দ্বারা কক্ষের বায়ুকে আকৃষ্ট করিয়া বাহিরে পাঠান হয়।

(৩) **সমন্বয় পদ্ধতি** (Balance system) : উপরোক্ত দুইটি পদ্ধতি একসঙ্গে কাজ করে। বৈদ্যুতিক পাখার দ্বারা এই কাজটি অনুষ্ঠিত হয়।

জল : ইহার উৎপত্তি, অবিশুদ্ধি এবং জল বিশোধন

(Water—its sources, pollution and purification)

জল : জল আমাদের জীবনস্বরূপ। খাদ্য না খাইয়াও আমরা কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারি কিন্তু জলপান ব্যতীত দুই একদিনের বেশী বাঁচা যায় না। ইহার কারণ দেহের রাসায়নিক সংগঠন এইরূপ যে প্রতি মুহূর্তে দেহ জল চায়। আর এই জল সরবরাহ করিতে না পারিলে মানুষ বাঁচে না। জীবনধারণের জন্য নিম্নলিখিত কারণে আমাদের জলপান করিতে হয় :

(১) প্রথমতঃ, আমাদের দেহের এক-তৃতীয়াংশ জল দ্বারা গঠিত। অস্থিমজ্জা ও রক্তের উপাদানে জল রহিয়াছে এবং দেহের প্রতিটি জীবকোষ জলদ্বারা গঠিত। ঘাম, মলমূত্র ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়া আমাদের দেহ হইতে জল নির্গত হইতেছে বলিয়া প্রতি মুহূর্তে আমাদের দেহের কয়েক লক্ষ জীবকোষ (cell) মরিয়া যাইতেছে। উহাদের স্থানে আবার কয়েক লক্ষ জীবকোষ সৃষ্টি হইতেছে। জল পান না করিলে এই নতুন জীবকোষ সৃষ্টি হইতে পারিত না। এই জন্যই বলিয়াছি যে দেহ প্রতি মুহূর্তে জল চায়।

(২) যতক্ষণ খাদ্য কঠিন আকারে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা দেহ পুষ্টির কাজে লাগে না। জল খাদ্যকে তরল করিয়া প্রতি জীবকোষে পৌঁছাইয়া দেয়।

(৩) জলের জন্য দেহ যেমন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে তেমনি জলের সাহায্যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থ দেহ হইতে নিষ্কাশিত হয়। বাড়ির নর্দমায় যেমন জল ঢালিয়া দিলে সমস্ত ময়লা ঐ নর্দমা দিয়া চলিয়া যায় তেমনি নিয়মিত জলপানের দ্বারা দেহের সমস্ত ময়লা মলমূত্রের আকারে বাহির হইয়া যায়।

(৪) জলের অপর গুণ এই যে উহা আমাদের দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেহকে শীতল রাখে। আমাদের দেহ একটি সচ্ছিদ্র (Porous) মাটির পাত্রের মত। তোমরা হয়ত দেখিয়াছ সচ্ছিদ্র পাত্রে জল রাখিলে জল চুয়াইয়া চুয়াইয়া বাহির হইয়া মাটির পাত্রটিকে ভিজা রাখে। ফলে ভিতরকার জল ঠাণ্ডা থাকে। দেহ হইতে অনুরূপভাবে ঘামের আকারে জল নির্গত হইয়া দেহ ঠাণ্ডা রাখে।

জল নির্গমন : দেহ হইতে চারিটি পথে জল নির্গত হয় :

(১) ঘামের আকারে ত্বক্ (skin) হইতে ;

(২) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতর দিয়া ফুসফুস হইতে ;

(৩) মূত্রের আকারে বৃক্ক (kidney) হইতে ;

(৪) মলের (excreta) আকারে।

এইভাবে প্রতিদিন জলের যে অপচয় হইতেছে জলপান করিয়া আমরা সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকি। প্রকৃতি আপনা হইতে তৃষ্ণার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া এই জলপানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

জলের প্রাপ্তিস্থান

(Source of Water)

জলের উৎসকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করিতে পারি ঃ

১। বৃষ্টির জল।

২। ভূপৃষ্ঠস্থ জল ঃ সমুদ্র, হ্রদ, নদী, দীঘি, পুষ্করিণী, ডোবা ইত্যাদির জল।

৩। ভূগর্ভস্থ জল ঃ প্রস্রবণ, কূপ ও নলকূপ।

(১) বৃষ্টির জল ঃ ভূপৃষ্ঠস্থ জলরাশি বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘের সৃষ্টি করে। ঐ মেঘ ঘনীভূত হইলে বৃষ্টি হয়। প্রথম অবস্থায় বায়ুমণ্ডলীর ভাসমান ধূলিকণা, বাষ্প ইত্যাদি জলের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। কিন্তু এক পশলা বৃষ্টির পর যে জল সংগ্রহ করা হয় তাহা মৃদু ও বিশুদ্ধ। উহাতে কোন প্রকার রোগজীবাণু থাকে না। এই জল অতি সুস্বাদু পানীয়।

(২) ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল ঃ (ক) সমুদ্র ঃ পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত এবং সমুদ্রই আমাদের জলের প্রধান উৎস, কিন্তু সমুদ্রের জলে ধাতব লবণ খুব বেশী পরিমাণে থাকে বলিয়া পানের অযোগ্য। সমুদ্র-তীরবর্তী দেশগুলিতে পানের জন্য
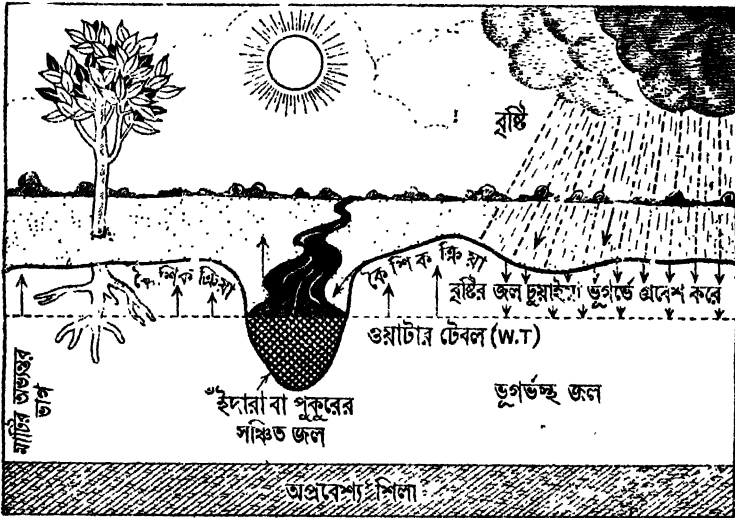
ওয়াটার টেবল

পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হয় এবং সমুদ্রগামী জাহাজগুলিতে সর্বদা পানীয় জল রাখিতে হয়।

(খ) নদী ঃ পর্বতের তুষার গলিয়া নদীর সৃষ্টি হয়। নদীর জলে দেহোপযোগী নানাবিধ খনিজ লবণ থাকে। উৎসের নিকটে নদীর জল বিশুদ্ধ এবং পানের যোগ্য

থাকে। কিন্তু সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় উহাতে নানাবিধ আবর্জনা মিশিতে থাকে এবং ক্রমশঃ পানের অযোগ্য হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে নদীর জলই পরিস্রুত হইয়া বড় বড় শহরগুলিতে সরবরাহ হয়।

(গ) **পুষ্করিণী ঃ** ভূগর্ভের অভ্যন্তরে জল সঞ্চিত থাকে এবং পুষ্করিণী কাটিয়া সেই জল পাই। প্রখর গ্রীষ্মে জল বাষ্পীভূত হইবার ফলে পুষ্করিণী যখন শুকাইয়া যায় তখন বর্ষার জল পাইয়াই উহারা আবার ভরিয়া ওঠে।

পুষ্করিণীর জলে মাটির তলার নানাবিধ খনিজ লবণ মিশ্রিত থাকে, তবে এই খনিজ লবণ আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল নয়। কিন্তু মানুষ ও পশুপক্ষী নানাভাবে পুকুরের জল দূষিত করিয়া পানের অযোগ্য করিয়া তোলে।

(ঙ) **ভূগর্ভস্থ জল** (Ground water) ঃ জলের অপর উৎস হইতেছে ভূগর্ভস্থ জল। যে ভূমির উপরে আমরা দাঁড়াইয়া আছি তাহার বেশ কিছুটা নীচে বৃষ্টির জল অপ্রবেশ্য স্তরে জমা হইয়া আছে। ভূগর্ভে এইভাবে জল সঞ্চিত আছে বলিয়াই পুষ্করিণী কিংবা কূপ খনন করিয়া আমরা জল পাই। মাটির তলার সঞ্চিত জলের উপরের সমতলকে (level) water table আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

বৃষ্টির জলের যে অংশ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে তাহারই কিছুটা আবার বালি, মাটি ও কাঁকরের স্তর ভেদ করিয়া অনবরত ভূমির উপরে চুয়াইয়া চুয়াইয়া উঠিয়া আসিতেছে এবং বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুস্তরে মিশিতেছে। জলের এইরূপ চুয়াইবার ক্ষমতাকে বলে কৈশিক ক্রিয়া (capillary action)। গ্রীষ্মকালে জল অধিক পরিমাণে বাষ্পীভূত হয় বলিয়া water table অনেক নীচে নামিয়া যায়। বর্ষাকালে আবার water table অনেক উপরে উঠিয়া আসে। একটি কূপের দিকে চাহিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে।

কূপ (well) ঃ দুই শ্রেণীর—অগভীর ও গভীর। অগভীর কূপ water table পর্যন্ত পৌঁছায়। পরন্তু গভীর কূপ water table ছাড়াইয়া আরও অনেক নীচে চলিয়া যায়। গভীর কূপের জল সাধারণতঃ সুস্বাদু ও পানের উপযুক্ত কিন্তু অগভীর কূপের জলে ময়লা ও রোগজীবাণু মিশ্রিত থাকে। প্রস্রবণের জলে দ্রবীভূত ধাতব লবণ ও গ্যাস অনেক সময় বিভিন্ন রোগ নিবারণ করিতে সাহায্য করে।

নলকূপ (tube well) ঃ নলকূপও কূপের মতই গভীর ও অগভীর হইতে পারে। গভীর নলকূপের জল যেমন পানের পক্ষে নিরাপদ অগভীর নলকূপের জল তেমন নিরাপদ নয়।

প্রস্রবণ (spring) ঃ জলে সর্বদাই অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের গ্যাস সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। ভূগর্ভস্থ জলে প্রাকৃতিক কারণে কোন কোন সময় এই দ্রবীভূত গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পাইবার ফলে ঐ জল কখনও কখনও ঝরনার আকারে মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হয়।
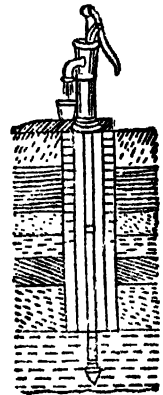
নলকূপ

জলের দোষ

২-আয়তন হাইড্রোজেন এবং ১-আয়তন অক্সিজেনের মিশ্রণে জল উৎপন্ন হয়। বিশুদ্ধ জল স্বাদহীন, বর্ণহীন ও গন্ধহীন। জলের সঙ্গে অন্যান্য বিজাতীয় পদার্থ মিশিয়া জলে আবিলতা (impurity) সৃষ্টি করে এবং কখনও বা উহাকে সম্পূর্ণ দূষিত (polluted) এবং পানের অযোগ্য করিয়া ফেলে।

জলের আবিলতা (Impurities in water) : জলে দুই শ্রেণীর আবিলতা দেখা যায়—(১) ভাসমান বা দৃশ্যমান এবং (২) দ্রবীভূত অর্থাৎ যাহা খালি চোখে দেখা যায় না।

(১) **ভাসমান বা দৃশ্যমান পদার্থ :** বালি, কাদা, খড়কুটা, শৈবাল ইত্যাদি কতকগুলি পদার্থ চোখে দেখা যায় এবং উহারা জলের সঙ্গে মিশিয়া জলকে আবিল করিয়া তোলে। মারাত্মক না হইলেও উহারা বিপজ্জনক, কারণ জলের সঙ্গে এইসব পদার্থ পেটে গেলে আমাদের অসুখ করিতে পারে।

(২) **দ্রবীভূত বা অদৃশ্য পদার্থ :** কতকগুলি পদার্থ আবার এমনভাবে জলের সঙ্গে মিশিয়া থাকে যে উহাদের আমরা চোখে দেখিতে পাই না। ইহারা দুই শ্রেণীর :

(ক) **গ্যাস :** অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি গ্যাস জলে দ্রবীভূত হইয়া থাকে। বায়ু হইতে জল এইসব গ্যাস নিজের মধ্যে টানিয়া লয়।*

(খ) **ধাতব লবণ :** ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহের ক্লোরাইড, সালফেট ও বাইকারবোনেট জলে অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। তাছাড়া সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি অন্যান্য ধাতব লবণও সামান্য পরিমাণে দেখা যায়। এই সকল লবণের প্রকৃতি ভেদে জলকে খরজল ও মৃদুজল দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়।

দূষিত জল (Polluted water) : টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় ইত্যাদি রোগের জীবাণু (bacteria) জলের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। উহারা আমাদের পেটে গিয়া আমাদের দেহে ঐ সমস্ত ব্যাধির বিস্তার করে। দূষিত জল বলিতে এইরূপ জীবাণু-মিশ্রিত জলকেই বোঝায়। দূষিত জল সাক্ষাৎভাবে মারাত্মক।

জল দূষিত হয় তিনভাবে—(১) প্রধানতঃ **মানুষের দ্বারা।** মানুষ জলের ধারে বসিয়া বাসন মাজে, মুখ ধোয়, স্নান করে, শৌচাদি ক্রিয়া করে, গরু-মহিষ স্নান

* সাধারণতঃ বায়ুতে সালফার ডাই-অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া গ্যাস থাকে না। কিন্তু কলকারখানার নিকটবর্তী জলাশয়ের জলে ঐ সকল গ্যাস দ্রবীভূত থাকিতে পারে। পশুপাখীর মৃতদেহ ও গাছপালা পচিয়াও জলে বিষাক্ত মার্শ গ্যাস সৃষ্টি হইতে পারে।

করায়, রাস্তা ধোয়া জল কখনও বা বাড়ির পায়খানার জল জলাশয়ে আসিতে দেয়, মৃত জীবজন্তুর শব ফেলে, কখনও বা রোগীর কাঁথা-কাপড় কাচে, এইভাবে এক-মানুষের দেহাশ্রয়ী জীবাণুরা জলের মাধ্যমে অন্যের দেহে সংক্রামিত হয় ও রোগ ছড়ায়।

(২) পশুপক্ষীর দ্বারা : পশুপক্ষীর দ্বারাও জল দূষিত হয়। উহারা যখন জলের মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করে, মুখে করিয়া নানা আবর্জনা, ভুক্তদ্রব্য, গলিত শবদেহ ইত্যাদি ফেলে তখন জল দূষিত হয়।

(৩) গাছপালা দ্বারা : গাছপালা পচিয়া জলে দূষিত গ্যাসের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া জলাশয়ের নিকটে গাছপালা থাকিলে উহাদের পাতা জলে পড়ে এবং উহা পচিয়া জল দূষিত করে।

জল বিশোধন
(Purification of water)

দূষিত জল পানের অযোগ্য। তবে আমরা যে শুধু পানের জন্য বিশুদ্ধ জল চাই তাহা নহে, পরন্তু ঔষধাদি প্রস্তুতির জন্য এবং রসায়নাগারে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাইবার জন্যও বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া কোন কোন জলে সাবান গুলিলে ভাল ফেনা হয় না। ফলে ঐ জলে কাপড়-চোপড় ভাল পরিষ্কার হয় না। বস্ত্রাদি পরিষ্করণের জন্যও তাই জল বিশোধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা সচরাচর নিম্নলিখিত কারণে বিশুদ্ধ জল চাই ঃ

(১) রন্ধন ও পানের জন্য ·

(২) ঔষধাদি প্রস্তুতির ও রসায়নাগারে ব্যবহারের জন্য ;

(৩) বস্ত্রাদি পরিষ্করণের জন্য ;

(৪) বয়লারে (Boiler) ব্যবহারের জন্য।

(১) রন্ধন ও পানের জন্য জল বিশোধন ঃ জলের মধ্যে কতকগুলি ধাতব লবণ দ্রবীভূত থাকে। ধাতব লবণগুলির মধ্যে লৌহ, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম দেহ গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। পানীয় জলের সঙ্গে এগুলি আমাদের পেটে গেলে উপকারই হয়। সুতরাং পানীয় জল বিশোধনের সময় এগুলি অপসারিত করার প্রয়োজন নাই। তবে ঐ সকল ধাতব লবণ অতিরিক্ত মাত্রায় দ্রবীভূত থাকিলে উহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় জল ফুটাইয়া লইলে অতিরিক্ত ধাতব লবণ নীচে পড়িয়া যায়। তারপর ঐ ফুটানো জল ছাঁকিয়া খাওয়া যাইতে পারে।

ধাতব লবণ ব্যতীত জল বায়ু হইতে কতকগুলি গ্যাসও টানিয়া লয়। এই সকল গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড একটি উল্লেখযোগ্য গ্যাস। ইহা খাদ্যদ্রব্য হজমে বিশেষ সাহায্য করে। বদহজম হইলে আমরা বাজার হইতে যে সোডা ওয়াটার কিনিয়া খাই তাহা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। তবে জলে যে সকল গ্যাস দ্রবীভূত থাকে তাহা সমস্তই যে দেহের পক্ষে উপকারী তাহা নয়। কোন কোন শিল্পাঞ্চলের জলে H_2 ইত্যাদি বিষাক্ত গ্যাস দ্রবীভূত থাকিতে পারে। তাছাড়া নদী, পুকুর এবং কূপের জলে গাছপালা ও জীবজন্তুর মৃতদেহ পচিয়া বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হইতে পারে। ঐ সকল বিষাক্ত গ্যাস জলে দ্রবীভূত থাকিলে উহা অবশ্যই পানীয় জল হইতে অপসারণ করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত জলে আবার বালি, কাদা, খড়কুটা প্রভৃতি কতকগুলি ভাসমান পদার্থ থাকে। ঐগুলি উদরস্থ হইলে আমাদের অসুখ করিতে পারে। তবে প্রকৃত দূষিত জল বলিতে বুঝায় বিভিন্ন রোগজীবাণুমিশ্রিত জল। এইসব জীবাণুগুলি আমাদের পেটে গেলে কলেরা, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি নানারকম পেটের পীড়া জন্মায়।

সকল ভাসমান পদার্থ, বিষাক্ত গ্যাস ও রোগজীবাণু সম্পূর্ণরূপে জল হইতে অপসারিত করাই পানীয় জল প্রস্তুতির মূল উদ্দেশ্য। নিম্নে পানীয় জল প্রস্তুতির কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হইতেছে:

প্রাচীন পদ্ধতি:

থিতান (Sedimentation): থিতাইতে পারিলে জলের অধিকাংশ ভাসমান ময়লা নীচে পড়িয়া যায়। রৌদ্রে থিতান জলে রোগজীবাণুও কম থাকে। জলে সামান্য ফটকিরি মিশাইয়া দিলে জলের ময়লা খুব তাড়াতাড়ি থিতাইয়া যায়। থিতান জল দেখিতে স্বচ্ছ কিন্তু উহাতে রোগজীবাণুগুলি থাকিয়া যায় বলিয়া উহা পানের অযোগ্য।

ছাঁকন (Filtration): ঘড়া বা কলস ফিলটার: আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে চারিটি ঘড়া কিংবা কলসের সাহায্যে জল ছাঁকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

একটি কাঠের মঞ্চ তৈয়ারী করিয়া তাহাতে উপর্যুপরি চারিটি ঘড়া কিংবা কলসী সাজান হয়। উহাদের প্রথম তিনটির তলায় ছিদ্র থাকে এবং তাহাতে পাট কিংবা খড়ের পলিতা লাগান থাকে। দ্বিতীয় ঘড়াটিতে কয়লা থাকে এবং তৃতীয়টির উপরে বালুকণা এবং নীচে নুড়ি সাজান থাকে। প্রথম ঘড়াটিতে জল ঢালিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘড়ার মধ্য দিয়া জল চুয়াইয়া চুয়াইয়া সবচেয়ে নীচের ঘড়াটিতে জমা হয়। এই ভাবে ছাঁকা জল দেখিতে খুব স্বচ্ছ কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।
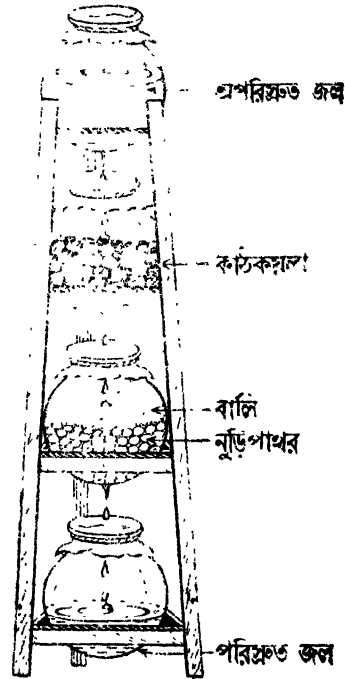
ফুটান (Boiling): আমাদের দেশে ফুটাইয়া জল বিশোধনের রীতি প্রচলিত আছে। অন্ততঃ বিশ মিনিট ধরিয়া জল ফুটাইলে জলে প্রায় সমস্ত জীবাণু মরিয়া যায়। তাছাড়া অতিরিক্ত ধাতব লবণ থিতাইয়া পড়ে এবং দ্রবীভূত গ্যাস বাষ্পাকারে

বাহির হইয়া যায়। এইজন্য গৃহে পানীয় জল প্রস্তুতির ইহা একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি।

আধুনিক পদ্ধতি : প্রথমে পাম্পের সাহায্যে নদী হইতে জল তুলিয়া আনিয়া বৃহৎ জলাধারে থিতাইতে দেওয়া হয়। এই জলাধারে ফটকিরি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এখানে জল থিতাইবার ফলে জলের সমস্ত ভাসমান ময়লা নীচে পড়িয়া যায়। তারপর ঐ জল ফিলটার বেডে পাঠান হয়। ফিলটার-বেডগুলি চারিপাশ কংক্রিটে বাঁধান এবং মেঝেটি থাকে ইটের তৈয়ারী। প্রত্যেকটি ফিলটার বেডে উপর্যুপরি বালি, ছোট
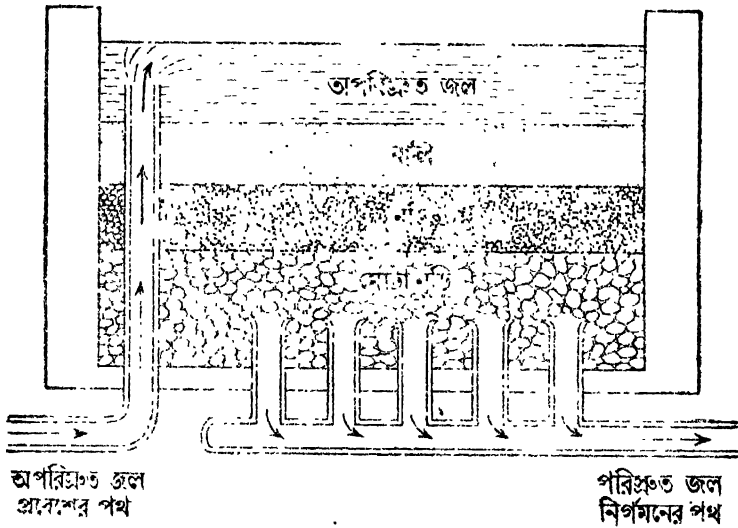
ফিল্টার বেড

নুড়ি এবং মোটা নুড়ির তিনটি স্তর থাকে। সবচেয়ে উপরে অর্থাৎ বালুর স্তরের উপরে জল রাখা হয়। এই সময় বালুর স্তরের উপরে একটি পাতলা পর্দা পড়ে। এই পর্দাটি ফিলটার বেডের প্রাণস্বরূপ ; কারণ উহাই জলের অবশিষ্ট ভাসমান ময়লা এবং জীবাণুসমূহ আটকাইয়া জল পরিস্রুতিতে সাহায্য করে। এইজন্য উহাকে vital layer বলে। জলের জীবাণুগুলি ঐখানে খাদ্যের অভাবে মারা যায়। পর্দাটি সাত আট-সপ্তাহ কার্যক্ষম থাকে।

ফিল্টার বেডে জল পরিস্রুত হইবার পর জলে ক্লোরিন মিশাইতে হয়। এই সময় জলের স্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ থাকে না। ঐ স্বাদ ও গন্ধ সৃষ্টি করার জন্য পরিস্রুত জলকে যান্ত্রিক উপায়ে বায়ুচালিত করা হয় অর্থাৎ কুয়াশার আকারে উহাকে বায়ুমধ্যে
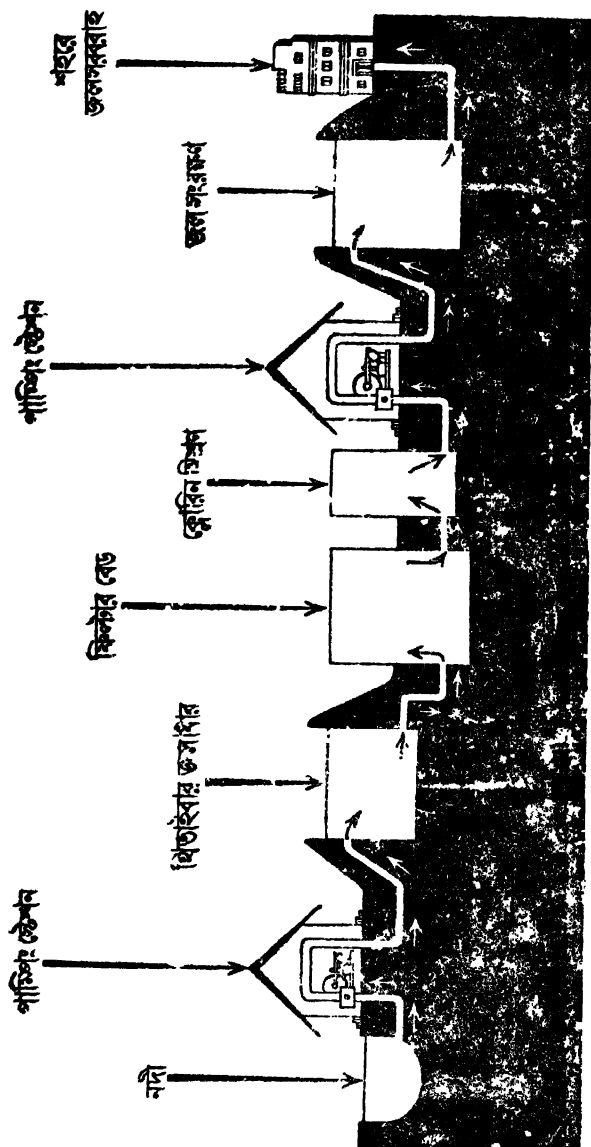
জল পরিস্রুত হইয়া সরবরাহের জন্য সংরক্ষিত হইতেছে

ছিটানো হয়। বায়ুচালিত হইবার ফলে জলের মধ্যে বায়ুস্থিত অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং জলে একটি সুন্দর স্বাভাবিক স্বাদ আসে। পরিস্রুত জলকে তারপর ট্যাঙ্কে ধরিয়া লইয়া সমস্ত শহরে সরবরাহ করা হয়। কলিকাতা শহরে এই উপায়ে জল বিশোধিত করা হইয়া থাকে।

বার্কফেল্ড ফিল্টার (Berkefeld Filter) ঃ পানীয় জল বিশোধনের জন্য বর্তমানে গৃহে বার্কফেল্ড ফিল্টার ব্যবহৃত হয়। এই ফিল্টারের মধ্য দিয়া রোগজীবাণু ও ভাসমান পদার্থসমূহ অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু জল অনায়াসে উহার মধ্য দিয়া চুয়াইয়া অন্যত্র পরিচালিত হইতে পারে। একটি পিপার ন্যায় চীনামাটির পাত্রের মধ্যে এই ফিল্টারটি বসান থাকে। নদী, পুকুর ইত্যাদি হইতে জল সরাসরি ঐ চীনামাটির পাত্রের মধ্যে জমা করা হয়। ফিল্টারের মধ্য দিয়া জলকণাগুলি চুয়াইয়া নিম্নের একটি প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত হয়। ধূলাবালি, রোগজীবাণু ইত্যাদি উপরের প্রকোষ্ঠেই পড়িয়া থাকে।
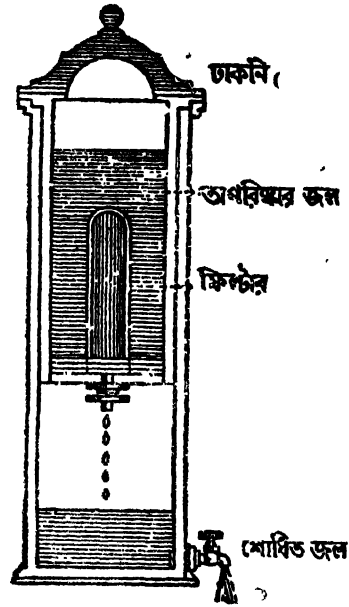
বার্কফেল্ড ফিল্টার

(২) ঔষধাদি প্রস্তুত ও রসায়নাগারে ব্যবহারের জন্য জল বিশোধন ঃ

শুধু যে পানের জন্যই জল চাই তাহা নয়, ঔষধাদি প্রস্তুত করা এবং রসায়নাগারে ব্যবহারের জন্যও বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই উদ্দেশ্যে সকল প্রকার ধাতব লবণ ও গ্যাসশূন্য বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন। একমাত্র পাতন প্রক্রিয়ায় এইরূপ বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত করা হয়। নিম্নে সাধারণ পাতন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হইল ঃ

পাতন প্রক্রিয়া (Distillation) ঃ একটি ফ্লাস্কে কিছুটা অবিশুদ্ধ জল লইয়া কর্কের সাহায্যে উহাকে বায়ুনিরুদ্ধ করিতে হইবে। কর্কের সঙ্গে একটি নির্গমনল যুক্ত থাকে ঐ নির্গমনলটি আবার লাইবিগ কনডেনসারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। লাইবিগ কনডেনসারটি-একটি কাচের জ্যাকেট পরানো নলবিশেষ। প্রথমে জ্যাকেটের মধ্য দিয়া শীতল জল প্রবাহিত করাইতে হয়। জলীয় বাষ্প সরু কাচের নলের মধ্য দিয়া যাইবার

সময় ঐ শীতল জলের সংস্পর্শে আসিয়া পুনরায় জলে পরিণত হয় এবং গ্রাহক পাত্রে সংগৃহীত। হয় ধাতব লবণসমূহ অনুদ্বায়ী। সুতরাং উহারা ফ্লাস্কের তলায় পড়িয়া
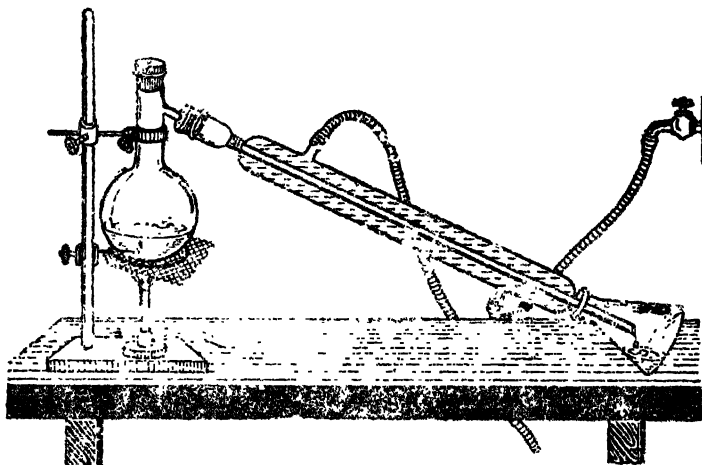
পাতন প্রক্রিয়া

থাকে। ফ্লাস্ক, কনডেনসার এবং গ্রাহকপাত্রকে একসঙ্গে পাতনযন্ত্র বলা হয়।

(৪) বস্ত্রাদি ধৌত এবং বয়লারের জন্য সর্বদা মৃদু জল দরকার। জলে কতকগুলি ধাতব লবণের উপস্থিতি হেতু জল খরতাপ্রাপ্ত হয়। জলের খরতা দুই শ্রেণীর—স্থায়ী ও অস্থায়ী। জল ফুটাইয়া সহজেই জলের অস্থায়ী খরতা দূর করা যায়।

শিশুর যত্ন
(Care of the child)

1. গৃহে শিশুর স্থান (Place of child in the home) ঃ

পরিবারে একটি শিশুর আগমন আনন্দ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ছোট বড় গৃহের সকলে তাহার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে থাকে। তবে বাপ মায়ের জীবনে একটি শিশুর আগমন সাধারণ আনন্দ ও উত্তেজনার চেয়ে বেশী অর্থবহ। কারণ সন্তান দাম্পত্যসম্পর্ক পাকা করিয়া তোলে এবং নরনারীর জীবনের স্বপ্নকে গভীরতা দেয়। দৈহিক আকর্ষণের স্তর অতিক্রম করিয়া তাহারা আত্মিক সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে। দাম্পত্যজীবনে সন্তানের অভাব কোন কিছু দিয়া পূর্ণ করা যায় না।

পরিবার ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎই হউক শিশুর আগমনে পারিবারিক জীবনযাত্রায় একটা বিপুল পরিবর্তন আসে। অল্প সময়ের মধ্যে শিশুর প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির ব্যবস্থা করা কঠিন নয় কিন্তু তাহাকে স্বীকৃতি দিতে গেলে সকলের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং ইহার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন সেই প্রস্তুতি ঘটিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটে। গৃহের প্রত্যেককে উপলব্ধি করিতে হইবে সকলের উপর একটি নতুন দায়িত্ব আসিয়াছে এবং ছোট বড় সকলকে নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথ পালন করিতে হইবে।

পরিবার একটি যৌথজীবন এবং গৃহের সকলে এই যৌথজীবনের অংশীদার। সকলের সহযোগিতার উপর যদি এই যৌথজীবন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তাহা শিশুর পক্ষে এবং সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়। শিশু পালনের কাজে সাহায্য করিয়া বাবা জীবন সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন এবং শিশুদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসার সুযোগ পান। অবশ্য পারিবারিক সহযোগিতার দ্বারা সকলের চেয়ে বেশী লাভবান হয় শিশুরা।

শিশু যদি প্রথম হইতেই পরিবারের একজন বাঞ্ছিত ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি পায় তবে তাহার ভালবাসার দাবী মিটিতে পারে। শিশুকে অবশ্য একজন সাধারণ সভ্য হিসাবে স্বীকার করিতে হইবে, তাহার চেয়ে বেশী কিছু নয় অর্থাৎ সে যে পরিবারের সকলের অতি আদরের বস্তু, বাপমার জীবন যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতেছে একথা যেন সে টের না পায়।

শিশুর আগমনের পর বাড়ির সকলকে এই নতুন সভ্যটির সঙ্গে খাপ-খাওয়াইতে হয়। বয়স্ক শিশুদের উপলব্ধি করা দরকার যে এখন হইতে তাহাদের একটু বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে। নতুন শিশুটির বেশী বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজন। তাই তাহার নিদ্রার সময় বেশী হৈ চৈ চেঁচামেচি করা চলিবে না। তাহার খাদ্যের প্রয়োজন বেশী। নতুন শিশুটির প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া হয়ত তাহাদের ছোটখাট দাবীগুলি পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। বাড়ির সকল শিশুই যদি তাহার প্রাপ্য ভালবাসা এবং বড়দের মনযোগ লাভ করে, প্রয়োজনীয় সুখসুবিধাগুলি ভোগ করে এবং নিজ নিজ

বয়সের অনুপাতে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পায় তবে নতুন শিশুর আগমনে যে অসুবিধা সৃষ্টি হইবে তাহারা অনায়াসে তাহা মানিয়া লইবে। নতুন শিশুটিও ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে শিখিবে যে সে পরিবারের একজন অংশীদার কিন্তু একমাত্র অংশীদার নয় কিংবা উহার কর্তা অথবা উপরওয়ালাও নয়। শিশুর দৈহিক প্রয়োজনগুলি অবশ্যই মিটান হইবে কারণ তাহার নরম ক্ষুদ্র দেহ এখনও পরিবারের রুটিনের সঙ্গে চলার মত মজবুত হইয়া ওঠে নাই। তাহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা অথবা কোন ব্যথাবশতঃ ক্রন্দন শোনামাত্র সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগ দেওয়া হইবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে শিশুর এই সবের মধ্যে একটিও অসুবিধা ঘটে নাই শুধু অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই সে কাঁদিতেছে তখন তাহার কান্না থামাইবার জন্য কেহ কাজকর্ম বন্ধ করিবে না। ক্রমশঃ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু উপলব্ধি করিবে যে চাহিবামাত্র তাহার দাবী পূরণের কোন সম্ভাবনা নাই এবং তাহার পালা আসা পর্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। শিশু গৃহে এই তথ্যটি যত শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারিবে বড় হইয়া বাহিরের জগতে খাপ খাওয়াইতে তাহার তত বেশী সুবিধা হইবে।

পরিবারের নিকট শিশুর প্রধান দাবী হইল নিরাপত্তার দাবী। বাড়ির সকলের সঙ্গে একাত্মবোধ করিলেই তবেই শিশুর মনে নিরাপত্তার ভাব আসা সম্ভব। ইহার জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া ওঠা দরকার। বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ির লোকদের যত বেশী সঙ্গে পাইবে তত বেশী তাহাদের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হইবে।

একটি শিশুর আগমনের ফলে পরিবারের দৈনন্দিক কাজকর্ম এবং সময় পরিকল্পনা যেন দীর্ঘদিন ধরিয়া ব্যাহত না হয়। যত শীঘ্র সম্ভব শিশুর জীবনও একটি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে। তবে এই ছক যে কিরূপ হইবে তাহা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়া স্থির করিতে হইবে।

জোর জবরদস্তি করিয়া শিশুর জীবনে কোন নিয়ম চাপাইতে নাই ইহাতে হয়ত সে প্রবল আপত্তি জানাইবে। আসল কথা হইল শিশুর জীবনের ছক এবং পারিবারিক জীবনের ছক এরূপ হইবে যে সকলের সর্বোচ্চ সন্তোষ ও তৃপ্তিলাভ হইবে এবং সকলের জীবনের কাজকর্ম সবচেয়ে কম ব্যাহত হইবে।

মানুষমাত্রই স্নেহের কাঙাল। তাই জননীর-স্নেহস্পর্শ ব্যতীত শিশুর মনের উপযুক্ত বিকাশ ঘটে না। মা কিংবা মাতৃস্থানীয় অপর কেহ তাহার দৈহিক প্রয়োজন মিটাইলে, তাহার ক্ষুদ্র দেহ লইয়া নাড়াচড়া করিলে, তাহাকে আদর করিলে, তাহার অঙ্গে স্নেহচুম্বন আঁকিয়া দিলে, কথা বলিলে এবং খেলা করিলে শিশুর আনন্দলাভ হয় এবং শিশুর সঙ্গে এইভাবে একটা গভীর আবেগের সম্পর্ক স্থাপিত হইলে শিশু মাতৃস্নেহ আস্বাদন করে। বাঞ্ছিত শিশু যাহারা পরিবারের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত পালিত হয় তাহারা বাপ-মা, বাড়ির লোক, পরিবারের বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে এত অজস্র স্নেহ পায় যে তাহাদের আর স্নেহের ক্ষুধা থাকে না। অবশ্য অতিরিক্ত আদর আবার অনাদরের মতই খারাপ হইতে পারে।

প্রথম সন্তান এবং বহু আকাঙ্ক্ষিত সন্তানরা বাপ-মায়ের অধিক মনোযোগ এবং অতিরিক্ত প্রশ্রয় পায়। তাহার সব আব্দার এবং সমস্ত খেয়ালখুশি তাহারা পূরণ করেন। ফলে শিশু তাহার নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা বড় ধারণা পোষণ করিতে

থাকে। এই ধারণা সবসময় তাহার পক্ষে হিতকর হয় না এবং বাস্তবে তাহার নিজেকে খাপ খাওয়াইতে কষ্ট হয়। জন্মের কয়েক বছর পরে শিশুর যখন বাপমায়ের উপর একান্ত নির্ভরতার সময় কাটিয়া যায় তখনও বাপ-মা সন্তানের সব কিছু করিয়া দেন। একসময় সে যে তাহাদের খোকা অথবা খুকু ছিল একথা তাঁহারা কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। ফলে সন্তানের বাপমায়ের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং আসক্তি দেখা যায়। এইসব সন্তানরা কখনো আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে না এবং বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে লড়াই করিতে হইলে সহজেই ভাঙিয়া পড়ে।

২. **শিশুর সাধারণ ব্যবস্থাপনা** (General management of the baby): জন্মের পরেই শিশু স্বাবলম্বী হইয়া ওঠে না কিংবা নিজের দেহের প্রয়োজনগুলি নিজে মিটাইতে পারে না। পরন্তু অন্যান্য জীবের তুলনায় মানব-শিশু অনেক বেশী অসহায় এবং পরনির্ভর থাকে। আর এই পরনির্ভরতা চলে দীর্ঘদিন ধরিয়া। মানুষের মত কোন প্রাণীরই শৈশব এত দীর্ঘ নয়। প্রত্যেক জননীকেই তাই দুইটি কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ, তাঁহার শিশুর দৈহিক প্রয়োজন কি কি? দ্বিতীয়তঃ, কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহার প্রয়োজন মিটান যায়? সংক্ষেপে বলা যায় সদ্যোজাত শিশুর দৈহিক প্রয়োজন পাঁচটি—**খাদ্য, নীরবতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ বায়ু ও উপযুক্ত উত্তাপ**। শিশুর যত্ন লইবার প্রণালী এই যে আবেগবশতঃ হঠাৎ একেক বার একেক ভাবে যত্ন লওয়া উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত শিশুর চিন্তা-শক্তির উদয় না হয় এবং সে অন্য কিছু আশা না করে ততদিন বিনা পরিবর্তনে দিনের পর দিন একই সময়ে এবং একইভাবে যত্ন লইতে হইবে। যে শিশু সুস্থ সবল এবং স্বাভাবিক অবস্থায় জাত তাহাকে অনিয়মে অনাবশ্যক বহু দ্রব্য না দিয়া নিয়মিতরূপে কেবল আবশ্যক দ্রব্যগুলি দিলেই সে স্বাস্থ্যে, সুখে ও মনের আনন্দে দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। তাহার ঘুমের, স্নানের, আদরের ও কোলে লইবারও নির্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক।

শিশুর প্রয়োজনের মধ্যে প্রথমেই পড়ে পরিমাণ মত ও যথাযথ সময়ে আহার। মায়ের দুধই হউক আর বোতলের দুধই হউক শিশুকে ঘন ঘন না খাওয়াইয়া প্রতি দিন আড়াই কিংবা তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। প্রতি বারে শিশু যদি যথেষ্ট দুধ পায় তবে সে মনের আনন্দে প্রায় তিন ঘণ্টা থাকিতে পারে।

রাত্রির খাওয়া প্রথম হইতেই বন্ধ করিয়া দিয়া দিনে-রাত্রে ৮-বারের পরিবর্তে ৭-বার খাওয়াইবে। শিশু হৃষ্টপুষ্ট হইলে দুই মাস বয়স হইতেই চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়ান অভ্যাস করিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ৬-বার খাওয়াইবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে দুধের সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্যান্য খাদ্য দিতে হয়। উপযুক্ত আহার না পাইলে শিশুর যথাযথ দৈহিক বিকাশ হয় না। দৈহিক বিকাশের উপর মানসিক বিকাশও বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই শিশুকে উপযুক্ত আহার দেওয়াই মায়ের কর্তব্য। শিশু উপযুক্ত আহার পাইলে তাহার বয়সের অনুপাতে ওজন বৃদ্ধি পাইবে।

শিশুর ওজন বৃদ্ধির উপায়ঃ খাঁটি দুধ পান না করা পর্যন্ত চিনি ব্যতীত শিশুর ওজন বৃদ্ধি পাইতে পারে না। তাহার ওজন বাড়াইবার জন্য তাই জলমিশ্রিত দুধে কোন প্রকার শর্করা দিতে হয়। মিছরি, মধু, কিংবা চিনি মিশান যাইতে পারে।

নবজাত শিশুকে দুধ পান করাইবার সময় প্রতি বারে চা চামচের আধ চামচ হইতে শুরু করিয়া ক্রমান্বয়ে উহার পরিমাণ বাড়াইয়া দুই চামচ পর্যন্ত করা যায়। শিশুর ওজন যদি আশানুরূপ না বাড়ে তবে শিশুকে আর চিনি না দিয়া গুঁড়া দুধ দেওয়া ভাল কারণ উহা হজম করা সহজ। মল নরম কিংবা পাতলা হইলে চিনির পরিমাণ কমাইতে হয়।

যে শিশু মাইপোষে দুধ পান করে তাহাকে এক মাস হইতেই কমলালেবুর রস দেওয়া উচিত। স্তন্যপায়ী শিশুদের ওজন না বাড়িলে মাইপোষে কিছু স্বতন্ত্র খাদ্য দিতে হয়। প্রয়োজন হইলে মাতৃদুগ্ধ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া কৃত্রিম খাদ্য দিতে হইবে।

নীরব পরিবেশে বিশ্রামও শিশুর আরেকটি দৈহিক প্রয়োজন। কারণ বিশ্রামই শিশুর ক্লান্তি দূর করিয়া তাহার দেহগঠনে সাহায্য করে। শিশুকে তাই একাকী বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে হয়। সে হয়ত বিছানায় আদৌ শুইয়া থাকিতে চাহিবে না এবং গা মোচড়ামুচড়ি করিবে কিংবা কাঁদিয়া অসম্মতি জানাইবে কিন্তু এসব ব্যাপার অগ্রাহ্য করা বুদ্ধিমানের কাজ। তারপর নিস্তব্ধ বিছানায় থাকিয়া আপনিই সে ঘুমাইয়া পড়িবে। অতিরিক্ত ক্লান্ত বা উত্তেজিত হইয়া ঘুমাইতে না দিয়া প্রথম হইতেই শিশুকে নির্জন পরিবেশে ধীরে ধীরে ঘুমের মধ্যে প্রবেশ করিতে শিখান উচিত। কারণ এইভাবে ঘুমাইতে অভ্যস্ত হইলে পরিণত বয়সে অল্প বিশ্রামের ফল ভাল হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিশুর অন্যতম দৈহিক প্রয়োজন। অপরিচ্ছন্নতার ফলেই আমাদের দেশের লোকেরা নানা প্রকার রোগে ভুগিয়া থাকে। শিশুর দেহ অত্যন্ত কোমল এবং তাহার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও খুব কম। তাই বয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় শিশুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন আরও বেশী। শিশুর দেহ, জামা-কাপড় ও বিছানা সর্বদা পরিষ্কার রাখিতে হয়। এবং শিশুকে নিয়মিত স্নান করাইতে হয়।

বিশুদ্ধ বায়ু এবং প্রয়োজনীয় উত্তাপও শিশুর প্রয়োজনের অন্তর্গত। এই দুইটির অভাবে শিশুর দেহ উপযুক্তভাবে বাড়িতে পারে না। গৃহের সর্বাপেক্ষা আলো-বাতাসপূর্ণ কক্ষটি শিশুর জন্য নির্বাচন করা উচিত। শীতপ্রধান দেশের শিশুদের দেহে উত্তাপ ঠিক রাখিবার জন্য যথেষ্ট জামাকাপড় পরাইতে হয় কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অনাবশ্যক জামাকাপড় দিয়া শিশুকে মুড়িবার প্রয়োজন নাই।

উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে শিশুর দৈহিক প্রয়োজন মিটিবে।

শিশুকে মাই ছাড়ান (Weaning the baby) **:** বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে ধীরে ধীরে মাতৃস্তন্য ত্যাগ করাইয়া অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত করাইতে হয় নতুবা শিশুর উপযুক্ত পুষ্টি হয় না। এইজন্য শিশুকে দুই তিন মাস বয়স হইতে প্রথমে ফলের রস, তারপর সিরিয়াল, তারপর শাক-সবজি এবং অবশেষে শক্ত ফল অভ্যাস করাইতে হয়। প্রথমে চায়ের চামচের সিকি চামচ রস দিয়া শুরু করিয়া ৪/৫ মাস বয়সে ২/৩ চামচ এবং ৬ মাস বয়সে বড় চামচের ২/৩ চামচ দিতে হয়। গাজরের রস, কমলালেবুর রস ও টমেটোর রস বিশেষ উপকারী। ফলের রসে কয়েকদিন অভ্যস্ত হইলে সিরিয়াল দিতে শুরু করিবে।

সিরিয়াল : আমরা প্রথমে সুজি জাতীয় মিহি-সিরিয়াল ব্যবহার করিব। তবে 'ফ্যারাক্স' নামক সিরিয়ালও দেওয়া যাইতে পারে। সুজি দিতে হইলে প্রথমে সুজি ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া লইয়া চা চামচের এক চামচ পরিমাণ দুধের সঙ্গে মিলাইয়া

দিবে। এইভাবে তিন মাস বয়স হইতে সিরিয়াল খাওয়াইতে শুরু করিয়া ক্রমশঃ সিরিয়ালের পরিমাণ বাড়াইয়া ছয় মাস বয়সে দৈনিক ৬ আউন্স করা যাইতে পারে। শিশুকে দুধ খাওয়াইবার পর তিন মাস বয়সে শক্ত বিস্কুট দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে সে চুষিতে কিংবা কামড়াইতে পারে। ছয় সাত মাস বয়সে প্রতিদিন সিরিয়াল না দিয়া মাঝে মাঝে দুধের সঙ্গে একটি টোস্টও দেওয়া চলে।

শাক-সবজি : সিরিয়ালে অভ্যস্ত হইবার পর পাঁচ মাস হইতে শিশুকে শাক-সবজি দিতে শুরু করিবে। বেলা একটা কিংবা সাড়ে চারটার সময় যখন সে দুধ খাইবে তখনই শাক-সবজির ঝোল খাইবার উপযুক্ত সময়। সবজির মধ্যে আলু, পালং শাক ও গাজরই উৎকৃষ্ট। নয় দশ মাসে কড়াই শুঁটি ও বাঁধাকপির ঝোল দেওয়া চলে। সবজি-গুলি ভাল করিয়া ধুইয়া একটু লবণ দিয়া সিদ্ধ করিয়া থেঁতলাইয়া দিতে হয়। শিশুর এই খাদ্যে কোনরূপ মাখন কিংবা তেল দেওয়া চলে না।

শিশুর বৃদ্ধির জন্য এই বয়সে খনিজ লবণ অত্যন্ত প্রয়োজন। কাজেই শাক-সবজির ঝোল হইতে শিশু যেন প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ পায়। কোন সবজি যদি দুই তিন দিন গ্রহণে আপত্তি জানায় তবে জোর করিয়া উহা আর তাহাকে খাওয়াইবে না। দুই এক সপ্তাহ বাদে ঐ সবজি আবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে সে খায় কিনা।

৯/১০ মাসের শিশুকে সুসিদ্ধ মাছ কিংবা মাংস ভাল করিয়া চটকাইয়া একদিন অন্তর ½ হইতে এক আউন্স করিয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। মাছ-মাংসের বদলে ৩০ গ্রাম ছানাও দেওয়া চলে।

জল, ফল ও ফলের রস : একেবারে শৈশবের খাদ্য হইল জলীয়। কিন্তু কঠিন খাদ্য খাইতে শুরু করিলে শিশু জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিবে। এই সময় কমলা-লেবুর রস ব্যতীত সিরিয়ালের সঙ্গে খোসাছাড়ান আপেল, আপেলের রস কিংবা পেষা পাকা কলা দেওয়া যাইতে পারে। কমলালেবুর রস ব্যতীত আনারসের রস দেওয়া চলে। অন্য কোন ফলের রস দিলেও লেবু কিংবা টমেটোর রস দিতেই হইবে।

দন্তোদ্গম (Teething) : শিশুর দাঁত ওঠা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। আমরা সাধারণতঃ ছয় সাত মাস বয়স হইতেই শিশুর দাঁত ওঠার প্রতীক্ষায় থাকি। কিন্তু ইহাতে ভয়ের কিছু নাই। ঐ সময় শিশু যদি অসুস্থ হয় তাহার পেটের পীড়া দেখা দেয়, সবুজ ও নরম পায়খানা হয় তবে দাঁত ওঠার জন্যই ঐরূপ হইতেছে ভাবা ঠিক নয় কারণ দাঁত ওঠা ভিন্ন অন্যান্য কারণেও ঐসব উপসর্গ আসিতে পারে। কাজেই অসুস্থতার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া উহাদের দূর করা উচিত।

এক বৎসর বয়সে শিশুর অন্ততঃ ছয়টি এমন কি বারোটি পর্যন্ত দাঁত উঠিতে পারে। দাঁত উঠিতে বিলম্ব হইলে দেখিবে শিশু যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ পদার্থ দুধ, শাক-

সবজি, কডলিভার ওয়েল এবং রৌদ্র স্নান পাইতেছে কিনা। শিশুর কখন কয়টি দাঁত উঠিতে পারে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অস্থায়ী দাঁত	সংখ্যায় ২০ টি	
দাঁত ওঠার সময়	দাঁতের সংখ্যা	
১ম ৬-৮ মাস	নীচের পাটির সম্মুখের ছেদন দন্ত	২
২য় ৮-১০ মাস	উপরের " " " "	৪
৩য় ১২-১৮ মাস	নীচের পাটির পার্শ্বের ছেদন দন্ত	২
	এবং প্রথম পেষণ দন্ত	৪
৪র্থ ১৮-২০ মাস	শ্বা দন্ত	৪
৫ম ২৮-৩২ মাস	দ্বিতীয় পেষণ দন্ত	৪
		মোট—২০

জীবনে দুইবার দাঁত উঠিয়া থাকে। জন্মের পর ছয় মাস হইতে দুই বৎসরের মধ্যে কুড়িটি অস্থায়ী দাঁত ; তারপর ছয় হইতে বিশ বছরের মধ্যে ঐ দাঁত পড়িয়া গিয়া ৩২টি স্থায়ী দাঁত ওঠে।

3. **শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারা** (Process of growth and development of children)

মাতৃজঠরে আসিবার পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের দেহে অনবরত পরিবর্তন চলিতে থাকে। জীবনের প্রারম্ভে এই পরিবর্তন চলে অতি দ্রুত বেগে, তারপর উহার গতি মন্থর হইয়া আসে কিন্তু পরিবর্তনের কাজ অব্যাহত থাকে। যৌবনের সুন্দর সুঠাম দেহের জায়গায় ধীরে ধীরে জরা নামিয়া আসে, দাঁত পড়ে, চুল পাকে, মানুষের দেহের এই যে বিকাশ ইহার গতি ধারাবাহিক, জননীর সন্তান ধারণের পর হইতে ইহার শুরু। বস্তুতঃ পুং-কোষ এবং স্ত্রী-কোষের মিলন মুহূর্ত হইতে শিশুর দেহ গঠনে যে পরিবর্তন দেখা যায় ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে সত্তর বৎসর পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও সেইরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। জন্ম তাই কোন একটি আকস্মিক ঘটনা নয়, বহুপূর্ব হইতেই লোকচক্ষুর অন্তরালে মাতৃগর্ভে তাহার আগমনের বিরাট প্রস্তুতি চলে।

জন্মের পর শিশু কেবল খানিকটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাড়িয়া ওঠে না, পরন্তু পরিণতির লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য তাহার একটি ধারাবাহিক শৃংখলাবন্ধ ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের নামই শিশুর বিকাশ। জীবনের পাঁচটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশ দেখা যায়, যথা—(১) দৈহিক, (২) মানসিক, (৩) ভাষাগত, (৪) প্রাক্ষোভিক এবং (৫) সামাজিক চেতনার বিকাশ।

দৈহিক বিকাশ (Physical development) : গর্ভসঞ্চারের পর মাতৃগর্ভে যে ডিম্বকোষ গঠিত হয় উহা নিজ ধর্ম অনুসারে বৃদ্ধি পায়। একটি বিভক্ত হয় দুইটি কোষে, দুইটি আবার চারটি কোষে। এইভাবে বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয় এবং আদি কোষটি ধীরে ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করে। প্রথম দুই সপ্তাহ ডিম্বকোষের কোন বাহ্য পরিবর্তন ঘটে না। শুধু অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে। দুই সপ্তাহের পর ডিম্বকোষটি দ্রুত বিকশিত ও বর্ধিত হয় এবং

উহা ভ্রূণ নামে অভিহিত হয়। মাতৃদেহ হইতে ঐ ভ্রূণ পুষ্টি লাভ করে। তিন মাসের পর হইতে কোষগুলি মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার লাভ করে। গর্ভের প্রথম সপ্তাহ হইতে অষ্টম সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কে ভ্রূণের আদি বা প্রাথমিক পর্যায় এবং নবম সপ্তাহ হইতে ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত অবস্থাকে পরিপুষ্ট ভ্রূণের অবস্থা বলে। সাত মাস ধরিয়া ভ্রূণ ধীরে ধীরে মানবশিশুর আকার ধারণ করে। এই সময় বিভিন্ন কাজের জন্য শিশুর প্রয়োজনীয় পেশী, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হয়।

দেহের অভ্যন্তরে কোন জন্মগত ত্রুটি না থাকিলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে এবং ওজনে বাড়িতে থাকে। এই বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিবার জন্য ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী এবং অন্ত্র প্রভৃতিও আকৃতিতে বাড়িতে থাকে। দৈহিক বিকাশ শুধু আকৃতিগত পরিবর্তনেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ও সামঞ্জস্য বদলায়। যৌবনোদ্গমের পরেই শিশুর দেহে বয়স্ক ব্যক্তির দেহের গঠনের অনুরূপ সামঞ্জস্য আসে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের কতকগুলি অবয়ব বিলুপ্ত হয়, যেমন বক্ষঃস্থলে অবস্থিত শৈশবগ্রন্থী নামে পরিচিত থাইমাস গ্রন্থী, মস্তিষ্কের নিম্নে অবস্থিত পাইনিয়াল গ্রন্থী, বেবিনস্কি এবং ডারউইনিয়ান রিফ্লেক্সগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত শৈশবের দাঁত এবং চুল পড়িয়া নতুন স্থায়ী দাঁত ও চুল গজায়। যৌবনোদ্গমের সঙ্গে যৌবনের নানা চিহ্ন দেহে পরিস্ফুট হয় এবং তাহার মনে নানা যৌন কৌতূহল দেখা দেয়।

মানসিক বিকাশ (Mental development)ঃ দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনেরও বিকাশ ঘটে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু নতুন নতুন কথা শেখে, প্রতি বৎসরই তাহার শব্দভাণ্ডার বাড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাশক্তি, বিচারবুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, বস্তু নিরীক্ষণের ক্ষমতা, কল্পনা প্রবণতা ইত্যাদি বাড়িতে থাকে।

শিশুর প্রথম চিন্তা অবাস্তব এবং কাল্পনিক। সে সর্বদা এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে এবং তাহার চিন্তা নিজেকে লইয়া। কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার কল্পনার রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তব জগতে প্রবেশ করে, তাহার আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব কমিয়া যায় এবং সে ক্রমশঃ সামাজিক হইয়া ওঠে।

মানসিক বিকাশের দিক দিয়া শিশুর সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হইল কৌতূহল। সাধারণতঃ চার বৎসর বয়সের সময় তাহার এই কৌতূহল বেশী দেখা যায়। শিশুরা এই সময় খেলনা পাইলে ভাঙিয়া চুরিয়া দেখে উহা কিভাবে তৈরী। এই কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে গিয়া সে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তাহার কৌতূহল হইতে জ্ঞান-পিপাসার গভীরতা ও মানসিক বিকাশের গতি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

ভাষার ক্রমবিকাশ (Language development)ঃ ভাষার ক্রমবিকাশ মানসিক ক্রমবিকাশেরই অন্তর্গত। শিশুর কথা শেখার প্রচেষ্টাকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করিতে পারি—(ক) প্রাক্‌কথন এবং (খ) কথা বলার স্তর।

(ক) **প্রাক্‌কথন স্তরঃ** কথা বলিতে শেখা একটি সময়সাপেক্ষ জটিল ব্যাপার। সাধারণতঃ ১১/১২ মাসের পূর্বে শিশুর ভাষা ফোটে না কিন্তু ভাষায় দক্ষতা অর্জনে বাক্‌যন্ত্রের যে সুনিপুণ কর্মক্ষমতার প্রয়োজন হয় জন্মের প্রথম লগ্নেই তাহার তামিল

শুরু হইয়া যায় এবং সে ক্রন্দন, কাকলি এবং ভঙ্গিমার সাহায্যে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করে।

ক্রন্দন: জন্মের পর প্রথম দুই সপ্তাহ শিশু প্রায় অকারণে কাঁদিয়া উঠে। জন্মের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে শিশুর কান্না কমিয়া আসে। তখন শিশু ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অস্বস্তি-বোধ, যন্ত্রণা ইত্যাদি নানা কারণে কাঁদে। তিন মাস বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বেই শিশু উপলব্ধি করিতে শেখে যে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের অব্যর্থ অস্ত্র হইল ক্রন্দন।

শৈশবের কাকলি: ক্রন্দন ব্যতীত আরো অনেক ধ্বনি শিশুর কণ্ঠে শোনা যায়। ইহারই নাম শৈশব-কাকলি। সাধারণতঃ চার মাস বয়সে শিশুর কাকলি শুরু হইয়া যায়। ভাষার মধ্যে যে সকল বর্ণ আছে শিশু তাহার প্রায় সবগুলিই এই সময় উচ্চারণ করিতে পারে। কিন্তু তথাপি তাহার মুখে প্রথম স্বরধ্বনি তারপর ব্যঞ্জনধ্বনির আবির্ভাব হয়। জন্মকাকলির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল পুনরুক্তি অর্থাৎ একটি শব্দ শিশু বার বার উচ্চারণ করে, যেমন মা-মা-মা দা-দা-দা ইত্যাদি। এখানে মামা শব্দের অর্থ সত্যই মামা নয়। শৈশব-কাকলির পুনরুক্তি একেবারে অর্থহীন। বস্তুতঃ শৈশব-কাকলি উদ্দেশ্যহীন কথা নিয়া খেলা। তবে উদ্দেশ্যহীন হইলেও বৃথা নয়। ইহার মধ্য দিয়া শিশু ক্রমশঃ বাক্‌যন্ত্রের পেশীসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতে শেখে।

ভঙ্গিমাভাষণ: ক্রন্দনের মতই ভঙ্গিমাও শিশুর মনের ভাব-প্রকাশের একটি উপায়। প্রত্যেকটি শিশু অঙ্গ দোলাইয়া তাহার আনন্দ, বিরক্তি, নানারকম ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করে। পিতামাতা সামান্য প্রচেষ্টা করিলেই প্রত্যেকটি শিশুভঙ্গিমার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন।

(খ) **কথা শেখা:** প্রাক্‌কথন হইল কথা শেখার প্রস্তুতির পর্ব। ইহার পরে প্রকৃত কথা শেখার পালা শুরু হয়। সজ্ঞানে ভাষা শিক্ষার প্রথম পর্বে আসে বয়স্কদের অনুকরণ করার চেষ্টা।

অনুকরণ: সুস্থ শিশুরা ৬/৭ মাস বয়স হইতেই বড়দের স্বর অনুকরণের চেষ্টা করিতে থাকে। বিশেষ শব্দোচ্চারণের পূর্বে শিশু কথার সুর, ঢং এবং ছন্দ অনুকরণ করে। তাই বড়রা উহার সামনে কথা বলিলে সে আপনার নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রতিধ্বনি করিয়া ওঠে। এই অবস্থাকে প্রতিধ্বনি প্রতিক্রিয়া স্তর (echo reaction stage) বলে। ১০/১১ মাস বয়স হইতেই ভিন্ন ভিন্ন শব্দের স্বরকম্পন অনুকরণ করিবার জন্য শিশু প্রস্তুত হয়। এই সময় সে মামা দাদা কথাগুলি বলতে শেখে এবং বয়স্কদের নিকট হইতে ক্রমশঃ মাতৃভাষা আয়ত্ত করে। পরে বিদেশী ভাষাও শেখে।

অর্থবোধ: শিশু ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র বস্তুর সঙ্গে স্বতন্ত্র অর্থের সংযোগ সাধন করিতে পারে। কিন্তু প্রথম প্রথম শিশু প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করিয়া উহাদের সামঞ্জস্যটাই বেশী লক্ষ্য করে। ফলে সকল বয়স্ক পুরুষকে বাবা এবং সকল বয়স্ক মহিলাকে মা বলিতে শেখে।

শব্দসম্ভার ও বাক্য গঠন: শিশুর কথোপকথনে প্রথম প্রথম বিশেষ্য পদের আধিক্য দেখা যায় এবং এক একটি শব্দের সাহায্যে তাহারা মনের সম্পূর্ণ ভাবকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। তারপর আসে ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ। সর্বনাম শব্দ লইয়া প্রত্যেক শিশু বড় গোলমালে পড়ে। দুই বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে শিশুর শব্দে

বিশেষ্যের তুলনায় ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ও অব্যয়ের আধিক্য দেখা যায়। তিন বছর বয়সে শিশু শুদ্ধ বাক্য গঠনের অধিকারী হয়।

তোতলামি ঃ অনেক সময় দেখা যায় কথা বলিতে গিয়া শিশু ইতস্ততঃ করে, বার বার একটি শব্দ এবং শব্দের আদি অক্ষর উচ্চারণ করে। শিশুর এই ভাষাবিকৃতির নামই তোতলামি। তোতলামি ভাষাবিকাশের পথে এক দুস্তর বাধাস্বরূপ। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশেও বাধা ঘটায় এই তোতলামি। শৈশবেই তোতলামি দূর করা উচিত নতুবা উহা মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে এবং শিশুর মধ্যে একটি স্থায়ী হীনমন্যতার সৃষ্টি করিতে পারে। সাধারণতঃ দুই তিন বছর বয়সের সময়, পাঠশালায় প্রবেশের কালে কিংবা যৌবনোদ্গমের সময় তোতলামি দেখা দিতে পারে কারণ এই সময়গুলিতে শিশু এক একটি নতুন পরিবেশের সম্মুখীন হয়। দুই তিন বছর বয়সে শিশুর জীবনে ব্যক্তিত্বের বীজটি সবেমাত্র অঙ্কুরিত হয়, পরিবেশ হইতে এই প্রথম সে তাহার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে শেখে। তারপর পাঠশালায় আসিয়া শিশু নতুন সঙ্গী, নতুন শিক্ষক, বিচিত্র পাঠ্যবিষয় ইত্যাদির সম্মুখীন হয়, অপরিচিত বহু নতুন শিশুর সান্নিধ্যেও অনেক শিশু হতভম্ব হইয়া পড়ে। তারপর আবার যৌবনকালে তাহার দেহের বিপুল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও অনেক পরিবর্তন ঘটে। জীবনের এই তিনটি জটিল সময়ে শিশুর নিরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত হইতে পারে এবং তাহার ভাষা ঠিক পরিবেশের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারে না, ফলে তোতলামি দেখা দেয়।

অনুকরণপ্রবৃত্তি শিশুর মধ্যে অতিশয় প্রবল। আশেপাশে কোন তোতলা ব্যক্তি থাকিলে শিশু আপনার অজ্ঞাতসারে তাহাকে অনুকরণ করিয়াও তোতলা হইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত সঙ্গ হইতে শিশুকে দূরে রাখাই উচিত। এতদ্ব্যতীত স্নায়বিক দৌর্বল্য, পীড়ন, অকারণ ভীতি ও রুদ্ধ আবেগের ফলে তোতলামি দেখা দিতে পারে। বাব-মা বদরাগী হইলে কিংবা গৃহে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাভগ্নীর আবির্ভাবেও তোতলামি ঘটিতে পারে। শারীরিক কারণ যেমন শৈশবে মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত লাগিলে কিংবা হাম প্রভৃতি পীড়ার ফলে তোতলামি ঘটে।

তোতলামি প্রতিকারের একমাত্র উপায় হইল শিশুর সঙ্গে সহানুভূতিসূচক আচরণ করা। তোতলা শিশুকে সর্বদা উপহাস করিলে, তিরস্কার করিলে কিংবা ধীরে ধীরে কথা বলার উপদেশ দিলে উল্টা ফল ফলিয়া থাকে। ধৈর্য ধরিয়া তাহার প্রত্যেকটি কথা শুনিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত মাতাপিতা সর্বদা লক্ষ্য রাখিবেন কোন্ পরিস্থিতিতে শিশুদের মধ্যে তোতলামির উদ্ভব হয় এবং সর্বদাই ঐরূপ পরিস্থিতি হইতে শিশুকে দূরে রাখিবেন। উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ফলে সম্পূর্ণ বা আংশিক তোতলামি সারান যায়।

ভাষাবিকাশের প্রধান অন্তরায় ঃ শিশুর জীবনে ভাষার বিকাশ যদিও একটি নির্দিষ্ট সার্বজনীন নিয়ম ধরিয়া চলে তথাপি কোন কোন শিশু ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছাইয়া থাকে। কোন্ কোন্ উপাদানগুলি ভাষা শিক্ষার অন্তরায় সেই সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল ঃ

স্বাস্থ্য (Health) ঃ ভগ্নস্বাস্থ্য ভাষাবিকাশের একটি প্রধান অন্তরায়। একেই ত রুগ্ন এবং দুর্বল শিশুর কথা বলার স্পৃহা কম, উপরন্তু তাহার মনোভাব আন্দাজ

করিয়া লইয়া শিশু ভাষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পূর্বেই পিতামাতা তাহার অভাব পূর্ণ করিয়া থাকেন। এইসব শিশু পূর্ণ বাক্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না বলিয়া তাহাদের ভাষা শিখিতে বিলম্ব ঘটে। বধিরতা এবং ক্ষীণ শ্রবণশক্তিও ভাষা বিকাশের পথে প্রকাণ্ড অন্তরায়। আজন্ম বধির শিশু স্বভাবতঃই মূক হয়।

বুদ্ধি (Intelligence) : বুদ্ধির সঙ্গে ভাষার একটি নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। সকল বুদ্ধিমান শিশুই অবশ্য তাড়াতাড়ি কথা শেখে না। তবে যে সব শিশু তাড়াতাড়ি কথা শেখে তাহারা সাধারণতঃ বুদ্ধিমান।

সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশ (Socio-economic status) : যে সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশে শিশুর জীবন কাটে ভাষাবিকাশে তাহার প্রভাব অসীম। উন্নত এবং মার্জিত পরিবেশে লালিত শিশুর ভাষা থাকে মার্জিত এবং শব্দভাণ্ডারও থাকে সমৃদ্ধ। দরিদ্র ঘরের শিশুরা মার্জিত ভাষার ব্যবহার শোনে না এবং সচরাচর মায়ের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হয়। জীবনে ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে না বলিয়া অশিক্ষিত পরিবারের পিতামাতা শিশুর উচ্চারণভঙ্গীও শোধরাইবার চেষ্টা করে না। অনুকূল পরিবেশে লালিত হইলে অনুন্নত শ্রেণীর শিশুরাও সহজেই সুন্দর ভাষা ও ভাবের অধিকারী হইতে পারে।

যৌন পার্থক্য (Sex difference) : গোড়ার দিকে ছেলেরা ভাষাবিকাশের পথে মেয়েদের চেয়ে একটু অগ্রসর থাকে। কিন্তু শৈশব অতিক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলেদের অতিক্রম করিয়া যায়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, ইহার কারণ এই সময় হইতে কন্যা জননীর এবং পুত্র পিতার সহিত আপনার সাযুজ্য লক্ষ্য করিয়া কন্যা মাতাকে এবং পুত্র পিতাকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। পিতা অধিকাংশ সময় গৃহের বাহিরে কাটান বলিয়া পুত্র তাঁহার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হয় এবং ফলে তাহার ভাষা শিক্ষাও ব্যাহত হয়। এই কারণেই একমাত্র ছেলের চেয়ে একমাত্র মেয়েরাই বেশী বাক্‌পটু হইয়া থাকে। ছেলেদের উচ্চারণ বিকারও মেয়েদের তুলনায় বেশী এবং তাহারও কারণ মূলতঃ মনস্তাত্ত্বিক। মেয়েদের মধ্যে যে ভাবাবেগের ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায় ছেলেদের মধ্যে তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং মেয়েদের তুলনায় অভিভাবকদের নিকট বকুনি খায় ছেলেরাই বেশী।

পারিবারিক সম্পর্ক (Family relationship) : নিবিড় পারিবারিক সম্পর্ক ভাষাবিকাশে সহায়তা করে। শিশুরা যদি গৃহের পরিজনদের সকলের সঙ্গে সচ্ছন্দে কথাবার্তার সুযোগ ও স্বাধীনতা পায় তবে তাহার ভাষারও দ্রুত উন্নতি ঘটিয়া থাকে। আবার যমজ শিশু এবং পরিবারের যে সকল শিশুরা একেবারে সমসাময়িক তাহারাও ভাষাবিকাশে সচরাচর পিছাইয়া থাকে। কারণ তাহারা পরস্পরের প্রতি একান্ত আকৃষ্ট থাকায় তাহাদের ভাষা সমাজায়িত হইতে বিলম্ব ঘটে। অনাথ আশ্রমের শিশুদের সম্মুখে আদর্শ ভাষার নমুনা থাকে না বলিয়া তাহাদেরও দ্রুত ভাষাবিকাশ ঘটে না। এই কারণে নার্সারী স্কুলের শিশুদের ভাষাবিকাশে বিলম্ব ঘটে।

দ্বিভাষা (Bilingualism) : শিশুকে এই সময়ে দুইটি বা ততোধিক ভাষা শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা ভাষা শিক্ষার অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বিশেষতঃ শিশু যদি গৃহে একটি ভাষা ব্যবহার করে এবং স্কুলে অপর একটি ভাষা (সাধারণতঃ বিদেশী

ভাষা) শেখে তবে দুইটি ভাষাতেই সে পিছাইয়া থাকে। শিক্ষাবিদ্‌গণ আজকাল তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করার পক্ষপাতী।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional development) **:** নবজাত শিশু কি ধরনের এবং কয়টি মৌলিক প্রক্ষোভ নিয়া জন্মায় সে সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা হইয়াছে। দার্শনিক দেকার্তে (Descarte) বিস্ময়, ভালবাসা, ঘৃণা, কামনা, দুঃখ ও আনন্দ এই ছয়টি মৌলিক প্রক্ষোভের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ওয়াট্‌সনের মতে শিশুর আবেগ মাত্র তিনটি—ভয়, রাগ এবং আনন্দ। জোর শব্দ এবং হঠাৎ ভারসাম্য বা অবলম্বন হারান হইতে ভয় জাগে। মূল রাগের উপলক্ষ্য মাত্র একটি—শিশুর স্পন্দন, অঙ্গচালনা ইত্যাদিতে বাধা দেওয়া। আবার আদর করিলে শিশুর মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা কিন্তু ওয়াট্‌সনের এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁহাদের মতে শিশুর প্রক্ষোভ এতই সাধারণধর্মী যে কোন্ প্রক্ষোভের কোন্ প্রতিক্রিয়া তাহা বোঝা প্রায় অসম্ভব। ক্যাথারিন ব্রিজেস (Katherine Bridges) একাধিক পরীক্ষা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে এক ধরনের উত্তেজনামূলক অবস্থাই শিশুর আদিম প্রক্ষোভ। তিন মাস বয়স হইতেই শিশুর এই আদিম প্রক্ষোভ বিশেষায়িত হইতে শুরু করে এবং উহা হইতে আনন্দ ও অস্বাচ্ছন্দ্য এই দুইটি প্রক্ষোভ জন্ম নেয়। অস্বাচ্ছন্দ্য ৪ মাস বয়সে বিশেষায়িত হয় রাগে, ৫ মাসে বিরক্তিতে এবং ৬ মাসে ভয়ে। ৬ মাসের সময় আনন্দ বিশেষায়িত হয় উচ্ছ্বাসে, ৯/১০ মাসে বড়দের প্রতি ভালবাসায় এবং ১৫ মাসে ছোটদের প্রতি অনুরাগে। এই বয়সেই শিশুর মনে হিংসারূপ প্রক্ষোভেরও সঞ্চার হয়।

প্রক্ষোভের শ্রেণীবিভাগ : সমাজজীবনে প্রক্ষোভের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা অনুযায়ী প্রক্ষোভকে ইতিবাচক (Positive) ও নেতিবাচক (Negative) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইতিবাচক প্রক্ষোভগুলির মধ্যে পড়ে আনন্দ, সুখ, স্নেহ কৌতূহল ইত্যাদি। এই প্রক্ষোভগুলি সমাজজীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে আমাদের সমূহ সাহায্য করে। পরন্তু ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতি নেতিবাচক প্রক্ষোভের পর্যায়ভুক্ত। নেতিবাচক বলিয়া গণ্য হইলেও ইহারা কিন্তু জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ ভীতি-রোষ প্রভৃতি শিশুকে আত্মরক্ষা করিতে সাহায্য করে। ভীতির অনুভূতি তাহাকে বিপদ হইতে সজাগ করিয়া দেয়, অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করে এবং বিপদের কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভের সহায়তা করে। রোষের অনুভূতি তাহাকে শত্রুকে পরাভূত করিয়া নিজেকে রক্ষা করিবার প্রেরণা দেয়। তবে এই সকল আবেগগুলি বেশী বাড়িতে দিতে নাই কারণ উহারা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে শিশুর মানসিক সুস্থতার ব্যাঘাত ঘটাইবে। তাই গোড়া হইতেই শিশুকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে সমস্ত আবেগগুলি সংযত ও নিয়ন্ত্রিত থাকে।

শিশুর আবেগের সুষ্ঠু বিকাশের পিছনে থাকে দৈহিক ও মানসিক পরিনমন (maturation) এবং উপযুক্ত শিক্ষা (learning)।

সামাজিক চেতনার বিকাশ (Social development) **:** সামাজিক চেতনার বিকাশ বলিতে বুঝায় শিশুর পারিপার্শ্বিকস্থিত অন্যান্য ব্যক্তি, দল ও সংগঠনের সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের পরিণতি। শিশু যখন পৃথিবীতে জন্ম নেয় তখন হয়ত তাহার ভিতর

সামাজিক হইবার ক্ষমতা সুপ্ত অবস্থায় থাকে কিন্তু তবুও সে সামাজিক নয়। কিন্তু শীঘ্রই সে নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসে, তাহাদের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। যে সমাজের মধ্যে শিশু প্রতিপালিত হয় সেই সমাজের অনুমোদিত আচরণ সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সজাগ হইয়া ওঠে এবং সেই মান অনুযায়ী আপন আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। শিশুর এই সামাজিক আচরণের ক্রমবিকাশকে **সামাজিকীকরণ** নাম দেওয়া যাইতে পারে।

বিকাশের ধারা ঃ দৈহিক বিকাশের ক্ষেত্রে যেরূপ সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রেও সেইরূপ শিশুর চেতনার গণ্ডি একটি নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলে। শিশুর আচরণে এই গতিপথ অবধারিত। ফলে কোন শিশুকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ না করিয়াও কোন্ বয়সে শিশু ভীরু কিংবা লাজুক হইয়া পড়িবে, কোন্ বয়সে ছেলেরা ছেলেদের প্রতি এবং মেয়েরা মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, কোন্ বয়সে তাহাদের মধ্যে যৌন চেতনার বিকাশ হইবে ইত্যাদি তথ্য শিশুবিদ্‌রা বলিয়া দিতে পারেন। শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশকে আমরা দুইটি অধ্যায়ে ভাগ করিতে পারি—(ক) প্রাক্-সামাজিক আচরণ ও (খ) সামাজিক আচরণ।

(ক) **প্রাক্-সামাজিক আচরণ ঃ** জন্মের সময় হইতে প্রায় দেড়মাস পর্যন্ত প্রতেকটি শিশু থাকে একটি অসামাজিক জীব। এই সময় শুধু তাহার দেহের প্রয়োজনগুলি মিটিলেই সে সন্তুষ্ট থাকে। মানুষ এবং বস্তুর পার্থক্য সে উপলব্ধি করে না। এই বয়সে শিশু মানুষ এবং পশুপাখীর কণ্ঠস্বরের পার্থক্যও বুঝিতে পারে না। দ্বিতীয় মাস হইতে শিশু মানুষ চিনিতে পারে। তৃতীয় মাসে সে অপরের উপস্থিতিতে খুশি হয়। তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া তাহাকে ভুলানো যায়। তাহাকে একা ফেলিয়া গেলে সে কাঁদে। এই সময় হইতেই তাহার প্রকৃত সমাজচেতনা শুরু হইয়া যায়।

(খ) **সামাজিক আচরণ ঃ** শিশুর প্রথম সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় বয়স্কদের সঙ্গে কারণ বয়স্ক ব্যক্তিরাই শিশুর জীবনের প্রথম সঙ্গী। প্রথম দেড় মাস শিশু মানুষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে কিন্তু প্রায় দুই মাস বয়স হইতেই শিশু মানুষের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া ঘাড় ফিরাইতে পারে এবং মানুষের মুখ দেখিয়া হাসিয়া ওঠে। শিশুর মুখের হাসিই তাহার সমাজচেতনার প্রথম স্ফূর্তি অর্থাৎ এই সময় শিশু সর্বপ্রথম তাহার পাশে অপর ব্যক্তির উপস্থিতি উপলব্ধি করে এবং তাহার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

তৃতীয় মাসে ঃ সে অপরের উপস্থিতিতে খুশি হয় এবং মানুষ দেখিলে হাত-পা ছুঁড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করে। এই সময় শিশুর সঙ্গে কথা বলিলে সে কান্না থামায় এবং কোনরূপ শব্দ করিয়া অন্যদিকে তাহার মনযোগ ফিরান যায়। এই বয়সে একা ফেলিয়া গেলে সে কাঁদে। তৃতীয় মাসেই শিশু মাকে চিনিতে পারে।

চতুর্থ মাসে ঃ শিশুর সঙ্গে কেহ খেলা করিলে কিংবা কথা বলিলে সে হাসিয়া প্রত্যুত্তর দেয়। এই বয়সেও কণ্ঠস্বরের তারতম্য তেমন উপলব্ধি করে না। ক্রুদ্ধ কিংবা প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর শিশুর মুখে হাসি ফুটাইতে সমান কার্যকর।

পঞ্চম মাসে ঃ তখন হইতে শিশু কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য করে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কিংবা ক্রুদ্ধ চাহনিতে শিশু ভীত হইয়া পড়ে। মিষ্টস্বর এবং মধুর চাহনিতে

তাহার আনন্দের সঞ্চার হয়। খাঁটি এবং কৃত্রিম ক্রোধের পার্থক্য বোঝার তখনও ক্ষমতা জন্মায় না। পঞ্চম মাসে শিশু পরিচিত মুখ স্মরণ করিতে পারে এবং চেনা-অচেনায় পার্থক্য বোঝে। এই সময়েই শিশু অন্য শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

ষষ্ঠ মাসে ঃ বয়স্কদের প্রতি শিশুর মনোভাব থাকে আক্রমণাত্মক। সে বড়দের চুল ছিঁড়িয়া নাকমুখ খামচাইয়া দিতে চায়, চশমা ও বস্ত্রাদি ধরিয়া টানে। এতদ্ব্যতীত মুখের নানারকম ভঙ্গী করিতে পারে। ষষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে অচেনা মুখ দেখিলে তাহার মধ্যে একটা লজ্জা ও ভয় জাগে। অপরিচিতদের প্রতি যেমন লজ্জা ও ভয় থাকে পরিচিতদের প্রতি তেমনি একটা বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখা যায়।

অষ্টম কিংবা নবম মাসে ঃ শিশুর ভাষা শেখার প্রচেষ্টা শুরু হয়। বড়দের অনুকরণ করিয়া সে হাতে তালি দিতে কিংবা টা টা করিতে পারে।

দশম হইতে দ্বাদশ মাসের মধ্যে শিশু আয়নায় প্রতিফলিত আপন প্রতিবিম্বের সহিত খেলে এবং উহাকে চুম্বন করে। এক বৎসর বয়সের সময় শিশুকে না না বলিয়া কোন কাজ হইতে বিরত করা যায়। এই বয়সে শিশু অপরিচিত লোক দেখিলে ভয় পায়। নবম-দশম মাসে শিশুর লজ্জা খুব বেশী থাকে এবং এই সময়টি অচেনা বয়স (strange age) বলিয়া পরিচিত। দ্বিতীয় বৎসরের শেষার্ধে আবার একটি অচেনা অধ্যায় আসে। এই সময় অচেনা লোক শিশুকে কোলে নিতে চাহিলে সে একেবারে মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া ফেলে। ১৫ মাস বয়সে শিশু বড়দের সঙ্গ খুব পছন্দ করে এবং নানা কাজে তাহাদের অনুকরণ করিতে শেখে। দুই বৎসর বয়সে শিশু অপরের দেখাদেখি নিজেই খাইতে, পোশাক পরিধান করিতে এবং তাহার খেলাঘরের সামগ্রীগুলি গোছগাছ করিয়া রাখিতে আরম্ভ করে। শুধু বড়দের নকল করিয়াই শিশু জীবনে এতখানি স্বাবলম্বী হইয়া ওঠে।

4. শিশুর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন উপাদান
(Factors of development)

দেহের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য অবস্থা শিশুর ক্রমবিকাশের ধারা ও নক্‌শাকে নিয়ন্ত্রণ করে। শিশুর দৈহিক বিকাশের মূলে রহিয়াছে নানা উপাদান, যথা—খাদ্য, সাধারণ স্বাস্থ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আবার সূর্যালোক, উন্মুক্ত বায়ু ও আবহাওয়া প্রধান। পরন্তু সামাজিক সম্পর্ক ও বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী তাহার ব্যক্তিত্বের কাঠামো নির্মাণে সাহায্য করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ কোন একটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল নয়, উপাদানগুলি আবার পরস্পর ওতপ্রোত জড়িত। শিশুর ক্রমবিকাশে উহাদের কোন্‌টির ভূমিকা যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই। তবে ক্রমশঃ কম গুরুত্ব হিসাবে নিম্নে উহাদের আলোচনা করা হইল।

(১) বুদ্ধি (Intelligence): সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে সহজাত বুদ্ধিই বোধহয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। সাধারণতঃ বুদ্ধিমান শিশুর বিকাশের গতি দ্রুত এবং নিরেট শিশুদের গতি মন্থর হইয়া থাকে। হাঁটার ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে খুব চালাক শিশুরা তের মাসে হাঁটে, মাঝামাঝিরা চৌদ্দ মাসে, অপেক্ষাকৃত নিরেট শিশুরা বাইশ মাসে এবং একেবারে বোকার দল (idiots) তিরিশ মাস বয়সে হাঁটে। কথা বলার ব্যাপারে খুব চালাক শিশুরা এগার মাসে, সাধারণ শিশুরা ষোল মাসে, অল্পবুদ্ধি শিশুরা চৌত্রিশ এবং বোকারা একান্ন মাসে কথা বলা শুরু করে।

(২) যৌন পার্থক্য (Sex): প্রাক্‌-শৈশবে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বুদ্ধির মাত্রা বেশী থাকে। কিন্তু তারপরে অন্ততঃ কথা বলার ব্যাপারে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই আগাইয়া যায়। দৈহিক পুষ্টিও ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের আগে ঘটে। তাই মেয়েদের মধ্যে যৌনবাসনা আগে জাগ্রত হয় এবং মনের বিকাশ ঘটে ছেলেদের চাইতে আগে।

(৩) অন্তঃনিস্রাবী গ্রন্থী (Glands of Internal secretion): কতকগুলি গ্রন্থির অন্তঃসরণ ও শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় কণ্ঠে অবস্থিত থাইরয়েডের (Thyroid) নিকটবর্তী প্যারাথাইরয়েড (Parathyroid) গ্রন্থিসমূহ রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নির্ধারিত করে। এই গ্রন্থিগুলির অভাব (deficiency) ঘটিলে অস্থির বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং মাংসপেশীর উত্তেজনা অতিশয় বৃদ্ধি (hyperexcitability of the muscles) পায়। থাইরয়েড গ্রন্থিজাত থাইরক্সিনও শিশুর শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। ইহাদের অভাবে 'ক্রেটিন' (cretin) বা বিকলাঙ্গ নির্বোধ (deformed idiot) শিশুর সৃষ্টি হয়। বক্ষে অবস্থিত থাইমাস গ্রন্থি (thymus) কিংবা মস্তকের নিম্নভাগে অবস্থিত পাইনিয়াল গ্রন্থিসমূহ (pineal glands) অতিমাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠিলে শিশুর মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং বাল্যাবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। যৌনগ্রন্থিসমূহের অভাবে যৌনচেতনা ঘটিতে বিলম্ব ঘটে। পরন্তু উহারা সক্রিয় হইয়া উঠিলে শিশুর অকালে যৌনচেতনার উদ্গম হয়।

(৪) **পুষ্টি** (Nutrition) **:** ক্রমবিকাশের অন্যতম উপাদান হইল পুষ্টি। পুষ্টি বলিতে শুধু খাদ্যের পরিমাণই বুঝায় না, উহার গুণাগুণও পুষ্টির অন্তর্গত। শৈশবের খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব ঘটিলে রিকেটস্, দাঁতের রোগ এবং আরও হাজার রকমের গোলমাল দেখা দেয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে প্রত্যেকটি সুস্থ ও সবল ব্যক্তি শৈশবে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য পাইয়াছে।

(৫) **উন্মুক্ত বায়ু ও সূর্যালোক** (Fresh air and Sunlight) **:** দৈহিক বিকাশের জন্য উন্মুক্ত বায়ু ও সূর্যালোক একেবারে অপরিহার্য। তবে মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে উহার দান কতখানি তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই।

(৬) **আঘাত এবং রোগপীড়া** (Injuries and Diseases) **:** শৈশবে কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে কিংবা মস্তিষ্কে কোন গুরুতর আঘাত লাগিলে মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। অনবরত রোগে ভুগিতে থাকিলে দৈহিক বিকাশও বিলম্বিত হইয়া থাকে।

(৭) **পরিবারের শিশুর স্থান** (Position in the Family) **:** পরিবারে শিশুর স্থানও শিশুর ক্রমবিকাশের গতি নির্ধারিত করে। দেখা গিয়াছে প্রথম সন্তানের চেয়ে পরবর্তী সন্তানদের ক্রমবিকাশের গতি দ্রুত। ইহার কারণ অবশ্যই এই যে পরবর্তী শিশুরা অগ্রজদের অনুকরণের যে সুবিধা পায় প্রথম শিশুটি সচরাচর সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকে। একই কারণে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ সন্তানটি যদি অগ্রজদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হয় তবে তাহারও মানসিক বিকাশে অনেক বিলম্ব ঘটে কারণ অনুকরণ করিবার মত আদর্শ নমুনা তাহার সামনে থাকে না। তাই সে একেবারে শিশু বনিয়া যায়।

(৮) **জাতি এবং সংস্কৃতি** (Race and Culture) **:** বিশেষজ্ঞদের মতে জাতি এবং সংস্কৃতির অবদানও শিশুর ক্রমবিকাশে কম নয়। উদাহরণ হিসাবে তাঁহারা শ্বেতকায় জাতির সহিত কৃষ্ণকায় নিগ্রো সন্তানদের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে কৃষ্ণকায় শিশুরা শ্বেতশিশুর চেয়ে বুদ্ধিতে হীন। কিন্তু শ্বেতজাতি দীর্ঘকাল ধরিয়া যে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছে কৃষ্ণকায় শিশুরা সেই সকল সুবিধা না পাওয়া পর্যন্ত বুদ্ধির ক্ষেত্রে এই জাতিগত তুলনা চলে না।

সপ্তম অধ্যায়

গৃহে অসুস্থ ব্যক্তির যত্ন
(Care of the sick at home)

1. গৃহশুশ্রূষার মূলনীতি (Basic principles of home nursing) :

প্রতি গৃহেই অল্পবিস্তর রোগপীড়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গৃহিণী অথবা অপর কোন বয়ঃস্থা মহিলাকে শুশ্রূষার দায়িত্ব লইতে হয়। সুতরাং গৃহশুশ্রূষার মূলনীতিগুলি সকলের জানা থাকা উচিত। গৃহশুশ্রূষার মূল কথা হইল (১) রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলা এবং (২) সংক্রামক রোগ হইলে রোগের বিস্তার বন্ধ করা।

(১) রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলাই হইল সবচেয়ে প্রথম কাজ। একজন সুস্থ ব্যক্তি তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলি যেমন স্নান, আহার ইত্যাদি নিজেই মিটাইতে পারে কিন্তু একজন অসুস্থ ব্যক্তি অপরের সাহায্য ব্যতীত এই কাজগুলি সমাধা করিতে পারে না। তাই তাহার শুশ্রূষার প্রয়োজন। রোগীর প্রয়োজনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :

(ক) দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন : স্নান, আহার, দেহের পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি দৈহিক প্রয়োজন এবং স্নেহ প্রীতিলাভ মানসিক প্রয়োজনের অন্তর্গত।

(খ) পারিপার্শ্বিকস্থিত প্রয়োজন : বস্ত্রাদির পরিচ্ছন্নতা, রোগিকক্ষে আলো-হাওয়া প্রবেশের সুযোগ ইত্যাদি পারিপার্শ্বিকস্থিত প্রয়োজনের অন্তর্গত।

(গ) চিকিৎসাগত ও শুশ্রূষাগত প্রয়োজন :

(i) উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক রোগনির্ণয়,

(ii) নির্ভুল চিকিৎসা ও উপযুক্ত ঔষধপথ্য লাভ,

(iii) চিকিৎসকের নির্দেশমত কোন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কর্তৃক শুশ্রূষা লাভ।

রোগীর উপরোক্ত প্রয়োজন মেটান এবং রোগীর আরোগ্যলাভে সাহায্য করা গৃহ-শুশ্রূষার প্রথম ও প্রধান কথা।

(২) ব্যাধির বিস্তার বন্ধ করা : পরিবেশকে রোগমুক্ত রাখা গৃহশুশ্রূষার অন্যতম মূলনীতি। সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে সামান্য অসাবধানতাতেই রোগ ছড়াইয়া পড়ে। তাই শুশ্রূষাকারিণীকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হয় এবং ব্যাধির প্রসার বন্ধ করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। রোগভোগকালে, ব্যাধির অবসানে কিংবা রোগীর মৃত্যু ঘটিলে রোগীর কক্ষের সমস্ত দ্রব্যাদি, আসবাব, রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র, পুস্তক, বিছানা, বাসনকোসন ইত্যাদি নির্বীজিত করিয়া লইতে হয়। রোগি-কক্ষ নির্বীজিত করাও একান্ত প্রয়োজন।

রোগমুক্তির পর রোগীর দেহ নির্বীজিত করিয়া ফেলা এবং যতদিন রোগ ছড়াইবার সম্ভাবনা থাকে ততদিন রোগীকে গৃহে সংরুদ্ধ রাখা গৃহশুশ্রূষার অন্যতম মূলনীতি।

এই নীতিগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইলে গৃহশুশ্রূষা সফল হইয়াছে বলা যায়।

2. রোগীর সাধারণ যত্ন
(General care of the Patient)

(a) **রোগি-কক্ষ নির্বাচন ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা** (Selection of sick room & its other requirements) ঃ

2. **রোগি-কক্ষ নির্বাচন ঃ** উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে রোগি যাহাতে অবস্থান করিতে পারে তাহা দেখাই শুশ্রূষাকারিণীর প্রধান কাজ। একটি প্রশস্ত, প্রচুর আলোহাওয়াযুক্ত, ধূলিধূমবর্জিত কক্ষই রোগীর উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় সাহায্য করিতে পারে। হাসপাতালের কক্ষগুলি সাধারণতঃ রোগীর স্বাস্থ্যের উপযোগী করিয়াই তৈয়ারী হয়, কিন্তু গৃহে রোগি-কক্ষ নির্বাচনের সুযোগ সীমিত থাকে। বাড়ির মধ্যে অন্তত সবচেয়ে আলোবাতাসযুক্ত ও নির্জন ঘরখানিই রোগীর জন্য বাছিয়া লওয়া উচিত। রোগীর পক্ষে ঔষধ, পথ্য এবং শুশ্রূষা যতখানি প্রয়োজনীয়, সূর্যালোকও ঠিক ততখানি প্রয়োজনীয়। শ্রীমতী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বলিয়াছেন, 'আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জানিয়াছি প্রত্যেকটি রোগি চায় আলো। গাছের গতি যেমন আলোর দিকে, প্রত্যেকটি রোগী তেমনি সূর্যালোকের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া থাকে, উপযুক্ত আলোক এবং হাওয়া পাইলে রোগী সহজেই সারিয়া ওঠে।' রোগীর আপনার ঘরখানি যদি রোগি-কক্ষ নির্বাচিত হইবার উপযুক্ত হয়, তবে রোগীর সেই ঘরে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। রোগি-কক্ষের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থাকিলে উহা আদর্শ রোগী-কক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহার সুবিধা এই যে রোগীর রাত্রির পথ্য, ফল, দুধ, মিষ্টি কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি ঐ কক্ষে একটি টেবিলের উপর রাখিয়া দেওয়া যায় অথচ ঐগুলি কাহারো নজরে আসে না।

আসবাব-পত্রের সংস্থান ঃ অপ্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাব রোগি-কক্ষ হইতে অপসারিত করিবে। দরজা-জানালাগুলি হইবে বেশ বড় বড় এবং আড়ম্বর শূন্য। জানালায় কোন নক্শা কিংবা জাফ্রি কাটা থাকিবে না, কারণ তাহাতে ধূলাবালি ও মাকড়সার জাল জমিয়া ঘর নোংরা হয়। একটি খাট, দুইটি টেবিল, দুইখানি সাধারণ চেয়ার ও একটি ইজি চেয়ারই রোগি-কক্ষের পক্ষে যথেষ্ট। জামা-কাপড় ইত্যাদি রাখিবার জন্য একটি আলমারিও রাখা চলে। খাটখানি এমনভাবে রাখিবে যাহাতে বিছানায় শুইয়া শুইয়া রোগি নীল আকাশ দেখিতে পায় অথচ ঝড়-ঝাপ্টা বা দমকা হাওয়া আসিয়া রোগীর গায় না লাগিতে পারে। প্রয়োজন মনে করিলে রোগীর জানালায় পর্দা লাগানো যাইতে পারে। কক্ষের সমস্ত আসবাব যথাসাধ্য সুরক্ষিত রাখিবার চেষ্টা করিবে। যে টেবিলে ধুইবার সরঞ্জাম থাকে, উহা ম্যাকিনটোশ দিয়া মুড়িয়া দিবে। কম্বল নষ্ট হইবার ভয় থাকিলে

রোগি-কক্ষ ঃ— 1. জানালা, 2. খাট. 3. টেবিল, 4. আগন্তুকদের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ার, 5. শুশ্রূষাকারিণীর জন্য নির্দিষ্ট আসন, 6. আলমারি।
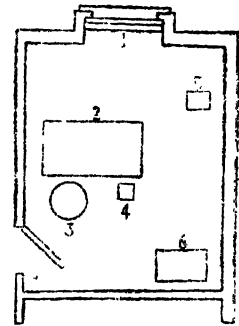
পুরু ব্রাউন পেপার দিয়া কম্বল ঢাকিয়া দিবে। রোগি-কক্ষের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের মধ্যে রহিয়াছে—

(১) একটি ক্লিনিকাল থার্মোমিটার,
(২) ঔষধ মাপিবার ও খাওয়াইবার গ্লাশ,
(৩ ফিডিং কাপ,
(৪) কাপ, ডিশ পীরিচ ও চামচ,
(৫) মুখ ধোওয়াইবার গামলা,
(৬) চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীর হাত মুছিবার জন্য দুইখানি স্বতন্ত্র তোয়ালে,
(৭) একটি কমোড এবং একটি বেড-প্যান,
(৮) একটি গরম (hot water bag) ও একটি ঠান্ডা জলের ব্যাগ (Ice bag),
(৯) এক বালতি জল,
(১০) একটি মগ,
(১১) সাবান,
(১২) এক কুজা পানীয় জল,
(১৩) একটি নোটবুক ও পেন্সিল,
(১৪) একটি ডুশ,
(১৫) একটি সেকেণ্ডের কাঁটাযুক্ত ঘড়ি।

রোগীর ব্যবহারের চিরুনি, টয়লেটের সামান্য জিনিসপত্র, বাসনকোসন রোগি-কক্ষের সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে রাখা যায়। আসবাবের বাহুল্য যেমন রোগীর স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, একেবারে সজ্জাবিহীন শূন্যকক্ষও রোগীর মনকে নিস্তেজ ও পীড়িত করিয়া তোলে। এইজন্য রোগি-কক্ষে সামান্য পুষ্পবিন্যাস দরকার। তবে ফুলের রং, বর্ণ, গন্ধ ও পরিমাণ নিরূপণে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তীব্র গন্ধযুক্ত ফুল রোগীর পক্ষে উপযুক্ত নয়। এতদ্ব্যতীত ফুলগুলি রাত্রে সরাইয়া ফেলা উচিত, কারণ ফুলের আকর্ষণে নানারকম কীট-পতঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। একমাত্র মানিপ্ল্যান্ট ব্যতীত অন্য কোনরূপ গাছপালাও রোগীর ঘরে রাখা উচিত নয়।

আলোর বন্দোবস্ত: বৈদ্যুতিক আলোই রোগি-কক্ষের পক্ষে উপযোগী। এই আলোকের প্রধান সুবিধা এই যে ইহা বায়ুস্থিত অক্সিজেন টানিয়া লয় না। উপরন্তু প্রয়োজন হইলে বৈদ্যুতিক আলো কাগজ দিয়া মুড়িয়া রাখা চলে। ইহাতে রোগীর চোখে তীব্র আলো লাগে না অথচ শুশ্রূষাকারিণীরও কাজের অসুবিধা হয় না। রাত্রে আবার স্বল্প পাওয়ারের নীল বা সবুজ আলো জ্বালাইয়া রাখা চলে।

রোগি-কক্ষে বায়ু সঞ্চালন: রোগি-কক্ষে বায়ু সঞ্চালনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ঘরের দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দিয়া বাহিরের মুক্ত বায়ু ভিতরে টানিয়া আনা। উত্তাপ পরিমাপের জন্য কক্ষে একটি থার্মোমিটার রাখা চলে। শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র দিয়া অনায়াসে কক্ষের উত্তাপ ঠিক রাখা যায়। কিন্তু সে সুবিধা না থাকিলে সবচেয়ে প্রশস্ত কক্ষটি রোগীর জন্য নির্বাচন করাই শ্রেষ্ঠ। রোগীর পক্ষে দক্ষিণ, পূর্ব অথবা দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী ঘরই প্রশস্ত। এইরূপ ঘরে উন্মুক্ত হাওয়া ও পর্যাপ্ত সূর্যকিরণ মেলে। উত্তরমুখী ঘর রোগীর একেবারে অনুপযুক্ত কারণ শীতকালে

উত্তরে হাওয়া যেমন সুখপ্রদ নয়, তেমনি উত্তরের ঘরে সূর্যালোক প্রবেশেরও সম্ভাবনা নাই। রোগি-কক্ষে বায়ু চলাচলের সুবিধার জন্য বড় বড় জানালা থাকা উচিত এবং জানাগুলি সর্বদাই খুলিয়া রাখিবে। রাতের হাওয়া রোগীর পক্ষে খারাপ এ খুবই ভুল ধারণা। শীতকালে সমস্ত জানালা খুলিয়া রাখা সম্ভব নয়। বায়ু-সঞ্চালনের জন্য ঘরে তাই ঘুলঘুলি অথবা স্কাইলাইট থাকা উচিত। একটি লোকের জন্য প্রতি ঘণ্টায় ৩০০০ ঘনফুট বায়ু প্রয়োজন। কমপক্ষে ১০০০ ঘনফুট বায়ু না হইলে রোগীর চলে না। তাই রোগি-কক্ষটি হওয়া উচিত ১০ ফুট লম্বা, ১০ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট উচ্চ।

(b) শিশু প্রাপ্তবয়স্ক এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের শুশ্রূষা (Nursing of the patient at different age levels) :

প্রতি গৃহেই শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিরা কোন-না-কোন সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহাদের শুশ্রূষার প্রয়োজন হয়।

শিশুর শুশ্রূষা : শিশুদের শুশ্রূষা সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ কারণ [illegible] খুব ছোট শিশুরা নিজেদের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করিতে পারে না। এই কারণে শিশুর নিদ্রা, ক্রন্দন, মুখের ভাব, জিহ্বা, মল, চর্ম ও নিঃস্রাব পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হয় এবং শিশুর অসুস্থতা অনুমান করিয়া লইতে হয়।

(১) **নিদ্রা :** শিশুর সুনিদ্রা হইয়াছে, না ঘুমের মধ্যে সে ছটফট করিয়াছে।

(২) **ক্রন্দন :** ছোট শিশুর ক্রন্দন সাধারণতঃ অবস্থাজ্ঞাপক। নাকি সুরে ক্রন্দন, ভীষণ চীৎকার, অনবরত কান্না শিশুর বিভিন্ন অসুবিধা প্রকাশ করে। শুশ্রূষাকারিণীকে এই ক্রন্দন পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সুস্থ শিশুরা সর্বদা সজোরে ক্রন্দন করে।

(৩) **মুখের ভাব :** বিভিন্ন রকম রোগে শিশুর মুখে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ পায়। রক্তিমাভা জ্বর সূচনা করে, হলদে ভাব জনডিস (Jaundice) রোগের সূচক। পরন্তু নীল আভা তাহার হৃৎপিণ্ডের (heart) কষ্ট প্রকাশ করে।

ভীষণ ভেদ বমি হইলে শিশুর মুখে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

(৪) **জিহ্বা :** জিহ্বায় কোন আবরণ পড়িয়াছে কি না।

(৫) **মল :** মলের পরিমাণ ও বর্ণে কিছু অস্বাভাবিকত্ব আছে কিনা লক্ষ্য করিতে হইবে। অসুস্থ হইলে শিশুর মলের ঘনত্ব, বর্ণ, সংখ্যা ও পরিমাণের দিকে নজর রাখিতে হয়।

(৬) **চর্ম :** দেহে তাপ অনুভব করা যাইতেছে কিনা অথবা চর্মে কোন র‍্যাশ বাহির হইয়াছে কিনা।

(৭) **নিঃস্রাব :** নাক অথবা কান দিয়া কখন কখন নিঃস্রাব হইতে থাকে। এই নিঃস্রাব লক্ষ্য করিলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে।

শিশুদের শুশ্রূষা করার দ্বিতীয় অসুবিধা হইল যে তাহারা সাধারণতঃ অবুঝ। অসুস্থ হইলে আরও বেশী অবুঝ হইয়া পড়ে এবং ঔষধ-পথ্য গ্রহণে আপত্তি জানায়। শুশ্রূষাকারিণীর তখন শিশুর আব্দার বা আপত্তিতে নরম হইতে নাই। তাহার যাহা করণীয় তিনি করিবেন।

Premature baby-র শুশ্রূষা : এইসব শিশুরা অত্যন্ত দুর্বল থাকে। তাই জন্মের পরে তাহাদের স্নানের পরিবর্তে ঈষদুষ্ণ তেল দ্বারা ঘষিয়া দিয়া নরম কাপড় দিয়া দেহ মুছাইয়া দিতে হয়। তারপর তুলা দিয়া জড়াইয়া একটি ফ্লানেল কাপড় পরাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদের জন্য incubator প্রয়োজন হইতে পারে। Incubator না থাকিলে গরম জলের ব্যাগের সাহায্যে দেহ গরম রাখিবে।

প্রাপ্তবয়স্কদের শুশ্রূষা : একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির শুশ্রূষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। অত্যন্ত পীড়িত না হইলে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে হাতের কাছে সব কিছু জোগাইয়া দিলে সে নিজেই তাহার মুখ ধোওয়া, গা স্পঞ্জ করা, ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করার কাজ করিতে পারে। বস্তুতঃ একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি গুরুতর অসুস্থ না হইলে নিজের কাজ নিজেই করা পছন্দ করেন এবং অপরের হাতে মুখ ধুইয়া বা অপরের হাতে খাবার গ্রহণ করিয়া তাহার কখনো তৃপ্তি হয় না। অল্প অসুস্থ ব্যক্তির কাজগুলি শুশ্রূষাকারিণী করিয়া দিবেন না, কেবল তাহার দৈনন্দিন কাজগুলি সম্পন্ন করিতে সহায়তা করিবেন। তবে গুরুতর অসুস্থ হইলে তাহার সমস্ত ভারই গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃদ্ধদের শুশ্রূষা : বার্ধক্যকে দ্বিতীয় শৈশব বলা হয়। শিশুর মতই বৃদ্ধদের শুশ্রূষাও কঠিন কাজ কারণ বৃদ্ধ বয়সে মানুষ শিশুর মতই অবুঝ এবং আরও বেশী স্পর্শকাতর হইয়া পড়ে। সামান্য ত্রুটি কিংবা অমনোযোগ লক্ষ্য করিলে তাহারা নিজেদের অবহেলিত মনে করে। শুশ্রূষাকারিণীকে তাই একদিকে যেমন রোগীর দৈহিক প্রয়োজনগুলির দিকে খেয়াল রাখিতে হয় অপর দিকে তেমন আবার তাহার মনের দাবীও মিটাইতে হয়।

সমস্ত রুগ্ন ব্যক্তির বিশেষভাবে মুখের যত্ন লইতে হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পিঠেরও বিশেষ যত্ন লওয়া কর্তব্য।

রোগীর পিঠের যত্ন : দীর্ঘদিন বিছানায় শুইয়া থাকিলে রোগীর পিঠে অনবরত চাপ ও ঘষা লাগে বলিয়া পিঠে শয্যাক্ষত হইতে চায়। এই ক্ষত নিবারণের জন্য রোগীর পিঠের যত্ন লওয়া একান্ত প্রয়োজন। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সহজে বেড-সোর হইতে চায়।

বেড-সোর বা শয্যাক্ষত (Bed sore) : বেড-সোর কথাটির অর্থ শয্যাজনিত চর্মের ঘা। দীর্ঘদিন যাবৎ শয্যাশায়ী হইয়া থাকিবার ফলে রোগীর দেহের কোন কোন অংশের রক্ত চলাচল কমিয়া আসে এবং সেই সমস্ত জায়গায় বেড-সোর হইতে চায়। শরীরের যে সব অংশে অনবরত ঘষা ও চাপ লাগে সেই সকল স্থানেও বেড-সোর হইতে চায়। পিঠে এবং কোমরে সবচেয়ে বেশী শয্যাক্ষত দেখা যায়। তাছাড়া যেসব অংশে চর্মের উপর হাড় বেশ উঁচু হইয়া থাকে সেই সব স্থানে বেড-সোর দেখা দেয়, যেমন—কাঁধ, কনুই, নিতম্ব হাটু ও পায়ের গোড়ালি ইত্যাদি। বেড-সোর নিবারণের জন্য শুশ্রূষাকারিণীকে সর্বদা সজাগ থাকিতে হয় কারণ একবার বেড-সোর দেখা দিলে উহা দ্রুত ছড়াইতে থাকে। এইজন্য বেড-সোরের চিকিৎসার চেয়ে বেড-সোর প্রতিরোধ করা সহজ কাজ।

বেড-সোরের সূচনা ও কারণ : বেড-সোর দেখা দিবার পূর্বে চর্মের সেই স্থানটি লালবর্ণ হইয়া ওঠে। তৎক্ষণাৎ উহা প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না

পারিলে বেড-সোর এত দ্রুত ছড়াইতে থাকে যে উহার প্রসার বন্ধ করা শুশ্রূষাকারিণীর পক্ষে এক দুরূহ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

বেড-সোর হইবার কারণ প্রধানতঃ চারিটি ঃ

(১) **অসাবধানতাবশতঃ রোগীকে নাড়াচাড়া করা ঃ** শুশ্রূষারিণীর অসাবধানতা বেড-সোরের একটি কারণ। বেড-প্যান কিংবা বেড-রেস্টের ধারাল কিনারায় ঘষা লাগিয়া বেড-সোর হইতে পারে।

(২) **ঘর্ষণ ঃ** চাদর জড় অথবা ভাঁজ হইয়া থাকিবার ফলে কিংবা বিছানায় রুটির গুঁড়া জমা হইয়া থাকিলে ঘর্ষণের সৃষ্টি হইতে পারে। ঘর্ষণের ফলে সচরাচর জানুদ্বয়ের ভিতরের দিকে, মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগে, গোড়ালির ভিতর দিকে এবং কানে বেড-সোর হইয়া থাকে।

(৩) **চাপ ঃ** বহুদিন ধরিয়া শয্যায় একইভাবে শুইয়া থাকিবার ফলে দেহের কোন কোন অংশে বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে ও কোমরে অত্যন্ত চাপ পড়িতে পারে এবং রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া অবশেষে বেড-সোর সৃষ্টি করে।

(৪) **দেহের কোন অংশ অনবরত ভিজা থাকিবার ফলে ঃ** দেহের অংশবিশেষ অনবরত ভিজা থাকিতে থাকিতে সেই স্থানের চামড়া নরম হইয়া আসে এবং সহজেই সেখানে ক্ষত হইতে পারে। অতিরিক্ত ঘাম, মলমূত্র ধারণে অক্ষমতার জন্য, আবার স্নানের পরে রোগীর দেহ ভাল করিয়া না মোছাইয়া দিলেও শরীর ভিজা থাকে।

বেড-সোর প্রতিরোধের উপায় ঃ

(১) চাদরে কিংবা ম্যাকিনটোশে যেন ভাঁজ না পড়ে, কুঁচকাইয়া না যায় কিংবা রুটির গুঁড়া না থাকে।

(২) দিনে অন্ততঃ দুইবার করিয়া সাবানজল দিয়া পিঠ ও কোমর উত্তমরূপে মাখাইবে। শুশ্রূষাকারিণীর সাবানজল লইয়া নির্দিষ্ট স্থানটিতে বৃত্তাকারে মাখাইবে। ঐ জল চর্মে শুষিয়া গেলে অলিভ অয়েল ও স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া সকলস্থানে ঘষিয়া দিবে এবং রোগীর গায় একটু পাউডার ছড়াইয়া দিবে।

(৩) রোগি-দেহের কোন অংশে যাহাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে এবং প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর অক্ষম রোগীদের পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া দিবে।

(৪) শরীরের কোথাও জল জমিয়া থাকিতে দিবে না।

(৫) চর্মে কোনরূপ রুক্ষতা দেখা দিলে স্পিরিট ও অলিভ ওয়েল সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ঐ স্থানে মাখাইবে।

বেড-সোরের চিকিৎসা ঃ প্রতিরোধের সবরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি বেড-সোর দেখা দেয় কিংবা চর্মের কোন অংশ লাল হইয়া ওঠে তবে শুশ্রূষাকারিণীর প্রথম কর্তব্য হইবে পরদিন চিকিৎসক আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানটির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং ইতোমধ্যে

(১) শুশ্রূষাকারিণী এয়ার কুশন দিয়া বেড-সোরকে সব রকম চাপ ও ঘর্ষণ হইতে রক্ষা করিবে।

(২) দেহের অন্যত্র যাহাতে বেড-সোর না ছড়াইতে পারে এইজন্য ক্ষতস্থানটি পরিষ্কার রাখিবে।

(৩) বেড-সোরের আশেপাশের উঁচু হাড়বিশিষ্ট স্থানগুলিতে দিনে অনেকবার অলিভ অয়েল ও স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া মাখাইবে।

(c) **রোগীর ঔষধ (Administration of drugs) :**

রোগীর ঔষধ দিবার দায়িত্বও শুশ্রূষাকারিণীর। উপযুক্ত ঔষধ, পথ্য ও শুশ্রূষার সাহায্যেই রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলা সম্ভব। দেহে ঔষধ প্রবেশ করাইবার নানারকম পথ আছে ; যথা—(ক) মুখ, (খ) নাক, (গ) ত্বক্ ও (ঘ) মলদ্বার।

(ক) **মুখের মধ্য দিয়া রোগীর দেহে ঔষধ দেওয়া :** রোগীকে ঔষধ খাওয়াইতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিবে :—

(১) ঔষধ দিবার পূর্বে সর্বদা ঔষধের লেবেল দেখিয়া নাম পড়িয়া লইবে। শুধুমাত্র গন্ধ শুঁকিয়া বা ঔষধের বর্ণ দেখিয়া কখন কোন্ ঔষধ দিতে হইবে আন্দাজ করিতে যাইবে না।

(২) চিকিৎসক যদি ঔষধ দিবার কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ না করিয়া দেন তবে ঔষধ দিবার মোটামুটি নিম্নলিখিত সময় অনুসরণ করা যাইতে পারে :

ঔষধ দেওয়া হইবে	সময়	রাত্রি	এবং	দিন
দুই ঘণ্টা অন্তর	২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২	„		„
তিন ঘণ্টা অন্তর	৩, ৬, ৯, ১২	„		„
দিনে তিন বার	১০, ২, ৬		দিন	
দিনে চার বার	১০, ২, ৬, ১০	„		„

(৩) আহারের পর ঔষধ দিবার নির্দেশ থাকিলে আহার শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ দিবে এবং পূর্বে যদি ঔষধ দিবার নির্দেশ থাকে তবে আহারের অন্ততঃ ২০ মিনিট পূর্বে ঔষধ দিবে।

(৪) চিকিৎসকের বিশেষ নির্দেশ না থাকিলে সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও কখনও ঘুম ভাঙাইয়া ঔষধ দিবে না।

(৫) ঔষধ দিবার পূর্বে ঔষধের বোতলটি ঝাঁকিয়া লইবে।

(৬) ঔষধ দিবার পরে রোগীকে সর্বদা ছোট এক গ্লাস জল পান করিতে দিবে। ঔষধ খাইবার পরে রোগীর মুখ যদি অত্যন্ত বিস্বাদ লাগে তবে এই বিস্বাদ ভাব দূর করিবার জন্য মৌরী বা জোয়ান ইত্যাদি যে কোন মুখরোচক জিনিস দিবে। রোগীর মুখ যদি শুকনা বোধ হয় তবে ঔষধ দিবার পূর্বে মুখে একটু জল দিয়া লইবে।

(৭) খাইবার ঔষধ ব্যতীত অন্য যে-কোন ঔষধ যদি বিষাক্ত নাও হয় তথাপি সর্বদা পৃথক্ করিয়া রাখিবে।

(৮) বিষাক্ত ঔষধ ও খাইবার ঔষধের শিশির গড়ন ও বর্ণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিষাক্ত ঔষধের জন্য রঙিন শিশি এবং খাইবার ঔষধের জন্য সাদা শিশি ব্যবহার করিবে। বিষাক্ত ঔষধের শিশির গায় "বিষ" শব্দটি বড় করিয়া লিখিয়া দিবে।

(৯) সংক্রামক রোগীর ব্যবহৃত বাসনপত্র ও বস্ত্রাদির মতই তাহার ঔষধের গ্লাস, শিশি, মুখ ধুইবার গামলা ইত্যাদি পৃথক্ করিয়া রাখিবে।

(১০) ঔষধে লোহা থাকিলে দাঁত কালো হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য লৌহমিশ্রিত ঔষধ স্ট্র দিয়া রোগীকে গ্লাস হইতে টানিয়া খাইতে বলিবে।

মুখ দিয়া যেসব ঔষধ খাওয়ানো হয় তাহা সাধারণতঃ ছয় প্রকার—তরল (liquid), বটিকা (pills), চূর্ণ (powder), ট্যাবলেট (tablet) ক্যাপসুল (capsules), তৈলজাতীয় (oil) ঔষধ।

তরল ঔষধ (Liquid) ঃ রোগীর মুখে তরল ঔষধ দিবার পূর্বে উহা ঝাঁকিয়া লইবে। যে সব ঔষধের তলায় থিতানি পড়ে গ্লাসে ঢালিবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া রোগীর মুখে ঢালিয়া দিবে। তরল ঔষধ মেজার গ্লাসে ঢালিয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মেজার গ্লাস

ঔষধ ঢালিবার পরে শিশির ছিপি খুব ভাল করিয়া আঁটিয়া দিবে এবং ঔষধ খাওয়ানো হইয়া গেলে গ্লাসটি সঙ্গে সঙ্গে ধুইয়া শুকাইয়া ফেলিবে।

বটিকা (Pills) ঃ সাধারণতঃ একবারে একটি গোটা বটিকা খাইয়া ফেলিবার নিয়ম। অনেকের একটি ভুল ধারণা আছে যে গলার ভিতর বটিকা ফেলিয়া দিলে গিলিতে সুবিধা। রোগীর মুখে প্রথমে শুধু একটু জল ঢালিবে। তারপর জিহ্বার অগ্রভাগে বটিকাটি রাখিয়া রোগীকে গিলিতে বলিবে।
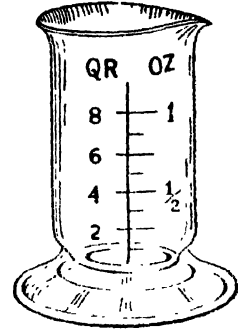
চূর্ণ (Powder) ঃ জলের সঙ্গে ঔষধের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। কখনও কখনও চিকিৎসক মধুর সঙ্গে চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইবার নির্দেশ দেন। শুশ্রূষাকারিণীর কাজ হইল চিকিৎসকের নির্দেশ পালন করা।

ট্যাবলেট (Tablets) ঃ বটিকার মতই ট্যাবলেট একসঙ্গে জল দিয়া গিলিয়া ফেলা যায় নতুবা চূর্ণ করিয়া জলের সঙ্গেও খাওয়া চলে। গলা অথবা বুকের কষ্টের জন্য যে ট্যাবলেট দেওয়া হয়, রোগীকে তাহা সর্বদা চুষিয়া খাইতে বলিবে।

ক্যাপসুল (Capsuls) ঃ একটি খাপে ভরা ঔষধ। রোগীকে সর্বদা গিলিয়া খাইতে দিবে।

তৈলাক্ত ঔষধ (Oil) ঃ যথা, ক্যাস্টর অয়েল অথবা কর্ডালিভার অয়েল। গ্লাসের ভিতর এবং কিনারায় পাতিলেবু কিংবা কমলালেবুর রস মাখাইয়া লইয়া ঔষধ ঢালিবে। এইবার খানিকটা লেবুর রস প্রথমে গ্লাসে ঢালিয়া দিয়া ঔষধ দিবে। তারপর আবার খানিকটা লেবুর রস ঢালিয়া দিবে। এইবার গ্লাসের সমস্ত পদার্থটুকু রোগীর মুখে ঢালিবে।

গরম দুধের সঙ্গে ক্যাস্টর অয়েল মিশাইয়াও রোগীকে দেওয়া যায়। একটি কাঁটা (fork) দিয়া বেশ করিয়া ক্যাস্টর অয়েল ও দুধ ফেটাইয়া লইবে। তারপর রোগীকে উহা খাইতে দিবে। তৈলাক্ত ঔষধ খাওয়াইবার জন্য সর্বদা একটি পৃথক গ্লাস ব্যবহার করিবে। লবণ ও জল দিয়া সহজেই ঐ গ্লাস পরিষ্কার করা চলে।

(খ) **নাক** ঃ ঔষধ দিবার আর একটি পথ হইল নাক। অত্যন্ত পীড়িত রোগীদের নিঃশ্বাসের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য নাসাপথে অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবে শিক্ষিত (trained) শুশ্রূষাকারিণী ব্যতীত গৃহে সাধারণ লোকেদের দিয়া এইরূপ অক্সিজেন দিবার চেষ্টা করা উচিত নয়।

(গ) ত্বক্ : দেহের ঔষধ প্রবেশের আর একটি পথ হইল ত্বক্। ইন্‌জেকশান ও মালিশ এই দুই ভাবে ত্বকের মধ্য দিয়া ঔষধ দেওয়া হয়। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী মালিশ করা কঠিন নয়, কিন্তু চিকিৎসক কিংবা শিক্ষিত শুশ্রূষাকারিণী ব্যতীত অপর কেহ রোগীকে ইন্‌জেকশন দিবার চেষ্টা করিবেন না।

(ঘ) মলদ্বার : মলদ্বার দিয়া রোগীকে এনিমা (enema) দেওয়া হয়।

অচেতন রোগীদের মুখ দিয়া খাওয়ান সম্ভব হয় না বলিয়া মলদ্বার দিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপভাবে খাওয়ানোকে এনিমা দেওয়া বলে। সাধারণ লবণ জলের (normal saline water) সঙ্গে গ্লুকোজ মিশাইয়া মলদ্বার দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে। চিকিৎসকের নিকট হইতে লবণ জল ও গ্লুকোজের পরিমাণ জানিয়া লইবে। রোগীকে এনিমার সাহায্যে খাইয়াইবার পূর্বে পরীক্ষা করিয়া লইবে রোগীর তলপেটে কোন মল জমা হইয়া আছে কিনা। সাধারণতঃ নল দিয়া যদি গরম জল বাহির হইয়া আসে তবে বুঝিবে রোগীর তলপেটে মল জমিয়া নাই, সুতরাং নির্ভয়ে খাদ্য দেওয়া চলিতে পারে।

রোগীর পথ্য (Administration of food) : শুধু ঔষধ ও শুশ্রূষাতেই রোগি সুস্থ হইয়া ওঠে না। তাহার সঙ্গে উপযুক্ত পথ্যও চাই। পথ্য রোগীর শরীর গঠনে সাহায্য করে। পথ্য রোগীর (১) ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে, (২) পেশীসমূহ গঠনে সাহায্য করে ও দেহে উত্তাপ সঞ্চার করে, এবং (৩) রোগীর দেহকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। উপরোক্ত সব কয়টি কাজ সাধনের জন্য আমাদের খাদ্যে প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য, কার্বোহাইড্রেট, ধাতবলবণ, ভাইটামিন ও জল থাকা দরকার। কলেরা, উদরাময় ইত্যাদি পীড়া হইলে স্বতন্ত্র কথা, নতুবা কি সুস্থ কি অসুস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনধারণের জন্য উল্লিখিত সব কয়টি উপাদান থাকা প্রয়োজন।

রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিবার সময় কয়েকটি নিয়ম মানিয়া চলিবে :

(ক) রোগীর বয়স, পেশা, শারীরিক অবস্থা ও আবহাওয়া অনুযায়ী খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত হইবে।

(খ) প্রত্যেকবারের খাদ্য রোগীকে তৃপ্তি দিবে, পরিমাণে বেশী হইবে না অথচ পূর্ণ খাদ্যমূল্য থাকিবে।

(গ) খাদ্যমূল্য বিচার করিয়া বাজারের সস্তা জিনিসের মধ্য হইতে খাদ্য তালিকা তৈরী করিবে।

(ঘ) যে ঋতুতে যে শাক-সবজি ও ফল পাওয়া যায় সেই ঋতুতে সেই সব শাক-সবজি ও ফল খাইতে দিবে। সময়ের জিনিস সুস্বাদু ও দামে সস্তা হয় এবং উহার খাদ্যমূল্যও বেশী থাকে।

(ঙ) চিকিৎসক সম্মতি দিলে রোগীর পছন্দমাফিক বিভিন্ন রকমের খাদ্য দেওয়া উচিত।

পথ্য পরিবেশন : চিকিৎসক রোগীর জন্য যে পরিমাণ খাদ্য নির্ধারণ করেন তাহা বিভিন্ন বারের আহারের মধ্যে সমপরিমাণে বণ্টন করিয়া খাওয়ান উচিত। রাত্রি বেলার চেয়ে দিনের বেলায় আহারের মাত্রা বেশী হইবে। চিকিৎসকের বিশেষ নির্দেশ না থাকিলে কখনো রোগীর ঘুম ভাঙাইয়া খাওয়ানো উচিত নয়।

রোগীর প্রত্যেক বার আহারের একটি নির্দিষ্ট সময় রাখিবে এবং ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রোগীকে খাইতে দিবে। রোগীর নিকটে খাবার আনিবার পূর্বে তাহাকে একটি আরামদায়ক ভঙ্গীতে বসাইবে এবং তাহার হাত ও মুখ ভাল করিয়া ধোয়াইয়া লইবে। সম্ভব হইলে রোগীর বিছানায় একটি বড় জলচৌকির উপরে খাদ্য পরিবেশন করিবে। রোগীর নিকট একেবারে একটির বেশী পদ (dish) পরিবেশন করিবে না কিংবা খাইবার সময় রোগীকে কোন তাড়া দিবে না। আহার শেষ হইলে সঙ্গে সঙ্গে এটো বাসন রোগি-কক্ষ হইতে সরাইয়া ফেলিবে।

শয্যাশায়ী রোগীদের পথ্য ঃ নিতান্ত দুর্বল ও পীড়িত রোগীদের সাধারণতঃ তরল খাদ্য দেওয়া হইয়া থাকে। যেসব রোগীর মাথা তুলিবার সামর্থ্য নাই তাহাদের চায়না ফিডারের সাহায্যে খাওয়াইতে হয়। কোন কোন রোগী চায়না ফিডারের চেয়ে আইডিয়াল ফিডারে খাওয়া বেশী পছন্দ করে। সেইক্ষেত্রে একটি টিউব বা স্ট্র রোগীর মুখে লাগাইয়া দিলে রোগী নিজেই খাদ্যদ্রব্য মুখ দিয়া টানিয়া লইতে পারিবে। প্রতিবার আহারের পর স্ট্র পোড়াইয়া ফেলিবে।

অষ্টম অধ্যায়	সাধারণ সংক্রামক রোগসমূহ (Common Infectious diseases)

1. শিশুদের সাধারণ রোগসমূহ (Common childhood diseases) :

আমাদের দেশের শিশুরা নানাবিধ রোগে ভুগিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অপুষ্টিজনিত রোগই হইল প্রধান।

অপুষ্টিজনিত রোগের প্রাথমিক লক্ষণ : শিশুর বৃদ্ধি হ্রাস পাইলে কিংবা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে, চোখের উজ্জ্বলতা নষ্ট হইলে, হাসিখুশিভাব কমিয়া আসিলে বা না থাকিলে, খেলাধুলায় অনিচ্ছা প্রকাশ পাইলে কিংবা শিশুর মেজাজ খিটখিটে হইয়া উঠিলে বুঝিতে হইবে শিশু উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য পাইতেছে না। তাহার দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকা দেখিয়া তখনই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

পুষ্টির অভাবে শৈশবে যেসব রোগ দেখা দেয় তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত রোগই হইল প্রধান :

(১) প্রোটিন—ক্যালোরী ম্যালনিউট্রিশন।

(২) ভাইটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রোগ।

(৩) রক্তাল্পতা—লোহ এবং ফোলিক অ্যাসিডের অভাবের জন্য।
ফোলিক অ্যাসিড ভাইটামিন 'বি'-র অন্তর্গত।

(১) **প্রোটিন—ক্যালোরী ম্যালনিউট্রিশন :** ক্যালোরীর অভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা প্রোটিনের অভাবে এই রোগ দেখা দেয়। এই রোগের কবলে পড়িলে শিশুদের ওজন বয়সের অনুপাতে কম হয়। তাছাড়া নিম্নলিখিত উপসর্গ দেখা দেয় :

(১) নিয়মিত শরীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না ;

(২) চামড়ার নীচের চর্বি কমিয়া যায় ;

(৩) মাংসপেশী সুগঠিত হয় না এবং শুকাইয়া যায় ;

(৪) ত্বক খসখসে হয় এবং বহুদিন ধরিয়া শিশু এই রোগে ভুগিতে থাকিলে ত্বকে ঘা হইয়া যাইতে পারে ;

(৫) মাথার চুল পাতলা হইয়া যায় এবং রঙ ফ্যাকাশে হইয়া যায়। এই অপুষ্টি বেশীদিন ধরিয়া চলিলে চুলের রঙ অনেক সময় কটা হইয়া যায়। চুল ধরিয়া টানিলে শিশুর লাগে না এবং সহজেই উঠিয়া আসে।

(৬) এইসব শিশুদের প্রায়ই পেট খারাপ হয় ও ক্ষুধা কমিয়া যায়।

(৭) কোন কোন ক্ষেত্রে হাত-পা ফুলিয়া যায় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বাচ্চারা একেবারে শুকাইয়া যায়, চামড়া কুচকাইয়া যায় এবং মনে হয় শিশু যেন অস্থিচর্মসার। প্রথমটিকে (ক) কোয়াশিওরকর এবং দ্বিতীয়টিকে (খ) ম্যারাসমাস বলা হয়।

(ক) কোয়াশিওরকর (Kwashiorkor): প্রোটিনের বিশেষ অভাব হইলে মাংসপেশী ক্ষয় করিয়া শিশুর দেহ প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে এবং শরীরে জল জমে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে শিশুকে মোটা-সোটা ও গোলগাল দেখায়। বাপ-মা মনে করে শিশু বেশ স্বাস্থ্যবান হইয়া উঠিতেছে। ফলে এই রোগ ধরা কঠিন হইয়া পড়ে এবং এই রোগে আক্রান্ত হইয়া শিশুরা মারা পড়ে।

কোয়াশিওরকর

(খ) ম্যারাসমাস (Marasmus): শৈশবে উপযুক্ত মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে কিংবা বিকল্প খাদ্য দিতে বিপ্লব ঘটিলে শিশুর তাপ বা শক্তি উৎপাদক খাদ্যের অভাব ঘটে। শিশু আর আগেকার মত উজ্জ্বল আনন্দময় এবং ক্রীড়াচঞ্চল থাকে না। অনেক সময় খিটখিটে হইয়া পড়ে। না কাঁদিলেও বিছানায় শুইয়া থাকে এবং হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলা করে না। গাল চুপসাইয়া যায়, ওজন হ্রাস পাইতে পাইতে শেষে গায়ে শুধু হাড়মাস অবশিষ্ট থাকে। শৈশবের এই অপুষ্টিজনিত ব্যাধিটি ম্যারাসমাস নামে পরিচিত। এই ব্যাধিতে শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

শুধু যে দারিদ্র্যের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শিশুরা এই রোগের কবলে পড়ে তাহা নয়, অনেক সময় বাপমায়ের খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের জন্যও তাহারা এই রোগের বলি হইয়া থাকে। এই রোগ দূর করিতে হইলে শিশুদের পাঁচ ছয় মাস বয়স হইতে বদলি খাদ্যে অভ্যস্ত করাইতে হইবে, শিশুর খাদ্যে গরুর

দুধ কিংবা গুঁড়া দুধের ব্যবস্থা করিতে হইবে; যাহাদের দুধ কিনিবার সামর্থ্য নাই তাহারা ছোলার ছাতুর সঙ্গে বাদাম গুঁড়া করিয়া মিশাইয়া খাওয়াইতে পারেন।

(২) **ভাইটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রোগ :** যে কোন বয়সের যে কোন লোকের ভাইটামিন 'এ'-র অভাব হইতে পারে। তবে সাধারণতঃ ১ হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের এই রোগটি বেশী দেখা যায়। ইহার অভাবে চোখ অন্ধ হইয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে যত অন্ধ আছে তাহার মধ্যে এক-চতুর্থাংশ লোক এই ভাইটামিনটির অভাবের জন্য।

এই রোগের প্রথম উপসর্গ হইল রাতকানা অর্থাৎ কম আলোতে তাহারা ঠিকমত দেখিতে পায় না। 'এ'-র অভাব চলিতে থাকিলে চোখের সাদা অংশ শুকাইয়া যায়, অনেক সময় সাদা অংশে ফেনার মত দাগ পড়ে। অভাব আরও বাড়িলে চোখের মণি আক্রান্ত হয়, নরম হইয়া যায় এবং চোখ যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়। এই অবস্থাকে বলে ক্যারাটোম্যালেশিয়া। এরূপ অবস্থায় চোখ যদি ফাটিয়া যায় তবে সেই চোখ চিরকালের মত অন্ধ হইয়া যায়। কোন চিকিৎসায় তাহা ভাল করা যায় না।

ম্যারাসমাস

লৌহ বা ফোলিক অ্যাসিডের অভাব

প্রাণিজ খাদ্য যেমন দুধ, মাখন, ঘি, ডিম, মেটে, কডলিভার অয়েল এবং শার্ক লিভার অয়েলে 'এ' ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তাছাড়া সবুজ শাক, গাজর, পাকা লাল কুমড়ো, পাকা পেঁপে, পাকা আম ও পাকা টমেটোতেও প্রচুর পরিমাণে 'এ' ভাইটামিন পাওয়া যায়।

(৩) **রক্তাল্পতা** (Anaemia) : শিশুরা এই রোগের দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। রক্তাল্পতার প্রধান কারণ

এই অসুখ হইলে কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট দেখা দেয়, রঙ ফ্যাকাসে হইয়া, জিভ ও নখ ফ্যাকাশে হয় এবং অতি সহজে ক্লান্তি আসে। হাত-পা-মুখও ফুলিতে পারে।

সবুজ শাক, নানারকম ডাল, মাছ, মাংস ও ডিমে লৌহ এবং ফোলিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।

(৪) **রিকেটস** (Rickets): শিশুর দেহে ভাইটামিন ডি, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসঘটিত লবণের অভাব হইলে বা উপযুক্ত অনুপাতে না থাকিলে শিশু ভীরু ও অস্থিরমতি হয়। তাহার মাংসপেশী শিথিত ও দুর্বল হয়। হাড় পুষ্ট হয় না বলিয়া অবয়ব বিকৃত হয়। ইহা রিকেট নামে পরিচিত। আমাদের দেশে প্রচুর সূর্যালোক আছে বলিয়া ভাইটামিন ডি'র অভাব হয় না কিন্তু ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব হয়। উহাদের ক্রমাগত অভাবের ফলে শিশুর দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয় বা হ্রাস পায়, দাঁত খারাপ হয় এবং অকালে দাঁতের ক্ষয় হয়। দুধ, পনীর, ডিমের কুসুম, ডাল বাদাম ও শস্যকণা যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া দরকার।

রিকেট

শিশুদের অন্যান্য রোগসমূহ

(১) **কোষ্ঠকাঠিন্য** (Constipation): যে সকল শিশুকে কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ান হয় তাহারা অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্যতায় কষ্ট পায়। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য আঙুর, কমলালেবু অথবা অন্য কোন প্রকার ফলের রস পান করা উচিত। মায়ের কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে স্তন্যপায়ী শিশুরও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে পথ্যদ্বারা বা অন্য উপায়ে চিকিৎসা করিলে শিশুও আরোগ্য লাভ করিবে।

(২) উদরাময় (Diarrhoea): ইহা সচরাচর দুগ্ধ তৈরী করার ত্রুটিবশতঃ অথবা ঠাণ্ডা লাগিয়া হইয়া থাকে। বার বার এবং প্রচুর পাতলা পায়খানা হয়, পেটে ব্যথা থাকে। পেটে যন্ত্রণা নাও থাকিতে পারে।

(৩) আমাশয় (Dysentery): ঠাণ্ডা লাগিয়া হইতে পারে। বার বার তবে পরিমাণে অল্প মল, পেটে যন্ত্রণা, কোথানি, আম, কখনো বা মলের সঙ্গে রক্ত পড়িতে পারে।

(৪) **সাধারণ সর্দিকাশি** (Common colds) : ঠান্ডা লাগিয়া অথবা ভাইটামিনের অভাব বশতঃ শিশুরা এই রোগের কবলে পড়ে।

(৫) **টনসিলাইটিস** (Tonsillitis) : শিশুদের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায়। টনসিলের প্রদাহকে টনসিলাইটিস বলে। টনসিলের স্ফীতি, রক্তিমতা ও যন্ত্রণা রোগের প্রধান লক্ষণ। তাছাড়া আনুষঙ্গিকভাবে খাদ্যদ্রব্য বা তরল পদার্থ গিলিতে কষ্ট হয়, কখনো আবার ঢোক গিলিতেও কষ্ট হয়।

(৬) **খোসপাঁচড়া** (Scabies) : শিশুদের যেসব চর্মরোগ দেখা যায় উহাদের মধ্যে খোসপাঁচড়াই প্রধান। খোসপাঁচড়া একপ্রকার চর্মের ক্ষত। অতি ক্ষুদ্র মাকড়সার মত একজাতীয় কীটাণু হইতে পাঁচড়া জন্মায়। কীটগুলি দেহচর্ম ফুঁড়িয়া যখন বাসা করে তখন চর্মে দারুণ চুলকানির সৃষ্টি হয়। অনবরত চুলকাইতে চুলকাইতে স্থানটিতে প্রথমে ঘা দেখা যায়। তারপর ঐ ঘা হইতে রক্ত ও পুঁজ পড়িতে থাকে।

পাঁচড়ার ক্ষতগুলি গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া বেনজিক বেনজোয়েট প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। শিশুর দেহ ভালভাবে পরিষ্কার রাখিলে খোসপাঁচড়ার হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করা যায়।

(৭) **কৃমি** (Worms) : কৃমি নানা প্রকারের, যথা—রাউন্ড ওয়ার্ম, থ্রেড ওয়ার্ম ও টেপ ওয়ার্ম। অধিক মিষ্টি, নোংরা অনুচিত খাবার, কখনো বা শারীরিক গঠনের গোলযোগের (constitutional defect) জন্য শিশুদের কৃমি হয়। খাদ্য সম্বন্ধে যত্ন নিলে ও খাদ্যের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিলে বহুলাংশে কৃমি প্রতিরোধ করা যায়।

2. সংক্রামক রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান

(Elementary knowledge of symptoms of infectious diseases)

যে সকল জীবাণুবাহিত ব্যাধি এক দেহ হইতে আরেক ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে তাহাদিগকে বলে সংক্রামক ব্যাধি। এই ব্যাধিগুলির মধ্যে কতকগুলি ব্যাধি ঘনিষ্ট সংস্রবের ফলে বিস্তারলাভ করে। উহাদিগকে বলে স্পর্শজ ব্যাধি (contagious diseases)।

কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধির লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায়

আমাশয় (Dysentery) : একটি পানীয়বাহিত পেটের পীড়া। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর আমাশয় দেখা যায়—ব্যাসিলারি ও এমিবাজনিত।

ব্যাসিলারি আমাশয়—রোগের লক্ষণ : ঘন ঘন মলত্যাগ, মলের সঙ্গে খুব তাজা টকটকে রক্ত ও মিউকাস এই রোগের লক্ষণ সূচনা করে। জ্বর, দৌর্বল্য ইত্যাদি উপসর্গও থাকে। সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দ্রুত সংক্রামিত হয়।

রোগ সংক্রমণ : রোগের জীবাণু খাদ্য ও পানীয়ের দ্বারা পেটে প্রবেশ করে। রোগবিস্তারে মাছি প্রধান সহায়ক। ধুলাবালির মধ্যেও রোগের জীবাণু থাকে এবং ঐ ধুলা খাদ্যে উড়িয়া আসিয়া খাদ্য জীবাণুদুষ্ট করে। রোগ বাহকের মারফতও রোগ সংক্রামিত হইতে পারে।

প্রতিরোধের উপায় : খাদ্য ও পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রোগ প্রতিরোধে অপরিহার্য। মাছি ও ধুলোবালির হাত হইতে খাদ্য ও পানীয় রক্ষা করিবে। গৃহে

আমাশয় রোগী থাকিলে তাহাকে স্বতন্ত্র রাখিবে এবং মলমূত্র নির্বীজিত করিয়া অপসারণের ব্যবস্থা করিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে সর্বদা উহা রেচক দিয়া দূর করিবে।

এমিবাজনিত আমাশয় রোগের লক্ষণ : চার পাঁচবার তরল দাস্ত হয়, দুর্গন্ধযুক্ত মিউকাস ও সংগে রক্তের ছিটা দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও সংগে জ্বর ও পেটে বেদনা থাকে।

রোগ সংক্রমণ ও প্রতিরোধের উপায় ব্যাসিলারি আমাশয়ের অনুরূপ। তাছাড়া এমিবাজনিত আমাশয় প্রতিরোধ করিতে হইলে জল ফুটাইয়া পান করা উচিত।

উদরাময় (Diarrhoea) : ইহাও একটি পানীয়বাহিত ব্যাধি। মল তরল ও সংখ্যায় অধিকতর হয়। বমি, পেটের যন্ত্রণা ও ঘন ঘন তরল মল নির্গত হওয়া ইহার প্রধান উপসর্গ।

প্রতিরোধের উপায় : খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবে। দুধ ফুটাইয়া পান করিবে। খাদ্যদ্রব্য মাছি হইতে দূরে রাখিবে।

কলেরা (Cholera)—রোগলক্ষণ : ভেদবমি, হাত-পায়ের খিঁচুনি, প্রস্রাব বন্ধ ও গভীর শারীরিক অবসাদ কলেরার প্রধান উপসর্গ। ঘন ঘন মলত্যাগ ও বমির জন্য রোগীর পিপাসা মিটিতে চায় না। রোগী ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া পড়ে। ত্বক্ বিবর্ণ হইয়া যায়, মুখ চুপসাইয়া যায়, আঙুলের চর্ম কুঞ্চিত হয় এবং দেহের উত্তাপ অস্বাভাবিকভাবে নামিয়া যায়।

প্রতিরোধের উপায় : প্রতিরোধের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টা দরকার। বদহজম ও তীব্র উদরাময় সংগে সংগে প্রতিরোধ করিবে। পচা, বাসি, উন্মুক্ত খাবার, খোসাযুক্ত মাছ বর্জন করিবে। পেট খালি রাখিবে না। ধুলাবালি ও মাছি হইতে খাদ্যদ্রব্য সাবধানে রাখিবে।

আইসক্রীম এবং সদ্যপ্রস্তুত সোডাওয়াটার বর্জন করিবে। পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবে এবং দুধ ফুটাইয়া পান করিবে। বাসনপত্রের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিবে। সর্বসাধারণের টিকা দিবার ব্যবস্থা করিবে। রথে ও মেলায় সকলকে টিকা দিবে এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা করিবে।

টাইফয়েড (Typhoid)—রোগের লক্ষণ : কলেরার মতই টাইফয়েড একটি পানীয়বাহিত সংক্রামক ব্যাধি। জ্বরের প্রথম অবস্থা হইতে মাথা ধরা, অবসাদ এবং নাড়ীর মৃদুগতি লক্ষিত হয়। জ্বর প্রত্যহ ক্রমবর্ধমান হইয়া প্রথম সপ্তাহের শেষভাগে ১০৩°-১০৪° ডিগ্রীতে ওঠে এবং একইভাবে চলিতে থাকে। প্রাতে জ্বর প্রায় ২° ডিগ্রী নামিয়া যায়। তৃতীয় সপ্তাহের শেষভাগে জ্বর প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া কমিয়া সাধারণ অবস্থায় আসে। জ্বর অপেক্ষা এই রোগের উপসর্গগুলি মারাত্মক।

প্রতিরোধের উপায় : পানীয়বাহিত ব্যাধি বলিয়া কলেরা রোগের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও মাছি নিয়ন্ত্রণ, রোগীর স্বতন্ত্রীকরণ ও তাহার যাবতীয় ব্যবহৃত দ্রব্য উত্তমরূপে নির্বীজন করা প্রয়োজন। মলমূত্রাদি নির্বীজিত করিয়া নিক্ষেপ করিবে অথবা পোড়াইয়া দিবে। টিএবিসি টিকা লইলে টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড ও কলেরার আক্রমণ সাময়িকভাবে প্রতিরোধ করা যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)—রোগলক্ষণ : জ্বর, সর্বাঙ্গে দারুণ বেদনাবোধ, হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা ও মানসিক অবসাদই প্রধান উপসর্গ।

প্রতিরোধের উপায় : রোগীর সংস্রব এড়াইয়া চলিবে। সর্বদা আলো-বাতাসপূর্ণ কক্ষে শুইবে, ভিড় এড়াইয়া চলিবে এবং উপযুক্ত শীতবস্ত্র পরিধান করিবে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে। স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি সর্বদা মানিয়া চলিবে। ব্যায়াম, বিশ্রাম ও পানাহার যেন স্বাস্থ্যসম্মত হয়। অতিরিক্ত ক্লান্ত এবং পানাসক্ত ব্যক্তিরা সহজে এই রোগের কবলে পড়ে। মারীর সময়ে সুস্থ ব্যক্তিদের লবণজলে গার্গল করা উচিত।

বাড়ীতে ইনফ্লুয়েঞ্জা হইলে রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিবে এবং দেহ গরম রাখিবে। রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ও রুমাল গরম সাবানজলে সর্বদা ফুটাইয়া নির্বীজিত করিয়া লইবে। বায়ুর মধ্য দিয়া রোগী হাঁচি কাশির সঙ্গে রোগের জীবাণু ছড়ায়। রোগীকে তাই উন্মুক্তভাবে হাঁচিতে কাশিতে বা যেখানে সেখানে থুথু ফেলিতে দিবে না। হাঁচিবার সময় সর্বদা রুমাল ব্যবহার করিবে।

ডিপথেরিয়া (Diptheria)—রোগের লক্ষণ : নাসারন্ধ্র, টনসিল ও শ্বাসনালীতে পর্দার সৃষ্টি করে। ঐ পর্দা শ্বাসনালী বন্ধ করিয়া দিতে পারে। হৃৎপিণ্ড দুর্বল করিয়া ফেলে।

প্রতিরোধের উপায় : রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিবে। রোগীর শ্লেষ্মা ও গয়ের পোড়াইয়া ফেলিবে।

যক্ষ্মা (Tuberculosis)—রোগের লক্ষণ : ঘুষঘুষে জ্বর, খুসখুসে অল্প কাশি, রাত্রে ঘাম হয় এবং ওজন দ্রুত কমিয়া যায়। শ্বাসপথ, মুখ ও ত্বকের ভিতর দিয়া রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করে।

প্রতিরোধের উপায় : প্রতিরোধের বিভিন্ন দিক রহিয়াছে, যেমন—

(১) রোগজীবাণুর বিস্তার নিবারণ ; (২) অনাক্রান্তদিগকে রক্ষা করা ; (৩) ব্যক্তিগত সাবধানতা ; (৪) রাষ্ট্রের কর্তব্য।

রোগীর থুথু, গয়ের ইত্যাদির সঙ্গে রোগজীবাণু নির্গত হয়। সুস্থ ব্যক্তিরা যাহাতে ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যাধির দ্বারা বিপন্ন না হয় সেইজন্য রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা এই রোগ নিবারণের প্রধান অঙ্গ।

অনাক্রান্তদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বিসিজি টিকা দেওয়া। এই টিকা লইলে পাঁচ ছয় বছরের জন্য যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়।

ব্যক্তিগত সাবধানতা : রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্রব পরিত্যাজ্য। দুধ অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট ফুটাইয়া পান করিবে। বন্ধ আলোবাতাসহীন কক্ষে ঘুমাইবে না এবং যতদূর সম্ভব মুক্তবায়ুতে বিচরণ করিবে।

রাষ্ট্রের কর্তব্য : দারিদ্র্য, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, আলোবাতাসহীন জনবসতিপূর্ণ স্থানে বাস, কলকারখানার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য যক্ষ্মারোগ দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। জনবহুল শহরগুলিতে আলোবাতাসযুক্ত স্বাস্থ্যকর গৃহনির্মাণের বন্দোবস্ত করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। কলকারখানার ধূম ও গ্যাস যাহাতে স্থানীয় আবহাওয়া দূষিত না করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। জনসাধারণের জন্য ভেজালশূন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা, যক্ষ্মারোগীদের জন্য উপযুক্ত

নিবাস নির্মাণ করা এবং জনসাধারণের জন্য বিসিজি টিকা দিবার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তর্গত।

হাম (Measles)—**রোগের লক্ষণ :** এক ধরনের তীব্র সংক্রামক রোগ। সর্বাঙ্গে ফুসকুড়ি লইয়া এই জ্বর আত্মপ্রকাশ করে। অত্যন্ত সর্দি, নাক ও চোখ দিয়া জল পড়া, মাথার যন্ত্রণা ও শীত শীত ভাব হামের প্রধান উপসর্গ। ১০৪°—১০৫° ডিগ্রী পর্যন্ত জ্বর উঠিতে পারে এবং ফুসকুড়ি অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে। চতুর্থ দিবসে চুলের গোড়ায় এবং কানের পশ্চাদ্ভাগে ফুসকুড়ি দেখা দেয়, তারপর সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে এবং তিনদিন পর্যন্ত থাকিতে পারে। দশম দিবসে আঁশ উঠিয়া যায়। হাম সারিবার পরে অনেক রোগী নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, উদরাময় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

রোগ-সংক্রমণ : সাধারণতঃ এক জায়গায় হাম হইলে আশেপাশের সমস্ত অঞ্চলে উহা ছড়াইয়া পড়ে। শৈশবেই হাম-জ্বরের প্রকোপ বেশী দেখা যায়। জনবহুল স্থান হাম বিস্তারের পক্ষে আদর্শস্থল বলিয়া গণ্য। রক্ত, কফ ও চর্মের মধ্যে হামের বীজাণু থাকে। রোগীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিলেই এই রোগ সংক্রামিত হয়। তবে রোগীর ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্য দিয়াও হাম ছড়ায়। হামের গুটি বাহির হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ উপ্তাবস্থায় হাম অত্যন্ত ছোঁয়াচে। উপ্তাবস্থা ৮-১৪ দিন।

প্রতিরোধের উপায় : হাম হইয়াছে টের পাইবামাত্র রোগীকে পৃথক্ ঘরে মশারির নীচে রাখিবে। তবে হামের গুটিকা বাহির হইবার পূর্বেই রোগজীবাণু সংক্রামিত হইয়া যায়। উন্মুক্তভাবে রোগীকে শ্লেষ্মা ফেলিতে দিবে না। রুমাল অথবা পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ঐ শ্লেষ্মা ফেলিতে দিবে এবং তারপর উহা পোড়াইয়া ফেলিবে। সমস্ত বিছানা, আসবাব ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি নির্বীজিত করিয়া রোগিকক্ষের বাহিরে আনিবে। বাড়ির লোকেদের বাড়িতে কিছুদিন আটক রাখা ভাল। অন্যান্য লোকেদেরও ঐ বাড়িতে আসাযাওয়া বন্ধ করা উচিত।

বসন্ত (Pox) দুই প্রকার—পানবসন্ত ও ইচ্ছাবসন্ত।

পানবসন্তের রোগলক্ষণ : সামান্য জ্বর, অস্থির ভাব এবং পিঠে ও পায়ে বেদনা দেখা দেয়। সর্বাঙ্গে ছোট ছোট লাল দাগ দেখা দেয় এবং ঐগুলি দ্রুত ফোস্কায় পরিণত হয়। ফোস্কাগুলি শুকাইয়া যায় এবং মামড়ি পড়ে এবং শরীরে কোন চিহ্ন থাকে না।

রোগ-সংক্রমণ : অত্যন্ত ছোঁয়াচে তবে মারাত্মক নয়। রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিলে রোগ হইতে পারে। রোগের মামড়ি বাতাসে মিশিয়া রোগ ছড়াইতে পারে। রোগীর শ্লেষ্মা ইত্যাদিও সংক্রামক। রোগীর ক্ষতে বসিয়া মাছি রোগজীবাণু ছড়াইতে পারে।

প্রতিরোধের উপায় : রোগীকে সর্বদা স্বতন্ত্র কক্ষে মশারির নীচে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্রব এড়াইয়া চলিবে। টিকা লইলে পানবসন্ত প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মায় না। তবে একবার পানবসন্ত হইলে দ্বিতীয়বার আক্রমণের সম্ভাবনা কম।

ইচ্ছাবসন্তের (Small pox) **রোগলক্ষণ :** প্রথম অবস্থায় বমি, মাথায় যন্ত্রণা, পিঠে বেদনা এবং অত্যধিক জ্বর হয়। গায়ে ক্ষুদ্র গুটিকা বাহির হয় এবং উহারা ছোট

ছোট ফোস্কার আকার ধারণ করে, তারপর পুঁজ জমে এবং ফোস্কাগুলি গুটিকার আকার ধারণ করে।

রোগ-সংক্রমণ ঃ রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিলে কিংবা বাসনপত্র ব্যবহারের দ্বারা রোগজীবাণু সংক্রামিত হয়। মৃতদেহ সৎকারকালেও রোগের সংক্রমণ সম্ভব। রোগীর শ্লেষ্মা ও মামড়ি ধূলিকণার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইতে পারে। রোগীর ক্ষতে বসিয়া মাছি রোগজীবাণু বহন করিতে পারে।

প্রতিরোধের উপায় ঃ টিকা লইয়া ইচ্ছাবসন্ত প্রতিরোধ করা যায়। নাক ও মুখ দিয়া বসন্তের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। তাই গরমজলে ডেটল দিয়া গার্গল করা ভাল।

বাড়িতে বসন্ত রোগ দেখা দেওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে স্বতন্ত্র কক্ষে মশারির ভিতরে রাখিবে। রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্য, মলমূত্র ইত্যাদি নির্বীজিত করিয়া অপসারিত করিবে। মাছি এবং অন্যান্য পতঙ্গ হইতে সতর্ক থাকিবে। গুটিকার খোলস একটি পাত্রে জমা করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। আরোগ্যলাভের পর রোগি-কক্ষ নির্বীজিত করিয়া লইবে এবং নির্বীজক লোশন দিয়া রোগীকে স্নান করাইবে। সর্বসাধারণকে টিকা দিবার ব্যবস্থা করিবে।

রোগীর যদি মৃত্যু ঘটে তবে জলের সঙ্গে শতকরা ৪০ ভাগ ফর্মালিন সলিউশন মিশাইয়া উহাতে একটি চাদর কিংবা বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া মৃতদেহ ভাল করিয়া জড়াইবে। তারপর দ্রুত অপসারিত করিবে। কাফনে চাপা দিলে উহা যেন বায়ু-নিরোধক হয়।

3. **প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা** (Preventive measures) **ঃ** সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়—(১) প্রাথমিক অবস্থায় রোগনির্ণয় (early diagnosis), (২) স্বতন্ত্রীকরণ (isolation), (৩) প্রজ্ঞাপন (notification), (৪) নিরোধন (quarantine), (৫) প্রতিরোধ (prevention), (৬) অনাক্রম্যতা (immunisation), এবং (৭) স্বাস্থ্যসংক্রান্ত শিক্ষার (health education) প্রসার।

(১) **প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয়** (Early diagnosis) করিতে পারিলে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা সহজ হয়। শিশুরা যেমন হাম, ডিপথেরিয়া, মামস, হুপিং কফ ইত্যাদি রোগের কবলে পড়িয়া থাকে। সুতরাং কাহারো গায় সামান্য ফুসকুড়ি দেখা দিলে, কিংবা গলাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, কাশি প্রভৃতি হইলে অবহেলা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ লইলে প্রাথমিক অবস্থায় রোগনির্ণয় করা সহজ হয়।

(২) **স্বতন্ত্রীকরণ** (Isolation) **ঃ** সংক্রামক ব্যাধি হইয়াছে টের পাইবামাত্র রোগীকে সুস্থ ব্যক্তি হইতে আলাদা করিয়া রাখিবে। গৃহে স্বতন্ত্র রাখিতে হইলে রোগীকে একটি পৃথক্ প্রকোষ্ঠে রাখিবে এবং তাহার বাসন-কোসন পৃথক্ করিয়া ফেলিবে। যে সমস্ত জিনিস রোগীর ব্যবহারে লাগিবে না তাহা সমস্ত সরাইয়া ফেলিবে। রোগীর ব্যবহৃত বাসনপত্র নির্বীজিত করিয়া রোগি-কক্ষের বাহিরে আনিবে এবং মলমূত্রে নির্বীজক লোশন ঢালিয়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। অবশেষে রোগি-কক্ষের বাহিরে আনিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে কিংবা মাটিতে পুঁতিয়া দিবে।

শুশ্রূষাকারিণী ব্যতীত অপর কেহ রোগি-কক্ষে প্রবেশ করিবেন না। তিনি সর্বদা নির্বীজক লোশন দিয়া হাত-পা ধুইয়া ফেলিবেন এবং রোগি-কক্ষে ব্যবহৃত নিজ বস্ত্রাদি ফুটাইয়া নির্বীজিত করিয়া লইবেন।

(৩) **প্রজ্ঞাপন** (Notification) **:** কোথাও সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলেই ব্যাধির প্রসার বন্ধ করিবার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বা হেলথ অফিসারকে সংবাদ দিতে হয়। ইহাকে বলে প্রজ্ঞাপন। এই সংবাদ দানের উদ্দেশ্য ব্যধির বিস্তার নিবারণ। রোগ হওয়ামাত্র সংবাদ পাইলে কর্তৃপক্ষ আসিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া সমস্ত লোক হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিবে এবং রোগীর পার্শ্ববর্তী এবং সংলগ্ন লোকদের প্রতিষেধক টিকা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিবে। ফলে সংক্রামক রোগের জীবাণু আর সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশের সুযোগ পাইবে না।

(৪) **নিরোধন*** (Quarantine) **:** রোগাক্রান্ত ব্যক্তির যতদিন রোগ ছড়াইবার ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে করা হয় ততদিন তাহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখার নাম নিরোধন। শুধুমাত্র বসন্তরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে এইরূপ নিরুদ্ধ রাখা হয়। নিরোধনও একপ্রকার স্বতন্ত্রীকরণ।

(৫) **প্রতিরোধ** (Prevention)—**নির্বীজন** (Disinfection) **:** শুশ্রূষাকারিনীর অন্যতম কর্তব্য হইল সংক্রামক রোগের প্রসার বন্ধ করা। রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ভাল করিয়া নির্বীজিত করিতে পারিলে রোগ ছড়াইবার আশঙ্কা থাকে না।

(১) **সদ্য সদ্য নির্বীজন** (Concurrent disinfection) **:** কোন ব্যক্তি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইলে পরে তাহার মলমূত্র, থুথু ও বাসন-পত্রাদির মধ্যে রোগের জীবাণু অদৃশ্যভাবে লাগিয়া থাকে। উহাদের নির্বীজিত করার নামই সদ্য নির্বীজন। সদ্য নির্বীজন একান্ত প্রয়োজন কারণ উহার অভাবে নিকটবর্তী লোকদের মধ্যে রোগ সহজেই ছড়াইয়া পড়ে।

(২) **পরিশেষ নির্বীজন** (Terminal disinfection) **:** রোগী আরোগ্য হইবার পরে কিংবা রোগীর মৃত্যু হইলে তাহার ব্যবহৃত সমস্ত দ্রব্যাদি নির্বীজন করা দরকার হইয়া পড়ে।

রোগি-কক্ষ এবং রোগীর তৈজসপত্র : কলেরা, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে রোগি-কক্ষের দেওয়াল ও মেঝে সাধারণতঃ দূষিত হয়। রোগীর গৃহ নির্বীজিত করার সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হইল fumigation অর্থাৎ গন্ধক পোড়াইয়া বাষ্প উৎপন্ন করা। কক্ষের সমস্ত আসবাব বাহির করিয়া লইয়া দরজা-জানলা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। তারপর একটি পাত্রে গন্ধক জ্বালিয়া দিবে। গন্ধক পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে। গন্ধকের পরিবর্তে ফর্মালিন ব্যবহার করা যায়। Fumigate

* বিদেশ হইতে যাহাতে কোনরকম সংক্রামক রোগের জীবাণু আসিয়া অপর একটি দেশে ছড়াইতে না পারে এইজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের বা রোগের বাহক হইতে পারে এইরূপ সন্দেহজনক ব্যক্তিদের আটক করিয়া রাখাকেই নিরোধন বলা হইত। এক সময় পৃথিবীর সমস্ত দেশের বন্দরগুলিতে নিরোধনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত। কিন্তু ইহাতে যাত্রীদের অশেষ দুর্ভোগ হইত বলিয়া আজকাল ভ্রমণকারীরা নিজ নিজ দেশ ছাড়িবার পূর্বে টিকা এবং ইনজেকশন ইত্যাদি লইয়াছে কিনা দেখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

করার তিন চার দিন পরে কক্ষের দরজা-জানলা খুলিয়া দিবে এবং কক্ষে বায়ু চলাচল করিতে দিবে। তখন উহা সম্পূর্ণ নির্বীজিত হইয়া যাইবে এবং সুস্থ লোকের বাসের উপযোগী হইবে।

বাড়িতে প্লেগ রোগ হইলে অন্ততঃ পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া কক্ষটি fumigate করিয়া চুনকাম করাইয়া লইবে।

আসবাবপত্র ঃ ফিনাইল অথবা কার্বলিক লোশন দিয়া আসবাব ধৌত করিয়া তার্পিন তেল দিয়া মুছিয়া লইলে আসবাবপত্র বিশোধিত হয় এবং উহার চাকচিক্য নষ্ট হয় না।

যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগীর ব্যবহৃত আসবাবে ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিয়া কয়েক ঘণ্টা প্রখর রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিবে এবং সুবিধামত বার্ণিশ করাইয়া লইবে।

বিছানাপত্র ও বস্ত্রাদি ঃ ছিন্নবস্ত্র, কাঁথা ইত্যাদি দগ্ধ করা বিধেয়। যে সকল বস্ত্র সিদ্ধ করা যায় সেগুলি সাবান ও সোডা দিয়া ফুটাইয়া কাচিয়া প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। সিল্ক, ফার কিংবা মূল্যবান বস্ত্রাদি ড্রাইওয়াশ করাইয়া লইবে। লেপ, তোশক ইত্যাদি প্রখর রৌদ্রে দিয়া নির্বীজিত করিয়া লইবে।

পুস্তক ও কাগজপত্র ঃ কাগজপত্র প্রখর রৌদ্রে ঘণ্টাখানেক ফেলিয়া রাখিবে। তারপর ঝাড়িয়া তুলিয়া রাখিবে।

(৬) **অনাক্রম্যতা (Immunisation) ঃ** রোগজীবাণুর দেহে antigen নামে একপ্রকার প্রোটিন থাকে। প্রত্যেক সংক্রামক রোগের জীবাণু অথবা ভাইরাসের নিজস্ব antigen থাকে ; তাহা জীবদেহে antibody সৃষ্টি করে। ঐ antibody ঐ বিশেষ সংক্রামক রোগের জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে পারে। রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে জীবদেহের এই সংগ্রাম করিবার শক্তিকে রোগ প্রতিরোধক বা অনাক্রম্যতা শক্তি (Immunisation) বলে।

কিছু কিছু মানুষের জন্মগতসূত্রে কোন কোন প্রকার রোগ-জীবাণুর সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি থাকে। এইরূপ শক্তিকে স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক শক্তি (Natural immunisation) বলে।

আবার স্বাভাবিক নিয়মেও দেহে কোন ব্যাধি যেমন হাম রোগ সংক্রামিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ রোগের উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিরোধ শক্তি বা antibody সৃষ্টি হয়। আরোগ্য লাভের পরেও ঐ antibody কিছু পরিমাণে থাকিয়া যায় এবং ঐ রোগের পুনরাক্রমণে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। রোগ প্রতিরোধের এই শক্তিকে বলে সক্রিয় অনাক্রম্যতা (Active immunity)। এই অনাক্রম্যতা শক্তি স্থায়ী।

কৃত্রিম উপায়েও জীবদেহে অনাক্রম্যতা শক্তি সৃষ্টি করা যায়। রোগের জীবাণু (bacteria) অথবা ভাইরাস (Virus) লইয়া প্রথমে তাপ প্রয়োগ করিয়া অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহাদের মারিয়া ফেলিতে বা দুর্বল করিতে হয়। জীবাণুগুলি মরিয়া গেলে কিংবা দুর্বল হইয়া পড়িলেও উহাদের antigen অবিকৃত থাকে। এখন এই মৃত অথবা দুর্বলীকৃত জীবাণুর antigen শল্য সহকারে জীবদেহে অনুপ্রবেশ করাইয়া অস্থায়ী অনাক্রম্যতা প্রদান করা যায়। এই প্রক্রিয়াকে নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা শক্তি (Passive immunity) বলে এবং এই পদ্ধতি ইনোকুলেশন (inoculation) নামে,

পরিচিত। এইভাবে টাইফয়েড, কলেরা, হাম ইত্যাদি রোগের প্রতিরোধ শক্তি গড়িয়া তোলা যায়।

ভ্যাকসিনেশন (Vaccination) **:** পরিবর্তিত পদ্ধতিতে বসন্ত রোগের হাত হইতে জীবদেহ রক্ষা করা যায়। বসন্ত রোগের ক্ষেত্রে গরুর দেহে বসন্ত রোগের বীজ প্রবেশ করান হয়। তারপর বসন্ত রোগাক্রান্ত গরুর লসিকা ত্বক সামান্য ছেদন করিয়া অন্য দেহে প্রবেশ করান হয় এবং সে বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শক্তি নিজ দেহে গড়িয়া তোলে। ল্যাটিন ভাষার Vacca শব্দের অর্থ গরু এবং এইভাবে vaccine কথাটির উৎপত্তি। ইংরেজ চিকিৎসক Edward Jenner এই যুগান্তকারী মানব-হিতকর বসন্তের টিকা (১৭৯৬) আবিষ্কার করেন।

অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত জন্তুর যেমন অশ্বের শরীরে রোগের জীবাণু কৃত্রিম উপায়ে অনুপ্রবেশ করাইলে কয়েকদিন পরে ঐ জীবদেহে antibody সৃষ্টি হয়। তখন উহার রক্তমস্তু বাহির করিয়া লইয়া পরিশোধন করিয়া অন্য জীবদেহে প্রবেশ করাইলে ঐ বিশেষ রোগের অনাক্রম্যতা শক্তি প্রদান করা যায়। ইহাকে বলে সিরাম (serum) ইনজেকশন।

(৭) **স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত শিক্ষা** (Health education) **:** সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের আসল উপায় হইল জনশিক্ষার প্রসার। অধিকাংশ লোকই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং তাহাদের সচেতন করিয়া তুলিতে না পারিলে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

সমস্ত সংক্রামক ব্যাধি ঠিক একভাবে ছড়ায় না। যেমন—ম্যালেরিয়া রোগের বাহন হইল মশা এবং কলেরা রোগের বাহন হইল মাছি। উহাদের অভ্যাসও স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, একই রোগ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ছড়াইতে পারে। যেমন—রোগীর ঘনিষ্ট সংস্রবে আসিলে যক্ষ্মা হইতে পারে—আবার গরুর দুধও যক্ষ্মা রোগের বাহন হইতে পারে। আবার রোগীর মলমূত্র, নিষ্ঠীবন ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ ছড়ায় ইহাও অনেকে জানেন না। এই সব কারণে জনসাধারণ সুশিক্ষিত না হইলে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবশ্য সরকারী প্রচেষ্টা ব্যতীত জনশিক্ষার প্রসার সম্ভব নয়। সরকারের শিক্ষণপ্রাপ্ত লোকেদের গ্রামে গ্রামে গিয়া সিনেমা দেখাইয়া, বক্তৃতা ও আলোচনা করিয়া, প্যাম্ফলেট ছড়াইয়া সংক্রামক ব্যাধির গুরুত্ব বুঝাইয়া দিতে হইবে।

নবম অধ্যায় | গৃহে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা (Providing First Aid at home)

1. প্রাথমিক প্রতিবিধান কাহাকে বলে এবং কোথায় প্রয়োগ করা হয় ?

কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিলে চিকিৎসক আসিবার পূর্বে যে জ্ঞানের দ্বারা দক্ষতার সঙ্গে আহত ব্যক্তির জীবন-রক্ষা কিংবা আরোগ্যের পথ সুগম করা যায় তাহারই নাম প্রাথমিক প্রতিবিধান। বিপদের সময় হাতের কাছে যাহা পাওয়া যায় তাহার সাহায্যে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী কখনও চিকিৎসকের ভূমিকা গ্রহণ করিবে না। চিকিৎসক আসিলেই তাহার দায়িত্ব শেষ হইয়া যায়। তবে চিকিৎসক আসিবার পূর্বে তাহাকে রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া কি পরিমাণ প্রতিবিধান প্রয়োজন এবং কতটা প্রতিবিধান দেওয়া সম্ভব তাহা স্থির করিতে হয়। কম্পন, অচৈতন্য অবস্থা, বিবর্ণতা আঘাতের স্থানে স্ফীতি কিংবা রক্ত জমা ইত্যাদি চিহ্নগুলি প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী নিজের চোখে দেখিয়া রোগ আন্দাজ করিয়া লইতে পারে। এতদ্ব্যতীত রোগীর শীত শীত ভাব, বমির ইচ্ছা, তৃষ্ণাবোধ অথবা ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ আছে কিনা তাহা সে রোগীর নিকট হইতেই জানিয়া লইতে পারে। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও উপস্থিতবুদ্ধি থাকা যেমন প্রয়োজন, সেইরূপ শারীরবৃত্ত ও শুশ্রূষাবিজ্ঞান সম্বন্ধেও কিছুটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আহত ব্যক্তি জীবিত কি মৃত সামান্য সন্দেহ থাকিলে চিকিৎসক আসা পর্যন্ত প্রাথমিক চিকিৎসা চালাইয়া যাওয়া উচিত।

প্রাথমিক প্রতিবিধান কোথায় প্রয়োগ করা হয়? শুধুমাত্র দেহের বাহিরের অংশের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে (external injury) প্রাথমিক প্রতিবিধান দেওয়া চলে।

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারিণীর কর্তব্য

১। দুর্ঘটনা গৃহেই ঘটুক কিংবা পথিপার্শ্বেই ঘটুক যাহা করণীয় তাহা অতি দ্রুত ও শান্তভাবে করিয়া যাইবে।

২। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গেলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস আনয়নের ব্যবস্থা করিবে।

৩। রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবে।

৪। আহত ব্যক্তিকে যথাসম্ভব কম নাড়াচাড়া করিবে এবং স্নায়বিক আঘাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে।

৫। স্নায়বিক আঘাত পাইলে উহার চিকিৎসা চালাইবে।

৬। রোগীর চারিদিকে অযথা ভিড় জমিতে দিবে না।

৭। অযথা বস্ত্র অপসারণ করিবে না।

৮। রোগীকে সত্বর চিকিৎসকের নিকট অথবা প্রয়োজন হইলে হাসপাতালে পাঠাইবে।

2 ব্যাণ্ডেজ

ব্যাণ্ডেজের প্রয়োজনীয়তা : অস্থিভঙ্গ কিংবা রক্তপাতে দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপ ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হয়। সচরাচর যেসব কারণে ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হয়, সেইগুলি এই—(১) স্পিলন্ট ও ড্রেসিং যাহাতে স্থানচ্যুত না হয়। (২) রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য। (৩) আহত অঙ্গের স্লিং হিসাবে। (৪) রোগীকে তুলিয়া বহন করিবার সুবিধার জন্য।

ব্যাণ্ডেজের শ্রেণীবিভাগ : গুটান ব্যাণ্ডেজ (Roller bandage), ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ (Triangular bandage), মেনি-টেল (Many-tail) ও টি-ব্যাণ্ডেজ (T-bandage) প্রভৃতি নানা রকমের ব্যাণ্ডেজ আছে। উহাদের মধ্যে গুটান এবং ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের সর্বাধিক প্রচলন দেখা যায়।

গুটান ব্যাণ্ডেজ (Roller bandage) : গুটান ব্যাণ্ডেজ সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। দেহের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন প্রস্থের গুটান ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হয়, যেমন—

পদদ্বয়—৩—৩½ ইঞ্চি (৭.৬২—৮.৮৭ সে.মি.)

চক্ষু—২ ইঞ্চি (৫.০৮ সে.মি.) বাহু—২½ ইঞ্চি (৬.৩৩ সে.মি.)

হাতের আঙুল—১—১½ ইঞ্চি (২.৫—৩.৭৫ সে.মি.)

মস্তক—২½ ইঞ্চি (৬.৩৩ সে.মি.)

বক্ষঃস্থল—৪—৬ ইঞ্চি (১০.১—১৫.২৪ সে.মি.)

নানাভাবে গুটান ব্যাণ্ডেজ বাঁধা যায়, যেমন

(১) সরল পাক (Spiral); (২) উল্টা পাক (Reverse); (৩) বৃত্তাকার (Circular); (৪) বাংলা চার অক্ষরের ন্যায় (Figure of eight) ও (৫) স্পাইকা (Spica)।

(১) **সরল পাক (Spiral) :** প্রত্যেকটি পাক এমনভাবে দিবে যাহাতে প্রত্যেকটি
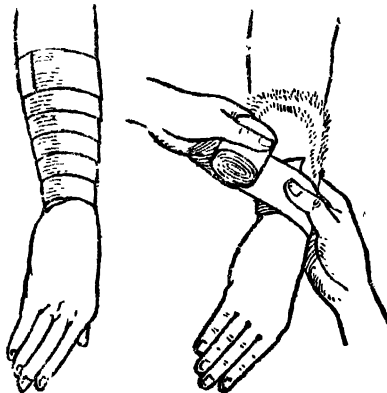
সরল পাক

উপরের পাক নীচের পাকের ⅔ অংশ আবৃত করে। সাধারণতঃ আঙুল, কব্জি ও বাহুতে ব্যবহার করা হয়।

(২) **উল্টা পাক (Reverse) :** পাকগুলি সরল পাকের অনুরূপ তবে প্রত্যেকটি পাক উল্টাইয়া দেওয়া হয়। যে অঙ্গে ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হইবে তাহা সর্বত্র সমান স্থূল হইলে সরল পাক দেওয়া হয় পরন্তু অঙ্গের অসম স্থূলতার জন্য উল্টা পাক উপযোগী।

উল্টা পাক
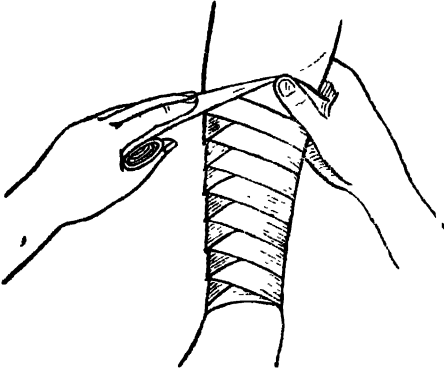
(৩) **বৃত্তাকার (Circular) :** এমনভাবে দুই তিনটি পাক দিতে হইবে যাহাতে একটি পাক অপরটিতে সম্পূর্ণ আবৃত করে। সাধারণতঃ কব্জি অথবা গুলফের (ankle) ড্রেসিং স্থির রাখিতে হইলে এইরূপ বৃত্তাকার গুটান ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হয়।

(৪) **বাংলার চার অক্ষরের ন্যায় (Figure of eight) :** আড়ভাবে উপর হইতে নীচের দিকে এবং নীচ হইতে উপরের দিকে পাক দিতে হইবে। একটি পাক আরেকটি পাককে এমন ভাবে ছেদন করিবে যাহাতে বাংলা চার অক্ষরের মত দেখায়। জানু, কনুই, গুলফ ইত্যাদি সন্ধিতে ইহা প্রয়োগ করা হয়।

চার আকৃতি ব্যাণ্ডেজ

(৫) **স্পাইকা (Spica) :** চার অক্ষরের অনুরূপ। সাধারণতঃ কাঁধ, নিতম্ব, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি যেসব সন্ধি-স্থল দেহের সঙ্গে সমকোণ ভাবে রহিয়াছে সেইসব স্থানে প্রয়োগ করা হয়।

স্পাইকা ব্যাণ্ডেজ

ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ (Triangular bandage) : ইহা সচরাচর কোন অঙ্গকে ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এক টুকরা চৌকা কাপড় লইয়া আড়কোণে কাটিয়া লইলে দুইটি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ প্রস্তুত হইবে। ইহা মস্তক, বাহু, উরুসন্ধি এবং অন্যান্য

স্থানে প্রাথমিক প্রতিবিধানের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাহু ঝুলাইয়া রাখিতে হইলে একটি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ লইয়া উহার একটি প্রান্ত স্কন্ধের উপর রাখ এবং গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আহত স্কন্ধের উপর আন এবং বুকের সামনের দিকে অন্য প্রান্তটি ঝুলাইয়া দাও। এইবার দ্বিতীয় প্রান্তটি আনিয়া প্রথম প্রান্তের সঙ্গে বাঁধিয়া দাও। ব্যাণ্ডেজের শীর্ষটি কনুই পর্যন্ত ভাঁজ করিয়া আনিয়া সেফটিপিন দিয়া আটকাইয়া দিবে।
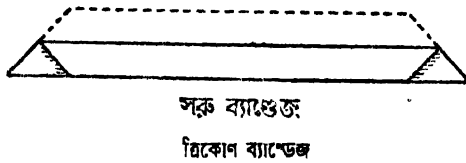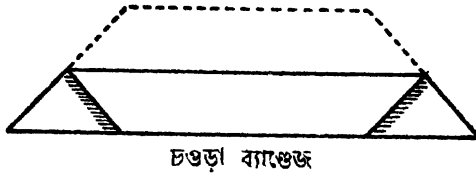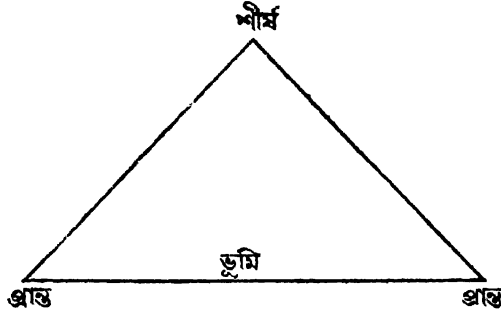
ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ

ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ একদিকে যেমন স্লিং হিসাবে ব্যবহৃত হয় অন্যদিকে তেমনি মস্তিষ্ক, হাত, কনুই, জানু, উরু এবং পায়ের আঘাত রক্ষা করিবার জন্য ব্যাণ্ডেজ হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

3. **গৃহে বিষাক্ত ঔষধ সংরক্ষণ** (Storage of poisonous medicines at home)

বিষাক্ত ঔষধাদি নিম্নলিখিত উপায়ে সংরক্ষণ করিবে ঃ

(১) রোগীর সমস্ত ঔষধ একটি আলমারিতে রাখিবে। বিষাক্ত ঔষধগুলি একটি

স্বতন্ত্র আলমারিতে তালাচাবি দিয়া রাখিবে। আলমারির সুবিধা না থাকিলে রোগী এবং শিশুদের নাগালের বাহিরে কোথাও রাখা কর্তব্য।

(২) খাইবার ঔষধ এবং বিষাক্ত ঔষধের জন্য সর্বদা পৃথক্ আকৃতির বোতল ব্যবহার করিবে। তাছাড়া খাইবার ঔষধগুলি সাদা রঙের এবং মালিশের বিষাক্ত ঔষধের শিশিগুলি রঙীন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৩) বিষাক্ত ঔষধের গায়ে একটি লেবেল লাগাইয়া 'বিষ' (Poison) কথাটি বড় করিয়া লিখিয়া রাখিবে এবং উহার নীচে রোগীর নাম, মাত্রা এবং কতবার প্রয়োগ করিতে হইবে লিখিয়া রাখিবে।

(৪) অনেক সময় খাইবার ঔষধের গায়েও 'বিষাক্ত' কথাটি লেখা থাকে। উহার অর্থ এই যে রোগী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ হইলে চিকিৎসকের নির্দেশ ব্যতীত উহা প্রয়োগ করিবে না। তাছাড়া অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রোগীর পক্ষেও বিষের মত কাজ করিবে। এই জাতীয় বিষাক্ত ঔষধের গায়েও লেবেল লাগাইয়া রোগীর নাম, মাত্রা এবং কতবার প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা লিখিয়া রাখিবে।

4. **গৃহে প্রাথমিক প্রতিবিধানের আবশ্যক সরঞ্জাম** (Maintaining a First Aid Box.)

গৃহে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে এবং যে কোন ব্যক্তি অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে। চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত রোগীর আরোগ্যলাভের পথ প্রশস্ত করা এবং তাহার অবস্থা যাহাতে আরও খারাপ না হইয়া পড়ে এইজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য প্রত্যেক গৃহস্থকেই প্রাথমিক প্রতিবিধানের কিছু কিছু সরঞ্জাম রাখিতে হয়। সরঞ্জামের তালিকা খুশিমত দীর্ঘ করা যায়, তবে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি অপরিহার্য :—টিংচার আয়োডিন, টিংচার বেঞ্জিন, ডেটল, মার্কুরি ক্রোম, জেনস্যান ভায়োলেট, বরিক তুলা, ঔষধের গ্লাস, কাঁচি—তীক্ষ্ন ও ভোঁতা, সেফটিপিন, স্যালভোলেটাইল বা স্মেলিং সল্ট, এ্যাসপিরিন ট্যাবলেট, বার্নল, এক ইঞ্চি গুটান ব্যাণ্ডেজ, তিন ইঞ্চি গুটান ব্যাণ্ডেজ, গজ ও কয়েক প্রকার ড্রেসিং, গরম ও বরফ জলের ব্যাগ, তুলা জড়াইবার কয়েকটি কাঠি।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। পারিবারিক জীবনে গৃহের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। গৃহ আমাদের জীবনের কোন্ কোন্ মূল্যবোধগুলি তৃপ্ত করে ?

২। বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার লোকেদের বাসস্থানের পরিকল্পনা কিরূপ হওয়া উচিত ?

৩। পরিবারের কি কি মূল দাবীগুলি গৃহের মিটান উচিত ? শিশু এবং বয়স্কদের জন্য গৃহে কি সংস্থান রাখা উচিত ? [H. S. 1962]

৪। বাসস্থান পরিকল্পনার মূলনীতিগুলি বর্ণনা কর।

৫। কত রকম উদ্দেশ্যে একটি শয়ন কক্ষ ব্যবহার করা যায় ? জীবনে শয়ন কক্ষের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৬। কত রকম উদ্দেশ্যে একটি বৈঠকখানা ব্যবহার করা যায় আলোচনা কর।

৭। পারিবারিক জীবনে শিশু কক্ষের গুরুত্ব আলোচনা কর এবং একটি শিশুকক্ষের প্রয়োজনীয় আসবাবের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৮। শিশুকক্ষে কি কি ধরনের খেলনা ও অন্যান্য সরঞ্জাম রাখা উচিত ? এইসব খেলনাগুলি কি শিশু-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে হয় ? উপযুক্ত কারণ দেখাও।

৯। কারুশিল্পের মূলনীতিগুলি বর্ণনা কর। গৃহসজ্জার নিজস্ব নীতিগুলি বর্ণনা কর। এই সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।

১০। গৃহপ্রসাধনে বর্ণের গুরুত্ব কতকখানি ? বর্ণচক্র কাহাকে বলে ? একটি বর্ণচক্র আঁকিয়া দেখাও।

১১। মনের উপর বর্ণের কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে ? মিত্র ও বিবাদী বর্ণ, উষ্ণ ও শীতল বর্ণের পার্থক্য দেখাও।

১২। আলপনা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

১৩। দক্ষিণ ভারতীয়দের জীবনে আলপনার গুরুত্ব আলোচনা কর। একটি দক্ষিণ ভারতীয় আলপনা আঁকিয়া দেখাও। গুজরাতে আলপনাকে কি বলে ?

১৪। পুষ্পবিন্যাসের সাধারণ নিয়মগুলি বর্ণনা কর। খাবার ঘরে কিভাবে পুষ্পবিন্যাস করিবে ? জাপানী পুষ্পবিন্যাসের মূল নীতিগুলি আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বাহিরে কর্মরতা একজন গৃহিণীর একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত কর।

২। গৃহপরিকল্পনায় সময় পরিকল্পনার গুরুত্ব নির্দেশ কর। সময় পরিকল্পনার সময় কোন্ কোন্ বিষয়ে খেয়াল রাখিবে ?

৩। গৃহের সাধারণ কয়েকটি অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের নাম কর। ঐসব কীটপতঙ্গের হাত হইতে কিভাবে রেহাই পাইতে পার ? কয়েকটি পতঙ্গনাশকের নাম কর। [H. S. 1963]

৪। গৃহে ইঁদুর ও মাছি কেন বিনষ্ট করিবে এবং কিভাবে উহাদের বিনষ্ট করিবে ?

৫। টীকা লিখঃ (ক) আসবাব পরিষ্করণ (খ) গৃহের অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ।

৬। তুমি একটি হোটেলের সুপার নিযুক্ত হইয়াছ। ডিশ ধোওয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে তোমাকে ভৃত্যদের নির্দেশ দিতে হইবে। অল্প ব্যয়ে এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ধুইবার কি নির্দেশ দিবে ? এক প্রস্থ ডিশের মধ্যে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি রহিয়াছে :

(ক) কাচের গামলা ; (খ) চারিধার নকশা কাটা ডিশ ; (গ) রুপার কাটাচামচ ; (ঘ) হাড়ের হাতলওয়ালা ছুরি ; (ঙ) সোনার কাজ করা চীনামাটির বাসন ; (চ) পিতল ও তামার তৈলাক্ত বাসন ; (ছ) অ্যালুমিনিয়ামের বাসন ও ট্রে। বাসন ধোওয়ার জন্য ৫০১ বার সাবান, তেঁতুল, সোডা, রিঠা ও ছাই দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

১। জীবনে পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব কি ? পোশাকের রুচি বলিতে কি বুঝায় ? একটি কিশোরী কন্যার বিবাহ বাড়িতে যাইবার উপযুক্ত পোশাক কি ?

২। পোশাকের উপাদান নির্বাচনের সময় কোন্ কোন্ বিষয়ে গুরুত্ব দিবে ?

৩। জীর্ণবস্ত্র সংস্কার করিয়া কিভাবে কাজের উপযোগী করিয়া তোলা যায়। রিপু ও তালি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

১। তন্তু কাহাকে বলে ? কিরূপে তন্তু দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভব বলিয়া মনে কর ?

২। তন্তুর শ্রেণীবিভাগ করিরা দেখাও।

৩। রেশম তন্তু কাহাকে বলে ? রেশম তন্তু চিনিবার উপায় কি ?

৪। পশম তন্তু কাহাকে বলে ? একটি পশম তন্তুর বৈশিষ্ট্য আলোচনা কব।

৫। কৃত্রিম তন্তু কাহাকে বলে ? রেয়নকে ঠিক সাংশ্লেষিক তন্তু বলা চলে না কেন ?

৬। বাড়িতে একটি সাদা সুতির শাড়ী কিভাবে ধুইবে ? সুতির কাপড়ে মাড়ের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় কর।

৭। সাদা রেশমের ব্লাউজ কিভাবে ধুইবে ? একটি নাইলনের রঙিন শাড়ি ধুইবার প্রণালী বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

১। চিত্রের সাহায্যে মানবদেহের পরিপাক ক্রিয়ার বিভিন্ন ক্রিয়া বর্ণনা কর।

২। মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশগুলি চিত্রের সাহায্যে দেখাও এবং উহাদের মাধ্যমে দেহে কিরূপে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে তাহা বর্ণনা কর।

৩। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কক্ষের মাধ্যমে মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৪। জনাকীর্ণ স্থানের বায়ু ও বন্ধ বায়ুর পার্থক্য কি? তোমার জানা কয়েকটি বায়ুবাহিত ব্যাধির নাম কর।

৫। অতিরিক্ত ভিড়ের বিপদ এবং যাত্রিপরিবাহী যানবাহনের মধ্যে বাঁচার কুফল কি?

৬। স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

৭। বায়ুর উপাদানসমূহ বর্ণনা কর। প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু বিশোধন পদ্ধতির উল্লেখ কর।

৮। বায়ু-সঞ্চালন কাহাকে বলে? নৈসর্গিক উপায়ে বায়ু-বিশোধনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৯। স্বাস্থ্যের জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা কি? বিশুদ্ধ পানীয় জলের গুণসমূহ বর্ণনা কর। দূষিত জল পানের কুফল কি?

১০। বিশুদ্ধ জল কাহাকে বলে? পানের জন্য তুমি কিভাবে বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ করিবে? বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য তুমি গৃহে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। গৃহে একটি শিশুর স্থান এবং গুরুত্ব নির্দেশ কর।

২। একটি শিশুর বিভিন্ন বিকাশ সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

৩। অনূর্ধ্ব তিন বছরের একটি শিশুর সামাজিক আচরণ বর্ণনা কর।

৪। শিশুর প্রক্ষোভ কত রকমের? শিশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্ষোভিক দাবীর উল্লেখ কর এবং কিভাবে ঐ দাবী মিটান যায় বল।

৫। শিশুরা কথা বলা শিখে কিভাবে? বয়স্করা শিশুর ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে কিভাবে সাহায্য করিতে পারেন?

৬। শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত আলোচনা কর। পিতৃমাতৃহীন শিশুর মানসিক বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলির উল্লেখ কর।

৭। শিশুর তোতলামির কারণ বর্ণনা কর। তোতলামি দূর করার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়?

সপ্তম অধ্যায়

১। গৃহ-শুশ্রূষার মূলনীতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। রোগি-কক্ষ নির্বাচনের সময় কোন্ কোন্ বিষয়ে নজর রাখিবে এবং কেন রাখিবে? কারণ দেখাইয়া তোমার মত সমর্থন কর।

৩। সুস্থ ব্যক্তির চেয়ে একজন রোগীকে সামলান কঠিন। রুগ্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই অসুবিধা কেন দেখা দেয়? রোগীকে কিভাবে স্পঞ্জ দিবে? স্পঞ্জের আবশ্যক সরঞ্জামগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৪। শয্যাক্ষতের প্রধান কারণ কি? একজন ভাল শুশ্রূষাকারিণী হিসাবে তুমি এইরূপ রোগীকে কিভাবে সেবা করিবে এবং শয্যাক্ষত নিবারণের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। রোগীকে ঔষধ দিবার পূর্বে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করিবে? একজন ভাল শুশ্রূষাকারিণী হিসাবে রোগীর আর কি কি অত্যাবশ্যক যত্নের প্রয়োজন রহিয়াছে তুমি মনে কর? [H. S. 1965]

অষ্টম অধ্যায়

১। কয়েকটি শৈশবীয় রোগের নাম কর। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা কর।

২। প্রোটিন-ক্যালোরি ম্যালনিউট্রিশান কাহাকে বলে? কিভাবে উহা প্রতিরোধ করা যায়।

৩। অপুষ্টিজনিত রোগ কাহাকে বলে? অপুষ্টিজনিত রোগের নাম কর। কি কি কারণে আমাদের দেশের শিশুরা অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে? উহা প্রতিরোধের কয়েকটি সহজ উপায় বল।

৪। শিশুদের কেন কোষ্ঠকাঠিন্য হয়? কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়?

৫। কোন সংক্রামক রোগ যদি মহামারি আকারে দেখা দেয় তখন প্রতিষেধ-মূলক কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত? [S.F. 1964, 1966, 1969, 1971]

৬। গৃহে একটি শিশুর খোসপাচড়া হইলে তাহার শুশ্রূষা এবং অন্যান্য শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে?

৭। সংক্রামক রোগ কাহাকে বলে? স্বতন্ত্রীকরণ, প্রজ্ঞাপন ও রোগ বিস্তারে প্রতিরোধ বলিতে কি বুঝায়?

নবম অধ্যায়

১। প্রাথমিক প্রতিবিধান বলিতে কি বুঝায়? প্রাথমিক প্রতিবিধান কোথায় প্রয়োগ করা হয়?

২। প্রাথমিক প্রতিবিধানের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে আলোচনা কর। একটি প্রাথমিক প্রতিবিধানের বাক্সে কি কি জিনিস রাখা উচিত?

৩। প্রাথমিক প্রতিবিধানের মূলনীতি কি? প্রাথমিক প্রতিবিধানকারিণীর কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। ব্যাণ্ডেজ কয় প্রকার ও কি কি? গুটান ব্যাণ্ডেজ ব্যবহারের নিয়ম কি?

৫। ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ কিভাবে তৈয়ারী করা হয়। উহার কয়েকটি প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। রোগীকে ঔষধ দিতে কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে? বিষাক্ত ঔষধ রাখিবার সময় কি সাবধানতা অবলম্বন করিবে?

গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশুশ্রূষা

Home Management & Home Nursing

● দ্বিতীয় পত্র ●

A. সার্থক গৃহ-পরিচালনা
(Effective Management of a Home)

1. গৃহপরিচালনায় পরিকল্পনা, সহযোগিতা, নির্দেশনা এবং সমীক্ষার ভূমিকা
(Role of planning, co-operation, guidance and evaluation in the field of home management)

গৃহ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা : গৃহের কর্তব্যকর্ম যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত হইবার জন্য গৃহ-পরিচালনার দরকার। গৃহে অনুষ্ঠিত যে সকল কাজে পরিচালনার গুরুত্ব অনুভব করা যায় তাহা এই—

(১) সময় ও শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা গৃহের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা এবং জীবনের দাবী মিটান ;

(২) পারিবারিক অর্থের সুষ্ঠু প্রয়োগের দ্বারা সকলের মঙ্গলবিধান করা ;

(৩) উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ;

(৪) প্রয়োজনীয় আসবাব ও সরঞ্জাম ক্রয় করা ;

(৫) প্রত্যেকের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা করা ;

(৬) গৃহের প্রত্যেকের স্বাস্থ্যরক্ষা করা ;

(৭) প্রত্যেকের শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষলাভের ব্যবস্থা করা ;

(৮) সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ করা ;

(৯) পরিবারের সকলের মধ্য সদ্ভাব ও সহযোগিতা রক্ষা করা ;

(১০) সর্বোপরি একটি জীবনদর্শনে পরিবারের সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা।

গৃহ-পরিচালনা কাহাকে বলে ? গৃহ পরিচালনাকে পারিবারিক জীবনের প্রশাসন ব্যবস্থা বলা হয়। পরিচালকের শক্তি ও দক্ষতার জোরে এই প্রশাসন চলে। পারিবারিক সম্পদকে কাজে লাগাইয়া কতকগুলি ঈপ্সিত লক্ষ্যে পেঁছান এবং গৃহের সকলের দৈহিক ও মানসিক তৃপ্তিবিধান করাই গৃহ-পরিচালনার উদ্দেশ্য।

গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-পরিকল্পনা (Home management and planning) **:** কোন একটি ঈপ্সিত লক্ষ্যে পেঁছাইবার জন্য মানুষ মনে মনে কিংবা কাগজে-কলমে যে ছক আঁকে তাহাকেই পরিকল্পনা বলে। সার্থক গৃহ-পরিচালনার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ প্রতিটি পরিবারের উদ্দেশ্য হইল কোন বিশেষ লক্ষ্যে পেঁছান যেমন সকলের জন্য দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান, প্রাকৃতিক তৃপ্তিলাভ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এইসব ঈপ্সিত বস্তুলাভের পথ যত সহজ হয় পরিকল্পনা গ্রহণ করাও ততই সহজসাধ্য হয়, পরন্তু পথটি যদি দুরূহ হয় তবে পরিকল্পনা করাও ততই কঠিন হইয়া পড়ে, কারণ পথে যেসব বাধা অতিক্রম করিতে হয় পরিকল্পনাকারীকে সেইসব বাধার কথাও চিন্তা করিতে হয়।

পরিকল্পনা গ্রহণের সময় ঈপ্সিত বস্তুগুলির মূল্য বিচার করিয়া দেখিতে হয়। কোন্ বস্তুটি পরিবারের অধিক কাম্য, কোন্‌টি পাওয়ার মত উপযুক্ত সম্পদ

(resources) মজুত আছে ইত্যাদি ভাবিয়া দেখিতে হয়। পরিকল্পনার চূড়ান্ত পর্যায়ে আসে সিদ্ধান্তগ্রহণ। এই সিদ্ধান্তগ্রহণের পরই কাজ শুরু হয়। এ যেন কর্মের দ্বার খুলিয়া দেয়।

গৃহ-পরিকল্পনার সঙ্গে তিনটি প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে, যেমন

(১) গৃহ-পরিকল্পনাকে কিভাবে কার্যকরী করিব? অর্থাৎ পরিকল্পনা রূপায়ণের **পদ্ধতি** বা **কৌশল** (method) কি হইবে?

(২) কি উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করিব? অর্থাৎ পরিকল্পনার **লক্ষ্য** (goals) কি?

(৩) পরিকল্পনা কতখানি সফল হইল? অর্থাৎ পরিকল্পনা রূপায়ণের পরে একটি **সমীক্ষা** (evaluation) করিয়া দেখিতে হইবে।

(১) **পরিকল্পনা রূপায়ণের পদ্ধতি** (Method of planning): গৃহ-পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হইল ঘরোয়া সম্পদকে কাজে লাগান। এই সম্পদকে মানবিক (human resources) ও অ-মানবিক (non-human resources) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
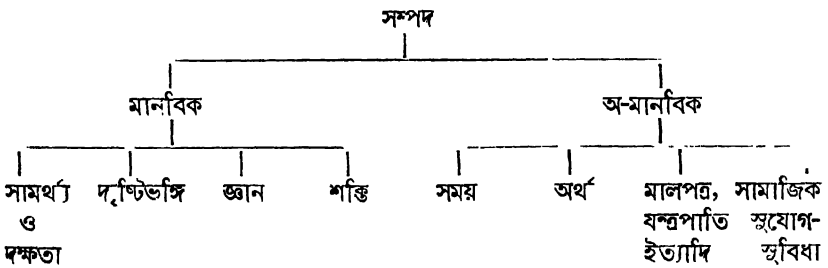
মানবিক সম্পদ: মানবিক সম্পদের মধ্যে পড়ে পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের কাজ করার সামর্থ্য ও দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও শক্তি। গৃহের প্রতিটি মানুষ তাহার **নৈপুণ্য**, বিশেষ **দৃষ্টিভঙ্গি**, বিভিন্ন বিষয়ের **জ্ঞান** এবং **শক্তি** লইয়া গৃহ-পরিচালনায় একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। এই মনুষ্যসম্পদকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া গার্হস্থ্য-জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করিয়া তোলা যায়। নীচে এই মনুষ্যসম্পদ ও তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল:

(ক) **দক্ষতা** (Ability and skill): একটি গৃহে নানা রকমের কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে যেমন খাদ্য প্রস্তুতি, শিশুপালন, গৃহের লোকেদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা, পোশাক প্রস্তুতি ইত্যাদি। এইসব নানাবিধ কাজে দক্ষতা অর্জনের উপরেই গৃহ-রচনার উৎকর্ষ নির্ভর করে। সম-আর্থিক শ্রেণীর পরিবারগুলির জীবনযাত্রায় যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার কারণ তাহাদের কর্মে দক্ষতার তারতম্য।

(খ) **দৃষ্টিভঙ্গি** (Attitudes): মানুষমাত্রই যখন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন তাহার মনে একটা অনুকূল কিংবা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়; এইভাবে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া তাহার দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া ওঠে; তারপর উহা তাহার জীবন তথা সমগ্র পারিবারিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে।

থমসনের মতে ব্যক্তির বংশধারা, অভিজ্ঞতা এবং সাময়িক উদ্দেশ্য মিলিয়া তাহার দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করে।

থার্স্টোন ও চেভ (Thurstone and Chave) যে কোন ব্যাপারে ব্যক্তির ঝোঁক ও অনুভূতি, সংস্কার ও বাতিক, আগেকার গড়া ধারণা, চিন্তা, ভয়, শাসানি এবং দৃঢ়বিশ্বাসের সমষ্টিকে দৃষ্টিভঙ্গি আখ্যা দিয়াছেন।

…"the sum total of a man's inclinations and feelings, prejudices and bias, preconceived notions, ideas, fears, threats and convictions about any topic."

মানুষমাত্রই জীবন সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণা পোষণ করে। তাহাদের মধ্যে কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী, কেহ জীবনে অত্যন্ত আসক্ত, আবার কেহ বা উদাসীন। কাহারো জীবনে স্থির লক্ষ্য থাকে এবং তাহার নিকট জীবনযাপনের উদ্দেশ্যই হইল ঐ আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়া, আবার কেহবা উদ্দেশ্যহীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, কেহ আবার এই দুইটি চরম অবস্থার একটি মাঝামাঝি পথ গ্রহণ করে। মোটের উপর প্রতিটি মানুষেরই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া ওঠে এবং ঐ দৃষ্টিভঙ্গিই তাহার জীবনকে পরিচালিত করে।

নববিবাহিত দম্পতি যখন প্রথম সংসারে পদার্পণ করে তখন দুইটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ হইতে আসিয়া তাহারা জীবনসাগরে মিলিত হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে তাহাদের জীবনযাত্রার একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া ওঠে। উহার উপর নির্ভর করে তাহাদের দাম্পত্য সুখ ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ।

গৃহপরিবেশ বিশেষতঃ বাপ-মায়ের চিন্তাধারা সন্তানদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। বাপ-মার পারস্পরিক সম্পর্ক, তাহাদের ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার, সুন্দর-অসুন্দরের বোধ, সন্তানদের প্রতি মনোভাব, প্রতিবেশীদের সহিত আচরণ ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত করে, তাহাদের সামাজিক জীবনদর্শনকে প্রভাবিত করে। অবশ্য গৃহপরিবেশ ব্যতীত চারিপাশের সামাজিক জীবন, সংবাদপত্রের প্রচার, সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নানা বিজ্ঞাপন, রেডিও, টেলিভিশন, বিশেষতঃ চলচ্চিত্র কিশোর-কিশোরীদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। কোন দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে কাজে আগাইয়া দেয়, বাস্তবজীবনের মুখোমুখি হইতে সাহায্য করে, আবার কোন দৃষ্টিভঙ্গি তাহাকে পিছাইয়া আনে, জীবনযুদ্ধে পরাজিত করে। ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি গৃহরচনায় একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে কারণ অর্থ-সামর্থ্যের চেয়েও দৃষ্টিভঙ্গিই মানুষের জীবনযাত্রার মান স্থির করে।

জ্ঞান (Knowledge)ঃ মানুষ তাহার জ্ঞানের জন্যই সমস্ত প্রাণি-জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছে। গৃহ-পরিচালনার ক্ষেত্রে যে পরিবারের লোকেদের জ্ঞান যত বেশী সেই পরিবার তত সুন্দর হইতে পারে।

বস্তুতঃ গৃহ-পরিচালনার কাজে বিচিত্র বিষয়ের জ্ঞান থাকা দরকার। পরিবারের নিকটে গৃহ-পরিচালিকা একাধারে চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারিণী, সুপকার, মনস্তাত্ত্বিক, পোশাক নির্মাতা, শিক্ষয়িত্রী, অর্থনীতিবিদ্ এবং সমাজসেবিকা; সর্বোপরি তিনি স্নেহশীলা জননী, জায়া এবং গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তির বন্ধু ও সহচরী।

গৃহিণীর দায়িত্ব প্রচুর। খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে তাহার বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। পুষ্টিকর অথচ রুচিকর খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য এবং অন্যান্য ব্যাপারে শিশুদের সদভ্যাস

গঠন করা—এ সবই নির্ভর করে গৃহিণীর জ্ঞানের উপর। তাছাড়া পোশাক নির্বাচন, পোশাক প্রস্তুতি এবং সর্বোপরি উহা সংরক্ষণের কৌশলটি তাহার দখলে থাকা চাই। কিন্তু তাহার সবচেয়ে বেশী জ্ঞান থাকা দরকার শিশুপালন সম্বন্ধে। অবহেলিত এবং বিশৃংখলভাবে প্রতিপালিত শিশু কখনই সু-নাগরিক হইয়া উঠিতে পারে না। শিশুদের দৈহিক প্রয়োজন এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক পরিবর্তন সম্বন্ধে গৃহিণীর জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে কিশোরদের সুস্থ মানসিক বিকাশ।

গৃহ-পরিচালনার জন্য যেসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার সেগুলি এই : (১) খাদ্যবস্তু ও পুষ্টি, (২) শিশুপালন, (৩) স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক প্রতিবিধান, (৪) গৃহসজ্জা, (৫) পোশাক-প্রস্তুতি, (৬) গৃহপরিকল্পনা, (৭) গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও (৮) সমাজসেবা। তাছাড়া মৌলিক বিজ্ঞান ও শিল্পকলার কিছু সাধারণ জ্ঞানও থাকা চাই। এই সকল বিষয়ের উপযুক্ত জ্ঞান গৃহিণীকে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে, অপচয় নিবারণে এবং গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে তৃপ্তি ও আনন্দ দিতে সাহায্য করিয়া থাকে। তবে এইসব ব্যবহারিক জ্ঞানই গৃহরচনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্য সম্বন্ধেও পরিবারের ব্যক্তিদের সচেতন থাকিতে হয়। বর্তমানের এই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সমন্বয়-সাধন করিয়া জীবনকে পূর্ণতা দান করিতে পারে ব্যক্তির জ্ঞান দূরদৃষ্টি।

শক্তি (Energy) : দৈনন্দিন গৃহকাজে আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানারূপ প্রয়াসের দরকার হয় এবং তাহার জন্য তাপ ও শক্তি ব্যয় হয়।

এইসব প্রয়াসেরই* একটি তালিকা নীচে প্রদত্ত হইল :

(১) মনের প্রয়াস — চিন্তা, যুক্তি, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নির্দেশ দান, দুর্ভাবনা, কথা বলা,

(২) চোখের প্রয়াস — চোখ নাড়ান, স্থিরভাবে তাকাইয়া থাকা, দেখা, খোঁজা পর্যবেক্ষণ করা, দূরের জিনিস নজর করা, আলোর সঙ্গে দৃষ্টিকে খাপ খাওয়ানো।

(৩) হাতের প্রয়াস — নাগাল পাওয়া, তুলিয়া ধরা, উঠান, বহন করা, হাত প্রসারিত করা, ধাক্কা মারা, ঠেলা।

(৪) দেহের প্রয়াস — নুইয়া পড়া, ঝোঁকা, ওঠা, কাত হওয়া, পাশ ফেরা, বসা, হাঁটু গাড়া।

(৫) পায়ের প্রয়াস — হাঁটা, নড়া, দাঁড়াইয়া থাকা।

---

* Frederick J. Kiesler পাঁচ রকম প্রয়াসের উল্লেখ করিয়াছেন—Mental effort, visual effort, manual effort, torsal effort এবং pedal effort.

কোন কাজে মানুষ কতটা শক্তি ব্যয় করিবে উহা নির্ভর করে তাহার বংশগতি, দেহের অভ্যাস এবং মনের প্রস্তুতির উপরে। উপযুক্ত অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা মানুষ একদিকে যেমন শক্তি ব্যয় করার ক্ষমতা বাড়াইতে পারে তেমনি সুচিন্তিত পরিকল্পনার সাহায্যে তাপ-সংরক্ষণেও সমর্থ হইতে পারে।

পরিবার পরিচালনায় ব্যক্তি তাহার সামর্থ্য ও দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, ও দৈহিক শক্তি খাটাইয়া জীবনকে সুস্থ, সুন্দর ও আদর্শ করিয়া তুলিতে পারে।

অ-মানবিক সম্পদ : ইহার মধ্যে পড়ে সময়, অর্থ, মালপত্র ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধাসমূহ অর্থাৎ পরিবহণের সুবিধা, রাস্তাঘাট, পার্ক ও লাইব্রেরী ইত্যাদি। এই সমস্ত কাজে লাগাইয়া গৃহ-পরিচালনা সার্থক করিয়া তুলিতে হয়।

সহযোগিতা (Cooperation) : গৃহপরিকল্পনাকে কর্মে রূপায়িত করিতে হইলে পরিবারের লোকেদের সহযোগিতা দরকার। পরিবার হইল একটি যৌথজীবন। সকল ব্যক্তির সহযোগিতার উপর এই যৌথজীবনের সাফল্য নির্ভর করে। সহযোগিতা একদিকে চায় নেতৃত্ব, অন্যদিকে চায় পারিবারিক কাজগুলি সমাধা করার জন্য যৌথ উদ্যম। সকলের সহযোগিতা লাভ করিতে হইলে সকলের সঙ্গে আলোচনা করিয়া এক-জন গৃহ-পরিকল্পনার দায়িত্ব লইবে কিন্তু অপরের উপর তাহার নিজের ইচ্ছা চাপাইয়া দিবে না। এইরূপ পারিবারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যখন কাজের পরিকল্পনা স্থির হয় তখন কোন আকস্মিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, কোন অতিথি-অভ্যাগত আসিলে কিংবা হঠাৎ কোন ব্যক্তি অসুস্থ হইয়া পড়িলে প্রয়োজনমত ঐ পরিকল্পনা বদলান যায় এবং স্বেচ্ছায় কেহ না কেহ কাজের দায়িত্ব লইতে আগাইয়া আসে। সহযোগিতার অর্থ হইল চিন্তায় ও কর্মে নমনীয়তা এবং ব্যক্তির ইচ্ছা নয়, পরিবারের মঙ্গলবিধানই গৃহ-পরিচালনার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইবে।

সহযোগিতালাভের আরেকটি উপায় হইল সমন্বয়সাধন (coordination)। যেকোন পারিবারিক প্রচেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে পরস্পরের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা দরকার। যাহারা কাজে অংশ গ্রহণ করিবে তাহারা গোটা পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিবে এবং কাজটি সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করিবে। উপমা হিসাবে সুস্থ দেহের উল্লেখ করা যায়। দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গের সুষম ক্রিয়ার উপর যেমন স্বাস্থ্য নির্ভর করে তেমনি গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতার উপর সার্থক পরিচালনা নির্ভর করে।

গৃহ-পরিচালনার উদ্দেশ্য (goals) কি ?

প্রত্যেক পরিবারেরই কতকগুলি ঈপ্সিত বস্তু থাকে। ঐ সব বস্তুপ্রাপ্তিকেই জীবনের লক্ষ্য বলা যায়। গৃহ-পরিচালনার উদ্দেশ্য হইল এইসব ঈপ্সিত বস্তু লাভ করা।

সমস্ত পরিবারের ঈপ্সিত বস্তুগুলি মোটামুটি এক ধরনের, যেমন—

(১) **প্রেম :** জীবনে প্রেমের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পারস্পরিক ভালবাসার সঞ্চার। দাম্পত্য প্রেম, বাৎসল্য, ভ্রাতাভগিনীর পরস্পরের অনুরাগ সবই ইহার অন্তর্গত।

(২) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ঃ পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যলাভ।

(৩) স্বাচ্ছন্দ্য ঃ জীবনকে সুন্দর ও বাঁচার অনুকূল করিয়া তোলা।

(৪) উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঃ অর্থাৎ নানাদিকে সাফল্য ও জীবনে প্রতিষ্ঠা।

(৫) জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।

(৬) কর্মে দক্ষতা অর্জন।

(৭) গঠনমূলক ও শিল্পকাজে আগ্রহ সৃষ্টি।

(৮) সৌন্দর্যপ্রীতি এবং জীবনে তাহার প্রয়োগ।

(৯) ধর্মের অনুশীলন অর্থাৎ সত্য এবং ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ এবং সমগ্র জীবনকে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠা করা।

নির্দেশনা (Guidance) ঃ উল্লিখিত ঈপ্সিত বস্তুগুলি লাভের জন্য উপযুক্ত নির্দেশনা দরকার। সাধারণতঃ বয়স্ক ব্যক্তিরাই এই ব্যাপারে নির্দেশ দিয়া থাকেন এবং ছোটদের জীবন ঐ নির্দেশ অনুসারে গড়িয়া ওঠে। দৈনন্দিন কাজগুলি যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কাজের সমন্বয় সাধিত হয় তাহার জন্যও গৃহ-পরিচালিকাকে উপযুক্ত নির্দেশ দিতে হয়।

সমীক্ষা (Evaluation) ঃ পরিকল্পনা রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে আবার গৃহ-পরিচালিকাকে সমীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় কাজে কতখানি সাফল্য ঘটিল। এই সমীক্ষা দুই রকমের—প্রথমতঃ প্রতিদিনের কাজের একটি সমীক্ষা। সারাদিনে যতখানি কাজ করিব ভাবিয়াছি তাহা করা গেল কিনা। গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তি এইভাবে নিজ নিজ কাজের একটি সমীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। এইরূপ আত্মসমীক্ষা (self-evaluation) ছোটদের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকর। জীবনের ঈপ্সিত বস্তুগুলি লাভের ব্যাপারেও একটা সমীক্ষা হওয়া দরকার। এইরূপ সমীক্ষাদ্বারা গৃহ-পরিচালিকা বুঝিতে পারেন তাহার সমগ্র জীবনব্যাপী কাজে কতখানি সাফল্যলাভ হইয়াছে, যেমন—

(১) স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমীক্ষা হইতে পারে। গৃহের প্রত্যেক লোকের স্বাস্থ্য কেমন যাইতেছে।

(২) প্রত্যেকটি লোকের দৈহিক, মানসিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের একটি সমীক্ষা করা যায়।

(৩) পারিবারিক সম্পর্কের একটি সমীক্ষা চলিতে পারে। সকলের সঙ্গে সকলের সদ্ভাব আছে কি ?

(৪) প্রতি গৃহে অর্থসংক্রান্ত একটি সমীক্ষা হওয়া দরকার। গৃহে উপযুক্ত অর্থাগম হইতেছে কিনা এবং প্রত্যেকটি লোকের প্রয়োজন মিটিতেছে কিনা, প্রত্যেককে শিক্ষা এবং আমোদ-প্রমোদেরই বা কতখানি সুযোগ দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

(৫) উপরোক্ত লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য পারিবারিক সম্পদকে কতখানি কাজে লাগান হইতেছে উহাও সমীক্ষার একটি বিষয়বস্তু হইবে।

উপসংহারে বলা যায় গৃহ-পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার পদ্ধতি, উদ্দেশ্য (বা লক্ষ্য) এবং উদ্দেশ্যের সাফল্য সম্বন্ধে সমীক্ষা গ্রহণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

B. আদর্শ গৃহপরিচালিকা
(An ideal home-maker)

1. গৃহপরিচালিকার গুণ ও ব্যবহার
(Her personality and behaviour pattern)

বুদ্ধি, উৎসাহ, মানুষের চরিত্র অনুধাবনের ক্ষমতা, কল্পনা, বিচারশক্তি, অধ্যবসায়, খাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি—এইগুলি হইল গৃহপরিচালিকার সর্বপ্রধান গুণ। আমাদের দেশে গৃহিণীরাই সাধারণতঃ গৃহপরিচালনা করেন। সুতরাং উপরোক্ত গুণগুলি গৃহিণীর গুণ বলিয়া ধরা যায়।

(১) **বুদ্ধি ঃ** কোন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা, তাহা বিশ্লেষণ করা, অতীতের অভিজ্ঞতা স্মরণ করা এসবই বুদ্ধির কাজের অন্তর্গত। মূল সমস্যাকে অনুধাবন করা, সমস্ত দিক হইতে একটি পরিস্থিতিকে বিচার করা, জীবনের অভিজ্ঞতাকে সময়মত কাজে লাগান—এসবই বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। মোটের উপর বাস্তবজীবনে ব্যবহারিক জ্ঞানকে বুদ্ধি আখ্যা দেওয়া যায়। পারিবারিক জীবনের সমস্যাগুলির মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত বুদ্ধির দরকার।

(২) **উৎসাহ ঃ** প্রত্যেক সুপরিচালকের এই গুণটি থাকে। সুস্থ দেহ এবং সুস্থ মনে বেশী উৎসাহ দেখা যায়। তবে উৎসাহী মেজাজের লোক হইল আলাদা জাতের। যখন যে কাজ হাতে আসিয়াছে তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উহা সম্পন্ন করার চেষ্টাকে বলে উৎসাহ। একের উৎসাহ সহজেই অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়। জননীর উৎসাহ সন্তানদের অনায়াসে প্রভাবিত করে। মাঝে মাঝে অতি উৎসাহ আবার নিরুৎসাহ হওয়ার চেয়ে আগাগোড়া একটি স্বাভাবিক উৎসাহের ভাব থাকা গৃহপরিচালিকার বিশেষ গুণ বলিয়া গণ্য হয়।

(৩) **মানবচরিত্র অনুধাবনের ক্ষমতা ঃ** প্রত্যেক পরিবারেই বিভিন্ন ধরনের লোক থাকে। সকলের দক্ষতা এবং কাজ করার শক্তি সমান নয়। প্রত্যেকের স্বভাব, রুচি এবং পছন্দ-অপছন্দও আলাদা থাকে। গৃহপরিচালিকা যদি প্রত্যেকের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে কাজ বন্টন করিয়া দেন, প্রত্যেকের স্বভাব তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সঙ্গে সেইরূপ আচরণ করিতে সমর্থ হন তবে সংসারের অনেক সংঘাত এড়ান যায় এবং অবিচার করা হইয়াছে ভাবিয়া কোন ব্যক্তি হতাশায় ভোগে না।

(৪) **কল্পনা ঃ** নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করিতে হইলে কিংবা কোন অজানা পথে পা বাড়াইতে হইলে গৃহপরিচালিকার কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা তখন সামান্যই কাজে লাগে। যাহাদের প্রবল কল্পনা-শক্তি আছে তাহারা বহুপূর্ব হইতে অনেক সমস্যা আন্দাজ করিয়া লইতে পারেন এবং উহা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি যাহার কল্পনায় যত স্পষ্ট ফুটিয়া ওঠে জীবনের সাফল্যলাভও তাহার পক্ষে তত সহজসাধ্য হয়।

(৫) **অধ্যবসায় ঃ** ইহাও গৃহ-পরিচালিকার একটি বিশেষ গুণ। কোন কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার পিছনে লাগিয়া থাকার নাম অধ্যবসায়। অধ্যবসায়ের জোরে

মানুষ যে কোন দুরূহ কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। প্রতিদিনের নির্দিষ্ট রুটিনবাঁধা কাজের অতিরিক্ত কাজ হাতে লইতে সু-গৃহিণী ভয় পায় না।

(৬) **বিচারবুদ্ধি:** গৃহপরিচালনায় যথেষ্ট বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। নিজ অভিজ্ঞতা অনুশীলন করিয়া দেখিতে, কোন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলা, পারিবারিক সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বিনিয়োগের জন্য, ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এবং সর্বোপরি পারিবারিক জীবনের সাফল্য সমীক্ষা করিয়া দেখার সময় যথেষ্ট বিচারবুদ্ধির দরকার।

(৭) **খাপ খাওয়ানো:** গৃহপরিচালিকাকে প্রতিদিন নানা পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়, নানারকম লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে হয়, এইসব বিভিন্ন লোক ও বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার মত মনের নমনীয়তা গুণটি তাহার থাকা প্রয়োজন। জীবন একটি মসৃণ ছাঁচে ঢালা পথ নয়, এখানে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। নানারকম সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হয়। একটি সমস্যার সমাধান হইতে না হইতে আরেকটি সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। সকল অবস্থার সম্মুখীন হইতে না পারিলে, সকল লোকের সঙ্গে নিজেকে মিলাইয়া চলিতে না পারিলে গৃহবিবাদ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

(৮) **আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি:** গৃহ একটি যৌথজীবন। সকলের চেষ্টায় এই জীবন চলে এবং প্রত্যেকে উহাতে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু গৃহের হাল ধরিয়া থাকেন গৃহিণী। সুতরাং তাঁহার আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তিনি নিজেই যদি এই ক্ষমতা হারান কিংবা আপন ভাবাবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তবে অন্যকে পরিচালনা করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হয় না।

গৃহ-পরিচালিকার ব্যবহার
(Her behaviour pattern)

গৃহ-পরিচালিকার ব্যবহারে সর্বদা নিরপেক্ষতা প্রকাশ পাইবে। আপনার সন্তান হইতে শুরু করিয়া আত্মীয়-স্বজন, দাসদাসী অথবা অপর কোন আশ্রিত ব্যক্তি সকলের সঙ্গে তিনি নিরপেক্ষ ব্যবহার করিবেন, নতুবা সুবিচার ও সমব্যবহার না পাওয়ায় অনেকের মনে ক্ষোভ থাকিবে, কেহ কেহ হতাশায় ভুগিবে।

সু-গৃহিণী অবশ্যই ধৈর্য দেখাইবেন এবং তাঁহার কাজের মধ্যে সেবার ইচ্ছা দেখা যাইবে। শিশুদের সহস্র রকমের উপদ্রব, রোগী ও বৃদ্ধদের সকল রকম আবদার তিনি হাসিমুখে সহ্য করিবেন।

গৃহিণীর ব্যবহার হইবে হাসিখুশি মেজাজ থাকিবে সদা-প্রফুল্ল। তাঁহার প্রফুল্লতা সংসারের অনেক অভাব-অনটন, অনেক গ্লানি ঢাকিয়া দিতে পারে।

সু-গৃহিণীর ব্যবহার সর্বদা সংযত হইবে। সন্তানদেরও তিনি বাড়াবাড়ি আদর করিবেন না কিংবা নিজের ভাবাবেগের অতিরিক্ত প্রকাশ দেখাইবেন না।

যে গৃহের গৃহিণী ব্যবহারে নিরপেক্ষ, যাঁহার কাজে সেবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়, যিনি সদা প্রফুল্ল এবং সম্পদে-বিপদে স্থির ও সংযত থাকেন তিনি সেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

পার্থিব, মানব ও অর্থ প্রভৃতি বিবিধ সম্পদ পরিচালনা ও উহাদের ব্যবহার
(Management and use of different resources including material, human and financial resources)

পার্থিব সম্পদ (Management and use of material resources) : গৃহ-পরিচালনায় নানারূপ পার্থিব সম্পদের ব্যবহার হয়। তাহাদের মধ্যে সময় ও অর্থই হইল সবচেয়ে মূল্যবান। উভয়ের মধ্যে কিন্তু একটি গুরুতর পার্থক্য আছে। মানুষে মানুষে তথা পরিবারে পরিবারে অর্থসম্পদের ব্যাপারে একটা বৈষম্য দেখা যায় কিন্তু সময়ের ব্যাপারে এই বৈষম্য নাই। ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচ সমাজের সকল স্তরের লোকেদের দিনের ২৪ ঘণ্টা সময় হাতে থাকে। উপযুক্ত পরিকল্পনার দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তাহার সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারে।

সময় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা : সময়ের একটি পরিকল্পনা করিয়া লইলে প্রথম হইতেই মানুষ নিজ নিজ করণীয় কাজগুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করার অভ্যাস গড়িয়া ওঠে, অবসর সময় নিজের ব্যক্তিগত কাজ করার সুযোগ পায় এবং কোন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে সেই সম্বন্ধে ভাবিবার সময় পায়। ফলে একটি সমাধান খুঁজিয়া পাওয়াও সহজ হয়। যাহার জীবনে এইরূপ একটা স্বচ্ছন্দ গতিতে কাজ চলিতে থাকে তাহার কাজের মধ্যে একটা বেগ আসে এবং সে নিজের কাজে সহজেই দক্ষতা অর্জন করিতে পারে।

সময় এবং কাজের অভ্যাস : প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজন এবং অভ্যাসগুলি স্বতন্ত্র, জীবনের নানা দিকে আগ্রহও প্রত্যেক পরিবারের একরূপ নয়। সুতরাং প্রত্যেক পরিবারের সময় পরিকল্পনা একরূপ হইতে পারে না। নববিবাহিত দম্পতির সময় পরিকল্পনা একরূপ পরন্তু যাহাদের জীবনে একটি সন্তানের আগমন হইয়াছে তাহাদের সময় পরিকল্পনা হইবে অন্যরূপ। কোন পরিবারে ছুটির দিনগুলিতেই কাজের চাপ বেশী থাকে আবার কোন পরিবার সারা সপ্তাহ ধরিয়া বেশী খাটিয়া ছুটির দিনগুলি চিত্তবিনোদনের জন্য রাখিতে চান। কাজের অভ্যাস এবং পরিমাণের উপর বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তাও নির্ভর করে। কোন পরিবারের লোকেরা কাজের শেষে কিছুটা বিশ্রাম চান আবার কেহ কেহ কার্যান্তরকেই বিশ্রামরূপে মনে করেন।

প্রত্যেক পরিবার তথা ব্যক্তির অভ্যাস, প্রয়োজন এবং আগ্রহ তাহার সময় পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

কাজের চাপ : প্রতি গৃহেই একটা সময় কাজের চাপ পড়ে। প্রতিদিন সাধারণতঃ সকালবেলা যখন প্রধান আহার্য প্রস্তুত হয়, বাড়ির লোকেরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যায় তখনই কাজের চাপ থাকে বেশী। দিনের মতই সপ্তাহে, মাসে, কোন কোন ঋতুতে এবং বৎসরের কোন একটা সময়ে কাজের চাপ পড়ে। এইজন্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক কাজের একটি পরিকল্পনা করিয়া লইলে সব কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা যায়, কোন সময়ে অতিরিক্ত খাটুনি পড়িলেও পরে আবার কিছুটা হাল্কা কাজ এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে কাজে অবসাদ আসে না এবং সময় ও শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার হয়।

কাজের পরম্পরা ঃ কাজের পরম্পরা অর্থাৎ কোন্ কাজ আগে এবং কোন্ কাজ পরে করা হইবে সময়-তালিকায় তাহা অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। সব কাজের এরূপ সময় নির্দেশ করা থাকিলে কোন কাজ শেষ করিতে অতিরিক্ত প্রয়াসের প্রয়োজন হইবে না কিংবা কাজে কোন তাড়াহুড়া লাগিবে না।

সময় ও শক্তি বাঁচাইবার পরিকল্পনা ঃ গৃহিণীকে যে কাজগুলি নিজহাতে করিতে হয় যেমন রান্না, বাসন মাজা এবং কাপড় কাচার জায়গাগুলি খুব কাছাকাছি হইলে তাঁহার সময় ও শক্তি বাঁচে। আবার কোন কোন কাজ যখন একসঙ্গে করা যায় যেমন ইকমিক কুকার চাপাইয়া কাপড়গুলি কাচিয়া ফেলা যায় কিংবা ঘর পরিষ্কার করা যায় তবে ঐরূপ কাজগুলি একই সময়ের মধ্যে করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে সময় বাঁচে।

বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ঃ প্রতিদিন কতটা কাজ করিতে হইবে এবং কোন্ কাজে কতটা সময় ব্যয় হইতে পারে তাহা জানা থাকিলে সময়ের পরিকল্পনা করা সহজ হয়। প্রত্যেক কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত সময় দিতে হইবে। উহাতে কাজ ভাল ভাবে করা যায় এবং পরবর্তী কাজের জন্য সময়ের অভাব হয় না।

জরুরী অবস্থার জন্য সময় ঃ দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক কাজের পরিকল্পনা সর্বদা কাটায় কাটায় অনুসরণ করা যায় না। কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে, কাজে হঠাৎ কোন বিঘ্ন ঘটিলে, বাড়িতে কোন অতিথির আগমন হইলে কিংবা কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে নির্ধারিত কাজ বাদ দিয়া সময়ের দাবী মিটাইতে হয় এবং তার জন্য প্রতিদিনের কিছুটা সময় ফাঁকা রাখিতে হয়।

শ্রমবিভাগ ঃ গৃহের প্রত্যেকটি লোকের শক্তি, সামর্থ্য এবং আগ্রহ অনুযায়ী কাজ বন্টন করিয়া দিবে। উহাতে সকলেরই কাজ সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ জাগিবে, সময়ের কাজ সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে এবং প্রত্যেকে বিশ্রামের সুযোগ পাইবে।

সময় পরিকল্পনা সংক্রান্ত নির্দেশ

(১) সময় তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির সর্বাধিক প্রাধান্য দিবে।

(২) গৃহের প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজের পরম্পরা নির্ধারণ করিবে।

(৩) সময় বাঁচানো পরিকল্পনা করার চেষ্টা করিবে।

(৪) প্রতিটি কাজ সন্তোষজনক ভাবে করার জন্য উপযুক্ত সময় দিবে।

(৫) শ্রমবিভাগের নীতি অনুসরণ করিবে এবং প্রত্যেকটি লোকের সময়কে কর্ম, বিশ্রাম এবং চিত্তবিনোদন এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করিয়া দিবে।

(৬) পরিবারের সকলের সঙ্গে সমবেতভাবে এবং প্রত্যেকে যেন আবার এককভাবে চিত্তবিনোদনের সুযোগ পায়।

(৭) সময় পরিকল্পনার নমনীয়তা থাকা দরকার অর্থাৎ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে উহার মোকাবিলা করার জন্য প্রতিদিন সকলের হাতে কিছুটা ফাঁকা সময় রাখিতে হইবে।

কাজের পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরবিন্যাস ঃ

প্রত্যেক পরিবারের উপযোগী সময় ও কাজের পরিকল্পনাকে ধাপে ধাপে গড়িয়া তুলিতে হয়। বিভিন্ন পরিবারের প্রয়োজন যদিও স্বতন্ত্র তথাপি প্রতি গৃহেই পরিকল্পনার নিম্নলিখিত চারটি স্তর অনুসৃত হইতে পারে ঃ

প্রথম ধাপে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক কাজগুলির একটা তালিকা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় ধাপে দৈনন্দিন কাজের একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সকলের মধ্যে কর্মবিভাগ করিয়া দিতে হইবে। কাজগুলিকে প্রধান প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া একেকটি ভাগের জন্য কিছুটা সময় নির্দিষ্ট করিতে হইবে। যেমন আহার্য দ্রব্য প্রস্তুত করা সংক্রান্ত কাজগুলি এবং দৈনন্দিন গৃহপরিষ্কারের কাজগুলিকে একটি প্রধান ভাগে ফেলা যায় এবং সেইভাবে কাজের সময় নির্ধারিত হইতে পারে। তারপর সকাল-বিকালের ফাঁকা সময়ে অন্যান্য কাজগুলি বিন্যাস করিতে হইবে।

তৃতীয় ধাপে আসিবে দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজগুলি সমাপ্ত করার পালা। এখানে দিনের ফাঁকা জায়গায় মাসের এবং ঋতুবিশেষের কাজ সময় নির্দিষ্ট হইবে।

চতুর্থ ধাপে আসিবে সময় পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার পালা। কোন্ কাজের দায়িত্ব কে লইবে আলোচনা করিয়া তাহা স্থির করিতে হইবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপের সঙ্গে সঙ্গে এই আলোচনা অর্থাৎ চতুর্থ ধাপের পরিকল্পনা করা যায়।

কাজের উপরোক্ত পরিকল্পনা করা সহজ, স্মরণ রাখা সহজ এবং কাজে রূপায়িত করাও সহজ।

সময় পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে সমীক্ষা গ্রহণ

সমীক্ষার জন্য নিজেকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করিবে ?

(১) বাড়ির কাজে কি আমি খুব বেশী সময় ব্যয় করিতেছি ? আমার ব্যক্তিগত কাজের জন্য কি যথেষ্ট সময় হাতে থাকিতেছে ?

(২) আমার পরিকল্পনা কতখানি সময় বাঁচায় ?

(৩) গৃহের প্রতিটি লোক কি পারিবারিক কাজে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছে, না কাহারো ঘাড়ে কাজের বোঝা বেশী চাপিয়াছে ?

(৪) যে কাজে আমি সময় ব্যয় করিতেছি বাড়ির লোকেদের নিকট কি তাহা মূল্যবান মনে হইতেছে ?

(৫) গৃহের লোকেদের কি আমি যথেষ্ট সঙ্গ দিতে পারিতেছি ?

(৬) আমার সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য উন্নততর কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(খ) মানুষ্যসম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ

(Management and use of human resources)

গৃহপরিচালনার প্রধান উপাদান হইল মানুষ। পূর্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজ নিজ সামর্থ্য ও দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে আপন আপন গৃহকে একটি বিশিষ্টতা দান করে।
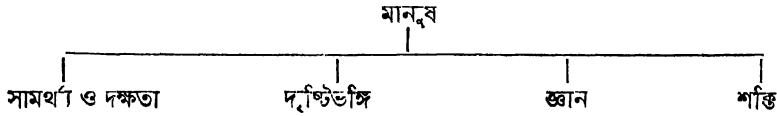
মানুষের এই সহজাত ক্ষমতাগুলির কিভাবে ব্যবহার ও পরিচালনা করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

সামর্থ্য ও দক্ষতা ঃ দক্ষতা বলিতে বুঝায় কোন কাজ অনায়াসে এবং সুচারুরূপে করার ক্ষমতা। আর. এস. উডওয়ার্থ দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারটি তিনটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন ঃ

(১) অনুসন্ধান বা আগ্রহ-সৃষ্টির স্তর (the exploratory stage) ;

(২) আনাড়ি অবস্থা এবং শিক্ষানবিশীর স্তর (the awkward and effortful stage) ;

(৩) দক্ষতা অর্জনের এবং সহজভাবে কর্মানুষ্ঠানের স্তর (the skilled and free running stage)।

গৃহপরিচালিকা গৃহের প্রত্যেকটি লোকের দক্ষতা অনুসারে কর্মবিভাগ করিয়া দিবেন। দক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসারে করা উচিত ঃ

(১) প্রথম হইতেই কাজের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং মনোযোগই হইল শিক্ষার প্রথম প্রয়োজন।

(৩) যে কোন কাজকে টুকরা টুকরা ভাবে না দেখিয়া সমগ্ররূপে দেখিবে এবং সেইভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে, যেমন কাপড় ধোওয়ার কাজটি ধোওয়া, মাড় দেওয়া ও ইস্ত্রি করা এই তিনটি কাজ হিসাবে না দেখিয়া একটি সমগ্র কাজরূপে দেখিতে হইবে।

(৪) সময়ের উপযুক্ত ব্যবধান রাখিয়া মাঝে মাঝে কাজটি অভ্যাস করিতে হয়। তাহাতে কাজে ক্লান্তি আসে না কিংবা কাজ একঘেয়ে বলিয়া মনে হয় না অথচ উহা ভুলিয়া যাইবার ভয়ও থাকে না।

(৫) যে কোন কাজ মোটামুটি আয়ত্ত হইলেই শিক্ষা শেষ হইয়াছে ভাবা ভুল। বারবার চেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে (trial and error) উহাতে দক্ষতা অর্জন করিতে হয়। কাজে একবার পাকা হইয়া গেলে কাজের সময় ও শ্রম বাঁচে এবং দেহচালনা তখন সুষম ও ছন্দোবদ্ধ হয়।

গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি নিজ নিজ কার্যে দক্ষতা অর্জন করে গৃহপরিচালনা তবে সহজ ও সুন্দর হয়।

দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞান ঃ গৃহপরিচালিকার দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞান গৃহরচনাতে একটি সৌন্দর্য ও সাফল্য সঞ্চার করে। কিছুটা বংশধারা এবং কিছুটা পঠনপাঠন ও অভিজ্ঞতা হইতে দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞান অর্জিত হয়। গৃহপরিচালিকা গৃহের সকল ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়া লইবেন এবং গৃহকর্মে প্রয়োজনমত প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইবেন।

[দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞান সম্বন্ধে ২—৫ পৃষ্ঠায় বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।]

শক্তি ঃ দৈনন্দিন কাজের জন্য আমাদের প্রতিদিন তাপ ও শক্তি ব্যয় হইতেছে। সময় পরিকল্পনার মত শক্তি ব্যয়েরও একটা পরিকল্পনা করিতে হয়। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল গৃহের দৈনন্দিন কাজগুলি করার পরেও বাহিরের কাজে অথবা সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ করার মত শক্তি রাখা।

শক্তি নিয়ন্ত্রণ ঃ শক্তি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু শক্তি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা একটি কঠিন কাজ। মানুষ ঘড়ি দেখিয়া সময়ের মাপ করিতে পারে এবং কাজের অগ্রগতি বুঝিতে পারে কিন্তু দৈহিক শক্তি মাপার মত অনুরূপ কোন যন্ত্র নাই। শুধু অভিজ্ঞতার দ্বারা সে শক্তিখরচের অনুমান করিতে পারে।

তাপ ও শক্তিখরচের পরিকল্পনা করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত থাকা দরকার ঃ

(১) দৈনিক কোন্ কাজে কতটা শক্তি খরচ হয় ?

(২) কোন্ কাজগুলি সবচেয়ে শ্রমসাপেক্ষ ?

(৩) অবসাদের পরিণাম কি ?

(৪) বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা কতখানি ?

(৫) সবশেষে শক্তি ব্যয় সংক্রান্ত পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা গ্রহণ।

(১) দৈনন্দিন সমস্ত কাজে একরূপ শক্তি ব্যয় হয় না। বসা কাজের তুলনায় হাঁটা-চলার কাজে কিংবা যেসব কাজে অধিক অঙ্গসঞ্চালন হয় তাহাতে বেশী শক্তি ব্যয় হয়। ঘরের কাজগুলিকে আমরা মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি—(১) হাল্কা কাজ যেমন হাতে সেলাই করা, পশম বোনা, তরকারি কোটা ইত্যাদি কাজে চেয়ারে বসিয়া থাকার তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশী শক্তি ব্যয় হয়। (২) সাধারণ পরিশ্রমের কাজ যেমন—ছোটখাটো জিনিস ইস্ত্রি করা, হাল্কা জামা-কাপড় কাচা, কাপ-ডিস ধোওয়া, কলে সেলাই করা ইত্যাদি কাজে ঘণ্টায় ২৪ ক্যালোরী মেটাবলিজম বাড়ে। (৩) কঠিন পরিশ্রমের কাজ যেমন—ঘর ধোওয়া-মোছা, ভারি কাপড় কাঁচা, ইস্ত্রি করা, বাসন মাজাঘষা করা ইত্যাদি কাজে ঘণ্টায় ৫০ ক্যালোরী শক্তি ব্যয় হয়। কাজের গতি বাড়াইলে শক্তি খরচের পরিমাণও বেশী হয়।

অতিরিক্ত শক্তি খরচ হইলে অবসাদ আসে। এই অবসাদ দুই রকমের—শারীরিক ও মানসিক। শরীর অবসন্ন হইলে কর্মদক্ষতা হ্রাস পায় আর মন যখন অবসন্ন থাকে তখন কোন কোন বিশেষ কাজে বিরক্তি আসে ফলে কাজে আশানুরূপ অগ্রগতি হয় না।

ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রথমতঃ মানুষমাত্রই যেমন কাজ পছন্দ করে তেমনি বিশ্রামও ভালবাসে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম পাইলে কাজ

করার আগ্রহ বাড়ে এবং কর্মক্ষমতা বাড়িয়া যায়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর বিশ্রাম না পাইলে দেহ শীঘ্র ভাঙিয়া পড়ে। যে সকল গৃহিণী বাহিরে কাজ করেন না মধ্যাহ্নই তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত বিশ্রামের কাল পরন্তু কর্মরতা মহিলারা নিজ নিজ সুবিধামত সময় বাছিয়া লইবেন।

তাপ ও শক্তিসংরক্ষণের উপায় ঃ

(ক) কাজে আগ্রহ থাকিলে স্বভাবতঃই তাপ ও শক্তি কম ব্যয় হয়। অনেক সময় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া কাজে আগ্রহ জাগান যায়।

(২) দক্ষতা অর্জন করিতে পারিলে কাজ ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসে এবং তাপ ও শক্তি কম খরচ হয়।

(৩) কাজের প্রক্রিয়া সরল করিলে এবং

(৪) অঙ্গসঞ্চালন হ্রাস করিতে পারিলে তাপ ও শক্তি কম খরচ হয়।

কাজের প্রক্রিয়া সরল করা ঃ নানাভাবে কাজের প্রক্রিয়া সরল করা যায়, যেমন ঃ

(১) রন্ধনের প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নতুন সরল পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় ;

(২) নানা রকমের পদ রান্না না করিয়া দুই একটি ভাল পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত করিলে এবং

(৩) প্রতিদিনের আহার্য বস্তুর সঙ্গে কিছু কাঁচা শাকসবজি স্যালাড হিসাবে গ্রহণ করিলে রন্ধনের পদ্ধতি সহজ করা যায়।

অঙ্গসঞ্চালন হ্রাস করিবার উপায় ঃ

নানাভাবে অঙ্গসঞ্চালন হ্রাস করা যায়, যেমন ঃ

(১) মিতশ্রম যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা,

(২) রান্নাঘর এবং কাজের নির্দিষ্ট স্থানগুলির পুনর্বিন্যাসের দ্বারা। সামান্য অর্থব্যয়ে রান্নাঘরের পুনর্বিন্যাস করা যায়। উনুনের সমান উচ্চতায় একটি আরামদায়ক বসিবার আসন তৈয়ারী করান, রান্নাঘরে কয়েকটি ভাল তাক নির্মাণ করান যাহাতে জিনিসপত্র নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়, উনুনের পাশেই বাসন ধোওয়ার জন্য একটি সিঙ্ক তৈয়ারী করান খুব ব্যয়সাধ্য কাজ নয়। অথচ এইরূপ ব্যবস্থা করিলে গৃহিণীর হাঁটাহাঁটির শ্রম বাঁচে।

(৩) ব্যবহারের সুবিধা দেখিয়া কিছু বাসনপত্র এবং আনুষঙ্গিক জিনিস ক্রয় করিলে যেমন কাঁসার বাসনের পরিবর্তে একপ্রস্থ স্টেনলেস স্টীলের বাসন কিনিলে, ইস্ত্রির প্রয়োজন হয় না এইরূপ বস্ত্রাদি ব্যবহার করিলে সময় ও শ্রম দুইই বাঁচিয়া যায়।

সমীক্ষা ঃ শক্তি ব্যয় সংক্রান্ত সমীক্ষা করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিবে ঃ

(১) জীবনের ঈপ্সিত বস্তুলাভের পরিপ্রেক্ষিতে কি আমার শক্তি ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হইয়াছে ?

(২) ঘরোয়া কোন্ কাজের জন্য অধিক শক্তি ব্যয় হইতেছে ?

(৩) আমি কি আমার শক্তির যথাযথ ব্যবহার করিতেছি ?

(৪) পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া শক্তি ব্যয় হইতেছে কি ?

(৫) কোন কাজ শেষ করার জন্য কি আমার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশী সময় লাগিতেছে এবং ফলে বেশী শক্তি ব্যয়িত হইতেছে ?

(৬) কোন্ কাজ আমার সবচেয়ে ভারি মনে হয় ?

(৭) আমি কি সহজে শ্রান্ত হইয়া পড়ি ? এই শ্রান্তি কি ধরনের ?

(৮) অবসাদ দূর করার জন্য আমার কি চাই—কর্মান্তর না পূর্ণ বিশ্রাম ?

অর্থসম্পদের পরিচালনা ও ব্যয়
(Management and use of financial resources)

পারিবারিক জীবনে অর্থসম্পদের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী কারণ উহার উপর নির্ভর করে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, সকলের স্বাচ্ছন্দ্য এবং শিশুদের জীবনের নিরাপত্তা। অর্থের সদ্ব্যবহার না হইলে পারিবারিক জীবনে অনেক মানসিক উদ্বেগ এবং দুর্ভোগ দেখা দেয়। পার্থিব সম্পদের অন্তর্গত হইল অর্থ।

পরিবারের অর্থসম্পদ বলিতে কেবল নগদ টাকাকড়ি বুঝায় না। নগদ টাকাকড়ি ব্যতীত দ্রব্যসম্ভার, সেবা এবং এই সমস্ত মিলিয়া যে সন্তোষ লাভ হয় সবকিছু অর্থ-সম্পদের অন্তর্গত। অর্থসম্পদের পরিচালনা বলিতে বুঝায় অর্থের পরিকল্পনা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং সবশেষে একটি সমীক্ষাগ্রহণ।

অর্থপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল ত্রিবিধ ঃ

(১) পরিবারের বিভিন্ন বিকাশসাধন করা ;

(২) সমগ্র পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা ; এবং

(৩) সমাজ-কল্যাণের কাজে সাধ্যমত অংশ গ্রহণ করা।

অর্থের সুপরিকল্পনার জন্য ছয়টি স্তর পথপ্রদর্শকের কাজ করিতে পারে। এই স্তর-গুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) **লক্ষ্য স্থির করা** এবং উহার সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা। যেসব পরিবার লক্ষ্যহীন ভাবে জীবন কাটায় তাহাদের হাতে যেমন যেমন অর্থ আসে ঠিক তেমনি খরচ হইয়া যায়। পরন্তু লক্ষ্য স্থির থাকিলে ব্যয়ের মাত্রা সংযত হয়, অর্থের সদ্ব্যবহার ঘটে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিয়া মানুষ সর্বাধিক সন্তোষ লাভ করে।

(২) **আয়বিশ্লেষণ করা।** আয় প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর—

(ক) আর্থিক আয় (money income) ও (খ) প্রকৃত আয় (real income)। এতদ্ব্যতীত পারিবারিক সম্পদ, মালপত্র, যন্ত্রপাতি ও মানুষের সেবাজনিত যে সন্তোষ-লাভ হয় উহাও পারিবারিক অর্থসম্পদের অন্তর্গত। উহাকে সম্পদের মনস্তাত্ত্বিক দিক বলা যায়।

(ক) **আর্থিক আয়** বলিতে বুঝায় পরিবারের ভাণ্ডারে কতটা নগদ অর্থ আসিল। বেতন, মজুরী, ব্যবসায়ের মুনাফা, বাড়ি ভাড়া, শেয়ারের লভ্যাংশ, লগ্নি টাকার সুদ, বার্ধক্য ভাতা, রয়ালটি (royalty) ইত্যাদি নানাভাবে অর্থের আগমন হইতে পারে।

এই নগদ অর্থের বিনিময়ে আমরা সচরাচর প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং লোকের সেবাকার্য ক্রয় করিয়া থাকি এবং সাধ্যমত কিছুটা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রাখি।

(খ) **প্রকৃত আয়** বলিতে বুঝায় নগদ টাকা, তাছাড়া স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আগত বস্তু কিংবা সুযোগ-সুবিধা যেমন—খেতের ফসল, শাক-সবজি ও ফলমূল, মাল, যন্ত্রপাতি, নিজস্ব বাড়িতে বাস করার সুবিধা ইত্যাদি।

গৃহের লোকেদের বিশেষতঃ গৃহপরিচালিকার জ্ঞান, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাও প্রকৃত আয়ের অন্তর্গত। কোথায় কখন কোন্ জিনিসটি সস্তায় ভাল পাওয়া যাইবে, কিভাবে অর্থ বিনিয়োগ করিলে বেশী সুদ আসিবে কিংবা কিরূপে গৃহের জিনিসটি সস্তায় ভাল পাওয়া যাইবে, কিংবা কিরূপে গৃহের জিনিস ও আসবাবপত্রের যত্ন লইতে হইবে এই ব্যবহারিক জ্ঞান পারিবারিক অর্থ বাঁচাইতে কিংবা অর্থ আগমনে সাহায্য করে।

(গ) আর্থিক আয় এবং প্রকৃত আয় ব্যতীত আরেক শ্রেণীর আয়ের উল্লেখ করা যায় —উহা হইল অর্থ এবং সেবাকাজ হইতে লব্ধ সন্তোষ। সন্তোষ লাভের ব্যাপারটি যদিও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত তথাপি গৃহপরিচালনার উৎকর্ষ যাচাই হয় ঐ সন্তোষের মাপকাঠির দ্বারা।

(৩) **নগদ টাকা কতটা আসিতেছে :** অর্থ পরিকল্পনার সময় গৃহে নগদ অর্থ আসার পরিমাণ জানিয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ বেতনভোগী ব্যক্তিদের সারা বৎসরের আয় নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু সাধারণ ব্যবসা কিংবা বৃত্তিতে যাহারা নতুন যোগ দিয়াছেন তাহাদের আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে না। তাহারা সারা বৎসরের আয়ের একটা গড়পড়তা হিসাব ধরিয়া লইয়া বারো মাসের মধ্যে উহাকে বিভক্ত করিয়া লইতে পারেন।

(৪) **প্রত্যেকটি পরিবারের জীবনবৃত্ত কতকগুলি স্তর অতিক্রম করে।** অর্থ পরিকল্পনার সময় এই স্তরগুলি অনুধাবন করা প্রয়োজন। যেমন বিবাহের পরেই নব-দম্পতি যখন প্রথম সংসার পাতে তখন হইল জীবনের প্রথম স্তর বা প্রথম অধ্যায়। তার-পর সন্তানের আগমন, শিক্ষা বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষার্থে তাহাকে প্রেরণ করা, কন্যার বিবাহ, চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ ইত্যাদি একটির পর একটি অধ্যায় আসিতে থাকে। জীবনের এই অধ্যায়গুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে অর্থপরিকল্পনা করা সহজ হয়।

(৫) **বর্তমানের স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা যেন ভবিষ্যতের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অনুসারী হয়।** অর্থ পরিকল্পনার এইটি সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। পার্থিব সম্পদকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে জীবনে যে সন্তোষ আসে তাহা বাস্তবিকই দুর্লভ।

(৬) অর্থব্যয়ের একটি সুষ্ঠু পন্থা উদ্ভাবন করা যাহাতে গৃহের সকলের সন্তোষ বিধান হয়।

অর্থব্যয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে :

(১) **বাজেট পদ্ধতি** (Budget method) : এই পদ্ধতি অনুসারে (1) খাদ্য, (2) বস্ত্র, (3) বাসস্থান, (4) যাতায়াত, (5) শিক্ষা এবং (6) আমোদ-প্রমোদ এইরূপ প্রধান প্রধান খাতে অর্থ বণ্টন করিয়া দিতে হয়।

1	2	3	4	5	6

(২) **অংশবন্টন পদ্ধতি** (Allowance method) ঃ এই পদ্ধতি অনুসারে গৃহস্বামী কতকগুলি খরচ মিটাইবার জন্য আয়ের কিছুটা অংশ পত্নীর হাতে ছাড়িয়া দিবেন যেমন ছেলেমেয়েদের মাসের বেতন, গোয়ালা এবং ধোপার খরচ, ভৃত্যদের মাহিনা ইত্যাদির ভার পত্নীর উপর থাকিবে এবং আয়ের বাকী মোটা অংশটি তিনি নিজের হাত রাখিবেন।
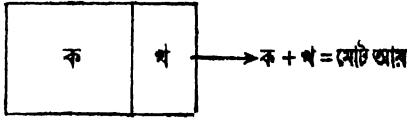
ক অংশটি গৃহস্বামীর হাতে থাকিবে এবং খ অংশটি গৃহিণীর হাতে দেওয়া হইবে।

(৩) **ডোল পদ্ধতি** (The handout or doling method) ঃ বাড়ির প্রত্যেকে নিজ নিজ আয় গৃহস্বামীর হাতে তুলিয়া দিবে এবং তিনি যাহার যেমন প্রয়োজন মনে করেন খরচের জন্য তাহার হাতে সেই পরিমাণ অর্থ দিবেন। ভারতের অনেক যৌথ পরিবারে অর্থব্যয়ের এইরূপ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চলিয়া আসিতেছিল।
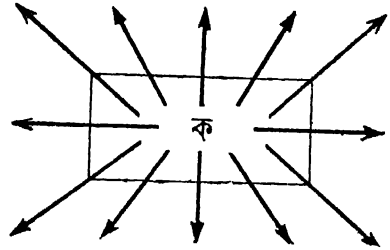
'ক' দ্বারা আয় এবং ছোট-বড় তীরগুলি নানারকম ব্যয় বুঝাইতেছে

উপরিউক্ত পদ্ধতি ব্যতীত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আরও দুইটি পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। প্রথমটি হইল সমান বেতন পদ্ধতি (Equal wages method) এবং দ্বিতীয়টি হইল আধা-আধি ব্যবস্থা পদ্ধতি (Fifty-fifty system)।

(৪) **সমান বেতন পদ্ধতি** (Equal wages method) ঃ এই পদ্ধতি অনুসারে পরিবারের সমস্ত অর্থ ব্যয় হইবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে স্বামী-স্ত্রী সমান ভাগে নিজেদের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া লইবে।
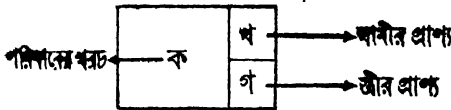
(ঙ) **আধা-আধি ব্যবস্থা** (Fifty-fifty system) ঃ স্বামী-স্ত্রী প্রথমেই পরিবারের অর্থ এবং দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন এবং নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ হইতে সংসারের অর্ধেক খরচ মিটান।
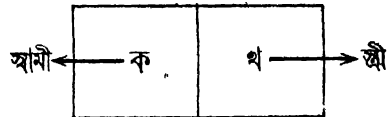
সমীক্ষা ঃ অর্থব্যয়ের পর উহার সাফল্য সম্বন্ধে সমীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। সমীক্ষার মানদণ্ডরূপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ব্যবহার করা যাইতে পারে ঃ

(১) মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণ কত এবং ঐ অর্থ পরিবারের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক মান রক্ষা করিতে পারিতেছে কিনা।

(২) পরিবারের সকলের ব্যক্তিগত প্রয়োজন কতটা মিটিয়াছে এবং প্রত্যেকের কতখানি সন্তোষবিধান হইয়াছে ?

(৩) ব্যয়ের পরিকল্পনায় সঞ্চয়ের সুযোগ আছে কিনা ?

(৪) পরিকল্পনা কার্যকরী করা বাস্তবে সহজ কিনা ?

C. পারিবারিক সম্পদ পরিচালনা
(Operation of Family Finance)

1. পারিবারিক বাজেট ও অর্থ-পরিচালনা
(Family budgeting and income management)

পূর্বেই বলিয়াছি অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক পরিবারই কোন-না-কোন পদ্ধতি* গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে বাজেট হইল অর্থব্যয়ের অন্যতম উৎকৃষ্ট পন্থা। একটি তহবিল হইতে যখন পরিবারের সকল দাবী মিটাইতে হয় তখন সীমাবদ্ধ আয়ের মধ্যে ব্যয় সংকুলান করাটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায় এবং খরচ করার পূর্বেই ব্যয় সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা করা দরকার হয়। বাজেট হইল **অর্থব্যয়ের এইরূপ পূর্ব-পরিকল্পনা**।

বাজেট করার পূর্বে পরিবারের আয়ের একটি যথাযথ হিসাব করিয়া লইতে হয়। এই হিসাবের মধ্যে পড়িবে মোট **আর্থিক আয়** (total money income) এবং **প্রকৃত আয়** (real income) অর্থাৎ সম্পত্তি হইতে আয় তাছাড়া যন্ত্রপাতি ও মানুষের কর্ম ও সেবাজনিত আয়।

বাজেটের প্রয়োজনীয়তা :

(১) বাজেট করার ফলে একটি পরিবারে কতটা অর্থ ব্যয় তাহা স্পষ্টভাবে জানা যায়।

(২) আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য আনা যায়। বস্তুতঃ এই ভারসাম্য বজায় রাখাই বাজেট করার প্রধান উদ্দেশ্য। এই ভারসাম্য আনার জন্য গৃহের জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি ও মানুষের শ্রম পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে হয়।

(৩) বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হইল আর্থিক স্বচ্ছলতা আনা। যাহার যাহা কিছু প্রাপ্য তৎক্ষণাৎ তাহা মিটাইয়া দিবার সামর্থ্যকে বলে আর্থিক স্বচ্ছলতা। অনেক সময় আর্থিক অভাবই ঠিক অস্বচ্ছলতার প্রধান কারণ নয়। টাকাটা ঠিক প্রয়োজনের সময় মজুত থাকে না বলিয়া অভাব দেখা দেয়। বছরের গোড়াতেই যদি একটি বাজেট করিয়া লওয়া যায় তবে এই অসুবিধা দূর করা যায়।

(৪) অসময়ের জন্য কিছু সঞ্চয়ের ব্যবস্থাও বাজেট করার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঠিক ঠিক বাজেট করিতে পারিলে আয়ের প্রত্যেকটি পয়সার সদ্ব্যবহার হয় এবং গৃহের প্রত্যেকটি লোকের সন্তোষ ও তৃপ্তি ঘটে।

বাজেট হইতে পারে দুই প্রকারের : মানসম্মত (standard) এবং আদর্শ (ideal)। কোন দুইটি পরিবারের প্রয়োজন কখনও এক হইতে পারে না। সুতরাং একের বাজেট

---

* (১) বাজেট পদ্ধতি, (২) অংশবণ্টন পদ্ধতি, (৩) ডোল পদ্ধতি, (৪) সমান বেতন পদ্ধতি এবং (৫) আধাআধি ব্যবস্থা — অর্থব্যয়ের এই পাঁচটি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

অন্যের পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভব নয়। তাই সম-আর্থিক-সামাজিক মর্যাদার লোক, যেমন—অধ্যাপনা, চিকিৎসা ইত্যাদি, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য নমুনা বাজেট প্রস্তুত করা যায়। এইরূপ নমুনা বাজেটকে বলে মানসম্মত বাজেট। মানসম্মত বাজেট দেখিয়া প্রত্যেক পরিবার আপন আপন প্রকৃত বাজেট (actual budget) প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। আদর্শ বাজেটে আবার সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট অর্থ কিভাবে ব্যয় করিলে তাহার সদ্ব্যবহার হইবে তাহাই দেখান হয়। আদর্শ বাজেট প্রস্তুত করাতে বিশেষ দূরদৃষ্টি দরকার।

বাজেটের খাত (Budget headings)ঃ প্রকৃত বাজেট প্রস্তুত করার সময় কোন্ কোন্ খাতে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে তাহা প্রথমে স্থির করিয়া লইতে হয়। ক্রমশঃ কম গুরুত্ব অনুযায়ী উহাদের পর পর সাজাইয়া লইয়া প্রত্যেকটি খাতের মধ্যে আবার কোন্ কোন্ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া লইবে। আগেই বলিয়াছি প্রত্যেকটি পরিবারের চাহিদা একরূপ নয়। তাই প্রত্যেকের বাজেট হইবে স্বতন্ত্র। তবে এখানে একটি মানসম্মত বাজেটের খাত দেখান হইল। প্রথমেই আমরা খাদ্য, বস্ত্র, পোশাক, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সঞ্চয়, আমোদপ্রমোদ ইত্যাদি প্রধান প্রধান বিভাগগুলি স্থির করিয়া লইলাম। তারপর উহাদের অন্তর্গত উপ-বিভাগগুলি দেখান হইল ঃ

১। **খাদ্য**

মুদি
মাছ, মাংস
টাটকা সবজি
ফল
ডিম
দুধ
গৃহের বাহিরে কেনা খাবারে ব্যয়

২। **বস্ত্র**

শাড়ি
ধুতি
জামা ইত্যাদি
অথবা
স্বামী
স্ত্রী
সন্তানদের প্রত্যেকের জন্য ব্যয়

৩। **বাসস্থান**

(ক) ভাড়া বাড়ি

ভাড়া
মেরামত বাবদ ব্যয়
অন্যান্য ব্যয়—যেমন ট্যাক্স

(খ) নিজস্ব বাড়ি

ধার শোধ
সুদ
ট্যাক্স
ইনস্যুরেন্স
মেরামত

৪। **বাড়ি পরিচালনার ব্যয়**

জল
বিদ্যুৎ
গ্যাস

৫। **জ্বালানি**

কয়লা
ঘুঁটে
কেরোসিন

৬। **টেলিফোন**

ফোনের ভাড়া
অতিরিক্ত কল
ট্রাঙ্ক কল ও টোল কল

৭। **ধোপা**

সাধারণ কাপড়
অথবা
গরম বস্ত্র

৮। **যাতায়াত**

গাড়ি
ট্যাক্সি
ট্রাম, বাস
ট্রেনের ভাড়া

৯। **শিক্ষা**

স্কুল-কলেজের বেতন
গৃহশিক্ষক
বই খাতা
যাতায়াতবাবদ ব্যয়
নৃত্যগীতবাবদ ব্যয়
দৈনিক, সাপ্তাহিক ও
মাসিক পত্র-পত্রিকা

১০। **স্বাস্থ্য**

চিকিৎসকের ফি
বিশেষজ্ঞের ফি
ওষুধের দাম

১১। **আমোদ-প্রমোদ**

পরিবারের জন্য
অন্যান্য লোকেদের জন্য
শিশুদের খেলনা

১২। **সঞ্চয়**

লাইফ ইনস্যুরেন্স
অন্যান্য উপায়ে সঞ্চয়

১৩। **অন্যান্য খরচ**

দান
উপহার

বাজেট প্রস্তুত করিবার নিয়ম ঃ বাজেট প্রস্তুত করিবার সময় দুইটি নিয়ম অনুসরণ করা যায়। প্রথমটি হইল **আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার রীতি** (Live within your income method)। এই রীতি অনুসারে বাজেট প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া লইবে ঃ

(১) সর্বপ্রথমে আগামী বছরের সম্ভাব্য আয়ের একটা হিসাব করিবে।

(২) তারপর ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাতগুলি নির্ধারণ করিবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জীবিকার মানই ব্যয়-নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ধনী পরিবারের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক এবং বাজেটে উল্লেখযোগ্য স্থান পায়, দরিদ্র পরিবারের পক্ষে তাহাই আবার একান্ত দুর্লভ এবং বাজেটে তাহাদের কোন স্থানই থাকে না।

(৩) প্রধান খাতগুলি নির্ণীত হইবার পরে কোন্ খাতে মোটামুটি কত ব্যয় করিবে তাহা স্থির করিয়া লইবে।

(৪) এইভাবে ব্যয়ের পরিমাণ স্থির হইবার পরে প্রত্যেকটি খাতের উপ-বিভাগগুলি এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি উপ-বিভাগের ব্যয়ও স্থির করিবে। উপ-বিভাগ করিবার সুবিধা এই যে ইহাতে পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের ব্যক্তিগত রুচি ও অভ্যাসের দিকে দৃষ্টি রাখা যায়। যেমন কোন পরিবারের গৃহকর্তার ধূমপানের অভ্যাস আছে এবং গৃহিণীর আবার পানের সঙ্গে জর্দা প্রয়োজন হয়। উক্ত পরিবারের খাদ্যের খাতে সিগারেট, পান ও জর্দার একটি উপবিভাগ রাখিলে হিসাব করার সুবিধা হয়।

(৫) সমস্ত হিসাবের পরে যদি দেখা যায় কোন একটি বা একাধিক খাতে প্রয়োজনের অনুরূপ অর্থ নাই তখন অন্য খাত হইতে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ খাতের প্রয়োজন মিঠান যায় কি না দেখিবে।

উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী বাজেট প্রস্তুত করিলে আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা সহজ হয়। দরিদ্র কিংবা সদ্যবিবাহিত দম্পতি যাহারা সবেমাত্র নিজেদের সংসার পাতিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম অনুযায়ী বাজেট করা প্রশস্ত।

জীবনকে যেভাবে গড়িতে চাই পদ্ধতি (The 'Make-life-what-I-would-like-it" method) : এই পদ্ধতিতে বাজেট করিবারও কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে।

(১) প্রথম কোন্ খাতে কত অর্থ ব্যয় করিবে তাহা স্থির করিবে। তারপর যে জিনিসগুলি কেনা দরকার তাহার একটা ফর্দ করিবে, যেমন পোশাকের ক্ষেত্রে পিতার কয়খানি ধুতি, মায়ের কয়খানি শাড়ি, কয়টা ব্লাউজ, সন্তান ও অন্যান্য পরিজনদের প্রত্যেকের কাহার কয়টি পোশাক, জুতো, মোজা ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ করিবে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, বাজেটের প্রত্যেকটি বিভাগের জিনিসগুলি গুরুত্ব অনুসারে সাজাইয়া যাইবে, যেমন খাদ্যের খাতে চাল, ডাল, মাছ, শাকসবজি, দুধ, ফল, মাখন, ডিম এইভাবে ক্রমশঃ কম গুরুত্ব অনুযায়ী উপ-বিভাগগুলি স্থাপন করিতে হয়।

(৩) খাত বিভাগের কাজ শেষ হইলে প্রত্যেকটি বস্তুর পাশে সম্ভাব্য দাম নির্দেশ করিবে। দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির ঝোঁক থাকিলে সম্ভাব্য বাড়তি দামও বাজেটের মধ্যে ধরিতে হয়। কতকগুলি ব্যাপার, যেমন—চিকিৎসার খরচ, কোন আকস্মিক ক্ষয়ক্ষতি, অতিথি-অভ্যাগত বাবদ খরচ আগে হইতে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। তবে এইসব বাবদ কিছু অর্থ হিসাবের মধ্যে ধরিতে হয়।

ধনী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারের পক্ষেই উপরিউক্ত নিয়মে বাজেট করা চলে। দরিদ্র পরিবারদের আবার আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার রীতিই অনুসরণ করা উচিত।

পারিবারিক হিসাব

(Maintaining household accounts),

পারিবারিক হিসাব রাখা গৃহ সুপরিচালনার অন্তর্গত। কত আয় হইল এবং প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য কত খরচ হইল এই হিসাব রাখা না হইলে আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা কঠিন হইয়া পড়ে এবং বাজেট করাও অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদের দেশের পরিবারগুলিতে সাধারণতঃ মাসের প্রথমেই মুদিখানার জিনিসগুলি কিনিয়া লওয়া হয়। রেশন ধরা হয় সপ্তাহে সপ্তাহে, আনাজপত্র, ফলমূল দৈনিক আসে। দৈনিক দুধ আসিলেও মাসের প্রথমে কিংবা মাসের শেসে দুধের দাম মিটাইয়া দিতে হয়। সুগৃহিণীর কর্তব্য হইল প্রত্যেকটি জিনিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব লিখিয়া রাখা এবং যাহার যাহা প্রাপ্য নির্দিষ্ট সময়ে মিটাইয়া দেওয়া। মাসের সম্ভাব্য খরচের একটি আন্দাজ পাইবার জন্য তিনি—

(১) রেশনবাবদ মাসে কত খরচ হইতেছে তাহা লিখিয়া রাখিবেন। কোন মাসে ৪ বার এবং কোন মাসে ৫ বারও রেশন আনিতে হয়। গৃহিণীর খরচের খাতায় উহার উল্লেখ থাকিবে।

(২) মাসিক মুদির খরচেরও একটি খাতা থাকা দরকার।

(৩) গৃহ পরিচালনা অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটি, টেলিফোন, বাড়ির ট্যাক্স, দাসদাসীদের বেতন, এতদ্ব্যতীত শিক্ষা-প্রকল্পে ব্যয়, ইনস্যুওরেন্সের প্রিমিয়াম ইত্যাদি বাবদ ব্যয়ও হিসাবের খাতায় লিখিতে হইবে।

(৪) গোয়ালা, ধোপা, খবরের কাগজের জন্য আলাদা আলাদা হিসাবের খাতা রাখিতে হইবে।

দৈনিক বাজার খরচের জন্য একটি স্বতন্ত্র খাতা থাকা চাই।

মাসিক ব্যয় ও দৈনিক ব্যয়ের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র খাতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তারপর দুইটি হিসাব মিলাইয়া লইলে প্রকৃত হিসাব পাওয়া যাইবে।

হিসাব রাখার উপকারিতা

দৈনিক হিসাব রাখার কতকগুলি সুবিধা আছে, যেমন—

(১) মাসে মাসে কোন্ জিনিস কতটা প্রয়োজন।

(২) কোন্ জিনিসের কত দাম এবং বাজার দর কতটা চড়ার দিকে।

(৩) দাসদাসীরা অপচয় করিতেছে কিনা এবং অপচয়ের পরিমাণ কত?

(৪) দাসদাসীরা কবে কাজে যোগ দিল, কবে ছাড়িয়া গেল, তাহাদের কোন অগ্রিম দেওয়া হইল কিনা তাহারও হিসাব থাকিবে।

(৫) বাড়ির ট্যাক্স, আয়কর, ইনস্যুওরেন্সের প্রিমিয়াম ঠিক সময়ে দেওয়া হইল কিনা, কাহারও নিকট দেনা থাকিলে শোধ দেওয়া হইল কিনা, পাওনা আদায় হইল কিনা, এসবও খেয়াল থাকে।

(৬) চলতি মাসের ব্যয় কত এবং আগামী মাসগুলিতে কোন প্রকারে ব্যয়সঙ্কোচ করা সম্ভব কিনা জানা যায়।

3. পারিবারিক অর্থ
(Family finance)

পারিবারিক ঋণ (Family credit) ঃ কোন পরিবারের জীবনযাত্রার মান দেখিয়া ঐ পরিবারের আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা যায় না। কারণ কোন পরিবার আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার নীতি অনুসরণ করিতে পারে আবার কোন কোন পরিবার বাহিরের ঠাঁট বজায় রাখার জন্য ঋণের আশ্রয় নিতে পারে। অবশ্য অনেক সময় বাধ্য হইয়াও অনেক ঋণ গ্রহণ করে। মোটের উপর জীবনযাত্রার সঙ্গে ঋণের প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। ঋণ কাহাকে বলে, পরিবারের অর্থনীতির উপর উহা কিভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে প্রত্যেক পরিবারের লোকেদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

ঋণ কাহাকে বলে? ভবিষ্যতে পরিশোধ করার পরিবর্তে বর্তমানে যে নগদ অর্থ, দ্রব্যাদি কিংবা অন্য কোন প্রকার সেবালাভের সুযোগ পাওয়া যায় তাহাকে ঋণ বলে। ঋণ হইল বর্তমানে কাহারো নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করা এবং ভবিষ্যতে উহা পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া।

হাতে যে নগদ টাকা মজুত আছে ঋণ তাহার তুলনায় আমাদের অধিক ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি করে। ঋণ পাওয়া একটি সুবিধা বিশেষ তবে অনেক সময় অতি উচ্চ মূল্যে এই সুবিধা ক্রয় করিতে হয়। ঋণ পরিশোধে বিলম্ব ঘটিলে আসল অর্থের তুলনায় সুদের পরিমাণ অনেক সময় বেশী হইয়া পড়ে।

কি কি পরিস্থিতিতে একটি পরিবার ঋণ করে?

(১) কতকগুলি একান্ত প্রয়োজন অথবা দায় মিটাইবার জন্য অনেক সময় পরিবারকে ঋণ করিতে হয়।

তাছাড়া কোন বস্তু ক্রয় করার মোট খরচ যদি খুব বেশী হয় এবং পরিবারের পক্ষে ঐ টাকাটা সঞ্চয় করা সম্ভব না হয় তখন অনেক পরিবার কিছু টাকা সঞ্চয় করে এবং বাকী টাকাটা ঋণ করিয়া উহা ক্রয় করে। ইহার সুবিধা এই যে মোট দাম পরিশোধ করার পূর্বেই জিনিসটি হাতে আসিল এবং উহা ভোগ করার সন্তোষ হইল। গৃহ-নির্মাণের জন্য বহু পরিবারই এইভাবে ঋণ করে।

(২) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, আসবাব, কখনো বা একটি শৌখিন দ্রব্য লোকে কিস্তিতে ক্রয় করে। কিস্তিও এক প্রকার ঋণ।

(৩) অনেক জায়গায় ছোট ছোট অনেক দেনা হইয়া গেল উহা পরিশোধের জন্য লোকে একটু মোটা রকমের দেনা করে। বহু লোকের নিকট ঋণ রাখার তুলনায় কোন এক ব্যক্তি কিংবা একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণ করা অনেকে অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করে।

(৪) গৃহে কোন জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হইলেও অনেক সময় ঋণ করিতে হয়। সাধারণতঃ স্বচ্ছল পরিবারগুলি পূর্ব হইতে এইসব অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকে বলিয়া আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে উহার মোকাবিলা করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের সেইরকম সঞ্চয়ের সুবিধা নাই তাহারা ঋণ করিতে বাধ্য হয়।

ঋণ পাইবার ভিত্তি কি?

যে কোন পরিবারের ঋণ পাইবার ভিত্তি হইল দুইটি: (ক) পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য এবং (খ) গ্রহীতার চরিত্র। উভয়ে মিলিয়া ঋণদাতার মনে যে বিশ্বাস উৎপন্ন করে তাহারই ফলে ব্যক্তি তথা পরিবার ঋণ পায়।

ক এবং খ কতটা ঋণ পাইতে পারে দেখান হইয়াছে।

(ক) পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য নির্ভর করে চারটি জিনিসের উপর:

(১) পরিবারের আয়;

(২) বন্ধক রাখার মত সম্পত্তি যেমন বাড়ি বা ইনস্যুরেন্সের পলিসি ইত্যাদি;

(৩) অন্যান্য মূলধন;

(৪) গৃহ পরিচালনার যোগ্যতা।

(খ) গ্রহীতার চরিত্র ঃ ঋণ পরিশোধের আর্থিক সামর্থ্য থাকিলেই চলে না সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকেদের চারিত্রিক খ্যাতি থাকা চাই।

দুইটি পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য সম্পূর্ণ একরকম কিন্তু চারিত্রিক খ্যাতি পৃথক্‌। ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইবে।

ঋণের ব্যবহার ঃ ঋণকে আয় বলিয়া গণ্য করা যায় না। তবে এই আয় কখন ব্যয় করা হইবে ঋণ সে সময় নির্ধারণ করিতে পারে। তাছাড়া ঋণ কতকগুলি সুযোগ সৃষ্টি করে এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া ঋণ করিলে প্রত্যেকে ঐ সুযোগের দ্বারা লাভবান হইতে পারে।

(১) গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে মানুষ যখন ঋণ করে তখন সম্পূর্ণ নগদ টাকাটা হাতে আসার পূর্বেই জিনিসটি ভোগ করা গেল। এই ভোগজনিত সন্তোষই হইল পরিবারের ব্যক্তিদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা।

(২) মনে কর পরিবার কিস্তিতে একটি সেলাইএর মেসিন কিনিল। উদ্দেশ্য উহা-দ্বারা কিছু অর্থ রোজগার করা। কিস্তির টাকা শোধ হইবার মধ্যে ঐ মেসিনের রোজগার যদি কিস্তিতে দেয় টাকার তুলনায় বেশী হয় তবে উহা হইবে পরিবারের পক্ষে একটি বিশেষ সুযোগস্বরূপ। নগদ টাকার মাপেই এই সুবিধা মাপা যাইতেছে।

(৩) আবার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন একটি মিতশ্রম যন্ত্র ক্রয় করার সময় আমরা অন্যভাবে চিন্তা করি। এখানে যন্ত্রটি পরিবারের কতটা সময় ও শ্রম বাঁচাইতে পারিবে উহাই হইবে বিবেচ্য বিষয়। সময় ও শ্রম বাঁচানোটা হইবে পরিবারের পক্ষে লাভজনক। পরিবারের বিশেষ সুবিধাটা এখানে সময় ও শ্রমের ভিত্তিতে দেখিতে হইবে, অর্থের ভিত্তিতে নয়।

(৪) তবে একটি শখের কিংবা বিলাসের জিনিস ক্রয় করার সময় চিন্তা করিতে হয় জিনিসটি বাজারে সোজাসুজি কিনিতে গেলে কত দাম লাগিত। কিস্তিতে কিংবা ধার করিয়া কেনার ফলেই বা কত দাম লাগিতেছে। অর্থাৎ বাজার দরের তুলনায় ক্রেতা কি উহা সুলভে পাইতেছে? যদি পায় তবে ঋণের সদ্ব্যবহার হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

পরিবারে কি কি ধরনের ঋণ অনুপ্রবেশ করিতে পারে?

একটি পরিবারে তিন ধরনের ঋণ অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়—(১) বিনিয়োগমূলক ঋণ, (২) ব্যবসা-সংক্রান্ত ঋণ ও (৩) পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য ঋণ।

(১) **বিনিয়োগমূলক ঋণ** (Investment credit) ঃ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিনিয়োগমূলক ঋণের ব্যবস্থা আছে। এইসব বিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিনিয়োগ করা যায়। যেমন ধর দশ হাজার টাকা দশ বৎসরের জন্য বিনিয়োগ করা হইল। যে অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে পরিবারের নিকট তাহা মজুত নাই তাই একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট উহা ঋণ করিল এবং মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক কিংবা বাৎসরিক কিস্তিতে উহা পরিশোধ করার চুক্তিবদ্ধ হইল। মেয়াদ অন্তে ঋণদাতা ঐ টাকা কিছু লাভসমেত ঋণগ্রহীতাকে ফেরত দিবে।

সরকারের সমস্ত জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলি সরকারকর্তৃক জনসাধারণকে এইরূপ ঋণদান। এই ঋণের সুবিধা লইয়া পরিবার নিজ নিজ মূলধন গড়িয়া তুলিতে পারে।

(২) **ব্যবসা-সংক্রান্ত ঋণ** (Commercial credit) ঃ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কোন পরিবার সরকারী অথবা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট সোজাসুজি ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

(৩) **পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য ঋণ** (Consumer's credit) ঃ দোকান হইতে বাকীতে জিনিস ক্রয় করার ব্যবস্থাকে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-সংক্রান্ত ঋণ বলে। বহু পরিবারই মুদির দোকান, গোয়ালা প্রভৃতির নিকট হইতে সারা মাস বাকিতে জিনিস ক্রয় করে। এইরূপ ঋণ করার সময় সকল পরিবারকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হয় কারণ মানুষেরত ভোগের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। একবার ঋণ করার অভ্যাস হইয়া গেলে ঋণের বোঝা বাড়িতেই থাকে।

ঋণগ্রহণ সংক্রান্ত কয়েকটি নির্দেশ ঃ একটি পরিবার ঋণ গ্রহণ করিবে কিনা, করিলেও কতটা ঋণ গ্রহণ করা উচিত এসব সম্বন্ধে কোন বাধাধরা নিয়ম তৈরী করা সম্ভব নয় কারণ প্রত্যেকটি পরিবারের সমস্যা আলাদা এবং এক পরিবারের সমাধান অন্য পরিবারের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তবে ঋণ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রত্যেকেই কয়েকটি সাধারণ নির্দেশ মানিয়া চলিতে পারে। নির্দেশগুলি প্রশ্নের আকারে দেওয়া হইল ঃ

(১) একটি পরিবারের কতটা ঋণ থাকা উচিত অর্থাৎ পরিবারের লোকেরা কতটা ঋণের বোঝা বহিতে পারিবে ?

(২) ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য কি ? কোন প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ করা না শুধু শখ মিটান ?

(৩) ঋণ গ্রহণের ফলে পারিবারিক জীবন হইতে আবশ্যক সামগ্রী কতটা বাদ পড়িবে ?

(৪) অনাবশ্যক বস্তুর জন্য ঋণ করিয়া কি কোন আবশ্যক জিনিস হইতে পরিবারের লোকেরা বঞ্চিত হইতেছে ?

(৫) দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ করিবার সময় আবার ভাবিতে হয় ঋণ শোধ করিতে গিয়া পরিবারের লোকেদের কতটা কৃচ্ছ্রতা সহিতে হইবে এবং ঐ কৃচ্ছ্রতা সাধন আদৌ সম্ভব কি না ?

(৬) ঋণের বর্তমান পরিস্থিতি কি ? প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ঋণের চুক্তির শর্তই বা কি ?

(৭) কোন সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে ঋণ গ্রহণ করা কি আদৌ সমর্থনীয় ?

4. পারিবারিক অর্থ বিনিয়োগ

(Investing family funds)

ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্ত সকল পরিবারই আজকাল সাধ্যমত অর্থ সঞ্চয় করে এবং উহা বিনিয়োগ করার চেষ্টা করে। অর্থ বিনিয়োগের উদ্দেশ্য হইল ঃ (১) ব্যক্তি তথা পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করা এবং (২) অন্যদিকে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে অর্থ বিনিয়োগের তেমন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। আজকাল সরকারী প্রচেষ্টায় এবং জনসাধারণের উদ্যমে নানাভাবে অর্থ বিনিয়োগের সুবিধা হইয়াছে। অর্থ বিনিয়োগের পূর্বে তিনটি জিনিস দেখিয়া লইবে ঃ

(১) ধনের নিরাপত্তা আছে কিনা।

(২) প্রয়োজনের সময় উহা পাওয়া যাইবে কিনা।

(৩) উহা কতখানি বাড়ানো সম্ভব।

প্রথমেই আমরা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(a) **ব্যাংকের সাহায্যে অর্থসঞ্চয় ঃ** ক্রেডিট বেচা ও ক্রেডিট কেনা এই দুইটি হইল ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। আরও সরল করিয়া বলা যায় জনসাধারণ ব্যাঙ্কে টাকা আমানত অর্থাৎ গচ্ছিত রাখে। এই গচ্ছিত অর্থ খাটাইয়া ব্যাঙ্ক উহা বহুগুণে বৃদ্ধি করে। তারপর অর্থ গচ্ছিতকারীকে কিছু সুদ দেয় এবং সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দেয়। সোজা কথায় পরের ধনে পোদ্দারির মত ব্যাঙ্কার অন্যের টাকায় ব্যাঙ্কিং করে। শুধু টাকাই নয়, ব্যাঙ্কে আমরা বহুমূল্য অলঙ্কারাদি ও কাগজপত্রও গচ্ছিত রাখিতে পারি। এইসব জিনিসের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে বলিয়া ব্যাঙ্কারকে আমাদের কিছু অর্থ দিতে হয়। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নিকট অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া আমরা কিছু সুদ পাই এবং অলঙ্কারাদি গচ্ছিত রাখিবার জন্য ব্যাঙ্ককে কিছু সুদ দিতে হয়।

মক্কেল (Customer) **ঃ** যাহারা ব্যাঙ্কে হিসাব খোলেন তাহাদের ব্যাঙ্কের মক্কেল বলা হয়। হিসাব খোলার সময় ব্যাঙ্কে আমানতকারীর নিকট হইতে আবেদন-পত্র গ্রহণ করে এবং ঐ পত্রে তাহার স্পেশিমেন সহি জমা রাখে। এই সহিটি আমানতকারী এবং মক্কেল উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আবেদনপত্র স্বাক্ষরিত হইবার পরে টাকা জমা দিবার জন্য ব্যাঙ্ক মক্কেলকে একখানি জমার বই দেয়। ঐ বই-এর প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিপত্র থাকে। উহাকে ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী ন্যূনতম ব্যাঙ্কের অর্থ জমা দিয়া ব্যাঙ্ক আবেদনকারীকে মক্কেল করিয়া লয়। টাকা জমা দিবার সময় মক্কেলের নাম, ব্যাঙ্কের একাউণ্ট নম্বর, টাকার পরিমাণ ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণ জমার খাতায় লিখিয়া দেয়। ব্যাঙ্ক বাম দিকের প্রতিপত্র সই করিয়া রসিদ স্বরূপ মক্কেলকে ফেরত দেয় এবং ডান দিকের প্রতিপত্রখানি হিসাব মিলাইবার জন্য রাখিয়া দেয়।

পাশ বই (Pass Book) **ঃ** ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া হইলে ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে একখানা পাশ বই দেয়। কত টাকা জমা পড়িল কত টাকা তোলা হইল এই সম্বন্ধে ব্যাঙ্কে যে হিসাব রাখা হয় পাশ বই শুধু তাহার নকল মাত্র।

চেক বই (Cheque Book) **ঃ** ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার পর আমানতকারী তাঁহার দরকার মত টাকা তুলিতে পারেন। নিজের নামে টাকা তুলিতে হইলে কিংবা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ হইতে আর কোন ব্যক্তিকে টাকা দিতে হইলে আমানতকারী কর্তৃক সর্বদাই ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিতে হয়। এই নির্দেশ পাইলে ব্যাঙ্ক অর্থ প্রদান করে। **কাহাকেও অর্থ দিবার জন্য আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংককে যে নির্দেশ দেওয়া হয় সেই নির্দেশ-পত্রকে বলে চেক।** আমানতকারীর স্পেশিমেন সহি মিলাইয়া দেখিয়া ব্যাঙ্ক চেকের

অর্থ প্রদান করে। চেক বই, জমার বই ও পাশ বই ব্যাঙ্ক বিনামূল্যে আমানতকারীকে দিয়া থাকে।

চেক তিন প্রকার ঃ বেয়ারার, অর্ডার ও ক্রশড চেক।

(১) **বেয়ারার চেক** (Bearer Cheque) ঃ চেকের উপর লেখা থাকে Pay…or Bearer ; যাহার অনুকূলে চেক কাটা হয় Pay শব্দটির পরে তাহার নাম বসাইয়া আনুষঙ্গিক তথ্য এবং চেকদাতার নাম সহি করিয়া দিতে হয়। চেকের বেয়ারার যে কোন ব্যক্তি [অর্থাৎ যাহার হাতে ঐ চেক রহিয়াছে] ঐ চেক সোজাসুজি ভাঙাইতে পারে। ব্যাঙ্ক ঐ চেক-গ্রহীতার পরিচয় নেয় না।

(২) **অর্ডার চেক** (Order Cheque) ঃ যাহার অনুকূলে চেক কাটা হইবে Pay শব্দটির পরে তাহার নাম লিখিয়া or Bearer শব্দটি কাটিয়া দিলে উহা অর্ডার চেক বলিয়া গণ্য হইবে। বেয়ারার চেকের মত অর্ডার চেক-সোজাসুজি ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে ভাঙান যায় তবে চেকের গ্রহীতা ব্যাঙ্কের পরিচিত ব্যক্তি হাওয়া চাই।

(৩) **ক্রশড চেক** (Crossed Cheque) ঃ সাধারণ চেকের বাম দিকে কোনাকুনি ভাবে সমান্তরাল দুইটি রেখা টানিয়া দিয়া উহার মধ্যে এণ্ড কোং (& Co) অথবা একাউণ্ট পেয়ী (A c Payee only) লিখিয়া দিলে উহা ক্রশড চেকে পরিণত হয়।

ক্রশড চেক ব্যাঙ্কের হিসাবে অবশ্য জমা দিতে হয় এবং সোজাসুজি ভাঙান যায় না। 'এণ্ড কোং' লেখা ক্রশড চেক endorse করা যায় কিন্তু একাউণ্ট পেয়ী চেক endorse করা যায় না। ক্রশড চেক সর্বদা নিরাপদ।

এণ্ডোর্সমেন্ট অব চেকস (Endorsement of cheques) ঃ endorsum এই ল্যাটিন শব্দ হইতে endorsement কথাটির উৎপত্তি। Endorsement-এর অর্থ হইতেছে কোন বস্তুর পশ্চাদ্দেশে কাহারও নাম লিখিয়া দেওয়া। চেকের স্বত্ব হস্তান্তর করিয়া দেওয়াই হইল endorsement-এর আসল উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি চেক হস্তান্তর করে তাহাকে বলে endorser এবং যে ব্যক্তিকে চেক হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইল তাহাকে বলে endorsee ; endorsement চারি প্রকারের ঃ

(১) Blank endorsement ;
(২) Special endorsement ;
(৩) Restrictive endorsement ;
(৪) Qualified endorsement ;

চেক কাটিবার সময় নিম্নলিখিত সতর্কতা গ্রহণ করিবে ঃ

(১) গচ্ছিত অর্থের তুলনায় বেশী পরিমাণ টাকার চেক কাটিবে না ;

(২) চেকের সহি এবং স্পেশিমেন সহি যেন এক হয় ;

(৩) চেকে কোন কাটাকুটি হইলে তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে স্পেশিমেন সহি করিয়া দিবে।

(৪) সর্বদা কালি দিয়া চেক সই করিবে।

(৫) টাকা তোলা সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের কোন বিশেষ নিয়ম থাকিলে উহা যেন লঙ্ঘিত না হয়।

চেক গ্রহণে সতর্কতা

চেক কাটিতে গেলে যেমন সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, চেক গ্রহণেও অনুরূপ সতর্কতার প্রয়োজন।

(১) চেক কালি দিয়া লেখা কিনা ;

(২) চেকে কাটাকুটি থাকিলে উহার পাশে চেক দাতার সহি আছে কিনা ;

(৩) চেকে প্রদত্ত তারিখ ঠিক আছে কিনা। পরবর্তী তারিখ-যুক্ত চেক (Post-dated cheque) গ্রহণ না করাই বিধেয়।

(৪) অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে যথাসাধ্য চেক গ্রহণ করা এড়াইয়া চলিবে কারণ অনেক সময় প্রতারিত হইবার ভয় থাকে।

বন্ধ আমানত (Fixed Deposits) **:** বন্ধ আমানত অনুসারে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাঙ্কে আমানত রাখা হয় এবং তাহার জন্য নির্ধারিত সুদ পাওয়া যায়। কম দিনের মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগ করিলে কম সুদ এবং বেশী দিনের মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগ করিলে বেশী সুদ পাওয়া যায়। বর্তমান নিয়ম অনুসারে ৬১ মাস পর্যন্ত অর্থ গচ্ছিত রাখিলে শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ পাওয়া যায়। প্রতি ছয় মাস অন্তর সুদের টাকা গ্রহণ করা যায় কিন্তু মেয়াদ ফুরাইবার পূর্বে টাকা তোলা যায় না। তবে প্রয়োজন হইলে গচ্ছিত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ ধার হিসাবে নেওয়া যায়।

ব্যাঙ্কে আজকাল আরও এক ধরনের বন্ধ আমানতের প্রচলন হইয়াছে। ৬১ মাস, ৭ বৎসর, ১০ বৎসর, ১৫ বৎসর, ২০ বৎসর কিংবা ২৫ বৎসরের মেয়াদে অর্থ আমানত করা যায়। আমানতের মেয়াদ যত দীর্ঘ হইবে সুদের পরিমাণ তত বেশী হইবে। এইরূপ বন্ধ আমানতের ক্ষেত্রে মেয়াদ ফুরাইবার পূর্বে সুদ কিংবা আসল কিছুই তোলা যাইবে না। মেয়াদ অন্তে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ সমেত আসল টাকা ফেরত দেওয়া হয়। সাধারণতঃ বিবাহ, শিক্ষা, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে মানুষ এইরূপ দীর্ঘমেয়াদী জমার সুযোগ গ্রহণ করে।

(ii) **পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সঞ্চয়** (Post Office accounts) **:** দূরদূরান্তরে আমাদের যে সকল আত্মীয় বন্ধু পরিচিতরা রহিয়াছে তাহাদের খবর আদানপ্রদানের কাজ করে পোস্ট অফিস বা ডাকঘর। উহার ঐ কাজের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। তবে পোস্ট অফিসের অন্যতম কাজ হইল জনসাধারণের টাকা গচ্ছিত রাখা।

পোস্ট অফিস সেভিংস একাউন্ট (Post Office Savings accounts) **:** একটি ন্যূনতম অঙ্কের অর্থ হইতে শুরু করিয়া যে কোন পরিমাণ অর্থ পোস্ট অফিসে জমা রাখা যায়। পোস্ট অফিস অর্থ গচ্ছিতকারীর একটি স্পেশিমেন সহি রাখিয়া দেয়। টাকা উঠাইতে গেলে পোস্ট অফিস ঐ সহি মিলাইয়া গচ্ছিতকারীকে টাকা দেয়। কত টাকা জমা পড়িল, কত টাকা তোলা হইল এই সকল হিসাব রাখিবার জন্য পোস্ট অফিস গচ্ছিতকারীকে বিনামূল্যে একটি জমার বহি দেয়।

পোস্ট অফিসের সুদের হার বাৎসরিক ৫% টাকা।

(iii) **সেভিংস ব্যাংক একাউন্ট** (Savings Bank account) **:** প্রত্যেক ব্যাঙ্কে চলতি হিসাব এবং সেভিংস হিসাব—এই দুইভাবে টাকা গচ্ছিত রাখা যায়। সেভিংস

হিসাবের মূল উদ্দেশ্য গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের টাকা জমা রাখিবার সুবিধা দেওয়া।

চলতি হিসাবের তুলনায় সেভিংস হিসাবে সুদের হার বেশী। তবে যখন তখন ঐ গচ্ছিত অর্থ তোলা যায় না এবং প্রতি ব্যাঙ্কেই মাসে টাকা তোলার দিনের সংখ্যা (যেমন কোথাও মাসে ৫ বার) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সেভিংস হিসাবে চেক বইএর সুবিধা পাওয়া যায়। তবে উহার জন্য একটি ন্যূনতম অঙ্কের অর্থ সর্বদা ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। চেক বই না দিলে withdrawal slip-এর সাহায্যে টাকা তুলিতে হয়।

(iv) **জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট** (National Saving Certificates): ১২ বৎসর মেয়াদী জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট, ১০ বৎসর মেয়াদী প্রতিরক্ষা ডিপোজিট সার্টিফিকেট ও ১০ বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (প্রথম পর্যায়) বিক্রয় ১৪ই মার্চ, ১৯৭০ হইতে বন্ধ হইয়াছে। এগুলির বদলে নিম্নলিখিত ৪ শ্রেণীর নূতন সার্টিফিকেট প্রচলিত হইতেছে।

(১) **৭-বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট** (২য় পর্যায়)।

মূল্যমান ১০, ১০০, ১,০০০ ও ৫,০০০ টাকা, আয়করমুক্ত এবং সুদের হার শতকরা ৬ টাকা।

(২) ৭-বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৩য় পর্যায়)

মূল্যমান ১০০, ১,০০০ ও ৫,০০০ টাকা, আয়করমুক্ত সুদ ৬% হারে প্রতি বছর দেওয়া হয় এবং মেয়াদ অন্তে আসল টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

(৩) ৭-বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৪র্থ পর্যায়)

মূল্যমান ১০০, ১,০০০ ও ৫,০০০ টাকা, সুদের হার ১০·২৫% টাকা। আয়কর দিতে হয় এবং কেবলমাত্র ব্যক্তির নামে কেনা যাইবে।

(৪) ৭-বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৫ম পর্যায়)

প্রতি মাসে সাত বৎসরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট কেনা যায়। বৎসরে শতকরা ১৪ টাকা সরল সুদ বা শতকরা ১০·২৫ টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ জমে। মেয়াদ অন্তে সব টাকা এক সঙ্গে নেওয়া যায় কিংবা মাসিক কিস্তিতেও গ্রহণ করা যায়। আয়কর দিতে হয়।

V. জীবনবীমা

অর্থ সঞ্চয় করিবার অন্যতম উপায় হইল জীবনবীমা। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার সুবিধা আছে বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারে অভাব-অনটন লাগিয়াই থাকে। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা সঞ্চিত থাকিলে অভাবের সময় ঐ টাকা উঠাইয়া লইবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয়। ব্যাঙ্ক হইতে যখন তখন টাকা উঠাইবার কোন অসুবিধা নাই। এই জন্যই বহু ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া যে সামান্য অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হয়, গৃহস্থ তাহা সহজেই খরচ করিয়া ফেলে। ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া জমান আর হইয়া ওঠে না। ফলে গৃহস্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় বহু পরিবার দারুণ অভাবে পড়িয়া দুঃখদুর্দশা

ভোগ করে। জীবনবীমার টাকা মেয়াদ (maturity) ফুরাইবার পূর্বে তোলা যায় না বলিয়া টাকাটা জমানো থাকে। বীমা কোম্পানী আবার বীমাকারীর জীবনের ঝুঁকি লইয়া থাকে। ব্যাঙ্কের তুলনায় জীবনবীমা তাই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে সঞ্চয়ের উৎকৃষ্টতম পন্থা। জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে এবং পতনোন্মুখ মধ্যবিত্ত সমাজকে আকস্মিক ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে জীবনবীমার বহুল প্রচলন দরকার।

ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই বীমার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত জীবনবীমা কর্পোরেশন (Life Insurance Corporation সংক্ষেপে L. I. C.) বীমা করিতে ইচ্ছুক এইরূপ ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি চুক্তি করে। চুক্তি-পত্রটিকে বলা হয় পলিসি (Policy) এবং যাঁহারা বীমা করিয়াছেন তাঁহাদের বলা হয় বীমাকারী (Policy holder)। এই চুক্তিতে স্থির হয় বীমাকারী কত টাকার বীমা করিবেন এবং কত বৎসরের মধ্যে এই টাকা দিবেন। তারপর মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক কিস্তিতে নির্ধারিত বৎসরের মধ্যে বীমার টাকা শোধ করা হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে এই অর্থ পরিশোধ করাকে বলে প্রিমিয়াম দেওয়া।

বীমা সাধারণতঃ দুই প্রকারের—(১) মেয়াদী বীমা (Endowment Palicy) এবং (২) আজীবন বীমা (Whole Life Policy)।

(১) **মেয়াদী বীমা ঃ** এইরূপ বীমা করিলে বীমাকারী বীমার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পর ঐ অর্থ নিজেই পাইবেন।

(২) **আজীবন বীমা ঃ** এইরূপ বীমা করিলে বীমাকারী বীমার নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পরেও টাকাটা পাইবেন না। বীমাকারীর মৃত্যুর পরে তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি (Nominee) ঐ অর্থের মালিক হইবে (clain by death)।

বীমা করিবার সুবিধা ঃ বীমা করিবার অনেকগুলি সুবিধা আছে। এই সুবিধাগুলিই বীমার বৈশিষ্ট্য। বীমার সুবিধা সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা যাক।

(১) বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ঃ ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থের মত বীমার অর্থ যখন তখন তোলা যায় না। বীমাকারী কর্পোরেশনের নিকট হইতে অবশ্য টাকা ধার পাইতে পারেন। তবে এই ধার সুদসমেত শোধ দিতে হয়। তাই সহজে কেহ বীমার বিনিময়ে ধার নিতে চান না।

(২) বীমাকারী ইচ্ছা করিলে সুদ ব্যতীত কর্পোরেশনের নিকট হইতে লাভও (Profit) পাইতে পারেন। লাভহীন (without profit) বীমা এবং লাভসমেত (with profit) বীমার পার্থক্য এই যে, লাভহীন বীমাতে মোট প্রিমিয়ামের অঙ্ক বীমার টাকার তুলনায় কম ; সুতরাং ইহার প্রিমিয়াম রেটও কম।

(৩) কিস্তিতে টাকা দিবার সুবিধা ঃ যে টাকা সঞ্চয় করিতে চাই উহা এককালীন জমা রাখিতে হয় না। কিস্তিতে বীমার টাকা দিতে হয়। নির্ধারিত সময়ে প্রিমিয়াম দিতে না পারিলে বীমা বাতিল (lapse) হইয়া যায়।

(৪) বীমার আর একটি সুবিধা এই যে নির্ধারিত সময় পার হইবার পূর্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে যে পরিমাণ অর্থ বীমা করা হইয়াছে কর্পোরেশন সেই অর্থ

বীমাকারীর মনোনীত ব্যক্তিতে ফেরত দেয়। জীবনবীমা করিবার এই বিশেষ সুবিধাটি কম নয়। কোন ব্যক্তি অকালে স্ত্রীপুত্র রাখিয়া মারা গেলে তাহার অভাবে সমস্ত পরিবারকে কষ্ট পাইতে হয় না।

(৫) প্রয়োজন হইলে বীমার পলিসি বন্ধক রাখা যায়। সরকারী বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থার সমবায় সমিতির সদস্যরা এইরূপভাবে বীমা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার পাইবার সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন।

প্রিমিয়াম রেট কিভাবে স্থির হয় ?

বীমা করিবার সময় বীমা কর্পোরেশন তাহার নিজস্ব চিকিৎসক দিয়া বীমাকারীর স্বাস্থ্য ভালভাবে পরীক্ষা করাইয়া লয়; পরীক্ষিত ব্যক্তির জীবন যদি নির্দিষ্ট মানসম্মত (standard life) বলিয়া বিবেচিত হয় তবে তাহাকে বীমা করিতে দেওয়া হয়। অল্পবয়স্ক ব্যক্তির প্রিমিয়ামের হার পূর্ণবয়স্কদের তুলনায় কম। অল্প বয়সেই তাই বীমা করা বাঞ্ছনীয়। যাহারা আবার বিপজ্জনক পেশায় নিযুক্ত, যেমন—রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি বা বিমান পরিচালকদের প্রিমিয়ামের হার অনেক বেশী। কারণ, বীমা কর্পোরেশন এই সকল ব্যক্তির জীবনের ঝুঁকি লইতেছে।

নানা রকমের বীমা করা যায়, যথা:

(১) **বিবাহ বীমা:** কন্যার বিবাহের জন্য মাতাপিতা অথবা অভিভাবকদের সঞ্চয় করা প্রয়োজন। শিশুকন্যার জন্মের পরেই পিতা কন্যার নামে এমন একটি বীমা করিতে পারেন যাহাতে কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিলে বীমাও পরিণত হইয়া উঠিবে। এইরূপ বীমার কন্যা যদিও বীমার মালিক তথাপি কার্যত পিতার জীবনকেই বীমা করা হইতেছে। কর্পোরেশন পিতার জীবনের উপর বীমা করিবে এবং প্রিমিয়ামের হার নির্ধারিত করিবে তবে অর্থের মালিকানা কন্যার। বীমা পরিণত হইবার পূর্বেই যদি পিতার মৃত্যু ঘটে তবে কর্পোরেশন উত্তরাধিকারীকে সম্পূর্ণ অর্থই দিতে বাধ্য। তবে বীমা পরিণত হইবার সময় পর্যন্ত উত্তরাধিকারীকে অপেক্ষা করিতে হয়। সাধারণ বীমার মত বীমাকারীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই অর্থ প্রাপ্য হয় না।

মনোনীত ব্যক্তির যদি পূর্বাহ্নে মৃত্যু ঘটে তবে বীমাকারী অপর কোন সন্তানকে মনোনীত করিতে পারেন অথবা যে অর্থ প্রিমিয়াম বাবদ দিয়াছেন সেই অর্থ ফেরতও লইতে পারেন।

(২) **শিক্ষা বীমা:** বিবাহের উদ্দেশ্যে বীমা করার মত যে কোন অভিভাবক কিংবা পিতা সন্তানদের শিক্ষার খরচ চালাইবার জন্যও বীমা করিতে পারেন। এখানেও নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পরে মনোনীত ব্যক্তি অর্থের মালিকানা পায়।

(৩) **বৃত্তিবীমা:** চাকরি হইতে অবসর লাভের পর যাহাদের পেনসন পাইবার আশা নাই তাহাদের পক্ষে এই বীমা খুবই সুবিধাজনক। বীমাকারী এমন একটি বীমা করিবেন যে তাহার চাকরি হইতে অবসর পাইবার সময় বীমাও পরিণত হইয়া আসিবে। তারপর বীমার টাকা একসঙ্গে গ্রহণ না করিয়া প্রতি মাসে বৃত্তির মত পাইতে থাকিবেন। এইরূপ একটি বীমা থাকিলে বৃদ্ধ বয়সে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না।

এতদ্ব্যতীত আরও দুই প্রকার বীমা আছে। উহার নাম দুর্ঘটনা বীমা ও ক্ষতিপূরক বীমা। দুর্ঘটনা বীমা করিলে বীমাকারী কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বীমার দ্বিগুণ অর্থ পাইবেন। দুর্ঘটনা বীমার প্রিমিয়ামের হার অত্যন্ত বেশী। ক্ষতিপূরক বীমা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। বীমাকারী এখানে আপনার জীবনের উপর বীমা না করিয়া কোন মূল্যবান সম্পত্তি, যথা—গাড়ি, বাড়ি অথবা ব্যবসায়ের উপর বীমা করিয়া থাকেন। এই সকল মূল্যবান সম্পত্তি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলে বীমাকারী বীমার অর্থ পাইয়া থাকেন।

কোম্পানীর শেয়ার (Shares in companies) ঃ সাধারণ লোকেরা সঞ্চিত মূলধন ব্যবসায়ে খাটাইয়া বাড়াইবার সুযোগ পায় না, পাইলেও অর্থের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অনেক সময় নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। তাই তাহাদের পক্ষে ভাল কোম্পানীর শেয়ার কেনা নিরাপদ। ভাল কোম্পানীর শেয়ার কিনিলে টাকা লোকসান হইবার আশঙ্কাও থাকে না। এখন প্রশ্ন হইল শেয়ার জিনিসটা কি? এক একটি বড় ব্যবসায় চালাইতে হইলে প্রচুর মূলধনের দরকার হয়। ব্যক্তি বিশেষের একক প্রচেষ্টায় সর্বদা এই বিরাট মূলধন যোগান দেওয়া সম্ভবপর হইয়া ওঠে না। তখন যৌথ উদ্যমে ব্যবসায় চালাইবার প্রয়োজন হয়। কয়েকজন উদ্যোগী ব্যক্তি মিলিয়া জনসাধারণের নিকট অর্থ বিনিয়োগের আহ্বান জানান। এই অর্থের বিনিময়ে তাহাদের কোম্পানীর অংশীদার করিয়া লওয়া হয়। অধিকাংশ কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ স্থির করা থাকে। এই মূলধনকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে (unit) ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। মূলধনের এই এককের নাম শেয়ার। শেয়ার বিক্রির সময় সর্বদা শেয়ারের দর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ধর একটি কোম্পানীতে ৫০ হাজার টাকা মূলধন প্রয়োজন। এক একটি শেয়ারের ১০০ টাকা করিয়া দর বাঁধিয়া দেওয়া হইল। এইবার কোম্পানীর শেয়ারের পরিমাণ দাঁড়াইল ৫০০ খানা এবং কোম্পানী ৫০০ খানা শেয়ার বিক্রয় করিবে।

শেয়ারের দর যেমন বাঁধা থাকে কোন কোন ক্ষেত্রে শেয়ারের পরিমাণও তেমনি বাঁধা থাকে। এই নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী কেহ শেয়ার কিনিতে পারিবে না। শেয়ারের টাকা এককালীন দিতে হইবে না কিস্তিতে দিতে হইবে তাহাও কোম্পানী স্থির করিয়া দেয়। যাহাদের এইরূপ শেয়ার আছে তাহাদের বলে শেয়ারহোল্ডার। শেয়ারহোল্ডাররা নিজ নিজ শেয়ার অনুযায়ী কোম্পানীর লভ্যাংশের ভাগ পাইয়া থাকেন।

শেয়ারহোল্ডার ইচ্ছা করিলে শেয়ার হস্তান্তর করিতে পারেন অথবা বিক্রি করিতে পারেন। যে দামে কেনা হইয়াছে তাহার তুলনায় অধিক দামে বিক্রি করিতে পারিলে শেয়ারহোল্ডার লাভসমেত (at premium) শেয়ার বিক্রয় করিবেন। লোকসান দিয়া শেয়ার বিক্রয় করিলে অর্থাৎ যে দামে কেনা হইয়াছে তাহার তুলনায় কম দামে বিক্রয় করার নাম এ্যাট ডিসকাউন্ট (at discount)। যে দামে কেনা হইয়াছে ঠিক সেই দামেই শেয়ার বিক্রয় করাকে বলে এ্যাট পার (at par)।

D. পরিবারের জন্য তন্তু নির্বাচন
(Selecting fibres for the family)

1. তন্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান (Knowledge of fabrics)

তন্তু চিনিবার উপায় (Indentification of Fibres)

তোমরা একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যে বিভিন্ন প্রকারের তন্তুর বৈশিষ্ট্য এবং উহাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে পড়িয়াছ। এখন একখানি কাপড় কি প্রকার তন্তু দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কোন একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষা দ্বারা একখানি কাপড়ের তন্তুর প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। সাধারণতঃ একাধিক পরীক্ষার সাহায্যেই উহা স্থির করা হয়। এজন্য যে সকল পরীক্ষার সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে তাহা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—

(১) **ভৌত পরীক্ষা** (Physical test), (২) **রাসায়নিক পরীক্ষা** (Chemical test), (৩) **আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা** (Microscope test).

ভৌত পরীক্ষা ঃ এই সকল পরীক্ষার উপর খুব বেশী নির্ভর করা চলে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহারা তন্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে আভাস দেয় মাত্র, সঠিকরূপে প্রকৃতি নির্ধারণ করিতে পারে না। ভৌত পরীক্ষাগুলি নিম্নরূপ ঃ

ভাঁজ করা (Creasing) **ঃ** একখানি কাপড় দুই ভাঁজ করিয়া আঙুলের সাহায্যে চাপিয়া ধর। লিনেনের কাপড় হইলে ভাঁজের দাগ বেশ সুস্পষ্ট হইবে এবং এই দাগ সহজে মিলাইয়া যাইবে না। সূতির কাপড়েও ভাঁজের দাগ পড়িবে, কিন্তু এই দাগ লিনেনের মত সুস্পষ্ট হইবে না এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে না। কাপড়ে খুব বেশী কলপ দেওয়া হইলে এই পরীক্ষার সাহায্যে লিনেন ও সূতির মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হইবে না। রেশম ও পশমের কাপড়ে এই পরীক্ষায় কোন ভাঁজ পড়িবে না।

সুতরাং এই পরীক্ষার সাহায্যে সূতি, লিনেন এবং রেশম বা পশমের মধ্যে পার্থক্য করা যাইতে পারে।

পাক খোলা (Untwisting the Fibre) **ঃ** কাপড় হইতে কয়েকটি সূতা বাহির করিয়া উহাদের পাক খুলিয়া ফেল। কাপড়খানি পশমদ্বারা নির্মিত হইলে ঐ সূতায়
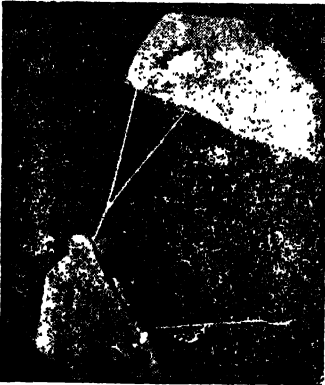
সুতার পাক খোলা

দুই ভাগে ভাগ করা

পশমের ন্যায় স্বাভাবিক ভাঁজ দেখা যাইবে সূতির বা অন্য কোন কাপড়ে এই ভাঁজ

দেখা যাইবে না। এইবার পাকখোলা সূতার একটি দুইহাতে টানিয়া দুইভাগে বিভক্ত কর। যেখানে তন্তুটি ছিঁড়িয়া যাইবে সেই অগ্রভাগ যদি দেখিতে সূচের ন্যায় সরু হয়, তবে উহা লিনেনের দ্বারা প্রস্তুত বুঝিতে হইবে। অন্যথায় যদি অগ্রভাগ দেখিতে একটি তুলির অগ্রভাগের ন্যায় মোটা হয় তবে উহা সূতি তন্তু বলিয়া জানিবে।

সিক্ত করা (Moisture test) ঃ এই পরীক্ষার সাহায্যে লিনেন অন্যান্য তন্তু হইতে সহজেই চিনিতে পারা যায়। একটি অঙ্গুলি জলে ভিজাইয়া কাপড়খানির উপরে রাখ। যদি সহজেই জল অঙ্গুলি হইতে কাপড়ে প্রবেশ করিয়া চারদিকে ছড়াইয়া পড়ে তবে কাপড়খানি লিনেন দ্বারা প্রস্তুত বুঝিতে হইবে।

পোড়ান (Burning test) ঃ যে কাপড়খানি পরীক্ষা করিবে তাহা হইতে কয়েকটি তন্তু বাহির করিয়া একটি জ্বলন্ত শিখায় ধর। পশম ও রেশম ধীরে ধীরে পুড়িবে এবং পালক পোড়া বা চুল পোড়া গন্ধ পাওয়া যাইবে। পুড়িবার পর একটি কালো গুটি বা দানা প্রস্তুত হইবে। সূতির তন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে পোড়ে। ইহা শিখাসহ জ্বলিতে থাকে এবং কাগজ পোড়া গন্ধ বাহির হয়। পুড়িবার পর একটু হালকা ছাই পড়িয়া থাকে। অ্যাসিটেট তন্তু ছাড়া অন্যান্য রেয়ন তন্তু সূতির ন্যায় পোড়ে। অ্যাসিটেট তন্তু আগুনে ধরিলে গলিয়া একটি শক্ত গুটি বা দানা প্রস্তুত হয়। পশম বা রেশমের গুটির মত এই গুটি সহজে ভাঙা যায় না। এই পরীক্ষার ফলাফল পর-পৃষ্ঠার চার্টখানিতে দেওয়া হইল।
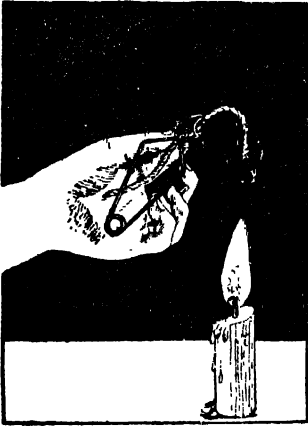
রেশম ও পশমের তন্তু পোড়ান হইতেছে

সূতির তন্তু পোড়ান হইতেছে

গরম ইস্ত্রি দ্বারা পরীক্ষা (Hot iron test) ঃ এই পরীক্ষার সাহায্যে অ্যাসিটেট, নাইলন ও ডেক্রন তন্তু অন্যান্য তন্তু হইতে পৃথক্ করা যায়।

একটি ইস্ত্রি খুব গরম করিয়া কাপড়গুলির উপর চাপিয়া ধর। যদি কাপড়খানি অ্যাসিটেট, নাইলন বা ডেক্রন তন্তুর হয় তবে উহা একেবারে গলিয়া যাইবে। সূতি, লিনেন, রেশম, পশম, বা রেয়নের কাপড়ে লালচে পোড়া দাগ পড়িবে, গলিয়া যাইবে না।

রাসায়নিক পরীক্ষা ঃ ভৌত পরীক্ষা অপেক্ষা এই সকল পরীক্ষাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। রাসায়নিক পরীক্ষাগুলি নিম্নরূপ ঃ

পোড়ানো পরীক্ষা (Burning test)

কয়েকটি তন্তু প্রজ্বলিত শিখায় ধর

- **জ্বলে**
  - শিখাসহ জ্বলে এবং কাগজ পোড়া গন্ধ বাহির হয়। পুড়িবার পর ধূসর বর্ণের হালকা ছাই পড়িয়া থাকে।
    - (১) সূতি
    - (২) লিনেন
    - (৩) রেয়ন (অ্যাসিটেট নয়)
    - (৪) র‍্যামি
    - (৩) পাট।
  - পুড়িবার সময় গলিয়া শক্ত, কালো দানা বা গুটি প্রস্তুত হয় এবং ভিনিগারের গন্ধ বাহির হয়।
    - (১) অ্যাসিটেট রেয়ন
  - ধীরে ধীরে জ্বলে এবং জ্বলিবার সময় চুল পোড়া বা পালক পোড়া গন্ধ বাহির হয়। শেষে গুটি-মত কালো ছাই পড়িয়া থাকে। হাতে ধরিলে এগুলি সহজেই ভাঙিয়া যায়।
    - (১) পশম,
    - (২) রেশম।
  - গলিয়া শক্ত তামাটে রংয়ের গুটি প্রস্তুত হয় এবং পুড়িবার সময় রাসায়নিক গন্ধ বাহির হয়।
    - (১) নাইলন,
    - (২) ডেক্রন।
- **জ্বলে না।**
  - (১) গ্লাস
  - (২) অ্যাসবেসটস
  - (৩) ধাতু।
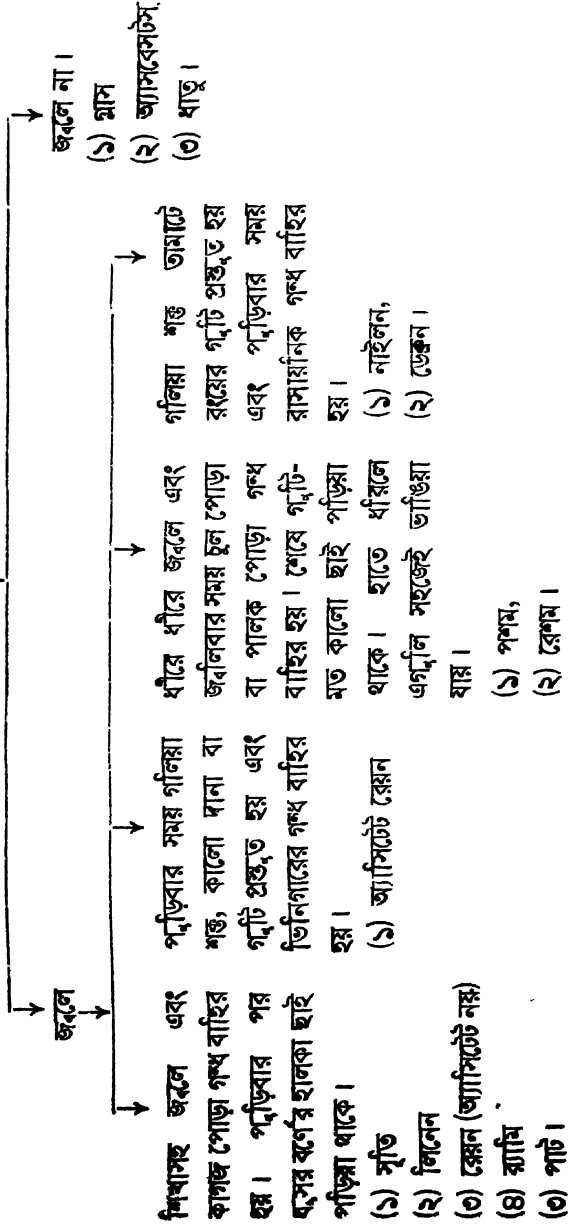
'লাই' পরীক্ষা (Lye test) : এই পরীক্ষার সাহায্যে নিশ্চিতরূপে রেশম ও পশম, সূতি ও লিনেন হইতে পৃথক করা যায়।

একশত সি সি. জলীয় দ্রবণে ৫ গ্রাম কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশ দ্রবীভূত করিয়া 'লাই' প্রস্তুত করা হয়।

একটি কাচের পাত্রে বা এনামেলের পাত্রে কাপড়ের টুকরাখানি 'লাই' দ্রবণের সহিত ১০ মিনিট ফুটাও। ফুটাইবার সময় পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে।

সূতি ও পশমের তন্তু দ্বারা প্রস্তুত কাপড়ে 'লাই' পরীক্ষায় কয়েকটি সূতির তন্তু পড়িয়া থাকে

রেশম ও পশম সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। সূতি ও লিনেন অবিকৃত থাকিবে। কাপড়খানি যদি সূতি এবং পশমের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে তবে উহা হইতে পশমের অংশটুকু দ্রবীভূত হইয়া যাইবে এবং পাত্রের তলায় কতকগুলি সূতির তন্তু পড়িয়া থাকিবে। এইরূপে একখানি মিশ্র তন্তুর কাপড় এই পরীক্ষা দ্বারা চিনিতে পারা যায়। নাইলন তন্তু 'লাই' দ্রবণে দ্রবীভূত হয় না।

অ্যাসিড পরীক্ষা (Acid test) : একশত সি. সি. জলীয় দ্রবণে দুই সি. সি. ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া একটি অ্যাসিড দ্রবণ প্রস্তুত কর।
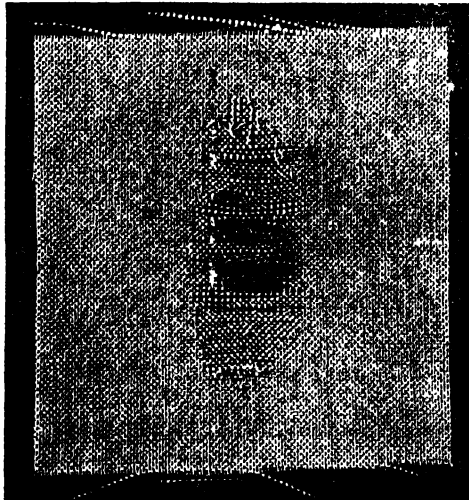
ঐ অ্যাসিডযুক্ত স্থানে একটি ফুটো দেখিতে পাইবে

প্রথমে একটি টেবিলের উপর একখানি কাগজ পাতিয়া উহার উপর কাপড়খানি রাখ। একটি কাচের নলের সাহায্যে এক ড্রপ অ্যাসিড দ্রবণ ঐ কাপড়ের উপরে ফেল। এইবার

একখানি কাগজ উপরে রাখিয়া একটি গরম ইস্ত্রি ঐ কাগজের উপর চাপিয়া ধর। কিছুক্ষণ পরে কাপড়খানি বাহির করিয়া জলে ধুইয়া পরিষ্কার কর।

কাপড়খানি সূতি বা রেয়নে প্রস্তুত হইলে ঐ অ্যাসিডযুক্ত স্থানে একটি ফুটো দেখিতে পাইবে। ইহাতে পশম বস্ত্রের কোন ক্ষতি হইবে না। কাপড়খানি সূতি ও পশমের মিশ্রণে প্রস্তুত হইলে সূতি দ্রবীভূত হইয়া যাইবে এবং পশম অবিকৃত থাকিবে। ফলে কাপড়খানি ফুটো ফুটো মনে হইবে।

দ্রাবক পরীক্ষা (Solvent test)ঃ সাধারণতঃ বিভিন্ন তন্তু দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়। যেমন, অ্যাসিটেট তন্তু গ্লাসিয়াল অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত হয়। অন্যান্য তন্তু উক্ত দ্রবণে দ্রবীভূত হইবে না। সুতরাং কোন একটি অজ্ঞাত তন্তু অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত হইলে উহা অ্যাসিটেট তন্তু বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অনেক সময় একই দ্রাবক একাধিক তন্তু দ্রবীভূত করে; যেমন—সুইডজার দ্রাবক রেয়ন, সূতি ও রেশম দ্রবীভূত করে। এইরূপ ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার সহিত অন্যান্য পরীক্ষা করিয়া উহাদের পার্থক্য নির্ণয় করিতে হয়।

নিম্নে কয়েকটি তন্তু এবং উহাদের যে যে দ্রাবক দ্রবীভূত করিতে পারে তাহাদের নাম দেওয়া হইল।

অ্যাসিটেট তন্তু—অ্যাসিটোন, গ্ল্যাসিয়াল অ্যাসেটিক অ্যাসিড।

ভিসকোস এবং কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন—সুইডজার দ্রবণ।

কিউপ্রামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড।

সূতি— ঐ

রেশম— ঐ

পশম—২০%সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট

নাইলন—৯০% কার্বলিক অ্যাসিড বা ফেনল

ভিনিয়ন—ক্লোরোফরম্

বাঁয়ে পরীক্ষার পূর্বে সূতি ও পশমের মিশ্রণে প্রস্তুত কাপড়ের অবস্থা। ডাইনে অ্যাসিড পরীক্ষায় পরে ঐ কাপড়ের অবস্থা

ইহা ছাড়া কখনও কখনও কতকগুলি বিশেষ রাসায়নিক পরীক্ষার সহায়তায় তন্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করা হইয়া থাকে।

আণুবীক্ষণিক পরীক্ষাঃ এই পরীক্ষাটি বস্ত্রশিল্পে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার সাহায্যে অতি সহজেই বিভিন্ন প্রকারের তন্তু চিনিতে পারা যায়। যখন একখানি কাপড় বিভিন্ন প্রকার তন্তুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয় তখন রাসায়নিক পরীক্ষা অপেক্ষা আণুবীক্ষণিক পরীক্ষাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

এই পদ্ধতিতে কাপড় হইতে কয়েকটি তন্তু বাহির করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 'স্লাইডে', পরীক্ষা করিতে হয়। 'স্লাইডে' একবারে চার-পাঁচটির বেশী তন্তু রাখিতে হয় না।

তোমরা বিভিন্ন প্রকার তন্তু দেখিতে কিরূপ তাহা পূর্বেই পড়িয়াছ। সুতরাং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিয়া উহাদের সহজেই চিনিতে পারিবে। লিনেন তন্তু চিনিবার জন্য এই পরীক্ষাটিই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। লিনেন তন্তু দেখিতে সোজা এবং লম্বা, মাথার দিকটা ধীরে ধীরে সরু হইয়া সূঁচের মত হয়। মাঝে মাঝে বাঁশের মত গাট দেখিতে পাওয়া যায়। র‍্যামী তন্তু দেখিতে অনেকটা লিনেনের মতই। তবে লিনেন অপেক্ষা ইহা আরও মোটা এবং অসমাঙ্গ (irregular)। রেশম তন্তু দেখিতে একটি কাচের শলাকার মত। উপরটা বেশ মসৃণ এবং উহা হইতে আলো বিকীর্ণ হয়। বন্য রেশম কৃষিজ রেশম অপেক্ষা মোটা এবং উহা কতকগুলি সমান্তরাল রেখার সমষ্টি বলিয়া মনে হয়। রেয়ন তন্তু দেখিতে রেশমের মত হইলেও উহা রেশম অপেক্ষা প্রায় চারগুণ মোটা এবং উহার গায়ে লম্বালম্বি কতকগুলি সমান্তরাল রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। নাইলন, ভিনিয়ন দেখিতে অনেকটা রেয়নের মতই। সুতরাং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহাদের চিনিয়া বাহির করা কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন প্রকার তন্তুর ছবি নিম্নে দেখান হইল।
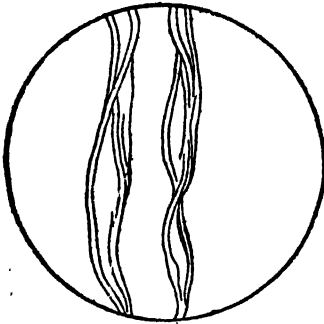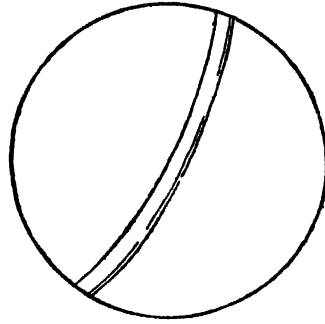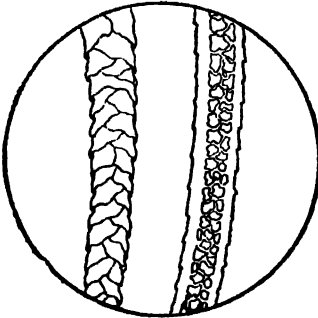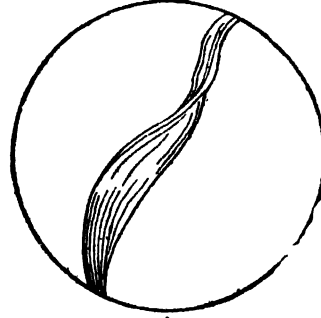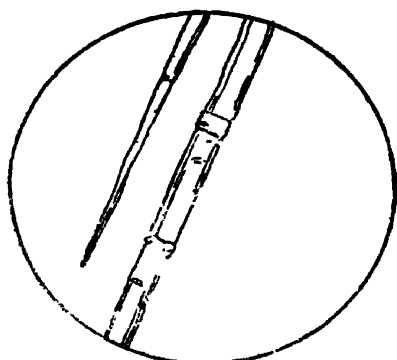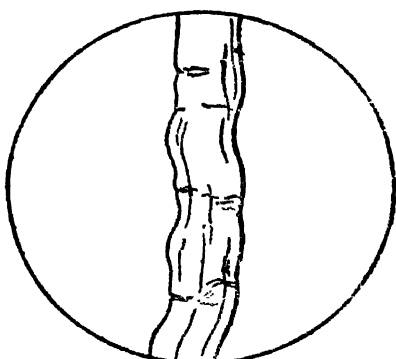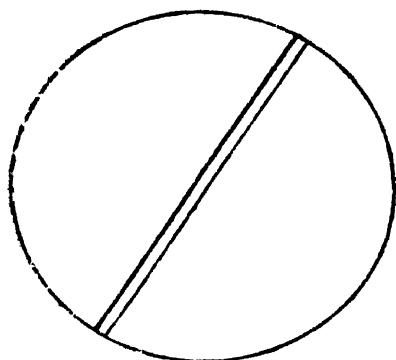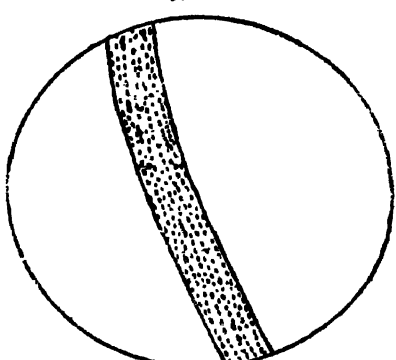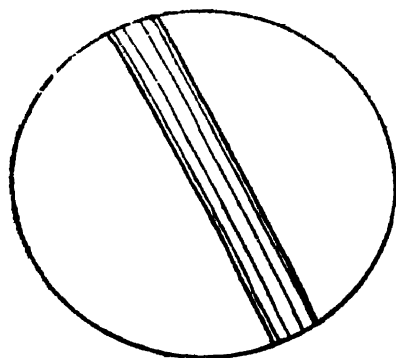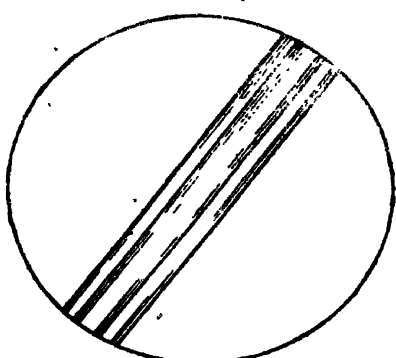
লিনেন
র‍্যামী
গ্লাস
নাইলন
রেয়ন
অ্যাসিটেট তন্তু

উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ, সাংশ্লেষিক ও খনিজ তন্তু নির্ণয় পদ্ধতি

(Identification of Vegetable, Animal, Synthetic and Mineral Fibres)

পরীক্ষা	উদ্ভিজ্জ (সূতি, লিনেন, র‍্যামী ইত্যাদি)	প্রাণিজ (রেশম, পশম)	সাংশ্লেষিক (নাইলন, ডেক্রন)	খনিজ (গ্লাস ও অ্যাসবেসটস্‌)
(১) কয়েকটি তন্তু একটি জ্বলন্ত শিখায় ধর।	শিখাসহ জ্বলিবে এবং কাগজ পোড়া গন্ধ বাহির হইবে। ধূসর বর্ণের হালকা ছাই পড়িয়া থাকিবে।	পুড়িবার সময় পালক পোড়া বা চুল পোড়া গন্ধ বাহির হইবে। শেষে কালো গুটিমত ছাই পড়িয়া থাকে এবং হাতে ধরিলে সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়।	গলিয়া শক্ত তামাটে গুটি বা দানা প্রস্তুত হয় এবং পুড়িবার সময় রাসায়নিক গন্ধ বাহির হয়।	মোটেই জ্বলিবে না।
(২) একটি খুব গরম ইস্ত্রি তন্তুর উপর চাপিয়া ধর।	লালচে পোড়া দাগ পড়িবে।	লালচে পোড়া দাগ পড়িবে।	গলিয়া যাইবে।	কোন পরিবর্তন হইবে না।
(৩) একটি তন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা কর।	পাক দেওয়া ফিতার মত—সূতি। মাথার দিকটা সরু সূঁচের মত, মাঝে মাঝে বাঁশের গাঁটের মত বন্ধনী—লিনেন। দেখিতে অনেকটা লিনেনের মত, কিন্তু আরও মোটা এবং অসমাঙ্গ—র‍্যামী।	দেখিতে একটি মসৃণ কাচের শলাকার মত; আলো বিকীর্ণ হয়—রেশম। তন্তুর উপরটি মাছের আঁশের মত একপ্রকার আবরণে ঢাকা—পশম।	নাইলন ও ডেক্রন তন্তু দেখিতে মসৃণ শলাকার মত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে উহাদের পার্থক্য বোঝা যায় না।	ক্ষুদ্র, সরু, সরল ও মসৃণ শলাকার মত—অ্যাসবেসটস্‌। সরু, মসৃণ এবং স্বচ্ছ শলাকার মত—গ্লাস।
(৪) শতকরা ৫ ভাগ কস্টিক সোডা জলে গুলিয়া একটি দ্রবণ প্রস্তুত কর এবং ইহাতে কয়েকটি তন্তু ফেলিয়া নাড়।	দ্রবীভূত হইবে না।	দ্রবীভূত হইবে।	দ্রবীভূত হইবে না।	দ্রবীভূত হইবে না।

সুতি ও লিনেনের তন্তু চিনিবার পদ্ধতি

(Indentification of cotton and Linen Fibres)

পরীক্ষা	সূতি	লিনেন
(১) একখানি কাপড় দুই ভাঁজ করিয়া আঙুলের সাহায্যে জোরে চাপিয়া ধর।	অস্পষ্ট ভাঁজের দাগ পড়িবে এবং এই দাগ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে না। [কাপড়ে কলপ থাকিলে সুস্পষ্ট ভাঁজের দাগ পড়িবে]	সুস্পষ্ট ভাঁজের দাগ পড়িবে এবং এই দাগ সহজে মিলাইয়া যাইবে না।
(২) একটি তন্তু দুই হাতে টানিয়া দুই ভাগ কর এবং উহাদের ছিন্ন অগ্রভাগ লক্ষ্য কর।	অগ্রভাগ তুলির অগ্রভাগের ন্যায় মোটা।	অগ্রভাগ দেখিতে সূঁচের ন্যায় সরু।
(৩) কয়েকটি তন্তু জলে কিছুক্ষণ ফুটাইয়া সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্রবণে দুই মিনিটকাল ফেলিয়া রাখ।	দ্রবীভূত হইয়া যাইবে।	অপরিবর্তিত থাকিবে।
(৪) সিলভার-নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণে থায়োসালফেটের জলীয় দ্রবণ মিশাইয়া একটি পরিষ্কার দ্রবণ প্রস্তুত কর। উক্ত দ্রবণে কস্টিক সোডার দ্রবণ মিশাইলে **রোডাই দ্রবণ** (Rohdai Solution) পাওয়া যাইবে। এই রোডাই দ্রবণে কয়েকটি তন্তু ভাল করিয়া নাড়।	বেগুনী বর্ণ ধারণ করিবে।	বেগুনী-নীল (Violet-Blue) বর্ণ ধারণ করিবে।

রেশম ও পশম চিনিবার পদ্ধতি
(Identification of Real Silk and Wool

পরীক্ষা	রেশম	পশম
(১) কাপড় হইতে কয়েকটি তন্তু বাহির করিয়া উহাদের পাক খুলিয়া ফেল।	তন্তু সরল মনে হইবে, উহাদের মধ্যে কোন ভাঁজ দেখা যাইবে না।	তন্তুর মধ্যে কোঁকড়ান চুলের মত ভাঁজ দেখা যাইবে।
(২) কয়েকটি তন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা কর।	মসৃণ কাচের শলাকার মত আলো বিকীরণ করে। আড়াআড়িভাবে কাটা তল সমবাহু ত্রিভুজের মত।	উপরিভাগ মাছের আঁশের মত আবরণে ঢাকা। আড়াআড়িভাবে কাটা তল —বৃত্তাকার।
(৩) ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দ্রবণে কয়েকটি তন্তু আধ মিনিটকাল সিদ্ধ কর।	দ্রবীভূত হইবে।	দ্রবীভূত হইবে না।

রেশমের বস্ত্রাদি তাহাদের স্বাভাবিক মসৃণতা এবং চাকচিক্য হইতে সহজেই চিনিতে পারা যায়। পশমের বস্ত্রাদিতে রেশমের চাকচিক্য দেখা যায় না।

খাঁটি রেশম ও কৃত্রিম রেশম চিনিবার পদ্ধতি

(Identification of Real Silk and Artificial Silk

পরীক্ষা	খাঁটি রেশম	কৃত্রিম রেশম (ভিসকোস ও কিউপ্রামোনিয়াম)
(১) কয়েকটি তন্তু একটি জ্বলন্ত শিখায় ধর।	পুড়িবার সময় পালক পোড়া বা চুল পোড়া গন্ধ পাওয়া যাইবে।	পুড়িবার সময় কাগজ পোড়া গন্ধ পাওয়া যাইবে।
(২) কয়েকটি তন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা কর।	মসৃণ কাচের শলাকার মত আলো বিকীরণ করে।	দেখিতে অনেকটা খাঁটি রেশমের মতই কিন্তু উহা অপেক্ষা চারগুণ মোটা এবং গায়ে কতকগুলি সমান্তরাল রেখা দেখা যায়।
(৩) শতকরা ৫ ভাগ কস্টিক সোডা জলে গুলিয়া একটি দ্রবণ প্রস্তুত কর এবং ইহাতে কয়েকটি তন্তু ফেলিয়া নাড়।	দ্রবীভূত হইয়া যাইবে।	দ্রবীভূত হইবে না।
(৪) সোডিয়াম নাইট্রাইট (Sodium Nitrite) এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ঠাণ্ডা দ্রবণে কয়েকটি তন্তু কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। পরে ঐ তন্তু অন্য একটি পাত্রে রক্ষিত বিটা ন্যাপথল (Bita Napthol) এবং কস্টিক সোডার দ্রবণে ভাল করিয়া নাড়। এই পরীক্ষাকে কাপলিং (Coupling) পরীক্ষা বলে।	লাল বর্ণ ধারণ করিবে।	হলুদ বর্ণ ধারণ করিবে।

বিভিন্ন প্রকার রেয়ন ও অ্যাসিটেট তন্তু চিনিবার উপায়

(Identification of Rayon and Acetate Fibres)

পরীক্ষা	ভিসকোস	কিউপ্রামোনিয়াম	অ্যাসিটেট
(১) একটি তন্তুকে আড়াআড়ি ভাবে কাটিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহা পরীক্ষা কর।	অসমান ধারবিশিষ্ট পাতার মত।	বৃত্তাকৃতি	অসমান ধারবিশিষ্ট পাতার মত।
(২) এক টুকরা কাপড়ের উপর একটি খুব গরম ইস্ত্রি রাখ।	লালচে পোড়া দাগ পড়িবে।	লালচে পোড়া দাগ পড়িবে।	গলিয়া যাইবে।
(৩) একখানি কাপড় হইতে কয়েকটি তন্তু বাহির করিয়া একটি অগ্নিশিখার উপরে ধর।	সুতির ন্যায় শিখাসহ পুড়িবে এবং হালকা ছাই পড়িয়া থাকিবে। কাগজ পোড়া গন্ধ পাইবে।	সুতির ন্যায় শিখাসহ পুড়িবে এবং হালকা ছাই পড়িয়া থাকিবে। কাগজ পোড়া গন্ধ পাওয়া যাইবে।	গলিয়া কালো শক্ত গুটির মত দানা প্রস্তুত হইবে। ভিনিগারের গন্ধ পাওয়া যাইবে।
(৪) কয়েকটি তন্তু ঘন অ্যাসেটিক অ্যাসিডের (Glacial acetic Acid) মধ্যে ফেলিয়া ভাল করিয়া নাড়।	দ্রবীভূত হইবে না।	দ্রবীভূত হইবে না।	দ্রবীভূত হইবে।
(৫) উপরোক্ত পরীক্ষায় ঘন অ্যাসেটিক অ্যাসিডের পরিবর্তে কিউপ্রামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (Cuprammonium hydroxide) ব্যবহার কর।	দ্রবীভূত হইবে।	দ্রবীভূত হইবে।	দ্রবীভূত হইবে না।
(৬) একটি পাত্রে কিছু অ্যাসিটোন(Acetone) লইয়া উহাতে কয়েকটি তন্তু উত্তমরূপে নাড়।	তন্তু দ্রবীভূত হইবে না।	তন্তু দ্রবীভূত হইবে না।	তন্তু সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইবে।
(৭) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং আয়োডিন সমপরিমাণে মিশাইয়া উহাতে কয়েকটি তন্তু ফেলিয়া নাড়।	তন্তু ঘন নীল বর্ণ ধারণ করিবে।	তন্তু হালকা নীল বর্ণ ধারণ করিবে।	তন্তু হলুদ বর্ণ ধারণ করিবে।

উপরের পরীক্ষা হইতে লক্ষ্য করিবে যে অণুবীক্ষণ পরীক্ষার সাহায্যে ভিসকোস এবং কিউপ্রামোনিয়াম রেয়নের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। সপ্তম পরীক্ষাটিও এই বিষয়ে সাহায্য করিবে। অন্যান্য পরীক্ষাগুলি অ্যাসিটেট তন্তু হইতে এই সকল রেয়নের তন্তু চিনিবার উপায় মাত্র।

রেয়ন, নাইলন ও ডেক্রন চিনিবার পদ্ধতি

(Identification of Rayon, Nylon and Dacron Fibres)

পরীক্ষা	রেয়ন	নাইলন	ডেক্রন
(১) কয়েকটি তন্তু একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় ধর।	শিখাসহ জ্বলিবে এবং কাগজ পোড়া গন্ধ পাওয়া যাইবে। পুড়িবার পর হালকা ধূসর বর্ণের ছাই পড়িয়া থাকিবে।	গলিয়া ট্যান রঙের (Tan Colour) শক্ত দানা প্রস্তুত হইবে। পুড়িবার সময় রাসায়নিক গন্ধ পাওয়া যাইবে এবং ধূসর বর্ণের ধোঁয়া বাহির হইবে।	নাইলনের মতই গলিয়া ট্যান রংয়ের দানা প্রস্তুত হইবে এবং পুড়িবার সময় রাসায়নিক দ্রব্যের গন্ধ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই জাতীয় তন্তু পুড়িবার সময় কালো ধোঁয়া বাহির হয়; গলিয়া স্বচ্ছ কাচের মত হইবে।
(২) একটুকরা কাপড়ের উপর একটি খুব গরম ইস্ত্রি চাপিয়া ধর।	কাপড়ে পোড়া দাগ পড়িবে।	গলিয়া স্বচ্ছ কাচের মত হইবে।	
(৩) একটি তন্তু আড়াআড়িভাবে কাটিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে দেখ।	(a) ভিসকোস—পাতার মত (b) কিউপ্রামোনিয়াম—বৃত্তাকার	বৃত্তাকার	বৃত্তাকার
(৪) কিউপ্রামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রাবকে কয়েকটি তন্তু উত্তমরূপে নাড়।	দ্রবীভূত হইয়া যাইবে।	দ্রবীভূত হইবে না।	দ্রবীভূত হইবে না।
(৫) জলের সহিত শতকরা ৯০ ভাগ কার্বলিক অ্যাসিড মিশাইয়া একটি দ্রবণ প্রস্তুত কর এবং এই দ্রবণে কয়েকটি তন্তু উত্তমরূপে নাড়।	দ্রবীভূত হইবে না।	দ্রবীভূত হইবে।	দ্রবীভূত হইবে না।

প্রথম পরীক্ষার সাহায্যে নাইলন ডেক্রনের পার্থক্য ধরা যাইতে পারে। পুড়িবার সময় নাইলন তন্তু হইতে ধূসর বর্ণের ধোঁয়া এবং ডেক্রন হইতে কালো ধোঁয়া বাহির হইবে। পঞ্চম পরীক্ষার সাহায্যেও নাইলন ডেক্রন হইতে চিনিয়া বাহির করা যাইবে। ভিসকোস ও কিউপ্রামোনিয়াম রেয়নের পার্থক্য তিন নম্বর পরীক্ষার সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়।

কয়েকটি প্রধান প্রধান তন্তুর তুলনামূলক আলোচনা

(Comparative study of a few important fibres)

	সুতি	লিনেন	রেশম	পশম	রেয়ন	নাইলন
যে মৌলিক পদার্থে গঠিত (Elements present)	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার (গন্ধক)	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন
রাসায়নিক প্রকৃতি (Chemical Nature)	সেল্যুলোজ	সেল্যুলোজ	প্রোটিন	প্রোটিন	সেল্যুলোজ	প্রোটিন
আঁশের দৈর্ঘ্য (Length of the fibre)	$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি হইতে $2\frac{1}{2}$ ইঞ্চি	$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি হইতে 2 ইঞ্চি	800 গজ হইতে 1800 গজ	$1\frac{1}{2}$ ইঞ্চি হইতে 14 ইঞ্চি	—	—
আঁশের আকৃতি (Shape of the fibre)	মোচড়ান ফিতার মত,	নলের মত, মাঝে মাঝে বাঁশের গাটের মত বন্ধনীযুক্ত	নলের মত, একপ্রান্ত সরু, কোন বন্ধনী নাই, মসৃণ	মাছের আঁশের মত উপরে খোলস থাকে	অনেকটা রেশমের মত কিন্তু উহা অপেক্ষা প্রায় চারগুণ মোটা এবং গায়ে লম্বালম্বি রেখা দেখা যায়।	প্রায় রেয়নের মত,
আঁশের প্রস্থচ্ছেদের আকৃতি (Shape of cross section)	একদিক অবতল অপরদিক উত্তল,	দেখিতে এক একটি বহুভুজের মত	দেখিতে ত্রিভুজের মত	বৃত্তাকৃতি, আঁশযুক্ত ধার	ভিসকোস—পাতার মত, কিউপ্রামোনিয়াম—বৃত্তাকৃতি, অ্যাসিটেট—পাতার মত	বৃত্তাকৃতি
কুঞ্চন (Shrinkage)	আঁশের কোন কুঞ্চন নাই, কিন্তু বুননের জন্য কাপড় খাপিয়া যায়।	সাধারণত কুঞ্চন হয় না।	কুঞ্চন হয় না	তাপ, চাপ এবং জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে ইহা কুঞ্চিত হয় (Felting)	কুঞ্চন হয় .	কুঞ্চন হয়।
চাকচিক্য (Lusture)	চাকচিক্য নাই।	চাকচিক্য আছে।	অত্যন্ত চকচকে।	চাকচিক্য নাই।	অত্যন্ত চকচকে।	চাকচিক্য আছে।

	সুতি	লিনেন	রেশম	পশম	রেয়ন	নাইলন
জলীয় বাষ্প শোষণ ক্ষমতা (Moisture absorbency)	জলীয় বাষ্প শোষণ করিতে পারে, কিন্তু ধারণ করিবার শক্তি কম, এইজন্য বর্ষাকালে সুতির কাপড় স্যাঁত-সেঁতে মনে হয় (feels damp)	সুতি অপেক্ষা জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বেশী।– ইহা সহজেই জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। এইজন্য তোয়ালে এবং রুমাল প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপযোগী।	জলীয় বাষ্প শোষণ ও ধারণ করিবার ক্ষমতা সুতি ও লিনেন অপেক্ষা বেশী।	সকল তন্তুর চেয়ে অধিক জলীয় বাষ্প শোষণ করিতে পারে। ইহা নিজের ওজনের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে এবং ইহাতে পশম ভিজা (wet) মনে হইবে না।	সুতি ও লিনেন অপেক্ষা অধিকতর জলীয় বাষ্প শোষণ করিতে পারে, কিন্তু এই বাষ্প উহাদের মত তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিতে পারে না।	জলীয় বাষ্প শোষণ ক্ষমতা কম। এইজন্য নাইলন পোশাকে তেমন আরাম বোধ হয় না।
জোর (Strength)	সুতির আঁশ বেশ শক্ত এবং জলে ভিজাইলে ইহার জোর শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বাড়িয়া যায়। এইজন্যই এই জাতীয় বস্ত্রাদি জলে রগড়াইয়া পরিষ্কার করিলে কোন ক্ষতি হয় না	ইহা সুতির তন্তু অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ শক্ত। প্রকৃতপক্ষে বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত তন্তুর মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা শক্ত তন্তু। সুতির ন্যায় জলে ভিজাইলে ইহার জোর বাড়িয়া যায়।	ইহা সুতি অপেক্ষা অধিকতর শক্ত, কিন্তু জলে ভিজাইলে ইহার জোর অনেক কমিয়া যায়।	পশম-তন্তু অত্যন্ত দুর্বল। জলে ভিজাইলে ইহার শক্তি আরও কমিয়া যায়। এইজন্য পশমের বস্ত্রাদি ধুইবার সময় রগড়াইতে হয় না।	পশম অপেক্ষা শক্তি-শালী কিন্তু সুতি অপেক্ষা দুর্বল। জলে ভিজাইলে জোর কমিয়া যায়।	নাইলনও খুব শক্ত তন্তু। কিন্তু লিনেন অপেক্ষা ইহার জোর কম, জলে ভিজাইলে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না।
স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity and Resiliency)	স্থিতিস্থাপকতা শক্তি কম। এইজন্য সুতির কাপড়ে ভাঁজ পড়িলে বা কুচকাইয়া গেলে উহা সহজে মিলাইয়া যায় না।	লিনেন তন্তুর স্থিতি-স্থাপকতা শক্তি সর্বা-পেক্ষা কম।	সুতি ও লিনেন অপেক্ষা অধিকতর স্থিতিস্থাপক	অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক, ইহাতে কোন ভাঁজের দাগ পড়ে না। ভিজা অবস্থায় এই স্থিতিস্থাপ-কতা গুণ কিছুটা কমিয়া যায়।	স্থিতিস্থাপকতাশক্তি রেশম ও পশম হইতে কম।	অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক এবং ইহাতে সহজে ভাঁজের দাগ পড়ে না।

	সুতি	লিনেন	রেশম	পশম	রেয়ন	নাইলন
তাপ পরিবাহিতা (Heat Conductivity)	তাপ সুপরিবাহী। এই জন্য গ্রীষ্মকালে সুতির বস্ত্রে আরাম বোধ হয়।	সুতি অপেক্ষা অধিকতর তাপ সুপরিবাহী।	তাপ কুপরিবাহী, এই জন্য রেশম বস্ত্রে গরম বোধ হয়।	তাপ কুপরিবাহী, এই জন্য শীতকালে পশমের বস্ত্র ব্যবহার করা হয়।	সুতি অপেক্ষাও অধিকতর তাপ সুপরিবাহী।	তাপ সুপরিবাহী।
তাপের প্রভাব (Effect of heat)	স্বাভাবিক তাপে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। এইজন্যই সুতির বস্ত্র সোডা বা সাবান জলে ফুটাইয়া পরিষ্কার করা যায় এবং গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা চলে।	সুতির তন্তুর মতই স্বাভাবিক তাপে কোন ক্ষতি হয় না।	উত্তাপ প্রয়োগে হলদে হইয়া যায়।	বেশী উত্তাপে তন্তুর নমনীয়তা হ্রাস পায় এবং পোড়া দাগ পড়ে।	সুতি এবং লিনেনের মতই রেয়ন তন্তুর সাধারণ উষ্ণতায় কোন ক্ষতি হয় না। ইহাতে গরম ইস্ত্রি প্রয়োগ করা যায়। তবে খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে পোড়া দাগ পড়িয়া যায়। (অ্যাসিটেট রেয়নে গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে গলিয়া যায়।)	নাইলন তন্তু উত্তাপ প্রয়োগে নষ্ট হইয়া যায়। তবে উষ্ণ বা সামান্য গরম জলে নাইলন বস্ত্র পরিষ্কার করা চলে।
রং ধারণ ক্ষমতা (Affinity to dyes)	লিনেন অপেক্ষা রং ধারণ ক্ষমতা বেশী, কিন্তু রেশম এবং পশম অপেক্ষা কম। Mordantএর সাহায্যে রং করা অপেক্ষাকৃত সহজ।	এই প্রকার তন্তুতে সহজে রং ধরে না, সুতরাং রং করা অপেক্ষাকৃত কঠিন।	অতি সহজেই রং করা যায়।	অতি সহজেই রং করা যায়।	সুতি এবং লিনেনে যে সকল রং ব্যবহার করা হয় সেই সকল রং অতি সহজেই রেয়ন তন্তু ধারণ করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সুতি অপেক্ষা রেয়ন তন্তু রং করা অনেক সহজ। (অ্যাসিটেট তন্তু সুতি ও লিনেনে ব্যবহৃত রং ধারণ করিতে পারে না।)	নাইলন তন্তু সহজেই রং করা যায়, কিন্তু এই রং তেমন পাকা হয় না। সূর্যের আলো এবং পরিষ্কার করিবার সময় এই রং কিছুটা নষ্ট হইয়া যায়।

	সুতি	লিনেন	রেশম	পশম	রেয়ন	নাইলন
অ্যাসিডের ক্রিয়া (Action of Acids)	গাঢ় অ্যাসিডের সংস্পর্শে সুতির তন্তু দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়। লঘু অ্যাসিডে তন্তু দুর্বল হইয়া যায় এবং ইহা কাপড়ে শুকাইয়া গেলে কাপড় ফুটো হইয়া যায়।	সুতির তন্তুর অনুরূপ।	গাঢ় অ্যাসিডে ইহা নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু লঘু অ্যাসিডে ইহার কোন ক্ষতি হয় না।	গাঢ় অ্যাসিডে পশম নষ্ট হইয়া যায়। লঘু অ্যাসিড এই তন্তুর কোন ক্ষতি করে না।	অ্যাসিড রেয়ন তন্তুর ক্ষতি সাধন করে। এমন কি লঘু অ্যাসিডেও এই সকল তন্তু দুর্বল হইয়া পড়ে। (অ্যাসিটেট তন্তু অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং ফরমিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হইয়া যায়)	লঘু অ্যাসিডে নাইলন তন্তুর কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু গাঢ় অ্যাসিডে ইহা নষ্ট হইয়া যায়।
ক্ষারের ক্রিয়া (Action of Alkalis)	সুতির তন্তুতে যে কোন প্রকার ক্ষার নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে, ক্ষার ইহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না।	লিনেনের তন্তুতে নির্ভয়ে যে কোন প্রকার ক্ষার ব্যবহার করা চলে। তবে সুতির তুলনায় লিনেনের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।	রেশমতন্তু তীব্র ক্ষারের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু মৃদু ক্ষার, যেমন বোরাক্স, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।	রেশমের ন্যায় পশম তন্তুও তীব্র ক্ষারের প্রভাবে নষ্ট হইয়া যায়। তবে বোরাক্স, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি ব্যবহার করা চলে।	সুতি এবং লিনেন অপেক্ষা ইহার ক্ষার প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কম। এইজন্য গাঢ় ক্ষার এই তন্তুতে ব্যবহার করা চলে না, লঘু ক্ষার সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে।	নাইলন তন্তুর ক্ষার প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে, সুতরাং লঘু ক্ষার ইহার কোন ক্ষতি করে না।
ব্লিচিং দ্রব্যাদির ক্রিয়া (Effect of bleaching agents)	সুতির তন্তু ব্লিচিং দ্রব্যাদিতে নষ্ট হয় না। সুতরাং সকল প্রকার ব্লিচিং দ্রব্যাদিই সাদা সুতিতে ব্যবহার করা চলে।	সুতির তন্তুর ন্যায় যে কোন প্রকার ব্লিচিং দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা চলে; তবে প্রতিরোধ ক্ষমতা সুতির তুলনায় কম।	ক্লোরিন ব্লিচ অর্থাৎ ব্লিচিং পাউডার, হাইপোক্লোরাইট বা জাভেলী দ্রবণ রেশমতন্তু নষ্ট করিয়া ফেলে, মৃদু ব্লিচিং দ্রব্যাদি যথা হাইড্রোজেন পারক্সাইড ইত্যাদি নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।	রেশমতন্তুর মতোই উগ্র ক্লোরিনজাত ব্লিচ ব্যবহার করা চলিবে না। হাইড্রোজেন পারক্সাইড, ইত্যাদি মৃদু ব্লিচিং দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যায়।	উগ্র ক্লোরিন ব্লিচ রেয়ন তন্তুর ক্ষতি করে। সুতরাং হাইড্রোজেন পারক্সাইড ইত্যাদি মৃদু ব্লিচিং দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে হয়।	রেয়ন তন্তুর অনুরূপ

	সূতি	লিনেন	রেশম	পশম	রেয়ন	নাইলন
দাহ্যতা (Inflammability)	সূতির তন্তু সহজেই জ্বলিয়া উঠে এবং শিখা-সহ জ্বলিতে থাকে। পুড়িবার সময় কাগজ পোড়া গন্ধ বাহির হয় এবং শেষে হালকা ছাই পড়িয়া থাকে।	সূতির তন্তুর অনুরূপ।	এই তন্তু ধীরে ধীরে জ্বলে এবং পুড়িবার সময় পালকপোড়া গন্ধ বাহির হয়।	রেশমের ন্যায় ধীরে ধীরে জ্বলে এবং পালক পোড়া গন্ধ বাহির হয়। দাহ্যতা কম বলিয়া পশমের কম্বল আগুন নিভাইতে ব্যবহার করা হয়।	সূতি ও লিনেনের অনুরূপ। (অ্যাসিটেট তন্তু পুড়িবার সময় গলিয়া শক্ত কালো দানা প্রস্তুত হয়।)	নাইলন তন্তুতে আগুন ধরে না, আগুনের প্রভাবে ইহা গলিয়া যায়।
পোকায় কাটা (Action of Moths, mildew and other insects)	সূতির তন্তু মথ (moth) পোকায় কাটে না। কিন্তু ইহা mildew এবং ছত্রকের (mold) দ্বারা নষ্ট হইতে পারে, mildew ও ছত্রকের বৃদ্ধির জন্য খাদ্য, জলীয় বাষ্প এবং উত্তাপের প্রয়োজন। সুতরাং কাপড় বিনা কলপে শুষ্ক স্থানে তুলিয়া রাখিলে mildew এবং ছত্রকের হাত হইতে রক্ষা পায়।	সূতির তন্তুর অনুরূপ, তবে সূতি অপেক্ষা প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী।	রেশম তন্তু মথ পোকায় কাটে না, কিন্তু ইহা mildew এবং ছত্রকের দ্বারা নষ্ট হইতে পারে।	পশম তন্তুর বড় শত্রু হইতেছে মথ পোকা। সুতরাং ইহা খুব সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতে হয়। এই প্রকার তন্তু mildew এবং ছত্রকেও আক্রমণ করিতে পারে।	সূতির তন্তুর অনুরূপ। (অ্যাসিটেট তন্তু mildew দ্বারা আক্রান্ত হয় না।)	নাইলন তন্তু মথ, mildew এবং ছত্রক ইত্যাদি কোনপ্রকার পোকা দ্বারাই আক্রান্ত হয় না।

2. পোশাক প্রস্তুতি সংক্রান্ত দায়িত্ব
(Management responsibilities in clothing a family)

একটি পরিবারের পোশাক পরিকল্পনা সংক্রান্ত দায়িত্ব একটি মস্ত বড় দায়িত্ব। অন্ন এবং বস্ত্র এই দুইটি জিনিস যদিও আমাদের জীবনে অপরিহার্য তথাপি উহাদের সামাজিক মূল্য সমান নয়, খাদ্য আমাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। এক ব্যক্তি ঘরে বসিয়া কি খাইল তাহা কেহ দেখে না কিন্তু গৃহের বাহিরে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি আসিয়া পোশাকের উপর পড়ে। পোশাক নির্বাচনে ব্যক্তিগত রুচি যদিও প্রাধান্যলাভ করে তথাপি অন্যের মনের প্রতিক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। উপযুক্ত পোশাক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। আশেপাশের লোকেদের প্রতিক্রিয়া যদি পরিধেয় পোশাকের অনুকূল হয় তবে পরিধানকারীর মনে একটা সন্তোষ সৃষ্টি করে ও আত্মবিশ্বাস জাগায়। গৃহের সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত পোশাকের ব্যবস্থা করাতে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দরকার।

গৃহ পরিচালিকার পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্ব সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল। তাহার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হইল ঃ

(১) বাড়ীর ছোট ও অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের মনে পোশাক সম্বন্ধে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তোলা। পোশাকের মান সম্বন্ধে একটা ধারণা সৃষ্টি করা অর্থাৎ কখন কিরূপ পোশাক মানানসই, বিভিন্ন তন্তুর গুণাগুণ কি? বাহুল্য বর্জন করিয়া চলা অথচ প্রয়োজনমত পোশাক রাখা ইত্যাদি।

(২) পরিবারের পোশাকের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা।

(৩) পরিবারের সামর্থ্য অনুসারে পোশাকের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা।

(৪) নির্ধারিত অর্থের মধ্যে পরিচ্ছদ পরিকল্পনা করা অর্থাৎ কতটা পোশাক দর্জিকে দিব, কতগুলি তৈরী পোশাক (readymade) ক্রয় করা হইবে এবং বাড়িতে কতটা সেলাই করা সম্ভব স্থির করা।

(৫) সুলভে ভাল পোশাক ক্রয়ের জন্য বাজার নির্বাচন করা।

(৬) পোশাকের উপাদান পছন্দ করা ও ক্রয় করা।

(৭) অনুষ্ঠান অনুযায়ী শিশুদের পোশাক নির্বাচনের শিক্ষা দেওয়া।

(৮) পোশাকের উপযুক্ত যত্ন লওয়া এবং সংরক্ষণ করা এবং সে সম্বন্ধে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া।

(৯) নির্দিষ্ট বরাদ্দের মধ্যে কিশোর-কিশোরীদের পোশাক পরিকল্পনা ও ক্রয়ের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া।

(১০) বাড়িতে যদি সেলাইএর কিছু ব্যবস্থা করা হয় তবে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা।

(১১) সেলাইএর উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয় করা।

(১২) উহাদের যত্ন ও সংরক্ষণ করা।

পরিচ্ছদ পরিকল্পনার সময় গৃহ-পরিচালনার সমস্ত উপকরণ অর্থাৎ সময়, শক্তি, অর্থ, গৃহের লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাইতে হয়।

সময়ঃ বাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেনাকাটা করা, দর্জির কাছে যাওয়া অথবা ঘরে সেলাই করা এসবের জন্য যথেষ্ট সময় দরকার।

শক্তিঃ পোশাক কাচা, ইস্ত্রি করার জন্য যথেষ্ট তাপ ও শক্তি খরচ হয়।

অর্থঃ সকল ঋতু এবং সকল রকম সামাজিক প্রয়োজনের উপযোগী পোশাকের জন্য যথেষ্ট অর্থ প্রয়োজন।

দৃষ্টিভঙ্গিঃ অর্থ থাকিলেই উপযুক্ত পোশাক ক্রয় করা যায় না। সমকালীন ফ্যাসানের সঙ্গে সুরুচি বজায় রাখিয়া পোশাক নির্বাচনে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির দরকার।

জ্ঞানঃ পরিবারের কাহার কেমন রুচি, কাহার কতটা পোশাক প্রয়োজন এ জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে তন্তু সম্বন্ধে জ্ঞান, কেনাকাটার জ্ঞান, কোন্ বাজারে ভাল জিনিস পাওয়া যায়, বছরের কোন্ সময়ে বস্ত্রাদির উপরে বিশেষ ছাড় পাওয়া যায় এইসব জ্ঞান পোশাক পরিকল্পনায় অপরিহার্য।

যিনি পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্ব লইবেন তাঁহার নিজের যে উপরোক্ত সমস্ত যোগ্যতা ও সময় থাকিবে তাহা নয় তবে তিনি গৃহের সকলের সামর্থ্য, যোগ্যতা ও সময় বিচার করিয়া কাজ বণ্টন করিয়া দিবেন। এই বণ্টনের কাজও পোশাক পরিকল্পনার অন্তর্গত।

B. বস্ত্রাদি ধোওয়া এবং পরিষ্কার করার বিভিন্ন পদ্ধতি শুষ্ক ধোলাই ও কাপড়ের দাগ তোলা

(Different methods of washing and cleaning of clothing including dry cleaning and removal of stains)

বস্ত্রাদি ধোওয়া ও পরিষ্কার করার পদ্ধতি সম্বন্ধে একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে শুধু শুষ্ক ধোলাইএর কথা বলা হইল।

শুষ্ক ধোলাই (Dry cleaning)

তোমরা জান যে, কোন কোন বস্ত্র ধুইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। জর্জেট, ক্রেপডি-সীন, বিভিন্ন প্রকার রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি জলে ধুইবার সময় এই অসুবিধা প্রায়ই হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল বস্ত্রাদি ধুইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে উহাদের আকৃতি বদলাইয়া যাইবে। আবার রঙিন এবং ছাপার কাপড়ের রঙ অনেক সময় সাবান-জলে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এই জাতীয় বস্ত্রাদির স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখিয়া পরিষ্কার করিতে হইলে শুষ্ক ধোলাই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে

(১) বস্ত্রাদি কুঁচকাইয়া বা সঙ্কুচিত হইয়া যাইবার কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং

(২) রঙিন ও ছাপা কাপড়ের রঙ্ চটিয়া বা নষ্ট হইয়া যায় না।

সাধারণত রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি, ভেলভেট ও অন্যান্য রঙিন এবং ছাপা বস্ত্রাদিই শুষ্ক ধোলাইয়ের বিশেষ উপযোগী।

সকল তরল পদার্থই শুষ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহার করা যায় না। কোন কোন তরলে কাপড়ে খারাপ গন্ধ হয়। আবার কোন কোন তরল অতিশয় উদ্বায়ী এবং মুক্ত অবস্থায় রাখিলে উড়িয়া যায়। এই ধরনের তরলে ধোলাই করিলে বেশী খরচ হয়। আবার তরল যদি খুব কম উদ্বায়ী হয় তাহা হইলে কাপড় শুকাইতে অনেক অসুবিধা হয়। সুতরাং মাঝামাঝি উদ্বায়ী (moderately volatile) তরল শুষ্ক ধোলাইয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আবার কোন কোন তরলদ্রব্য বাষ্পীভূত করিলে পাত্রের নীচে তলানি পড়িয়া থাকে। এই শ্রেণীর তরলে কাপড়ে দাগ লাগিবার সম্ভাবনা থাকে। শুষ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত আদর্শ তরলের নিম্নলিখিত কয়েকটি গুণ থাকিবে :

(১) ইহাতে কাপড় সঙ্কুচিত হইবে না বা রঙিন কাপড়ের রঙ নষ্ট হইবে না।

(২) কাপড় হইতে দ্রুত ময়লা দ্রবীভূত করিবে।

(৩) বাষ্পীভূত করিলে নীচে কোন তলানী পড়িয়া থাকিবে না।

(৪) মাঝারি রকমের উদ্বায়ী হইবে।

(৫) ব্যবহারে কাপড়ে কোন গন্ধ হইবে না।

(৬) অদাহ্য বা সামান্য দাহ্য হইবে।

(৭) বিষাক্ত হইবে না।

(৮) সহজলভ্য এবং সস্তা হইবে।

অনেক সময় কোন একটি তরল অপেক্ষা একাধিক তরল একত্রে মিশাইয়া ব্যবহার করিলে ভাল ধোলাই হয়। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এবং বেনজিন একত্রে ব্যবহার করিলে যে কোন একটি তরল অপেক্ষা ভাল ধোলাই হইবে। বেনজিন, পেট্রল ইত্যাদির সহিত আজকাল বেনজিন সাবানও (Benzene soaps) ব্যবহার করা হয়। ইহাতে ময়লা বস্ত্রাদি তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়। বিভিন্ন প্রকারের বেনজিন সাবান বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। ইহাদেয় মধ্যে স্যাপোনিন (Saponine), লিকুইড সোপ (Liquid soap) এবং ওয়ারলিন (Weralin) বিদেশে প্রস্তুত কয়েকটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাবান।

পরিষ্কারক দ্রব্যাদি : যে সকল তরল শুষ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাদিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) দাহ্য, যথা—পেট্রল, বেনজিন ইত্যাদি,

এবং

(২) অদাহ্য, যথা—কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, ট্রাইক্লোরোইথিলিন ইত্যাদি। নিম্নে শুষ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত কয়েকটি তরলের উল্লেখ করা হইল :

পেট্রোলিয়াম ইথার (Petroleum ether) : ইহা অতিশয় উদ্বায়ী তরল। মুক্ত অবস্থায় বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয়। ইহা একটি সহজ দাহ্য তরল। সুতরাং ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়।

টারপেনটাইন (Terpentine) : ইহা ময়লা দূরে করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এই তরল ব্যবহারে কাপড়ে একটি বিশ্রী গন্ধের সৃষ্টি হয়। ইহা একটি দাহ্য তরল। এই সকল কারণে শুষ্ক ধোলাইয়ে টারপেনটাইন ব্যবহার করা উচিত নয়।

কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (Carbon tetrachloride) : ইহা একটি অদাহ্য তরল পদার্থ। সুতরাং কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। রঙিন কাপড়ের রংও ইহাতে নষ্ট হয় না বা কাপড়ে কোন খারাপ গন্ধের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং ইহা একটি আদর্শ পরিষ্কারক দ্রব্য। কিন্তু এই তরলটি অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাপেক্ষ।

বেনজল (Benzol) : পরিষ্কারক দ্রব্যাদির মধ্যে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা খুব বেশী উদ্বায়ী নয়, অথচ বস্ত্রাদি হইতে সহজেই বাষ্পীভূত হয় এবং কাপড়ে কোন খারাপ গন্ধের সৃষ্টি করে না। এই তরল ব্যবহারে রঙিন কাপড়ের রঙ সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে।

বেনজিন (Benzene) : ইহাও একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পরিষ্কারক দ্রব্য এবং শুষ্ক ধোলাইয়ে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা একটি দাহ্য তরল এবং ধোলাইয়ের সময় সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়।

পেট্রল (Petrol) : শুষ্ক ধোলাইয়ে এই তরলটিই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য তরল পদার্থের তুলনায় ইহা অনেক সস্তা। ইহাও একটি দাহ্য তরল। সুতরাং ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। সাধারণ ধোলাইয়ের পক্ষে এই তরলটি বিশেষ উপযোগী।

ইহা ছাড়া আধুনিক যুগে **ট্রাইক্লোরোইথিলিন** (Trichloroethylene) এবং **পারক্লোরোইথিলিন** (Perchloroethylene) এই দুইটি তরলও প্রচুর পরিমাণে শুষ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের সুবিধা এই যে ইহারা আগুনের সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে না এবং অপেক্ষাকৃত কম উদ্বায়ী, ফলে কাছাকাছি আগুন থাকিলেও ভয়ের কোন কারণ থাকে না এবং কম উদ্বায়ী বলিয়া খরচও অপেক্ষাকৃত কম পড়ে।

ধৌত প্রণালী : প্রথমে কাপড় হইতে আলগা ধুলা বা ময়লা ঝাড়িয়া বা ব্রাশ করিয়া যথাসম্ভব দূর কর। কাপড়ে জল বা জলীয় বাষ্প থাকিলে পরিষ্কারক তরলের সাহায্যে ময়লা দ্রবীভূত করিতে অসুবিধা হয়। সুতরাং কাপড় ভিজা থাকিলে ভাল করিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। পরিষ্কারক তরলটিও একেবারে জলশূন্য হওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় ঐ তরলে জল থাকিবার জন্যই কাপড় ভাল পরিষ্কার হয় না। একখণ্ড শুকনো তুলা তরলে ভিজাইয়া রাখিলে উহা তরল হইতে জল শোষণ করিয়া লইবে। এইরূপে জলশূন্য তরল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তিন-চারিটি তরলের পাত্র পর পর সাজাইয়া লও। প্রথম পাত্রে একটু বেনজিন সাবান গুলিয়া লইলে ভাল হয় (প্রতি ৪০ গ্যালনে ১ পাউণ্ড সাবান)। প্রথমে কাপড়খানি এই সাবান-গোলা তরলে ভাল করিয়া রগড়াইয়া ময়লা দূর কর। যখন অধিকাংশ ময়লা দ্রবীভূত হইবে, তখন কাপড়খানি হাতে চাপিয়া যথাসম্ভব তরল বাহির করিয়া দাও। এইবার দ্বিতীয় পাত্রে কাপড়খানি ডুবাইয়া অবশিষ্ট ময়লা দূর কর। ময়লা দূর হইলে কাপড়খানি পর পর তৃতীয় এবং চতুর্থ পাত্রে রক্ষিত তরলে ভাল করিয়া ধুইয়া লও। ধুইবার পর ভাল করিয়া একটি খোলা ঘরে বা ছায়ায় শুকাইতে দাও। শুকাইবার সময় মাঝে মাঝে টানিয়া ইহা পূর্বাকৃতিতে আনিয়া শুকাইবে। তাহা হইলে কুঁচকাইয়া আকৃতি নষ্ট হইবে না। বস্ত্রাদি শুকাইবার পর ভাল করিয়া ভাঁজ করিয়া একটি ভিজা কাপড় মাঝখানে রাখিয়া ইস্ত্রি করিবে। খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিবে না। কোন কোন

রেশম পশমের কাপড় ভাঁজ করিয়া চাপিয়া লইলেই হয়, ইস্ত্রি করিবার প্রয়োজন হয় না।

শুষ্ক ধোলাইয়ের সময় নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করিবে ঃ

(১) যে ঘরে কাপড় ধুইবে তাহাতে যেন ভালভাবে বাতাস চলাচল করে।

(২) ঘরে বা কাছাকাছি যেন কোন খোলা আগুন না থাকে।

(৩) কাপড়খানি একটি পাত্র হইতে অন্য পাত্রে লইবার সময় তরল পদার্থ যেন মেঝেতে না পড়ে।

কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার পদ্ধতি
(Removal of Stains)

দাগ কাহাকে বলে ? অপরিষ্কার জামা-কাপড় সাবান, সোডা ইত্যাদি সাধারণ পরিষ্কারক দ্রব্যাদির সাহায্যে ধুইলেই উহাদের ময়লা দূর হইয়া যায়। কিন্তু কখনও কখনও জামাকাপড়ে কোন কোন দ্রব্যাদির সাহায্যে এমন একটি বিশেষ ধরনের রঙের বা চিহ্নের সৃষ্টি হয় যে স্বাভাবিক উপায়ে ধুইবার সময় উহা সহজে মিলাইয়া যায় না। উহা অপসারিত করিতে এক বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। জামা-কাপড়ের এই প্রকার রং বা চিহ্নকেই দাগ (stain) বলে। উপযুক্ত সময়ে এবং যথাযথ পদ্ধতিতে চেষ্টা না করিলে ঐ দাগ উঠানো অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। মনে রাখিবে পুরানো দাগ অপেক্ষা নতুন দাগ উঠানো অনেক সহজ। তাছাড়া দাগ অনেক দিন কাপড়ে থাকিলে কাপড়খানি নষ্ট হইয়া যাইবারও আশঙ্কা থাকে। সুতরাং দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা উঠাইবার চেষ্টা করিতে হয়।

দাগ উঠাইবার জন্য যে সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয় তাহা মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ—

(১) **উগ্র অপসারক দ্রব্যাদি**, যথা—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিডের গাঢ় দ্রবণ, কাপড় কাচা সোডা, জাভেলী-ওয়াটার, ক্লোরিন ইত্যাদি। ইহারা অনেকক্ষণ কাপড়ের সংস্পর্শে থাকিলে কোন কোন তন্তুর ক্ষতি করিতে পারে। সুতরাং সাবধানতার সহিত এই সকল দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিতে হয়।

মৃদু অপসারক দ্রব্যাদি, যথা,—অক্সালিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ, ভিনিগার বা অ্যাসেটিক অ্যাসিড, বেকিং সোডা, অ্যামোনিয়া, বোরাক্স, হাইড্রোজেন পারক্সাইড ইত্যাদি।

এই সকল দ্রব্যাদি সাধারণত কাপড়ের কোন ক্ষতি করে না। এই জন্য মিহি এবং দামী কাপড়ের দাগ উঠাইতে এই জাতীয় দ্রব্যাদি নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কাপড়ের দাগ উঠাইবার জন্য প্রথমেই উগ্র অপসারক ব্যবহার না করিয়া মৃদু অপসারক দ্রব্যাদি হইতেই আরম্ভ করা উচিত। ক্লোরিন এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড, উভয়ই কাপড়ের দাগ উঠাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু ক্লোরিন উগ্র বলিয়া প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্বারাই দাগ উঠাইবার চেষ্টা করা কর্তব্য। ইহাতে দাগ না উঠিলে তখন ক্লোরিন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আবার বিভিন্ন প্রকারের দাগ উঠাইবার পদ্ধতিও বিভিন্ন। যে প্রণালীতে রক্তের দাগ উঠানো হয় তাহা লোহার দাগ উঠাইবার উপযোগী নয়। সুতরাং কি ভাবে দাগ লাগিয়াছে জানিতে পারিলে দাগ অতি সহজেই দূরে করা যায়। তাহা না হইলে একের পর এক বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিতে হইবে যতক্ষণ না ঐ দাগ উঠিয়া যায়। ইহাতে কাপড়ের তন্তু নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে।

অপসারক দ্রব্যগুলি বিভিন্ন প্রকার তন্তুর উপর বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে। কোন কোন অপসারক সূতি এবং লিনেনের কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু উহারা হয়তো রেশম এবং পশমের বস্ত্রাদি একেবারেই নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং দাগ উঠাইবার পূর্বে কাপড়খানি সূতি, রেশম, পশম প্রভৃতি কি প্রকার তন্তু দ্বারা প্রস্তুত তাহা সঠিকভাবে জানিতে হইবে।

সূতি বা লিনেনের উপর সাধারণতঃ মৃদু ক্ষারের (যথা, সোডি-বাই-কার্ব বা খাইবার সোডা, অ্যামোনিয়া, বোরাক্স ইত্যাদি) কোন প্রকার খারাপ ক্রিয়া হয় না। এমন কি কাপড় কাচা সোডা, সাবান ইত্যাদিও অনায়াসেই ব্যবহার করা চলে। অ্যাসিড কিন্তু এই জাতীয় কাপড়ের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। অ্যাসিডের গাঢ় দ্রবণ কোন ক্রমেই এই কাপড়ে ব্যবহার করা চলে না। এমন কি অক্সালিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ ব্যবহার করিলেও কাপড়খানি তখনই প্রচুর জলে ধুইয়া সমস্ত অ্যাসিড দূরে করিতে হয়। একবার ঐ অ্যাসিড কাপড়ে শুকাইলে কাপড়খানি নরম হইয়া ঐ স্থান ফাঁসিয়া যাইবে। ব্লিচিং পাউডার এবং ক্লোরিন খুব সাবধানতার সহিত এই জাতীয় কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পশম এবং রেশমের বস্ত্রাদি ক্ষারীয় অপসারক দ্রব্যাদিতে নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি মৃদু ক্ষারীয় দ্রব্যাদিও (যথা, অ্যামোনিয়া, বোরাক্স ইত্যাদি) সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়। গাঢ় অ্যাসিড ইহাদের তেমন ক্ষতি করিতে পারে না এবং অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফুটন্ত এবং অত্যধিক গরম জলে এই জাতীয় বস্ত্রাদি ঈষৎ হরিদ্রাভ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহা ছাড়া পশমের আঁশগুলি সঙ্কুচিত হইয়া কাপড় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং গরম বা ফুটন্ত জল ব্যবহার না করিয়া ঈষদুষ্ণ জলই ব্যবহার করা কর্তব্য।

রেয়ন বা আর্টিফিসিয়াল সিল্ক হইতে দাগ উঠাইবার জন্য গাঢ় অ্যাসিড বা ক্ষার ব্যবহার করা উচিত নয়। মৃদু অ্যাসিড এবং ক্ষার নির্ভয়ে উহাদের উপর ব্যবহার করা চলে। জলের সংস্পর্শে রেয়নের তন্তুগুলি সাধারণতঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। এই জন্য এই শ্রেণীর কাপড়ের দাগ উঠাইতে জল ব্যবহার না করাই ভাল। বোরাক্স এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। এমন কি ক্লোরিন এবং ব্লিচিং পাউডারের লঘু দ্রবণও সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। অ্যাসিটেট রেয়ন অন্যান্য রেয়ন হইতে একটু স্বতন্ত্র। ইহা অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং গরম ইস্ত্রি ব্যবহারে গলিয়া যায়। সুতরাং এই জাতীয় অপসারক দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিবার পূর্বে কাপড়খানি অ্যাসিটেট রেয়ন প্রস্তুত কি না তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন।

নাইলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি সিনথেটিক তন্তু অ্যাসিড এবং ক্ষারে নষ্ট হয় না। সুতরাং এই প্রকার অপসারক দ্রব্যাদি প্রয়োগে কোন বাধা নাই। জলীয় বাষ্প এই জাতীয়

তন্তুতে খুব কম শোষিত হয়। এই জন্য চা, কফি বা ফলের রস ইত্যাদি লাগিলে উহা তন্তুর মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক সময় জলে দুই একবার ধুইয়া ফেলিলেই ঐ দাগ উঠিয়া যায়। ভিনিয়নের বস্ত্র অ্যাসিটেট রেয়নের মত অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত হইয়া যায়। এই জন্য এই প্রকার অপসারক দ্রব্য ভিনিয়ন বস্ত্রের দাগ উঠাইতে ব্যবহার করা যায় না। নাইলনের কাপড়ে অল্প গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা যায়।

রঙিন বস্ত্রাদির দাগ উঠাইতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, কারণ, অনেক সময় রঙিন বস্ত্রের রং চটিয়া যায়। অ্যাসিডে রং নষ্ট হইয়া গেলে অনেক ক্ষেত্রেই ঐ রং অ্যামোনিয়ার লঘু দ্রবণের সাহায্যে ফিরাইয়া আনা যায়। ক্লোরিন ব্যবহারে রং নষ্ট হইলে উহা আর ফিরাইয়া আনা যায় না।

বস্ত্রাদি হইতে দাগ উঠাইবার সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে ঃ—

(১) কাপড়খানি কোন্ শ্রেণীর তন্তু দ্বারা নির্মিত তাহা জানা কর্তব্য ; কারণ, অপসারক দ্রব্যাদি বিভিন্ন প্রকার তন্তুর উপর বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে।

(২) কি জাতীয় দাগ তাহাও জানা প্রয়োজন। ভুল অপসারক দ্রব্য ব্যবহারে অনেক সময় দাগ না উঠিয়া একেবারে স্থায়িভাবে বসিয়া যায়।

(৩) দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা উঠাইতে হয়। পুরানো দাগ উঠানো অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য।

(৪) কোনও অজানা দাগে কখনও গরম জল ব্যবহার করিবে না। গরম জলে কোন কোন দাগ স্থায়িভাবে বসিয়া যায়।

(৫) কোনও রঙিন কাপড়ের দাগ উঠাইবার পূর্বে অপসারক দ্রব্যটি ঐ রং নষ্ট করিয়া ফেলে কিনা তাহা দেখা কর্তব্য। কাপড়ের এক প্রান্তে সামান্য একটু অপসারক দ্রব্য লাগাইয়া এই পরীক্ষা করিতে হয়।

(৬) প্রথমে মৃদু অপসারক দ্রব্য ব্যবহার করিবে। দাগ না উঠিলে তবেই উগ্র অপসারক দ্রব্যের সাহায্য লইবে।

(৭) দাগ উঠিয়া গেলে কাপড় হইতে অপসারক দ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে ধুইয়া পরিস্কার করিবে।

(৮) অপসারক দ্রব্য যদি অ্যাসিড হয় তবে দাগ উঠাইবার পর কোন লঘু ক্ষার দ্বারা প্রশমিত করিবে। অনুরূপভাবে কোন ক্ষারযুক্ত অপসারক দ্রব্য লঘু অ্যাসিড দ্বারা প্রশমিত করিতে হয়।

(৯) দাগ উঠাইবার পর তাড়াতাড়ি কাপড়খানি শুকাইয়া লইবে।

দাগের শ্রেণীবিভাগ

(Classification of stains)

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দাগের শ্রেণীবিভাগ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। কোন কোন দাগ, যথা—ঘি, মাখন ইত্যাদি, যেমন চর্বি জাতীয় দাগের শ্রেণীভুক্ত, তেমনি উহারা প্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদের প্রাণিজ দাগ-শ্রেণীভুক্তও করা যাইতে পারে। মোমের

(Paraffin wax) কথাই ধরা যাউক। ইহা পেট্রোলিয়াম হইতে উৎপন্ন এবং বৈজ্ঞানিক মতে **চর্বি জাতীয় পদার্থ নহে**। ইহা প্রাণিজও নয় এবং উদ্ভিজ্জও নয়; প্রকৃত পক্ষে ইহা খনিজ এবং এই শ্রেণীর দাগকে **খনিজ দাগ** বলাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ঘি, মাখন ইত্যাদি চর্বি জাতীয় দাগ যেভাবে উঠান হয়, ঠিক সেই পদ্ধতিতে ইহাও দূরে করা যায় বলিয়া মোমের দাগকে চর্বি জাতীয় দাগ বলা হয়। আবার **'আয়োডিন'**-এর দাগকে অনেকে **ধাতব দাগ** বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিজ্ঞানিগণ ইহাকে অধাতু (non-metal) বলিয়া গণ্য করেন। সুতরাং আয়োডিন জাতীয় দাগ অধাতব দাগ —ইহাই বিজ্ঞানসম্মত।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার দাগগুলিকে ভাগ করিবার একটি পদ্ধতি দেখান হইল:

(১) **উদ্ভিজ্জ দাগ:** ইহারা উদ্ভিদ্‌জগৎ হইতে উৎপন্ন, যথা—

(ক) বিভিন্ন প্রকার পানীয়ের দাগ—চা, কোকো, কফি, মদ ইত্যাদি।

(খ) বিভিন্ন প্রকার ফলের দাগ—আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

(গ) কোন সবুজ পাতার দাগ—ঘাসের দাগ, পাতার দাগ ইত্যাদি।

(২) **প্রাণিজ দাগ:** ইহারা প্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন; যথা—রক্ত, কফ, ডিম, ইত্যাদির দাগ।

(৩) **তৈল বা চর্বি জাতীয় দাগ:** যথা—ঘি, মাখন, মোম, বিভিন্ন প্রকার তেল ইত্যাদির দাগ।

(৪) **রাসায়নিক পদার্থের দাগ:** রাসায়নিক দ্রব্যাদি হইতে এই দাগের সৃষ্টি হয়; যথা—সিলভার নাইট্রেট, আয়োডিন বা টিংচার আয়োডিন ইত্যাদির দাগ।

(৫) **রংয়ের দাগ:** যথা—লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রং, নেল পলিশ প্রভৃতির দাগ।

(৬) **বিশেষ ধরনের দাগ:**—যথা—লোহা বা মরিচা, কালি, ঘাম ইত্যাদির দাগ।

বিভিন্ন প্রকার পানীয়ের দাগ উঠাইবার প্রণালী: চা, কফি, কোকো ইত্যাদি পানীয় দ্রব্যে ট্যানিন (tannin) নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে। কাপড়ে এই জাতীয় পানীয়ের দাগ সাধারণত ট্যানিন হইতেই উৎপন্ন হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ট্যানিনের দাগ প্রায় দেখা যায় না বলিলেই হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে উহা বাদামী রং ধারণ করে, বিশেষতঃ সাবান জল দিয়া ঐ দাগ উঠাইবার চেষ্টা করিলে আরও স্থায়িভাবে কাপড়ে বসিয়া যায়। গরম ইস্ত্রির সংস্পর্শেও এই দাগ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা উঠাইতে হয়।

প্রথমে দাগযুক্ত অংশটিকে একটি শুষ্ক কাপড়ের প্যাড-এর উপর টান করিয়া চাপিয়া ধর। অন্য একটি ন্যাকড়া জলে ভিজাইয়া এইবার ধীরে ধীরে ঐ দাগের উপর ঘষিতে থাক। দাগের বাহিরের দিক হইতে বৃত্তাকারে ঘষিতে ঘষিতে উহার কেন্দ্রের দিকে আসিতে হইবে। এইরূপ কয়েকবার ঘষিবার পরও যদি মিলাইয়া না যায় তবে ন্যাকড়াটি একটি সমপরিমাণ অ্যালকোহল ও জলের মিশ্রণে ভিজাইয়া পুনরায় ঐরূপে ঘষিতে থাক। কয়েকবার ঘষিবার পর কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন ঐ জায়গায় ঢালিয়া ভাল করিয়া হাত দিয়া রগড়াইয়া দাও। আধ ঘণ্টা এই অবস্থায় রাখিয়া ভাল করিয়া জল দিয়া ধুইয়া ফেল।

দাগ সম্পূর্ণ না মিলাইলে ফুটন্ত জল দাগের উপর ঢালিবে। বস্ত্রটি রেশম বা পশমের হইলে ফুটন্ত জল না ঢালিয়া ঈষদুষ্ণ জল প্রয়োগ করিবে; অনেক সময় ট্যানিনের দাগ উঠিয়া গিয়া জায়গাটিতে একটি তৈলাক্ত ভাব দেখা দেয়। এক্ষেত্রে একটি ন্যাকড়ায় কার্বন টেট্রাক্লোরাইড মাখাইয়া ঘষিয়া দিলে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবে। **এইভাবে সুতি, রেশম, পশম, রঙিন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইতেই দাগ উঠানো যায়।**

দাগ পুরানো হইলে অনেক সময় ব্লিচিং অপসারকের সাহায্য লইতে হয়। **রেশম ও পশমের বস্ত্রে** ঐ দাগযুক্ত স্থানে একটি ন্যাকড়া হাইড্রোজেন পারক্সাইড-এ ভিজাইয়া কয়েকবার ঘষিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। ইহাতেও দাগ না উঠিলে দাগযুক্ত স্থানটি জলে ভিজাইয়া বোরাক্স পাউডার উত্তমরূপে মাখাইয়া প্রায় এক ঘণ্টা ফেলিয়া রাখ এবং পরে জল দিয়া ধুইয়া ফেল।

রঙিন বস্ত্রে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বদলে শুধু বোরাক্স পাউডার মাখাইয়া এক ঘণ্টা ফেলিয়া রাখ। ইহাতেই দাগ মিলাইয়া যাইবে। দাগ উঠিয়া গেলে জলে ধুইয়া শুকাইয়া লও।

সুতি, লিনেন, রেয়ন ইত্যাদি কাপড়ের পুরানো দাগঃ জাভেলী অপসারকের (Javelle water) মধ্যে এক মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে কাপড়খানি কিছুক্ষণ সোডিয়াম থায়োসালফেট বা 'হাইপোর' দ্রবণে রাখিলেই দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবে। দাগ উঠাইবার পর কাপড়খানি ভাল করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে।

জাভেলী অপসারক কখনও রেশম, পশম বা রঙিন কাপড়ে ব্যবহার করিবে না। কারণ, ইহাতে ক্লোরিন থাকে এবং ক্লোরিন ঐ জাতীয় কাপড় নষ্ট করিয়া ফেলে।

জাভেলী অপসারক প্রস্তুতিঃ প্রায় আধ সের ঠাণ্ডা জলে এক পোয়া কাপড়কাচা সোডা গুলিয়া উহাতে আধ পোয়া ব্লিচিং পাউডার ধীরে ধীরে নাড়িয়া মিশাইয়া লও। দ্রবণটিকে একটি পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া একটি আঁট ছিপিযুক্ত বোতলে ভরিয়া রাখ।

সোডিয়াম থায়োসালফেট বা হাইপো দ্রবণ প্রস্তুতি—প্রায় এক পো জলে চা চামচের দুই চামচ ভিনিগার মিশ্রিত করিয়া উহাতে অর্ধ চামচ সোডিয়াম থাযোসালফেট বা 'হাইপো' দ্রবীভুত করিলেই এই দ্রবণ প্রস্তুত হইবে।

বিভিন্ন প্রকার ফলের দাগ উঠাইবার প্রণালীঃ ফলের রসের দাগ টাটকা থাকিতেই উঠাইতে হয়। অধিকাংশ ফলের দাগ ফুটন্ত জলেই উঠিয়া যায়। **কাপড়খানি সুতি বা লিনেনের হইলে** একটি গামলার মুখে উহা আঁট করিয়া পাতিয়া উপর হইতে ঐ দাগের উপর ফুটন্ত জল ঢালিতে থাক; দাগ ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইবে। **পশম বা রেশমের বস্ত্রে** ফুটন্ত জলের পরিবর্তে ঈষদুষ্ণ জল প্রয়োগ করিতে হয়। ফলের দাগ উঠাইতে সাবান ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ কোন কোন ফলের দাগ, যথা—জাম ফলের দাগ সাবান ব্যবহারের ফলে স্থায়ী দাগে পরিণত হয়। আঙুর, কমলালেবু বা সাইট্রাস ফলের (Citrus fruits) দাগ গরম সাবানজল ব্যবহারে অনায়াসেই উঠিয়া যায়। যে সকল ফলের দাগ গরম বা ফুটন্ত জলে উঠে না, তাহা ঠাণ্ডা জলে ভাল করিয়া ধুইয়া গ্লিসারিন বা soapless shampoo ভাল করিয়া মাখাইয়া উত্তমরূপে রগড়াইতে হয়। কয়েক ঘণ্টা এই অবস্থায় রাখিয়া কয়েক ফোঁটা ভিনিগার বা অক্সালিক অ্যাসিড মাখাইয়া দুই-এক মিনিট পরে ঠাণ্ডা জলে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিলেই উঠিয়া যায়। **সাদা,**

রঙিন, পশম, সূতি ইত্যাদি যে কোন প্রকার কাপড় হইতেই এইভাবে ফলের দাগ উঠানো যায়।

দাগ পুরানো হইলে ব্লিচিং অপসারক ব্যবহার করিতে হয়। পূর্ব বর্ণিত উপায়ে রেশম এবং পশমের বস্ত্রে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ও বোরাক্স ব্যবহার করিয়া এবং রঙিন বস্ত্রে শুধু বোরাক্স ব্যবহার করিয়াই দাগ উঠাইতে পারা যায়। সূতি, লিনেন ও রেয়নের কাপড়ে ঐ একই উপায়ে জাভেলী অপসারক প্রয়োগ করিতে হয়। ফলের দাগ উঠাইবার জন্য সোডিয়াম হাইড্রো সালফাইট-এর দ্রবণও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এক-পোয়া ঈষৎ গরম জলে চা-চামচের দুই-চামচ হাইড্রো সালফাইট গুলিয়া এই দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। অনেক সময় ফলের রসে রঙিন কাপড়ের রং চটিয়া যায়। সেইক্ষেত্রে ঐ রং চটা অংশটি অ্যামোনিয়ার একটি বোতলের খোলা মুখে ধরিলে রং ফিরিয়া আসে। অ্যামোনিয়ার পরিবর্তে ঐ অংশে খাইবার সোডার একটি লঘু দ্রবণ লাগাইলেও ঐ রং ফিরিয়া আসিবে।

ঘাস বা সবুজ পাতার দাগ উঠাইবার প্রণালী ঃ যদি কাপড়খানি সূতি বা লিনেনের হয় তবে ঐ দাগটি সাবান এবং গরম জলে ধুইয়া ফেলিলেই উঠিয়া যাইবে। পুরানো দাগ সাবান জলে না উঠিলে ব্লিচিং অপসারক ব্যবহার করিবে। দাগটি প্রথমে জাভেলী দ্রবণে ও পরে 'হাইপো'র দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। ইহাতেই **সূতি, লিনেন এবং রেয়নের কাপড় হইতে দাগ মিলাইয়া যাইবে।**

রঙিন কাপড়ের দাগ প্রথমে গরম জল এবং সিনথেটিক ডিটারজেন্ট বা লাক্স পাউডারএর সাহায্যে উঠাইতে চেষ্টা করিবে। দাগ না উঠিলে বোরাক্স পাউডার মাখাইয়া কিছুক্ষণ ফেলিয়া রাখ এবং পরে জল দিয়া ধুইয়া ফেল অথবা বোরাক্স পাউডার একটু গরম জলে গুলিয়া উহাতে কাপড়খানি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ।

রেশম এবং পশমের কাপড়ে গরম জল ব্যবহার করা চলিবে না। সিনথেটিক ডিটারজেন্ট বা লাক্স পাউডার এবং ঈষদুষ্ণ জলে প্রথমে দাগটি ধুইয়া ফেল। ইহাতে দাগ না উঠিলে প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং শেষে বোরাক্স পাউডার ব্যবহার করিবে।

রক্তের দাগ উঠাইবার প্রণালী ঃ দাগযুক্ত কাপড়খানি কয়েকবার ঠাণ্ডা বা ঈষৎ গরম জলে ভাল করিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া দাও। কখনও অত্যধিক গরম বা ফুটন্ত জল ব্যবহার করিবে না। টাটকা দাগ হইলে ইহাতেই উঠিয়া যাইবে। দাগটি পুরানো হইলে অ্যামোনিয়ার লঘু দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। প্রায় পাঁচ সের জলে বড় চামচের দুই চামচ অ্যামোনিয়া মিশাইয়া এই লঘু দ্রবণ প্রস্তুত করিতে হয়। অ্যামোনিয়ার দ্রবণের পরিবর্তে প্রায় পাঁচ সের জলে দুই কাপ লবণ গুলিয়া ঐ জলেও কাপড়খানি ভিজাইতে পার। ইহাতে দাগটি আলগা ও নরম হইয়া আসিবে। এখন সাবান এবং ঈষৎ গরম জলে কাচিয়া দিলেই দাগটি সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবে। খুব পুরানো দাগ উঠাইতে অনেক সময় ব্লিচিং অপসারকের সাহায্য লইতে হয়। একটি ন্যাকড়া হাইড্রোজেন পারক্সাইডে ভিজাইয়া ঐ দাগের উপর বৃত্তাকারে ঘষিয়া দাও। ইহাতেও দাগটি সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে উহাতে কিছু বোরাক্স পাউডার মাখাইয়া কিছুক্ষণ ফেলিয়া রাখ এবং পরে জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া ফেল। **রঙিন কাপড়ে**

পারক্সাইডের পরিবর্তে বোরাক্স ব্যবহার করিবে। এইরূপে **সুতি, লিনেন, রেশম, পশম, সাদা, রঙিন যে কোন কাপড়ের দাগ উঠাইতে পারা যায়।**

কম্বল ইত্যাদি জলে ধোওয়া ঠিক নয়। উহাতে রক্তের দাগ লাগিলে স্টার্চ এবং ঠাণ্ডা জলের একটি মলম প্রস্তুত করিয়া ঐ জায়গায় লাগাইতে হয়। মলমটি শুকাইয়া আসিলে ধীরে ধীরে একটি ব্রাশ দ্বারা ঐ মলম পরিষ্কার করিতে হয়। এইভাবে কয়েকবার মলমটি লাগাইলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

তৈল বা চর্বি জাতীয় দাগ ধুইবার প্রণালী ঃ সুতি এবং লিনেনের কাপড় হইলে দাগটি সাবান এবং গরম জল দিয়া ঘষিয়া দিলেই উঠিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন শোষক দ্রব্যের (absorbents) সাহায্যেও এই জাতীয় দাগ উঠানো যাইতে পারে। দাগের উপর চকের গুঁড়া, টেলকম পাউডার বা স্টার্চ ছড়াইয়া দাও। তৈল জাতীয় দ্রব্যটি ঐ পাউডারে শোষিত হইলে একটি ব্রাশ দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ফেল। এইভাবে কয়েকবার পাউডার ব্যবহার করিলেই দাগটি প্রায় মিলাইয়া আসিবে। আবার ঐ দাগটি ব্লটিং পেপারের মধ্যে রাখিয়া একটি গরম ইস্ত্রি চাপিয়া ধরিলেও ঐ তৈল জাতীয় পদার্থ ঐ ব্লটিং পেপারে চলিয়া আসিবে এবং দাগটি মিলাইয়া যাইবে। অ্যাসিটেট রেয়নে গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিবে না। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, পেট্রল এবং বেন্‌জিন দ্বারাও তৈল জাতীয় দাগ অনায়াসেই উঠানো যায়। দাগযুক্ত স্থানটি একটি পরিষ্কার ন্যাকড়ার প্যাডের উপর রাখিয়া আর একটি ন্যাকড়া উক্ত তরলে ভিজাইয়া ধীরে ধীরে বৃত্তাকারে ঐ দাগের উপর ঘষিলেই দাগটি মিলাইয়া যাইবে। দাগটি তরলে ভিজাইয়া রাখিলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া যায়। চকের গুঁড়া, গরম ইস্ত্রি ইত্যাদির সাহায্যে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে অবশিষ্ট দাগটুকু এই প্রকার তরলের দ্বারাই উঠাইতে হয়। **রেশম, পশম, সুতি, লিনেন, সাদা, রঙিন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইতেই দাগ উঠাইতে পারা যায়।**

আয়োডিন-এর দাগ উঠাইবার প্রণালী ঃ সুতি এবং লিনেনের কাপড়ে আয়োডিনের দাগ লাগিলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে সাবান জল দিয়াই উঠাইতে পারা যায়। দাগ পুরানো হইলে বা রেশম এবং পশমের কাপড়ে লাগিলে একটি ন্যাকড়া অ্যালকোহলে ভিজাইয়া ঐ দাগের চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘষিয়া উহার কেন্দ্রের দিকে আসিতে হয়। অ্যাসিটেট রেয়ন এবং রঙিন কাপড়ে অ্যালকোহলের লঘু দ্রবণ (একভাগ অ্যালকোহল দুইভাগ জল) ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে উহা একটি হাইপোর দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলেই সম্পূর্ণ উঠিয়া যাইবে।

বিভিন্ন প্রকার রংয়ের দাগ উঠাইবার প্রণালী ঃ—অধিকাংশ রংয়ের দাগই ঠাণ্ডা বা ঈষৎ গরম জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে উঠিয়া যায়। সুতি এবং লিনেনের কাপড়ে সাবান জলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে ব্লিচিং অপসারকের সাহায্য লইতে হয়। প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং পরে বোরাক্স ব্যবহার করিয়া দেখিবে। ইহাতে না উঠিলে জাভেলী দ্রবণ এবং 'হাইপো' ব্যবহার করিবে। রেশম, পশম ও রঙিন কাপড়ে জাভেলী দ্রবণ ব্যবহার করা যায় না।

নেল পালিশ (Nail Polish) উঠাইবার প্রণালী ঃ একটি ন্যাকড়ায় অ্যাসিটোন মাখাইয়া ঐ দাগটি ধীরে ধীরে বৃত্তাকার ঘষিতে থাক। দেখিবে দাগটি মিলাইয়া

যাইতেছে। অ্যাসিটেট রেয়ন এবং ভিনিয়নের কাপড়ে অ্যাসিটোন ব্যবহার করা চলিবে না। নিম্নলিখিত উপায়ে যে-কোন কাপড় হইতে দাগ অপসারিত করিতে পারা যাইবে।

দাগটিকে একটি কাপড়ের প্যাডের উপর টান করিয়া ধরিয়া প্রথমে কয়েক ফোঁটা কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বা পেট্রল এবং পরে কয়েক ফোঁটা অ্যামাইল অ্যাসিটেট দিয়া ভিজাইয়া একটি ন্যাকড়ার সাহায্যে ধীরে ধীরে ঘষিয়া দিলেই উহা সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবে।

লোহা বা মরিচার দাগ উঠাইবার প্রণালী : একটি ফুটন্ত জলের পাত্রের মুখে দাগ সমেত কাপড়খানি আঁট করিয়া পাতিয়া লও। একটি কাগজি লেবুর রস নিংড়াইয়া ঐ দাগের উপর দাও এবং কিছুক্ষণ পরে জলে ধুইয়া ফেল। এইভাবে কয়েকবার লেবুর রস দিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। এইভাবে দাগ উঠাইতে সময় বেশী লাগিলেও কাপড়ের কোন ক্ষতি হয় না। দাগ পুরানো হইলে উহাতে কিছু লবণ ও লেবুর রস মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লও। দাগ উঠিয়া গেলে ভাল করিয়া জল দিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লও। ইহাতেও দাগ না উঠিলে এক-পোয়া জলে তিন চামচ অক্সালিক অ্যাসিড গুলিয়া গরম করিয়া লও এবং ঐ গরম দ্রবণে দাগটি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। দাগ উঠিয়া গেলে কাপড়খানি ভাল করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লও। রঙিন কাপড়ের রং চটিয়া গেলে উহাতে অ্যামোনিয়া বা খাইবার সোডার লঘু দ্রবণ লাগাইলেই রং ফিরিয়া আসিবে।

এইরূপে রেশম, পশম, সাদা, রঙিন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইতে দাগ উঠানো যায়।

ঘর্মের দাগ উঠাইবার প্রণালী : অনেক সময় ঘামে জামা-কাপড়ে এক প্রকার দাগ পড়ে। দাগটি সঙ্গে সঙ্গে সাবান মাখিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে মেলিয়া রাখিয়া ভাল করিয়া সাবান দিয়া কাচিয়া দিলেই উঠিয়া যায়। পুরানো দাগ এইভাবে সম্পূর্ণ উঠিবে না। সে ক্ষেত্রে বোরাক্স পাউডার ঐ আর্দ্র দাগের উপর ছড়াইয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায়। বোরাক্সের পরিবর্তে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের লঘু দ্রবণেও দাগটি ভিজাইয়া রাখিলে উহা উঠিয়া যাইবে। **এইভাবে রেশম, পশম ইত্যাদি যে কোন কাপড় হইতে দাগ উঠানো যায়।** সুতি এবং লিনেনের দাগ সোডিয়াম হাইড্রো সালফাইটের দ্রবণে ভিজাইয়াও উঠাইতে পারা যায়।

অনেক সময় **রঙিন জামা-কাপড়ে** ঘামের দাগ লাগিয়া রং উঠিয়া যায়। এক্ষেত্রে ঐ দাগটি জলে ভিজাইয়া অ্যামোনিয়ার বোতলের খোলা মুখের কাছে ধরিলেই রং ফিরিয়া আসিবে। দাগ পুরানো হইলে অ্যামোনিয়ার পরিবর্তে একটু ভিনিগার লাগাইতে হয়।

কালির দাগ উঠাইবার প্রণালী : বিভিন্ন কালির উপাদান বিভিন্ন। সুতরাং একই প্রণালীতে সকল প্রকার দাগ দূর করা সম্ভব নয়, অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক প্রণালীর সাহায্য লইতে হয়।

ইনডিয়া বা ড্রইং কালি (India or Drawing ink) : দাগসমেত কাপড়খানি একটি ন্যাকড়ার প্যাডের উপর টান করিয়া ধরিয়া উহার উপর কয়েক ফোঁটা কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বা বেনজিন দাও। একটি ন্যাকড়ার সাহায্যে দাগটি বৃত্তাকারে ঘষিয়া উহার কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হও। কয়েকবার এইভাবে ঘষিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। পুরানো দাগ এইভাবে সম্পূর্ণ না উঠিলে উহা সিনথেটিক ডিটারজেন্ট ও জল দিয়া

রগড়াইয়া ধুইয়া ফেলিলেই উঠিয়া যাইবে। **এইরূপে রেশম, পশম, রঙিন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড়ের দাগ উঠানো যায়।** সূতি এবং লিনেনের কাপড়ের দাগ গাঢ় সাবান জল এবং অ্যামোনিয়ার দ্রবণে রগড়াইয়া দিলেও মিলাইয়া যায়।

ছাপার কালি (Printing ink) **:** দাগসমেত কাপড়খানি তার্পিন তেলে (Oil of turpentine) কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। পরে কাপড়খানি নিংড়াইয়া দাগটি কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেনজিন বা পেট্রল-এর ন্যাকড়ায় ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া দাও। **এইরূপে সকল প্রকার কাপড়ের কালির দাগ উঠানো যায়।**

চটের থলে হইতে দাগ উঠাইতে হইলে থলেটি কেরোসিন তেলের মধ্যে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সাবান জলে কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়।

লিখিবার কালি (Writing ink) **:** কালি কাপড়ে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একটি ব্লটিং পেপারে উহা যথাসম্ভব শুষিয়া লইতে হয়। পরে চকের গুঁড়া, টেলকম পাউডার বা স্টার্চ পাউডার কয়েকবার ঐ দাগে লাগাইয়া একটি ব্রাশ দ্বারা ঝাড়িয়া ফেলিলেই কালি উঠিয়া যাইবে। দাগ একেবারে মিলাইয়া না গেলে উহাতে অ্যালকোহলের একটি মলম লাগাইতে হইবে। একভাগ জল এবং একভাগ অ্যালকোহলের মিশ্রণে চকের গুঁড়া বা টেলকম পাউডার মিশাইয়া একটি মলম প্রস্তুত কর। এই মলম দাগের উপর লাগাইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর এবং শুকাইয়া গেলে ব্রাশ দিয়া পরিষ্কার করিয়া দাও। এইভাবে কয়েকবার মলম লাগাইয়া ঝাড়িয়া ফেলিলেই দাগ মিলাইয়া যাইবে। **এই প্রণালীতে সকল প্রকার কাপড় হইতে দাগ উঠানো যায়।**

সূতি এবং লিনেনের কাপড়ের দাগ গ্লিসারিন লাগাইয়া সাবান জলে রগড়াইলেও উঠিয়া যায়।

কোন কোন কালির দাগ উঠাইতে অক্সালিক অ্যাসিড ব্যবহার করিতে হয়। এক পোয়া ফুটন্ত জলে তিন চামচ অক্সালিক অ্যাসিড গুলিয়া উহাতে দাগটি ভিজাইয়া রাখিতে হয়। দাগ উঠিয়া গেলে ভাল করিয়া জল দিয়া ধুইয়া অ্যামোনিয়ার দ্রবণে প্রশমিত করিতে হয়। **এইরূপে রেশম, পশম, রঙিন বস্ত্রাদি হইতে কালির দাগ উঠাইতে পারা যায়।**

সূতি, লিনেন এবং রেয়নে কালির দাগ খুব দৃঢ়ভাবে বসিয়া গেলে জাভেলীর দ্রবণ ব্যবহার করিলেই উঠিয়া যাইবে। রঙিন সূতির দ্বারা বস্ত্রাদিতে এই দ্রবণ ব্যবহার করা চলিবে না। উহা অক্সালিক অ্যাসিডের সাহায্যেই উঠাইতে হয়।

রঙিন কাপড়ের দাগ উঠাইতে কয়েকটি সাবধানতা : তোমরা বিভিন্ন প্রকার কাপড় হইতে বিভিন্ন প্রকারের দাগ কি ভাবে উঠাইতে হয় পড়িলে। ইহাদের মধ্যে রঙিন কাপড় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। কারণ দাগের সঙ্গে সঙ্গে অপসারক দ্রব্যসমূহ অনেক সময়ই কাপড়ের রং নষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং কি কি অপসারক দ্রব্যাদি কাপড়ের রং নষ্ট করিতে পারে তাহা জানিলে তোমরা সহজেই সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিবে।

সাধারণতঃ উগ্র-ক্ষারীয় দ্রব্যের সংস্পর্শে রঙিন কাপড়ের রং চটিয়া যায়। তাই ক্ষারযুক্ত সাবান, সোডা ইত্যাদি ব্যবহার করিবার পূর্বে রঙিন কাপড়ের এক প্রান্তে ঐ

সাবান বা সোডা ঘষিয়া দেখিবে যে রং উঠিয়া যাইতেছে কিনা। মৃদু সিনথেটিক আজকাল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় এবং এই সকল ডিটারজেণ্ট নির্ভয়ে রঙিন কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিভিন্ন শোষক দ্রব্যাদি, যথা—চকের গুঁড়া, টেলকম পাউডার, স্টার্চ ইত্যাদি রংয়ের কোন ক্ষতি করে না। সুতরাং সম্ভব হইলে ইহাদের সাহায্যে দাগ তুলিতে চেষ্টা করিবে। অপসারক তরল দ্রব্যের মধ্যে অ্যালকোহল, ইথার এবং অ্যাসিটোন ব্যবহারে কাপড়ের রং নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং রঙিন কাপড়ের দাগ উঠাইতে এই সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার না করাই ভাল। একভাগ অ্যালকোহল এবং দুইভাগ জল একত্রে ব্যবহার করিলে রং নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। পেট্রল, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেনজিন, তার্পিন তেল ইত্যাদিতে রং নষ্ট হয় না। সুতরাং রঙিন কাপড়ের দাগ উঠাইতে এই সকল অপসারক তরল ব্যবহার করা যাইতে পারে। দাগ উঠাইতে অনেক সময় বিভিন্ন অ্যাসিড ব্যবহার করা হইয়া থাকে। মৃদু অ্যাসিড সাধারণতঃ রঙিন কাপড়ের কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু বেশীক্ষণ ঐ অ্যাসিডের সংস্পর্শে থাকিলে রং নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। লেবুর রস, ভিনিগার বা অ্যাসেটিক অ্যাসিড ইত্যাদিতে রং চটিয়া গেলে কাপড়ের ঐ স্থানটি অ্যামোনিয়ার একটি খোলা বোতলের মুখের উপর ধরিলেই রং পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। লঘু বা মৃদু ক্ষার অল্প সময়ের মধ্যে রঙিন কাপড়ের কোন ক্ষতি করে না। যদি রং উঠিয়া যায় তাহা হইলে ঐ জায়গায় একটু ভিনিগার লাগাইয়া দিলেই রং অনেক সময় ফিরিয়া আসে। বিভিন্ন ব্লিচিং অপসারকের মধ্যে জাভেলী অপসারক ক্ষতিকারক। ইহা ব্যবহারে রং স্থায়িভাবে উঠিয়া যায়। রঙিন কাপড়ের পক্ষে বোরাক্সই সর্বাপেক্ষা বেশী নিরাপদ। ইহাতে রং চটিয়া যাইবার কোন আশঙ্কা নাই। হাইড্রোজেন পারক্সাইডের লঘু দ্রবণও অল্প সময়ের জন্য রঙিন কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অপসারক দ্রব্যাদি ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা—ইহা ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখিও কাছাকাছি যেন কোনও অগ্নিশিখা না থাকে। ইহা সহজেই গ্যাস হইয়া যায়। তরল এবং গ্যাসীয় ইথার সহজেই জ্বলিয়া ওঠে। পেট্রল, বেনজিন, তার্পিন তেল, অ্যালকোহল, অ্যাসিটোন আগুনের সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে। সুতরাং খুব সতর্কতার সহিত এই সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবে। বিভিন্ন অ্যাসিডের মধ্যে অক্সালিক অ্যাসিড বিষাক্ত এবং ইহা হাতে ধরিলে তৎক্ষণাৎ হাত ধুইয়া ফেলিবে।

বিভিন্ন প্রকার দাগ উঠাইবার জন্য যে যে দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহা নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হইল ঃ

দাগ	দাগের অবস্থা	সূতি ও লিনেনের সাদা বস্ত্র	সূতি ও লিনেনের রঙিন বস্ত্র	রেশম ও পশম (সাদা ও রঙিন)	রেয়ন, নাইলন, ডেক্রন ইত্যাদি
পানীয়ের দাগ (চা, কফি, কোকো ইত্যাদি)	নূতন	(১) জল (২) জল ও অ্যালকোহলের মিশ্রণ (৩) গ্লিসারিন (৪) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড	(১) সাদা বস্ত্রের অনুরূপ	(১) সাদা বস্ত্রের অনুরূপ	সাদা বস্ত্রের অনুরূপ
	পুরাতন	(১) জাভেলী অপসারক ও 'হাইপো'	(১) বোরাক্স পাউডার	(১) হাইড্রোজেন পারক্সাইড ও বোরাক্স পাউডার (রঙিন বস্ত্রে)	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
বিভিন্ন প্রকার ফল, মদ (wine), ডাবের জল ইত্যাদির দাগ	নূতন	(১) ফুটন্ত জল (২) গরম সাবান জল (জাম ফলের দাগে সাবান ব্যবহার করিবে না। (৩) গ্লিসারিন এবং ভিনিগার বা অক্সালিক অ্যাসিড	(১) গরম জল (২) গ্লিসারিন এবং ভিনিগার বা অক্সালিক অ্যাসিড	(১) ঈষদুষ্ণ জল (২) গ্লিসারিন এবং ভিনিগার বা অক্সালিক অ্যাসিড	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ

দাগ	দাগের অবস্থা	সূতি ও লিনেনের সাদা বস্ত্র	সূতি ও লিনেনের রঙিন বস্ত্র	রেশম ও পশম (সাদা এবং রঙিন)	রেয়ন, নাইলন, ডেক্রন ইত্যাদি
	পুরাতন	(১) জাভেলী অপসারক (২) সোডিয়াম হাইড্রো-সালফাইট	(১) বোরাক্স পাউডার	(১) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ও বোরাক্স পাউডার (সাদা বস্ত্রে) (২) বোরাক্স পাউডার (রঙিন বস্ত্রে)	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
ঘাস বা সবুজ পাতার দাগ	নূতন	(১) সাবান ও গরম জল	(১) গরম জল ও সিনেথ-টিক ডিটারজেণ্ট বা লাক্স পাউডার	(১) ঈষদুষ্ণ জল ও সিনথেটিক ডিটারজেণ্ট	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
	পুরাতন	(১) জাভেলী অপসারক ও 'হাইপো'	(১) বোরাক্স পাউডার	(১) হাইড্রোজের পার-অক্সাইড (সাদা বস্ত্রে) ও বোরাক্স	
রক্তের দাগ	নূতন	(১) ঠাণ্ডা জল	(১) ঠাণ্ডা জল	(১) ঠাণ্ডা জল	(১) ঠাণ্ডা জল
	পুরাতন	(১) অ্যামোনিয়ার দ্রবণ বা লবণ জল (২) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড (৩) বোরাক্স পাউডার	(১) লবণ জল (২) বোরাক্স পাউডার	(১) লবণ জল (২) বোরাক্স পাউডার (যে সকল বস্ত্র জলে ধুইলে নষ্ট হইয়া যায় তাহাতে স্টার্চের মলম লাগাইতে হয়)	(১) রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ

দাগ	দাগের অবস্থা	সূতি ও লিনেনের সাদা বস্ত্র	সূতির ও লিনেনের রঙিন বস্ত্র	রেশম ও পশম (সাদা ও রঙিন)	রেয়ন, নাইলন, ডেক্রন ইত্যাদি
তৈল বা চর্বি জাতীয় দাগ	নূতন	(১) গরম সাবান জল (২) চকের গুঁড়া, টেলকম পাউডার বা স্টার্চ	সাদা বস্ত্রের অনুরূপ	(১) চকের গুঁড়া, টেলকম পাউডার, বা স্টার্চ (২) নিউট্রাল ডিটারজেণ্ট	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
	পুরাতন	(১) ব্লটিং পেপার ও গরম ইস্ত্রি (২) কার্বন টেট্রাক্লো-রাইড, পেট্রল, বেনজিন	সাদা বস্ত্রের অনুরূপ	সূতি ও লিনেনের অনুরূপ	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
আয়োডিনের দাগ	নূতন	(১) সাবান জল	(১) সাবান জল	(১) অ্যালকোহল	(১) অ্যালকোহলের লঘু দ্রবণ
	পুরাতন	(১) 'হাইপো'র দ্রবণ	(১) 'হাইপো'র দ্রবণ	(১) 'হাইপো'র	(১) 'হাইপো'র দ্রবণ
রংয়ের দাগ	নূতন	(১) সাবান জল	(১) সাবান জল	(১) ঈষৎ গরম জল ও নিউট্রাল ডিটারজেণ্ট	(১) রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
	পুরাতন	(১) জাভেলী দ্রবণ	(১) বোরাক্স পাউডার	(১) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড (২) বোরাক্স পাউডার	(১) রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ

দাগ	দাগের অবস্থা	সূতি ও লিনেনের সাদা বস্ত্র	সূতি ও লিনেনের রঙিন বস্ত্র	রেশম ও পশম (সাদা ও রঙিন)	রেয়ন, নাইলন ডেক্রন ইত্যাদি
নেল পালিশ	নূতন ও পুরাতন	(১) অ্যাসিটোন	অ্যাসিটোন	অ্যাসিটোন	অ্যাসিটোন, (অ্যাসিটেট রেয়ন ও ভিনিয়নের কাপড়ে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ও অ্যামাইল অ্যাসিটেট ব্যবহার করিতে হয়)।
লোহার দাগ	নূতন পুরাতন	(১) কাগজি লেবুর রস (১) লবণ ও কাগজি লেবুর রস (২) অক্সালিক অ্যাসিড	(১) কাগজি লেবুর রস (১) লবণ ও কাগজি লেবুর রস (২) অক্সালিক অ্যাসিড	(১) কাগজি লেবুর রস (১) লবণ ও কাগজি লেবুর রস (২) অক্সালিক অ্যাসিড	(১) কাগজি লেবুর রস (১) লবণ ও কাগজি লেবুর রস (২) অক্সালিক অ্যাসিড
ঘামের দাগ	নূতন পুরাতন	(১) সাবান ও রৌদ্র (১) বোরাক্স পাউডার (২) হাইড্রোজেন পারক্সাইড (৩) জাভেলী দ্রবণ	(১) প্রথমে অ্যামোনিয়ার লঘু দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া পরপর লঘু হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং সোডিয়াম হাইপো-সালফাইট-এর দ্রবণে ভিজাইতে হইবে (নূতন ও পুরাতন) (২) বোরাক্স পাউডার ও রৌদ্র	সূতি ও লিনেনের রঙিন বস্ত্রের অনুরূপ	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ

দাগ	দাগের অবস্থা	সূতি ও লিনেনের সাদা বস্ত্র	সূতি ও লিনেনের রঙিন বস্ত্র	রেশম ও পশম (সাদা ও রঙিন)	রেয়ন, নাইলন ডেক্রন ইত্যাদি
ইন্ডিয়া বা ড্রইং কালি	নূতন	(১) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বা বেন্‌জিন	(১) সাদা বস্ত্রের অনুরূপ	(১) সূতি ও লিনেনের বস্ত্রের অনুরূপ	(১) রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
	পুরাতন	(১) গাঢ় সাবান জল ও অ্যামোনিয়া	(১) গাঢ় সাবান জল ও অ্যামোনিয়া	(১) ঈষদুষ্ণ গরম জলে সিন্‌থেটিক ডিটারজেন্ট	(১) রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
ছাপার কালি	নূতন ও পুরাতন	প্রথমে তার্পিন তেলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া পরে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেন্‌জিন বা পেট্রল প্রয়োগ করিতে হয়।	সাদা বস্ত্রের অনুরূপ	সূতি ও লিনেনের বস্ত্রের অনুরূপ	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
লিখিবার কালি, (লাল, নীল, কাল, সবুজ ইত্যাদি)	নূতন	(১) ব্লটিং পেপার (২) চকের গুঁড়া, টেলকম পাউডার বা স্টার্চ (৩) অ্যালকোহল ও টেলকম পাউডারের মলম	সাদা বস্ত্রের অনুরূপ	সূতি ও লিনেনের বস্ত্রের অনুরূপ	রেশম ও পশম বস্ত্রের অনুরূপ
	পুরাতন	(১) জাভেলী দ্রবণ	(১) অক্সালিক অ্যাসিড (২) ব্লিচিং পাউডারের লঘু দ্রবণ	(১) অক্সালিক অ্যাসিড (২) হাইড্রোজেন পারক্সাইড	(১) অক্সালিক অ্যাসিড (২) হাইড্রোজেন পারক্সাইড

N. B. কখনও কখনও হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বদলে সোডিয়াম পারবোরেটের জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সোডিয়াম পারবোরেট জলের সংস্পর্শে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে। সুতরাং ইহা হাইড্রোজেন পারক্সাইড উগ্রতর অপসারক।

E. গৃহ-শুশ্রূষাকারিণীরূপে গৃহ-পরিচালিকা
(Home maker as a Home Nurse)

I. উত্তম শুশ্রূষাকারিণীর গুণাবলী
(Qualification of a good nurse)

মানুষ মাত্রই উত্তম সেবক কিংবা সেবিকা হইতে পারে না। উত্তম শুশ্রূষাকারিণী হইতে হইলে কতকগুলি সহজাত গুণের অধিকারী হইতে হয়, আবার কতকগুলি গুণ তাহাকে অর্জন করিতে হয়। **ধৈর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, সেবার ইচ্ছা** এবং **স্বাভাবিক প্রফুল্লতা** তাহার সহজাত গুণের অন্তর্গত।

১। ধৈর্য হইল শুশ্রূষাকারিণীর প্রথম ও প্রধান গুণ। অসুস্থ অবস্থায় সাধারণতঃ মানুষের মেজাজ রুক্ষ হইয়া পড়ে। রুগ্ন ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ এবং শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্য সুস্থ ব্যক্তির সেবকদের চেয়ে কঠিন।

২। কষ্টসহিষ্ণুতা ও সেবার ইচ্ছা শুশ্রূষাকারিণীর অন্যতম গুণ। প্রয়োজন হইলে রাত জাগিতে এবং অক্ষম রোগীর নোংরা কাজগুলি করিতে তিনি যদি অনিচ্ছুক হন তবে তাহার পক্ষে রোগীর সেবা করা সম্ভব নয়।

৩। শুশ্রূষাকারিণীর মেজাজ হইবে শান্ত অথচ প্রফুল্ল। দীর্ঘদিন রোগ-ভোগের ফলে রোগীর মন প্রায়ই বিমর্ষ থাকে। শুশ্রূষাকারিণী আপনার চিত্তের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা দিয়া রোগি-চিত্ত সতেজ ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিবেন। এইজন্য শুশ্রূষাকারিণী রোগীর সঙ্গে একটু গল্পগুজব করিয়া কাটাইবেন, অবসর সময়ে বই পড়িয়া শোনাইবেন।

উপরোক্ত সহজাত গুণগুলি ব্যতীত একজন শুশ্রূষাকারিণীর কতকগুলি অর্জিত গুণও থাকা চাই, যেমন—

১। **বিশ্বস্ততা ও নির্ভুলতা :** এই দুইটির মধ্যে বিশ্বস্ততা অধিক বাঞ্ছনীয়। চিকিৎসকের সমস্ত নির্দেশ তিনি নিখুঁতভাবে পালন করিবেন। তাহার মৌখিক কিংবা লিখিত রিপোর্টের মধ্যে অসত্যের ছায়া পর্যন্ত থাকিবে না এবং অতি সামান্য কাজও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পন্ন করিবেন। শুশ্রূষাকারিণীর কোন কাজে ভুল হইতে পারে এবং ভুল সর্বদা সংশোধন করা যায়। কিন্তু নিজের ত্রুটি ঢাকিবার জন্য তিনি যদি অসত্য বলেন তবে তাহা ক্ষমার অযোগ্য।

২। **বাধ্যতা :** চিকিৎসকের প্রতি আনুগত্য শুশ্রূষাকারিণীর অপর গুণ। তিনি তাহার কাজে কিংবা কথায় এমন কোন ব্যবহার দেখাইবেন না যাহাতে চিকিৎসক, বাড়ির লোকেরা এবং বিশেষতঃ রোগী তাহার প্রতি আস্থা হারায়।

৩। **সহানুভূতি :** রোগীর সহিত ব্যবহারে শুশ্রূষাকারিণীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইবে কিন্তু সেই সঙ্গে দৃঢ়তা থাকাও বাঞ্ছনীয়। অবশ্য তিনি রোগীর সঙ্গে কঠোর ব্যবহার প্রকাশ করিবেন না কিংবা তাহার ব্যবহারে ক্রোধ প্রকাশ পাইবে না। সহ্যের সীমা অতিক্রম করিলেও তিনি স্থিরভাবে তাহার কর্তব্য সমাধা করিবেন এবং কল্পনায় নিজেকে সর্বদা রোগীর আসনে বসাইতে চেষ্টা করিবেন।

শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্য

মানুষমাত্রেরই একদিকে যেমন সামাজিক কর্তব্য থাকে তেমনি নিজের প্রতিও তাহার কতকগুলি কর্তব্য থাকিয়া যায়। শুশ্রূষাকারিণীর বেলাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। তাহার কর্তব্যগুলিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি—(১) নিজের প্রতি কর্তব্য ও (২) রোগীর প্রতি কর্তব্য।

শুশ্রূষাকারিণীর নিজের প্রতি কর্তব্য ঃ রোগীর সেবা করিতে গিয়া শুশ্রূকারিণী নিজে যাহাতে কোনরূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া না পড়েন এইজন্য তাহাকে সর্বপ্রকার সর্তকতা অবলম্বন করিতে হইবে। নিজের প্রতি ইহাই তাহার সবচেয়ে প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। কোনরকম অসুস্থতা অনুভব করিলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহা জানাইবেন যাহাতে অপর কোন উপযুক্ত ব্যক্তি তাহার কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। হাতে কোন প্রকার আঁচড়, কাটা ক্ষত অথবা অন্য কোন প্রকার ক্ষত থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকার করিবেন। অবহেলা করিলে হাত বিষাক্ত হইতে পারে এবং দীর্ঘদিন রোগীর সেবা করিতে পারিবেন না। অনুরূপভাবে পা দুইখানিকেও তিনি বিশ্রাম দিবেন। নিয়মিতভাবে দৈনিক স্নান করিবেন এবং হাত ও নখের পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ যত্ন লইবেন।

শুশ্রূষাকারিণী স্বীয় কামরার জানালা সর্বদা উন্মুক্ত রাখিবেন এবং যতদূর সম্ভব খোলামেলা জায়গায় শয়ন করিবেন। সুযোগমত উন্মুক্ত স্থানে একটু ব্যায়াম করিবেন। যদি কাজ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া না থাকেন তবে কোন একটি শারীরিক পরিশ্রমের খেলা করা যুক্তিসঙ্গত। এই সব বিষয়ে মন আকৃষ্ট থাকিলে তিনি নানা চিন্তা ও উৎকণ্ঠা হইতে কিছুক্ষণের জন্য অব্যাহতি পাইবেন।

শুশ্রূষাকারিণী নিজের শারীরিক সুস্থতা ও সবলতার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। নিয়মিতরূপে আহার করিবেন এবং আহার্য সামগ্রী সহজ পরিপাচ্য এবং রুচিকর হইবে। অসময়ে আহার করিবেন না, দাস্ত পরিষ্কার রাখিবেন এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের অবিলম্বে প্রতিকার করিবেন।

রোগীর প্রতি কর্তব্য ঃ একজন সুস্থ ব্যক্তি তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলি স্নান, আহার ইত্যাদি নিজেই মিটাইতে পারে কিন্তু একজন অসুস্থ ব্যক্তি অপরের সাহায্য ব্যতীত এই কাজগুলি সমাধা করিতে পারে না। তাই তাহার শুশ্রূষার প্রয়োজন। রোগীর প্রয়োজনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন—স্নান, আহার, দেহের পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি দৈহিক প্রয়োজন এবং স্নেহ প্রীতিলাভ মানসিক প্রয়োজনের অন্তর্গত।

(২) পারিপার্শ্বিকস্থিত প্রয়োজন—বস্ত্রাদির পরিচ্ছন্নতা, রোগিকক্ষে আলো হাওয়া প্রবেশের সুযোগ ইত্যাদি পারিপার্শ্বিকস্থিত প্রয়োজনের অন্তর্গত।

(৩) চিকিৎসাগত ও শুশ্রূষাগত প্রয়োজন—

(ক) উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক রোগ নির্ণয়,

(খ) নির্ভুল চিকিৎসা ও উপযুক্ত ঔষধ পথ্য লাভ,

(গ) চিকিৎসকের নির্দেশমত কোন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কর্তৃক শুশ্রূষা লাভ।

রোগীর প্রয়োজনগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় একজন শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্যগুলি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর ঃ—

(১) রোগীর পারিপার্শ্বিকের প্রতি,
(২) রোগীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি,
(৩) চিকিৎসকের প্রতি।

(১) **রোগীর পারিপার্শ্বিকের প্রতি ঃ** রোগি-কক্ষে নীরবতা রক্ষা করা শুশ্রূষাকারিণীর প্রথম ও প্রধান কাজ। শুধু যে বাহিরের গোলমালই রোগীকে পীড়িত করে তাহা নয়, শুশ্রূষাকারিণীর চলাফেরা ও কাজকর্ম, জামাকাপড়ের খসখসানি জুতার মচমচ শব্দ, বাসনপত্রের ঠুং ঠাং আওয়াজ, দরজা-জানালা বন্ধ করিবার শব্দ রোগীর পক্ষে অনেক সময় বিরক্তিকর বোধ হয়। তাই চলাফেরায় তিনি সাবধান ও সতর্ক হইবেন এবং স্বাভাবিক অনুচ্চস্বরে কথা বলিবেন।

(২) **রোগীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি ঃ** রোগীর দৈহিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, নিয়মিত দাঁত মাজান, গা স্পঞ্জ করা, মাথা ধোয়ানো, রোগীকে ঔষধ-পথ্য দেওয়া, বিছানা-পত্র পাল্টান, মলমূত্র ত্যাগ করানো প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে।

শুশ্রূষাকারিণী রোগীর আরামের দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন। প্রয়োজনে রোগীর গায় হাত বুলানো কিংবা একটু বাতাস করা শুশ্রূষাকারিণীর অন্যতম কাজ। তবে অতিরিক্ত মনোযোগও রোগীর পক্ষে পীড়াদায়ক হইতে পারে। বারংবার রোগীর বিছানা টানিলে কিংবা মাথার বালিশ সোজা করিয়া দিলে, গরম জলের ব্যাগ যথাস্থানে আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে রোগী বিরক্তি বোধ করে।

(৩) **চিকিৎসকের প্রতি কর্তব্য ঃ** রোগীর সারা দিনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া চিকিৎসকের নিকট পেশ করা এবং তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী রোগীর সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা শুশ্রূষাকারিণীর অন্যতম প্রধান কাজ। চিকিৎসকের প্রতি কর্তব্য রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষাগত প্রয়োজনেরই অন্তর্গত।

চিকিৎসক দিনে একবার আসেন। শুশ্রূষাকারিণী তাই একটি চার্টে রোগীর জ্বর, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ির গতি, মলমূত্র ইত্যাদি লিখিয়া রাখিবেন। রোগীর দৈনন্দিন অবস্থা একটি স্বতন্ত্র রিপোর্টে লিখিয়া রাখিবেন।

পরিশেষ নির্বীজন ঃ রোগভোগ কালেই যে শুধু শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্য থাকে তাহা নয়, রোগের উপশমে কিংবা রোগীর মৃত্যু ঘটিলেও তাহার কতকগুলি দায়িত্ব থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ সংক্রামক রোগীর ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব গুরুতর।

ব্যাধির অবসানে কিংবা রোগীর মৃত্যু ঘটিলে রোগি-কক্ষের সমস্ত দ্রব্যাদি, আসবাব, রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র, পুস্তক, বিছানা, বাসন-কোসন ইত্যাদি নির্বীজিত করিয়া লইতে হয়। রোগি-কক্ষ নির্বীজিত করাও একান্ত প্রয়োজন।

রোগমুক্তির পর রোগীর দেহ নির্বীজিত করিয়া ফেলা শুশ্রূষাকারিণীর অন্যতম কাজ। প্রথমে বিশোধিত সাবান দিয়া রোগী গাত্রমার্জনা করিয়া লইবে। তারপর গরম জলে লবণ অথবা ডেটল কিংবা পটাশ পারমাঙ্গানেট মিশাইয়া স্নান করিয়া ফেলিবে। শুশ্রূষাকারিণী নিজেও এইভাবে স্নান করিয়া ফেলিবেন।

2. রোগী-কক্ষ (The sick room—choice of the room and its arrangement)

রোগী-কক্ষ নির্বাচন ঃ উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে রোগী যাহাতে অবস্থান করিতে পারে তাহা দেখাই শুশ্রূষাকারীর প্রধান কাজ। একটি প্রশস্ত, প্রচুর আলোহাওয়াযুক্ত, ধূলিধূমবর্জিত কক্ষই রোগীর উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় সাহায্য করিতে পারে। বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে আলোবাতাসযুক্ত ও নির্জন ঘরখানিই রোগীর জন্য বাছিয়া লওয়া উচিত। রোগীর পক্ষে ঔষধ, পথ্য এবং শুশ্রূষা যতখানি প্রয়োজনীয়, সূর্যালোকও ঠিক ততখানি প্রয়োজনীয়। শ্রীমতি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বলিয়াছেন, 'আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জানিয়াছি প্রত্যেকটি রোগী চায় আলো।' গাছের গতি যেমন আলোর দিকে, প্রত্যেকটি রোগী তেমনি সূর্যালোকের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া থাকে, উপযুক্ত আলোক এবং হাওয়া পাইলে রোগী সহজেই সারিয়া ওঠে। রোগীর আপনার ঘরখানি যদি রোগি-কক্ষ নির্বাচিত হইবার উপযুক্ত হয়, তবে রোগীকে সেই ঘরে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। রোগি-কক্ষের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থাকিলে উহা আদর্শ রোগি-কক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহার সুবিধা এই যে রোগীর রাতের পথ্য, ফল, দুধ, মিষ্টি কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি ঐ কক্ষে একটি টেবিলের উপর রাখিয়া দেওয়া যায় অথচ ঐগুলি কাহারো নজরে আসে না।

আসবাব-পত্রের সংস্থান ঃ অপ্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাব রোগি-কক্ষ হইতে অপসারিত করিবে। দরজা-জানালাগুলি হইবে বেশ বড় বড় এবং আড়ম্বরশূন্য, জানালায় কোন নকশা কিংবা জাফ্রি কাটা থাকিবে না, কারণ তাহাতে ধুলাবালি মাকড়সার জাল জমিয়া ঘর নোংরা হয়। একটি খাট, দুইটি টেবিল, দুইখানি সাধারণ চেয়ার ও একটি ইজি-চেয়ারই রোগী-কক্ষের পক্ষে যথেষ্ট। জামা-কাপড় ইত্যাদি রাখিবার জন্য একটি আলমারিও রাখা চলে। খাটখানি এমনভাবে রাখিবে যাহাতে বিছানায় শুইয়া শুইয়া রোগী নীল আকাশ দেখিতে পায় অথচ ঝড়-ঝাপ্টা বা দমকা হাওয়া আসিয়া রোগীর গায় না লাগিতে পারে। প্রয়োজন মনে করিলে রোগীর ঘরের জানালায় পর্দা লাগানো যাইতে পারে। কক্ষের সমস্ত আসবাব যথাসাধ্য সুরক্ষিত রাখিবার চেষ্টা করিবে। যে টেবিলে ধুইবার সরঞ্জাম থাকে, উহা ম্যাকিনটোশ দিয়া মুড়িয়া দিবে। কম্বল নষ্ট হইবার ভয় থাকিলে পুরু ব্রাউন পেপার দিয়া কম্বল ঢাকিয়া দিবে।

3. রোগীর শয্যা

শয্যা রচনার লক্ষ্য হইল রোগীকে যথাসাধ্য আরাম দেওয়া। শয্যার পারিপাট্য দরকার সন্দেহ নাই কিন্তু বিছানা বেশী পারিপাটি করিতে গিয়া যেন রোগীকে বিরক্ত করা না হয়। রোগীর শয্যা রচনার সাধারণ নিয়ম হইল রোগীর দেহের নীচেকার চাদর যেন বেশ মসৃণ ও আঁটসাট হয়, কিন্তু দেহের উপরকার আচ্ছাদন হইবে হাল্কা ও ঢিলেঢালা। শয্যা রচনায় শুশ্রূষাকারীকে যদি অপর কোন ব্যক্তি সাহায্য করে তবে খুব অল্পায়াসে চমৎকার শয্যা রচনা করা যায়। অতিশয় পীড়িত ব্যক্তির শয্যা রচনার জন্য সর্বদাই দুই জন লোক চাই।

রোগীর শয্যার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

(১) ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া একটি খাট ;
(২) একটি শতরঞ্জি ;
(৩) ২½ ইঞ্চি বা ৩ ইঞ্চি পুরু একটি ওয়াড়যুক্ত তোশক ;
(৪) ১ গজ বা ২ গজ একটি ম্যাকিনটোশ (Mackintosh) ;
(৫) দুইখানি চাদর—একখানি ম্যাকিনটোশের তলায় পাতিবার জন্য (undersheet) এবং অপরখানি ম্যাকিনটোশের উপরে পাতিবার জন্য (drawsheet) ;
(৬) পরিষ্কার ওয়াড়যুক্ত দুইটি বালিশ ;
(৭) গায়ে দিবার জন্য একটি সাদা চাদর (Top sheet) ;
(৮) শীতকাল হইলে লেপ অথবা দুইটি হাল্কা কিন্তু গরম কম্বল।

শয্যা রচনার নিয়ম (Bed making without the patient) ঃ খাটের উপরে শতরঞ্জি বিছাইয়া দাও। তোশকটিতে যেন ওয়াড় লাগানো থাকে। এইবার একটি চাদর তোশকের উপর পাতিয়া দাও। চাদরের কেন্দ্রস্থল যেন তোশকের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয়। চাদরটি চারপাশে বেশ শক্ত করিয়া গুজিয়া দিতে হয় যাহাতে বিছানায় কোনরকম ভাঁজ না পড়ে। চাদরের কোণগুলি ঠিক এনভেলাপের কোণের মত ভাঁজ করিয়া লইবে। এইরূপে কোণ করিলে চাদর বেশ আঁটসাট থাকে।

এইবার বিছানার উপরে ম্যাকিনটোশ বিছাইয়া দিবে। শিশু, বৃদ্ধ, অচৈতন্য কিংবা মলমূত্রের বেগধারণে অক্ষম (incontinent), রোগীদের বিছানায় ম্যাকিনটোশ অপরিহার্য। এইবার সাদা একখানি চাদর দিয়া ম্যাকিনটোশ ঢাকিয়া দাও। ম্যাকিনটোশের ঠান্ডা ভাব সাধারণতঃ রোগীর ভাল লাগে না। তাই উহার উপরে একখানি চাদর পাতিয়া দুই পাশে ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিবে। বালিশ দুইটি যথাস্থানে রাখিয়া দিবে।

তৃতীয় চাদরখানি দিয়া রোগীর দেহ ঢাকিয়া দিবে। রোগীর পায়ের দিকে তোশকের নীচে উহা আলতোভাবে গুঁজিয়া দিবে। কোণগুলি এনভেলাপের কোণের মত ভাঁজ করিয়া দিবে, তাহা হইলে রোগী নড়াচড়া করিলেও গা হইতে চাদর খুলিয়া পড়িবে না। শীতকাল হইলে পাতলা আচ্ছাদনের উপর একখানি, প্রয়োজনবোধে দুইখানি হাল্কা অথচ বেশ গরম কম্বল চাপাইয়া দিবে।

রোগীকে বিছানায় শায়িত রাখিয়া শয্যা রচনা (Bed making with the patient) ঃ শায়িত অবস্থায় রোগীর বিছানা পরিবর্তন করিতে হইলে দুইজন লোক দরকার। খাটের দুই দিকে দুই ব্যক্তি দাঁড়াইবে। চাদরের এনভেলাপের মত কোণগুলি প্রথম আলগা করিয়া লইবে। তারপর রোগীর 'গায়ের উপরকার' সমস্ত আচ্ছাদন সরাইয়া ফেলিবে। এইবার প্রথম ব্যক্তি পরিষ্কার চাদর, ম্যাকিনটোশ লম্বালম্বিভাবে গোল করিয়া গুটাইয়া লইয়া বিছানা বদলের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে এবং রোগীর মাথার বালিশ সরাইয়া লইবে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি রোগীকে একপাশে কাত করিয়া ধরিয়া রাখিবে। এদিকে প্রথম ব্যক্তি বিছানায় পাতা ম্যাকিনটোশ ও চাদর একসঙ্গে গোল করিয়া গুটাইয়া অপসারিত করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার চাদর ও ম্যাকিনটোশ

পাতিতে থাকিবে। বিছানার মাঝামাঝি পর্যন্ত চাদর পাতা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তি রোগীর কাঁধ ও নিতম্বের নীচে হাত রাখিয়া রোগীকে তুলিয়া ধরিবে এবং প্রথম ব্যক্তি চাদর ও ম্যাকিনটোশ সম্পূর্ণ তুলিয়া পরিষ্কার চাদর ও ম্যাকিনটোশ দ্রুত টানিয়া পাতিয়া দিবে। সর্বশেষে চাদরের কোণগুলি এনভেলাপের কোণের মত ভাঁজ করিয়া দিবে। বালিশ যথাস্থানে রাখিবে এবং রোগীর গায়ের উপর চাদর টানিয়া দিবে।

4. গৃহ-পরিচালনা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য

(Home management and family health)]

(i) **মাতা এবং শিশুর চিকিৎসাগত যত্ন** (Medical care for mothers and infants)

গর্ভবতী নারীর যত্ন : শিশু গর্ভে আসিবার পূর্ব হইতেই নারীকে বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে হয় এবং তাহার চিকিৎসাগত যত্নের প্রয়োজন দেখা দেয়। রুগ্ন ও দুর্বল নারী কখনই সুস্থ ও স্বাভাবিক সন্তানের মা হইতে পারে না। গর্ভকালে যাহাদের ওজন স্বাভাবিক অপেক্ষা কম থাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহাদের অকালে গর্ভপাত হয় এবং তাহারা টক্সেমিয়া (Toxemia) ও ইক্ল্যাম্পসিয়া (Eclampsia) নামক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। একবার এই রোগে আক্রান্ত হইলে গর্ভবতী নারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। সুতরাং গর্ভে আসিবার প্রাক্কালে নারীর দেহের স্বাভাবিক ওজন রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইবে গর্ভস্থ ভ্রূণের। ইহার ফলে অপরিণত, বিকলাঙ্গ এমন কি মৃত সন্তানও জন্মিতে পারে।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যেমন ইক্ল্যাম্পসিয়া রোগ সৃষ্টি হইতে পারে তেমনি অধিক পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রভাবেও ঐ রোগ দেখা দিতে পারে। গর্ভবতী নারীর দেহের ওজন হইতেই সে তাহার উপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে কিনা তাহা বুঝিতে পারা যায়। গর্ভের প্রথম তিনমাস ২ পাউণ্ড, দ্বিতীয় তিনমাসে ৪ পাউণ্ড এবং শেষের তিন মাসে ৬ পাউণ্ড মোটামুটি এই হারে দেহের ওজন বৃদ্ধি পাইলেই গর্ভবতী নারী তাহার যথোপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। দৈনিক খাদ্যের ক্যালোরী বা তাপমূল্য কমাইয়া বা বাড়াইয়া দেহের ওজনের এই হার রক্ষা করা যাইতে পারে। একজন গর্ভবতী নারীর প্রথম চিকিৎসাগত যত্নের মধ্যে পড়ে তাহার নিয়মিত ওজন লওয়া এবং তাহার জন্য যথোপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা।

খাদ্য : খাদ্যের তাপমূল্য—গর্ভের প্রথম কয়েক মাস খাদ্যের তাপমূল্য স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃদ্ধি করিবার তেমন প্রয়োজন হয় না। তবে তাহার দেহের ওজন যদি স্বাভাবিকের তুলনায় কম থাকে (underweight) তাহা হইলে খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। গর্ভের নবম মাসে মেটাবলিজম বৃদ্ধি পায়, এইজন্য এই সময় অধিক তাপমূল্যের খাদ্য প্রয়োজন হয়। (২২০০+৩০০) কিন্তু গর্ভের শেষের দিকে আবার হাঁটা চলা ও শরীরিক পরিশ্রমের কাজ কমিয়া আসে তখন তাহাকে একজন অল্প পরিশ্রমী প্রাপ্তবয়স্কা নারীর স্বাভাবিক অল্পমূল্য অর্থাৎ ২২০০ ক্যালোরী তাপমূল্যের খাদ্য দিলেই চলিবে।

প্রোটিন ঃ নিজের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের পরিপুষ্টির জন্য গর্ভাবস্থায় নারীর প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এই সময় প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াইতে হয় এবং প্রোটিন প্রাণিজ প্রোটিন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন থাকিলে টক্সেমিয়া রোগের সম্ভাবনাও কম থাকিবে।

ধাতব লবণ ঃ ভ্রূণের অস্থি-র পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস-ঘটিত ধাতব লবণের প্রয়োজন। লৌহঘটিত লবণের অভাব হইলে গর্ভবতী নারীর রক্তাল্পতা (anemia) রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং দৈনিক খাদ্যে যথেষ্ট লৌহঘটিত খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দুধ, ডিম, মাছ ইত্যাদি হইতে এই সকল ধাতব লবণ পাওয়া যাইতে পারে।

ভাইটামিন ঃ ক্যালসিয়ামের যথাযথ ব্যবহারের জন্য খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ভাইটামিন 'ডি'-এর ব্যবস্থা থাকা দরকার। ইহার অভাবে ভ্রূণের অস্থি পরিপুষ্ট হইবে না। মাখন, ডিম, কডলিভার অয়েল, শার্কলিভার অয়েল, ইলিশ মাছ ইত্যাদিতে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়।

ভাইটামিন 'এ' ও 'বি'-র অভাবে অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। গর্ভাবস্থায় শরীর সুস্থ রাখিতে ভাইটামিন বি-কমপ্লেক্স (B-Complex) বিশেষতঃ ভাইটামিন 'বি' বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। খাদ্যে এই সকল ভাইটামিন উপযুক্ত পরিমাণে থাকিলে গা-বমি করা, পেটে বেদনা অনুভব করা ইত্যাদি সাধারণ অসুস্থতার লক্ষণগুলি দেখা যায় না। এই ভাইটামিন কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়া শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি করে। গর্ভের শেষ মাসে গর্ভিনীর খাদ্যে ভাইটামিন 'কে' যুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

একজন গর্ভবতী নারীর খাদ্যে প্রতিদিন কিছু খাদ্যশস্য অর্থাৎ ভাত, রুটি ইত্যাদি দুধ, মাছ বা মাংস, সবুজ শাকসব্জি, অন্যান্য তরকারি, লেবু জাতীয় ফল, মাখন ও ১টি ডিম থাকা কর্তব্য।

গা-বমি ঃ অনেক গর্ভিণী নারীর প্রথম অবস্থায় গা বমির ভাব দেখা দেয়। সকালে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যদ্রব্য, যথা—রুটি, চিনি, জেলী, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি গ্রহণ করিলে এই অসুবিধা দূর হয়।

চোখে হঠাৎ ঝাপসা দেখা ও মাথা ঘোরা ঃ এরূপ ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে তাহার রক্তের চাপ পরীক্ষা করাইবে এবং চিকিৎসকের নির্দেশ লইবে।

হাত-পা ফোলা ঃ হাত বিশেষতঃ পা ফোলা শুরু হইলে বুঝিবে তাহার শরীরে জল জমিতে শুরু করিয়াছে। ফোলা শুরু হইবামাত্র নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে—

(১) তাহার খাদ্য হইতে লবণ হ্রাস করিতে হইবে ;

(২) তাহাকে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিতে বলিবে ;

(৩) কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াইয়া চলিতে নির্দেশ দিবে।

মূত্র-পরীক্ষা ঃ গর্ভিণী নারীর মূত্র পরীক্ষা করাইয়া যদি এ্যালবুমিনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তবে খাদ্য হইতে প্রোটিন কমাইবে এবং ডিম বাদ দিয়া দিবে।

অকালে যাহাদের গর্ভপাত হয় পুনরায় গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রক্ত পরীক্ষা করাইবে এবং চিকিৎসকের নির্দেশ মানিয়া চলিবে।

ভাবী মায়ের আরও কতকগুলি ব্যাপারে সতর্ক হইতে হইবে। তাঁহার বিশ্রাম, ব্যায়াম ও স্নানও হইবে উদ্দেশ্যপূর্ণ।

বিশ্রাম ঃ ভাবী মায়ের প্রচুর বিশ্রাম প্রয়োজন। প্রতিদিন তিনি অন্তঃত নয় ঘণ্টা বিশ্রাম করিবেন এবং দিনের বেলাতেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা চিত হইয়া বিশ্রাম লওয়া উচিত। সবরকম উৎকণ্ঠা ও কাজের চাপ হইতে তাহাকে রেহাই দিতে হইবে।

ব্যায়াম ঃ বিশ্রাম যেমন আবশ্যক ব্যায়ামও তেমনি। ভাবী মাতা তাহার লঘু গৃহকর্ম করিয়া যাইবেন তবে কঠোর পরিশ্রমের কাজগুলি তিনি করিবেন না। যাঁহারা কোনরূপ গৃহকর্ম করেন না তাঁহাদের অবশ্য কিছু ব্যায়াম করিতে হইবে। সটান চিত হইয়া শুইয়া প্রথমে এক পা তারপর আরেক পা তুলিয়া রাখিয়া পায়ের আঙুলগুলি ছড়াইয়া দিবেন। তারপর ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া পা নামাইয়া আনিবেন। পুনরায় চিত হইয়া শুইয়া পা দুখানি যতদূরে সম্ভব ফাঁক করিয়া দিবেন, পরে গুটাইয়া আনিবেন এবং ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যায়াম চালাইবেন। উপযুক্ত ব্যায়াম করিলে মাংসপেশী সবল ও নরম থাকে এবং প্রসবকালে কোন কষ্ট হয় না।

স্নান ঃ স্নানের উদ্দেশ্য কেবল পরিষ্কার হওয়া নয়, গর্ভাবস্থায় স্নান টনিকের কাজ করে। ঈষদুষ্ণ জলে কিছুক্ষণ বসিয়া তারপর ঠাণ্ডা জলে গাত্র মার্জনা সহকারে স্নান করিলে দেহে রক্ত চলাচল হয় এবং ভাবী মায়ের মাংসপেশীর নমনীয়তা অতিশয় বৃদ্ধি পায়।

গর্ভাবস্থায় শেষ মাসে বসিয়া স্নান করা নিষিদ্ধ কারণ এই সময় দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে এবং যোনিপথে জল প্রবেশের সঙ্গে কোন সংক্রামক পদার্থও শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। তাই এই সময় বর্ষণ স্নান বাঞ্ছনীয়। যে সকল স্থানে তাহার সুযোগ নাই সেখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া স্নান করিতে হইবে।

গর্ভাবস্থার শেষের তিন চারি মাস কুচকি ও তলপেটে অলিভ অয়েল কিংবা সরিষার তেল গরম করিয়া মাখিলে মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় এবং তলপেটে দাগ পড়ে না।

ভাবী জননী উপরোক্ত নিয়মে নিজ দেহের যত্ন লইবেন এবং সন্তান প্রসবের পর অন্ততঃ দুই দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইবেন। তারপর আবার ধীরে ধীরে পূর্বেকার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিবেন।

স্তন্যদানকারী মাতার চিকিৎসাগত যত্ন ঃ জন্মের পর অনেকদিন পর্যন্ত শিশু মায়ের স্তন্য পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে। খাদ্যের জন্য মায়ের উপরই তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। শিশুর এই খাদ্যের জন্য মায়ের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এই সময় নারী যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে তাহা প্রধানতঃ দুইটি উদ্দেশ্যে—(১) তাঁহার নিজের দেহের অভাব পূরণের জন্য এবং (২) শিশুর খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য। শিশুর জন্য মায়ের স্তনে যে দুধ সৃষ্টি হয় তাহাতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন থাকে। এক গ্রাম দুধের প্রোটিন প্রায় দুই গ্রাম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্যের প্রোটিন হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং শিশুর খাদ্য এই দুধ প্রস্তুত করিবার জন্য মায়ের খাদ্যে মাছ, মাংস ইত্যাদি উৎকৃষ্ট

শ্রেণীর প্রাণিজ প্রোটিনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম ও লৌহঘটিত খাদ্যদ্রব্যও প্রচুর গ্রহণ করা দরকার। এই সময় নারীর ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। দেখা গিয়াছে দৈনিক একটি শিশুকে ১ পাউন্ড দুধ পান করাইতে মায়ের ৬০০ ক্যালোরী তাপ বা শক্তি প্রয়োজন হয়। সুতরাং একজন স্তন্যদান-কারী জননীর খাদ্যে প্রায় ২২০০+৭০০=২৯০০ ক্যা• তাপ ও শক্তির প্রয়োজন হয়।

গর্ভাবস্থায় তাঁহাকে যে খাদ্য দেওয়া হইয়াছে তাহার তুলনায় দুধের পরিমাণ আরও বাড়াইতে হইবে। অতিরিক্ত তাপ বা শক্তির অভাব পূরণের জন্য মা তাঁহার নিজের রুচি অনুযায়ী ভাত, রুটি, জেলী ইত্যাদি যে কোন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে।

শিশুকে স্তন্যদান বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই খাদ্য পরিবর্তন করিয়া পূর্বেকার খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে নতুবা মেদ এবং চর্বি সৃষ্টি হইবে এবং obesity রোগের লক্ষণ দেখা দিবে।

মায়ের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপরোক্ত কারণে সন্তানের জন্মের পরে এবং স্তন্যদান বন্ধ করিবার পরে আবার ওজন লইয়া দেখিতে হয়।

শিশুর চিকিৎসাগত যত্ন ঃ ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব হইতেই শিশুর চিকিৎসাগত যত্নের প্রয়োজন অনুভূত হয়। শিশু মাতৃগর্ভে আসার পূর্বে জননী যদি যথোপযুক্ত খাদ্য পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার ওজন বৃদ্ধি স্বাভাবিক হইয়া থাকে তবে শিশুরও উপযুক্ত চিকিৎসাগত যত্ন লওয়া হইয়াছে বলা যায়।

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে চিকিৎসক ও ধাত্রী তাহার প্রাথমিক যত্নের ব্যবস্থা করিবেন। তারপর জননীকে তাহার দৈহিক প্রয়োজনগুলি ঠিকভাবে মিটাইতে হইবে। এই দৈহিক প্রয়োজন হইল প্রধানতঃ পাঁচটি—উপযুক্ত আহার, নিদ্রা ও বিশ্রাম, আলো, উত্তাপ ও পরিচ্ছন্নতা। ওজন লইলেই বোঝা যাইবে শিশুর প্রয়োজনগুলি ঠিকভাবে মিটিতেছে কিনা। একটি স্বাস্থ্যবান শিশুর চিহ্ন হইল ঃ

(১) শিশুর ওজন বয়সের অনুপাতে যথাযথ বৃদ্ধি পাইবে ;
(২) মাংসপেশীসমূহ দৃঢ় ও সুগঠিত হইবে ;
(৩) মল স্বাভাবিক ও নিয়মিত হইবে ;
(৪) শিশু সর্বদা প্রফুল্ল থাকিবে এবং তাহার সুনিদ্রা হইবে।

সুতরাং চিকিৎসাগত প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে ওজন লওয়া। শিশুর অন্যতম চিকিৎসাগত প্রয়োজন হইল তাহার মধ্যে অনাক্রম্যতা শক্তি বা রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা সৃষ্টি করা। এইজন্য শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রাথমিক টিকা, পোলিওর টিকা, ট্রিপল অ্যান্টিজেন, টি.এ.বি.সি. ও টাইফয়েডের ইনজেকশন দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণের পর যদি তাহার মধ্যে কোন অসুস্থতা দেখা যায় বা সব কিছু স্বাভাবিক থাকিয়াও তাহার ওজন ঠিকভাবে বৃদ্ধি না পায় তবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইতে হইবে।

(ii) শিশুর অনাক্রম্যতা ও দাঁতের যত্ন
(Immunisation and dental care for children)

আমরা নানারকম রোগজীবাণুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিতেছি। আমাদের দেহের শোণিতে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের এক সহজাত ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা

না থাকিলে মানুষ নানারকম রোগের কবলে পড়িয়া অচিরে প্রাণ হারাইত। কৃত্রিম উপায়ে টিকা দিয়া ব্যাধি প্রতিরোধ করার শক্তি আরও বাড়াইয়া তোলা যায়।

তোমরা জান যে সংক্রামক রোগের জীবাণু বা ভাইরাসের দেহে নিজ নিজ antigen নামে প্রোটিন থাকে। কোন রোগজীবাণু যখন দেহে প্রবেশ লাভ করে তখন উহা শরীরে বিষ (toxin) সৃষ্টি করে। ঐ রোগের জীবাণু অথবা ভাইরাস যদি মৃত কিংবা দুর্বলীকৃত অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে জীবদেহে অনুপ্রবেশ করান যায় তবে দেহ নিজের মধ্যে রোগ প্রতিরোধক শক্তি বা antibody সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে। এইভাবে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার শক্তিকে বলে অনাক্রম্যতা (immunisation)। কতকগুলি রোগের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা শক্তি অর্জন করার শৈশবই প্রকৃষ্ট সময়। সাধারণতঃ বসন্ত, পোলিও, ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ, টিটেনাস, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি রোগের জন্য শিশুকে টিকা দেওয়া হয়।

(১) **বসন্তের টিকা ঃ** বসন্ত রোগাক্রান্ত গরুর দেহের দুর্বলীকৃত ভাইরাস লইয়া শিশুর দেহে অনুপ্রবেশ করান হয়। জন্মের পর প্রথম ছয় মাসের মধ্যে একবার এবং তিন বছর পরে দ্বিতীয় বার টিকা দিতে হয়। তারপর প্রতি বছরই টিকা দেওয়া চলে। কেবলমাত্র প্রাথমিক টিকা (Primary Vaccination) দিবার পর প্রবল জ্বর, খিচুঁনি এবং টিকার স্থানে প্রবল বেদনা অনুভূত হয়। যত কম বয়সে প্রাথমিক টিকা দেওয়া যায় তত কম প্রতিক্রিয়া হয়।

(২) **ট্রিপল এ্যাণ্টিজেন** (Triple Antigen) ঃ হুপিং কফ, ডিপথেরিয়া ও ধনুস্টঙ্কারের প্রতিষেধক টিকা। হুপিং কফের সঙ্গে ডিপথেরিয়া ও ধনুস্টঙ্কারের vaccine মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে বলে Triple Antigen ; প্রাথমিক টিকা দিবার ২।৩ মাস পরেই অথবা ছয় মাস বয়সে প্রথমবার ইনজেকশন দিতে হয়। এক মাস পর পর আরও দুইটি ইনজেকশন দিতে হয়। তারপর চার-পাঁচ বছর বয়সে একটি booster dose দিলেই চলে।

(৩) **পোলিও বা শিশু পক্ষাঘাত** (Poliomyelitis) ঃ যে জাতের ভাইরাস পক্ষাঘাত সৃষ্টি করিতে অক্ষম (non-paralytic strains of polio virus) এই জাতের ভাইরাস একখণ্ড চিনির মধ্যে পুরিয়া শিশুকে খাওয়ান হয়। ইহা Sabin Vaccine নামে পরিচিত।

ট্রিপল এ্যাণ্টিজেন শেষ হইবার তিন চার মাস পরে কিংবা এক বছর বয়সে প্রথমবার এবং তিন মাস পর পর মোট তিনবার খাওয়াইতে হয়। সাত আট বছর বয়সে আবার একটি booster dose দিতে হয়।

উপরোক্ত প্রতিষেধক টিকাগুলি সর্বদা ৩।৪ মাসের ব্যবধান রাখিয়া দিতে হয় এবং উহাদের একসঙ্গে দেওয়া চলে না।

(৪) **টি. এ. বি. সি.** (Typhoid, Paratyphoid A and B and Cholera) ঃ আজকাল টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড এবং কলেরারোগের জীবাণু মিশ্রিত করিয়া টি. এ. বি. সি. ইনজেকসন দেওয়া হইতেছে। শিশুদেরও এই টিকা দেওয়া যায়।

(৫) **বি. সি. জি.** টিকা ঃ প্রায় এগার বছর বয়সে বালক-বালিকার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় শরীরে রোগ প্রতিরোধক antibody উপস্থিত আছে কি না। যদি না থাকে তবে যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধক টিকা দিতে হয়, নতুবা দিবার প্রয়োজন নাই।

কালমেৎ-গে'রা (Bacillus Calmette Gue'rin) আবিষ্কৃত এই টিকা বিসিজি (BCG) নামে পরিচিত।

শিশুর দাঁতের যত্ন ঃ জন্মের পূর্ব হইতেই শিশুর দাঁতের যত্ন শুরু হইয়া যায়। সন্তানসম্ভবা মায়ের খাদ্যে সেজন্য ক্যালসিয়াম, ভাইটামিন ডি, প্রোটিন ও খনিজ পদার্থ থাকা দরকার। জননীর খাদ্যের উপর শিশুর সাধারণ পুষ্টি ও দাঁতের সুস্থতা নির্ভর করে। জন্মের পর শিশুর নিজের দাঁতের দিকে নজর দিতে হয়। সাধারণতঃ ৫।৬ মাস বয়সে দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে এবং শেষ হয় বছর দুই বয়সে। প্রথম দাঁত যাহাকে আমরা দুধের দাঁত বলি তাহার সংখ্যা হইল বিশ। এই দুধের দাঁত পড়িয়া গিয়া প্রায় বারো বছরের মধ্যে দ্বিতীয় এবং স্থায়ী আটাশটি দাঁত উঠিয়া যায়। বাকি চারটি বড় বা আক্কেল দাঁত ওঠে আরও অনেক পরে। দুধের দাঁতের সম্যক্ যত্ন নিতে পারিলে পরে স্থায়ী দাঁতও সুস্থ এবং সবল হয়। শিশুর দাঁত ভাল রাখিতে হইলে দাঁত পরিষ্কার রাখা এবং সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত খাদ্য এ দুয়ের দিকেই সমান নজর দিতে হইবে।

(১) **খাদ্য ঃ** সমগ্র দেহের মতই দাঁতের পুষ্টিও নির্ভর করে খাদ্যের উপর। দেহে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ধাতবলবণাদির অভাব হইলে দাঁতের যথাযথ গঠন ও পুষ্টি হয় না। বিশেষতঃ এ ও ডি ভাইটামিন দাঁতের পক্ষে অপরিহার্য। শিশুর দাঁত যাহাতে ভাল থাকে এইজন্য তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ, ফলের রস ও কডলিভার অয়েল অথবা শার্ক লিভার অয়েল দিতে হইবে।

(২) **দাঁতের পরিচ্ছন্নতা ঃ** অপরিষ্কার রাখিলেই দাঁত খারাপ হয় এবং দাঁতের রোগ দেখা দেয়। আহারের পর ভাল করিয়া মুখ না ধুইলে মুখে খাদ্যকণা পচিয়া অম্ল সৃষ্টি করে এবং দন্তক্ষত (caries) দেখা দেয়। তাছাড়া দাঁতের গোড়ায় লালা ও খাদ্যকণা জমিয়া থাকিলে মুখে সহজেই রোগজীবাণু সৃষ্টি হয়। তখন দাঁত দিয়া পুঁজ ও রক্ত পড়ে। ইহাকে পাইওরিয়া (Pyorrhoea) বলে।

ছোট শিশুদের দাঁত কিভাবে খারাপ হয় ঃ ছোট বাচ্চারা বিস্কুট, চকোলেট, আইসক্রীম ইত্যাদি জিনিস খাইতে ভালবাসে। এইসব জিনিসগুলি দাঁতের ফাঁকে লাগিয়া থাকে এবং তাহাদের দাঁত খারাপ করে।

দাঁতের যত্ন ঃ দাঁত ওঠার সময় আগে পর্যন্ত জলে কয়েক ফোঁটা লিস্টারিন দিয়া মুখ ধুইয়া দিতে হয়। দাঁত ওঠার পর প্রতিদিন দুইবার প্রত্যূষে ঘুম হইতে ওঠার পর এবং রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্বে আরেকবার বাচ্চার দাঁত মাজানোর অভ্যাস করাইবে। প্রথমে আঙুল দিয়া দাঁতের মাড়ি ভাল করিয়া ঘষিয়া ফেলিবে। তারপর ব্রাশ কিংবা দাঁতন দিয়া দাঁত মাজিতে বলিবে। ব্রাশের তুলনায় দাঁতনই উৎকৃষ্ট। সর্বদা ভাল জাতের মাজন ব্যবহার করিবে। তাছাড়া প্রতিবার আহারের পর ভাল করিয়া কুলকুচা করিয়া মুখ ধুইয়া ফেলার অভ্যাস জন্মাইতে হইবে।

সম্ভব হইলে মাঝে মাঝে দন্ত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া ভাল। দাঁত হইতে শরীরের বহু রোগ ধরা পড়ে। দাঁত যেন একটি ল্যাবরেটরি। একজন বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসক

বলিয়াছেন দাঁত শরীরের সঙ্গে অদ্ভুত সম্পর্কে আবদ্ধ। শরীরে কিছু হইলে মুখের ভিতর তাহার লক্ষণ মেলা সহজ আবার মুখের ভিতর কিছু হইলে শরীরে তাহার উপসর্গ দেখা যায়।

(ii) গৃহে অসুস্থতার লক্ষণ চিনিবার উপায়
(Recognising symptoms of illness at home)

দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধই অসুস্থতার বা রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। গা ম্যাজ ম্যাজ করা, খাবারে অরুচি ইত্যাদিরূপে এই অস্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ পায়। আমাদের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন তাহাদের নিজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তখন আমাদের দেহের মধ্যে একটি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ আসে এবং আমরা তখন নিজেদের সুস্থ বলিয়া মনে করি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সুষ্ঠুভাবে কাজ করিলে তাহাদের উপস্থিতি আমরা অনুভব করি না। আমাদের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস অনবরত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া যথাক্রমে দেহে রক্ত-সঞ্চালন ও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া পরিচালনা করিতেছে। কিন্তু আমাদের কখনো তাহাদের উপস্থিতি বা কাজের কথা মনে হয় না। কিন্তু ইহাদের কোন একটি যদি অসুস্থ হইয়া পড়ে তবে সেই অসুস্থ অঙ্গটি তাহার নিজের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারে না, ফলে দেহের মধ্যে গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং আমরা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। অসুস্থ হৃৎপিণ্ড রক্ত পরিচালনার কাজটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারে না। ফলে বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতার কথা জানাইয়া দেয়। তেমনি ফুসফুসটি অসুস্থ হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা হয় এবং হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া ফুসফুসের অসুস্থতার কথা জানাইয়া দেয়। এইরূপে দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ হইতেই আমরা রোগলক্ষণ বুঝিতে পারি এবং লক্ষণ-সমূহের প্রকৃতি হইতে উহাদের চিনিতে পারা যায়। যে যে লক্ষণ দ্বারা উহাদের চিনিতে পারা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। চিকিৎসকরাই কেবল কোন একটি রোগ সঠিক ভাবে নির্ণয় করিতে পারেন। তবে প্রত্যেক গৃহিণীরই যদি সাধারণ রোগ সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক জ্ঞান থাকে তবে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া ওঠে না এবং সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে উহার প্রসার বন্ধ করা যায়। এইরূপে কয়েকটি সাধারণ রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

জ্বর : দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলেই জ্বরের উপস্থিতি বোঝা যায়। জ্বর আবার নানারকমের—সবিরাম জ্বর, অবিরাম সকম্প জ্বর, অবিরাম জ্বর, ঘুষঘুষে জ্বর, জ্বরের সঙ্গে আবার সর্দি-কাশি, গা হাত পা ব্যথা, গায়ে ফুস্কুড়ি অথবা র‍্যাশ দেখা দিতে পারে। এইসব বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত জ্বর বিভিন্ন রোগ সূচনা করে।

সাধারণ সর্দি-কাশি : নাক দিয়া জল পড়া, হাঁচি ইত্যাদি রোগের লক্ষণ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা : জ্বরের সঙ্গে সর্দি-কাশি ও গা ব্যথা থাকিবে।

টাইফয়েড : একটানা জ্বর চলিবে। ভোরের দিকে জ্বর কম থাকে এবং দুপুরের পরে বাড়িতে শুরু করে। নাড়ির গতি মৃদু এবং জিহ্বা অপরিষ্কার দেখা যায়।

দুই-তিন দিন ধরিয়া যদি জ্বর না কমে এবং উপরোক্ত লক্ষণগুলি দেখা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লইতে হয় কারণ ঐ জ্বর টাইফয়েডের দিকে যাইতে পারে।

হাম ঃ জ্বরের সঙ্গে কিংবা জ্বর ছাড়াই দেহে র‍্যাশ দেখা দিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পৃথক্ রাখিবে। শিশু ও বালকরাই সাধারণতঃ ইহার কবলে পড়ে।

বসন্ত ঃ অল্প জ্বর, গা-হাত-পা ব্যথা, গায়ে দুই একটি ফুস্কুড়ি বাহির হইলে বসন্ত হইতে পারে মনে করিয়া রোগীকে পৃথক্ রাখা উচিত।

ডিপথেরিয়া ঃ অল্প জ্বরের সঙ্গে গলা ব্যথা, মুখ দিয়া নাল পড়া, মুখে দুর্গন্ধ ইত্যাদি থাকিলে ডিপথেরিয়া রোগের সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হয়। নতুন রোগীর প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

বদহজম ঃ খাওয়ার পর খাদ্য দ্রব্য হজম হইল না, বা সঙ্গে চোঁয়া ঢেকুর বদহজম নির্দেশ করে।

কলেরা ঃ ভেদ-বমি যদি প্রচণ্ড আকার ধারণ করে এবং ঘাম দিয়া রোগী ঠাণ্ডা হইয়া নিস্তেজ হইয়া আসে তবে উহা কলেরার লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে।

আমাশয় ঃ পেটে কামড় দিয়া পায়খানা হয়। ঘন ঘন পায়খানা কিন্তু মলের পরিমাণ কম, সঙ্গে মিউকাস, কখনও রক্তের ছিটাযুক্ত বা দুর্গন্ধপূর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ. আমাশয় রোগের সূচনা করে।

সুতরাং জ্বর, গা-হাত-পা ব্যথা, হাঁচি-কাশি, পেট ফাঁপা, বারবার পায়খানা হওয়া, ভেদ-বমি ইত্যাদি কতগুলি সাধারণ রোগলক্ষণ। আরও নানাপ্রকার রোগলক্ষণ আছে কিন্তু সবগুলি একজন গৃহিণীর পক্ষে চেনা সম্ভব নয়। মোটের উপর কোন গুরুতর অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলেই উহা অসুস্থতার লক্ষণ মনে করিয়া চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে আবার তাহাদের ক্রন্দন, চীৎকার ও মলের বর্ণ অবস্থা জ্ঞাপন করে।

ম্যারাসমাস রোগে শিশুরা নাকি সুরে ক্রন্দন করে। আবার মেনেনজাইটিস হইলে ভীষণ চীৎকার করে। অবশ্য ক্ষুধা পাইলে কিংবা জলতৃষ্ণা বোধ করিলেও তাহারা ক্রন্দন করিয়া থাকে।

মলের বর্ণ ঃ শিশুর খাদ্যে প্রোটিনের আধিক্য ঘটিলে মল নরম, সবুজ এবং ছানার টুকরার মত হয়।

Sugar বেশী হইলে মল জলের মত এবং অল্প গন্ধযুক্ত হয়। মলদ্বারের পার্শ্বস্থ চর্ম উঠিয়া যায় এবং শূলবেদনা বোধ করে।

ফ্যাট বা চর্বির পরিমাণ বেশী হইলে মল নরম থাকে এবং ছানার মত সাদা টুকরা দেখা যায়।

মলের বর্ণ দেখিয়া জননী শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অসুস্থতা শব্দটি আজকাল অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। অসুস্থ বলিতে আজকাল আমরা দৈহিক অসুস্থতার সঙ্গে মানসিক অসুস্থতাও বুঝিয়া থাকি। বস্তুতঃ মানসিক ব্যাধি অনেক ক্ষেত্রে দৈহিক অসুস্থতার চেয়ে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। গৃহের আবহাওয়া যাহাতে সন্তানদের মানসিক বিকাশ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল হয় এইজন্য গৃহিণীকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। বালক-বালিকা বিশেষতঃ কিশোর-কিশোরীদের আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা কিংবা প্রাক্ষোভিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে গৃহিণী সঙ্গে সঙ্গে

সাবধান হইবেন এবং ঐ জট ছাড়াইবার চেষ্টা করিবেন। প্রয়োজন হইলে বিশেষজ্ঞেরও পরামর্শ লইবেন।

(iv) গৃহে বৃদ্ধ ও অশক্তদের যত্ন করা
(Care of the old and infirm at home)

বৃদ্ধ ব্যক্তিদের যত্নে রাখা ভারতের পারিবারিক জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য।

বার্ধক্যকে মানুষের দ্বিতীয় শৈশব বলা হয়। এই সময় শিশুর মতই তাহার দেহ মন দুর্বল হয় এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ফলে একটি শিশুর স্নানাহার, বিশ্রাম, নিদ্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে যেমন সতর্কতা পালন করিতে হয় গৃহে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের যত্নের বেলাতেও অনুরূপ নিয়মশৃঙ্খলা পালন করিয়া চলিতে হয়।

খাদ্য : বৃদ্ধবয়সে দেহযন্ত্রের প্রতিটি অংশেরই কার্যক্ষমতা কমিয়া যায়। সুতরাং খাদ্যের পরিমাণও এই সময় কমাইতে হয়। তেমনি বৃদ্ধের খাদ্যব্যবস্থায় তাহার দৈনিক ক্ষয়পূরণ এবং রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই সময় শুধু দেহের ক্ষয়পূরণের জন্যই প্রোটিনের প্রয়োজন হয় বলিয়া খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ সামান্য হ্রাস করিতে হয়। স্নেহপদার্থ হজমের শক্তিও এই বয়সে অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং খাদ্যে স্নেহের পরিমাণ কমাইয়া সহজপাচ্য স্নেহ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ না করিলে পেটের গণ্ডগোল লাগিয়া থাকিবে। দুধের স্নেহ সহজপাচ্য। সুতরাং স্নেহের অভাব তেল, দালদা ইত্যাদি খাদ্যের বদলে দুধ, মাখন প্রভৃতি হইতে পূরণ করাই ভাল। কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণও এই বয়সে কমাইতে হয়। বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট, যথা—চিনি, মিশ্রি ইত্যাদি কম খাইয়া অল্প পরিমাণ রুটি, ভাত ইত্যাদির সাহায্যেই কার্বোহাইড্রেটের অভাব পূরণ কর্তব্য। বিভিন্ন ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় লবণ। খাদ্যে উপযুক্ত ক্যালসিয়াম থাকিলে শরীর সুস্থ থাকে, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং যৌবনকাল অধিক দিন স্থায়ী হয়; এইজন্য দুগ্ধকে বৃদ্ধের খাদ্যের একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া গণ্য করা হয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৃদু রক্তাল্পতাও দেখা দেয়। সুতরাং লৌহঘটিত খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধের খাদ্যের অত্যাবশ্যক অংশ বলিয়া গণ্য করা উচিত। মাঝে মাঝে যকৃতের ব্যবস্থা করিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং বিভিন্ন শারীরিক অবস্থা খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব সূচিত করে। সুতরাং বৃদ্ধের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ ফলের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। শাক-সবজির পরিমাণ একটু কমাইয়া দেওয়া ভাল, কারণ শাক-সবজির দুষ্পাচ্য সেলুলোজ (cellulose) অজীর্ণ ও বদহজমের সৃষ্টি করিতে পারে। ফলমূল এবং বিভিন্ন খাদ্যশস্যের (cereals) অপেক্ষাকৃত মৃদু সেলুলোজই বৃদ্ধের কোষ্টকাঠিন্য দূর করিয়া শরীর সুস্থ রাখিবে। এই সকল খাদ্যশস্যের সহিত প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ জল পান করিতে হইবে।

শারীরিক সুস্থতার জন্য বৃদ্ধ ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্য দিতে হইবে—

এক পোয়া হইতে আধ সের দুধ,

৩-৪ আঃ বিভিন্ন ফল,

৩-৪ আঃ তরি-তরকারী,

একদিন অন্তর একদিন ১টি করিয়া ডিম, কিছু মাছ, কিছু মাংস, কমলালেবু ইত্যাদি ভাইটামিন 'সি' জাতীয় ফল,

সামান্য মিষ্টি, অভ্যাস অনুযায়ী চা বা কফি। শরীরের ওজন ঠিক রাখিবার জন্য প্রয়োজনমত ভাত, রুটি, মাখন ইত্যাদি।

বৃদ্ধের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ এবং অজীর্ণতা নিম্নলিখিত উপায়ে দূর করা যাইতে পারে:

(১) শাক-সবজি বা ফলের পরিবর্তে ইহার স্যুপ খাওয়া।

(২) খাদ্য-দ্রব্য গরম অবস্থায় খাওয়া।

(৩) খাদ্য-দ্রব্য তিন বারের পরিবর্তে ৪।৫ বারে অল্প অল্প খাওয়া।

(৪) রাত্রিতে অল্প পরিমাণ এবং সহজপাচ্য খাদ্য খাওয়া।

(৫) রাত্রে ঘুমাইবার পূর্বে ১ গ্লাস গরম দুধ পান করা। স্নেহজাতীয় খাদ্য, বিভিন্ন প্রকারের ভাজা, কেক, পুডিং ও অত্যধিক মিষ্টি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধবয়সে শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে এই সকল খাদ্যদ্রব্য খাদ্য হইতে বাদ দিতে হইবে।

বৃদ্ধ ব্যক্তিদের উপরোক্ত নিয়মে খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সারাজীবন তাহার আহারের অভ্যাস যাহাই থাকুক না কেন বৃদ্ধ বয়সে কিন্তু প্রতিদিন ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে তাহার আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার রাত্রির খাদ্য হইবে অতিশয় লঘু, পরিমাণে অল্প এবং সহজপাচ্য। সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই তিনি তাহার নৈশ আহার শেষ করিবেন এবং নৈশ ভোজনের পর অন্ততঃ দুই তিন ঘন্টা জাগিয়া থাকিবেন। ইহাতে ভাল হজম হইবে।

আহারের মতই বৃদ্ধ ব্যক্তিদের স্নানের নির্দিষ্ট সময় থাকা দরকার। ঠাণ্ডার দিনগুলিতে তাহাকে স্নানের জন্য ঈষদুষ্ণ জল দিতে হইবে। পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে পরিষ্কার, মসৃণ ও আরামদায়ক। পোশাক যেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয়।

বৃদ্ধ ব্যক্তিদের বিশ্রামেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হয়। সারাজীবন তিনি হয়ত বিশ্রামের সুযোগ পান নাই অথবা তেমন প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। কিন্তু বার্ধক্যে তাহাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর উপযুক্ত বিশ্রাম লইতে লইবে। বৃদ্ধ বয়সে ঘুম সাধারণতঃ কমিয়া আসে। তিনি অধিকরাত্রি জাগিবেন না এবং গৃহের একটি নির্জন ও আলোবাতাসযুক্ত কক্ষে তাঁহার নিদ্রার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নিদ্রা ও বিশ্রামের মত তাহার উপযুক্ত ব্যায়াম ও চিত্তবিনোদনেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃদ্ধ বয়সে ভ্রমণই হইল উপযুক্ত ব্যায়াম। যতদিন তাঁহার সামর্থ্য থাকিবে তিনি একাই ভ্রমণ করিবেন, তবে প্রয়োজন হইলে তাঁহার ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত সঙ্গীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। চিত্তবিনোদনের জন্য ঘরে একটি রেডিও, কিছু ভাল পড়ার বই, ও পত্রিকা রাখা দরকার।

দৈহিক যত্নের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মানসিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলে, গৃহের নানা ক্রিয়াকর্মে তাঁহাদের মতামত লইলে এবং অবসর সময়ে সকলে মিলিয়া দিনের কিছুটা সময় তাঁহার সঙ্গে একটু

গল্পগুজব করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মন শান্ত ও প্রফুল্ল থাকে এবং নিরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত হয় না।

অশক্ত ব্যক্তিদের যত্ন ঃ বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মতই অশক্ত ব্যক্তিদের যত্নও গৃহকর্ম ও গৃহশুশ্রূষার অন্তর্গত। মানুষ কেবল বার্ধক্যবশতঃ অশক্ত হয় না, রোগগ্রস্ত হইয়া অকালেও অশক্ত হইয়া পড়িতে পারে। বৃদ্ধদের তুলনায় এইসব অশক্ত ব্যক্তিদের যত্ন করার ব্যাপারে আরও বেশী সতর্ক হইতে হয়। কারণ অশক্ত ব্যক্তিদের দিনের সমস্ত কাজগুলি করিয়া দিতে হয় এবং তাহার প্রতি সর্বদা নজর রাখিতে হয়। বিছানাতেই হয়ত তাহাকে স্নান করাইতে হয়, বেড প্যান দিতে হয়। মলমূত্রের বেগধারণে যাহারা অক্ষম তাহাদের বিছানায় সর্বদা ম্যাকিনটোশ পাতিয়া রাখিতে হয় এবং অনবরত শুইয়া থাকার ফলে যাহাতে শয্যাক্ষত বা বেড-সোর না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। তাছাড়া চিকিৎসক তাহার খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে যেসব নির্দেশ দেন সেগুলি যথাযথ পালন করিতে হয়।

৫. দুর্ঘটনা, মচকানো, অস্থিভঙ্গ, বেদনা, কাটিয়া যাওয়া, রক্তপাত, দহন, বিজাতীয় বস্তু প্রবেশ, দংশন, হুলবিদ্ধ করা, মূর্ছা ও অজ্ঞান অবস্থায় প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা।

(Rendering First Aid to cases of accidents, sprains and fractures, pains, cuts, bleeding, burning, foreign bodies, bites, stings, fits and fainting.)

গৃহে কিংবা পথে-ঘাটে চলিতে গিয়া আমরা নানাভাবে আঘাত পাইয়া থাকি। এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে এমন একটি জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না করিলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে দেহের কোন অঙ্গ মচকানো, অস্থিভঙ্গ কিংবা সন্ধিচ্যুতি ইত্যাদি নানাজাতীয় বিপদ দেখা দিতে পারে। প্রথমেই মচকানো সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

মচকাইয়া যাওয়া (Sprains)

মচকাইয়া যাওয়া আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। দেহের বিভিন্ন সংযোগস্থল, যেমন—পায়ের গোড়ালি, হাতের কব্জি, হাতের আঙুল ইত্যাদি আমাদের মাঝে মাঝে মচকাইয়া থাকে। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে মচকাইয়া যাওয়া কাহাকে বলে? কোন আকস্মিক আঘাতের ফলে আমাদের হাড়ের সন্ধিস্থানের চারিদিককার স্নায়ুতন্তুর উপর অত্যধিক টান পড়িয়া স্নায়ুতন্তুগুলি অথবা সন্ধিবন্ধনীগুলি (Ligaments) ছিঁড়িয়া যায়। হাড় যদি না ভাঙে অথবা স্থানচ্যুত না হয় তবে হাড়ের সংযোগস্থলের এই তন্তুগুলি ছিঁড়িয়া যাওয়াকেই বলে মচকান (Sprain)।

মচকাইবার লক্ষণ ঃ (১) সন্ধিতে ব্যথা অনুভূত হইবে।

(২) সন্ধি নাড়াইবার চেষ্টা করিলে ব্যথা লাগিবে।

(৩) মচকানো স্থানটি স্ফীত ও বিবর্ণ হইয়া উঠিবে।

প্রতিবিধান ঃ (১) রোগীকে মচকানো স্থানটি সামান্য তুলিয়া ধরিতে বল এবং উহা নাড়াচাড়া করিতে নিষেধ কর।

(২) মচকানো স্থানটি উন্মুক্ত করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধ।

(৩) ব্যাণ্ডেজ ভিজাইয়া বাঁধিবে এবং শুকাইয়া আসিলে পুনর্বার ভিজাইয়া দিবে।

(৪) বাড়ির বাহিরে পায়ের গোড়ালি মচকাইলে জুতা না খুলিয়া বাংলা ৪ সংখ্যার মত দৃঢ়ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দাও।

অস্থিভঙ্গ (Fractures)

আকস্মিক কোন আঘাতে বা চাপে হাড় ভাঙিয়া বা ফাটিয়া যাওয়ার নাম অস্থিভঙ্গ বা 'ফ্রাকচার'। বিভিন্ন কারণে অস্থি ভাঙিতে পারে। অস্থি ভাঙিবার কারণ ঃ—

(১) অস্থিতে প্রত্যক্ষভাবে কোন আঘাত লাগিলে উহা ভাঙিতে পারে। পতনের ফলে, চাকায় পিষিয়া কিংবা কোন ভারি জিনিসের আঘাত লাগিয়া নানাভাবে প্রত্যক্ষ উপায়ে অস্থি ভাঙিতে পারে।

(২) পরোক্ষ আঘাতেও অস্থি ভাঙিতে পারে। যে স্থানে আঘাত লাগিয়াছে সেখানে না ভাঙিয়া যদি অন্য স্থানের অস্থি ভাঙে তবে তাহাকে পরোক্ষ উপায়ে অস্থি ভাঙা বলে। পায়ের উপর ভর দিযা পতনের ফলে যদি হাঁটুর অস্থি ভাঙে তবে উহা পরোক্ষ অস্থিভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে।

(৩) এতদ্ব্যতীত পৈশিক ক্রিয়ার ফলে অঙ্গের সংলগ্ন মাংসপেশীগুলির প্রবল সঙ্কোচন হয় এবং তাহার ফলে অস্থি ভাঙিতে পারে।
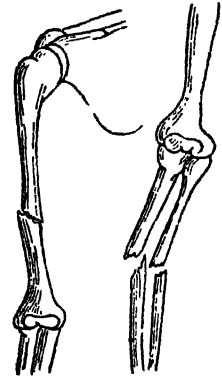
সরল অস্থিভঙ্গ মিশ্র অস্থিভঙ্গ

বিভিন্ন প্রকারের অস্থিভঙ্গ অস্থি সর্বদা একরূপে ভাঙে না। অস্থিভঙ্গের প্রকারভেদ আছে ঃ

(১) **সরল অস্থিভঙ্গ** (Simple or closed) ঃ এইরূপ ভঙ্গে শুধু অস্থি ভাঙিয়া থাকে, আঘাতের স্থানে কোন ক্ষত থাকে না।

(২) **মিশ্র ভঙ্গ** (Compound or open) ঃ এইরূপ ক্ষেত্রে অস্থি ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গে সংলগ্ন স্থান ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায় এবং বাহিরের রোগজীবাণু ঐ ক্ষতস্থান দিয়া সহজেই আহত ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে।

(৩) **জটিল ভঙ্গ** (Complicated) ঃ এইরূপ ক্ষেত্রে অস্থিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ শরীরযন্ত্র, যথা—মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি আহত হয়। জটিল অস্থিভঙ্গ সরল কিংবা মিশ্র হইতে পারে।

(৪) **বহু ভঙ্গ** (Comminuted) ঃ একই অস্থি কয়েকটি টুকরা হইয়া ভাঙিয়া যায়।

(৫) **পরস্পর সংবিদ্ধ অস্থিভঙ্গ** (Impacted) ঃ ভগ্ন অস্থির অগ্রভাগ অপর অস্থির মধ্যে প্রবেশ করে।

(৬) **গ্রীনস্টিক ফ্র্যাকচার** (Green stick fracture)ঃ অস্থি না ভাঙিয়া বাঁকিয়া অথবা ফাটিয়া যায়। সাধারণতঃ শিশুদের ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটে।

(৭) **ডিপ্রেস্‌ড ফ্র্যাকচার** (Depressed fracture)ঃ মাথার খুলি ভাঙিয়া নীচের দিকে বসিয়া যাওয়াকে বলে ডিপ্রেসড ফ্রাকচার।

অস্থিভঙ্গের লক্ষণ ঃ অস্থি ভাঙিলে আঘাতের স্থানটিতে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হইবে এবং স্থানটি নাড়াচাড়া করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইবে। ভগ্ন অস্থি-র চারিপাশে ফুলিয়া উঠিতে পারে। এতদ্ব্যতীত ভগ্ন অস্থি স্থানভ্রষ্ট হয় বলিয়া স্থানটি অসম ও অস্বাভাবিক দেখায়।

অস্থিভঙ্গের প্রতিবিধান ঃ অস্থিভঙ্গে প্রতিবিধানকারিণীর প্রথম কাজ হইল আহত অঙ্গটি স্বাভাবিকভাবে স্থাপন করা। স্বাভাবিকভাবে সংস্থাপন করিতে পারিলে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা সহজ হয়। ব্যান্ডেজ ও স্প্লিণ্ট এই দুইটি জিনিসের সাহায্যে ভগ্ন অস্থিকে স্থিতিশীল রাখা যাইতে পারে।

ব্যাণ্ডেজের ব্যবহার ঃ ঠিক অস্থিভঙ্গের স্থানটিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে না। ব্যাণ্ডেজ কখনও এমনভাবে আঁট করিয়া বাঁধিবে না যাহাতে রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হইতে পারে। গোড়ালি ও হাঁটু একসঙ্গে বাঁধিতে হইলে প্রথমে প্যাড দিয়া লইবে।

স্প্লিণ্টের ব্যবহার ঃ অভগ্নাস্থির উপরের ও নীচের সন্ধিস্থল মিলাইয়া বাঁধিবার জন্য স্প্লিণ্ট (splint) ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। ভগ্নস্থানের বস্ত্রের উপর স্প্লিণ্ট বাঁধিবে এবং সম্ভব হইলে আহত অঙ্গ ও স্প্লিণ্টের মাঝখানে প্যাড বা পটি দিয়া লইবে। স্প্লিন্ট যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়া উচিত। ছাতা, লাঠি, কাঠের টুকরা বা কার্ডবোর্ড ইত্যাদি যে কোন শক্ত জিনিসই স্প্লিণ্টরূপে ব্যবহার করা চলে।

দেহের বিভিন্ন অংশের অস্থিভঙ্গ

মাথা, হাত, পা, কোমর, মেরুদণ্ড, বুকের পাঁজরা ইত্যাদি দেহের নানা অংশ নানাভাবে ভাঙিতে পারে। অস্থিভঙ্গের পূর্ণ চিকিৎসা প্রতিবিধানকারীর পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। ইহার জন্য সর্বদা চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হয়। তবে চিকিৎসকের সাহায্য পাইবার পূর্ব পর্যন্ত রোগীর অবস্থার যাহাতে অবনতি না ঘটে সেইজন্য পার্শ্ববর্তী লোকেদের চেষ্টা করা উচিত।

মস্তক ভঙ্গ (Fracture of skull)ঃ মস্তক ভঙ্গ এক গুরুতর অবস্থা। মস্তকের ঊর্ধ্বভাগ কিংবা নিম্নভাগ ভাঙিতে পারে। ঊর্ধ্বভাগ ভাঙিলে আহত স্থান স্ফীত হইয়া ওঠে, শরীরে অস্থিরতা প্রকাশ পায়, অধিকাশ ক্ষেত্রে রোগী সংজ্ঞা হারায়। নিম্নভাগ ভাঙিলে রোগীর কান দিয়া একরকম তরল পদার্থ বাহির হয়, কখনও বা নাক দিয়া রক্ত-ক্ষরণ হইতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তবর্ণ হইয়া ওঠে।

প্রতিবিধান ঃ মাথা ও কাঁধে সামান্য উঁচু করিয়া ও ঠেস দিয়া রোগীকে চিত করিয়া শোয়াও। মাথা একপাশে ফিরাইয়া দিবে এবং কোন কান দিয়া রক্তক্ষরণ হইতে থাকিলে কানের দিকে মাথা ঘুরাইয়া কানটি নীচের দিকে করিয়া রাখ। তারপর চিকিৎসককে সত্বর সংবাদ দাও।

চোয়াল ভঙ্গ (Fracture of the jaw) **:** চোয়ালের অস্থি ভাঙিলে রোগী কথা বলিতে, চোয়াল নাড়িতে এবং কোন কিছু গিলিতে বেদনা বোধ করে। তাহার মুখে বেশী থুথু আসে এবং থুথুর সঙ্গে রক্তের ছিটা দেখা যায়। আঘাত গুরুতর হইলে দাঁত স্থানচ্যুত হইতে পারে।

প্রতিবিধান : রোগীকে কথা বলিতে দিও না এবং সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বসাও। একটি সরু ব্যাণ্ডেজ লইয়া কানের পাশ দিয়া ঘুরাইয়া বাঁধিয়া দাও।

মেরুদণ্ড ভঙ্গ (Fracture of spine) **:** মেরুদণ্ড ভঙ্গ খুবই সঙ্কটজনক অবস্থা।

প্রতিবিধান : রোগীকে শোয়াইয়া দাও এবং কোনরূপে নাড়াচড়া করিতে দিও না। রোগী অচেতনা হইয়া থাকিলে জিহ্বা আটকাইয়া যাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখ। কালবিলম্ব না করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য লও।

পঞ্জর ভঙ্গ (Fracture of Ribs) **:** বুকের পাঁজর ভাঙিলে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বেদনা অনুভূত হয়। কাশির সঙ্গে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়। যন্ত্রণা উপশমের জন্য রোগী ঘনঘন ও অগভীর শ্বাস লইতে থাকে।

প্রতিবিধান : অস্থি ভাঙিয়া ক্ষত হইলে অস্থি স্থিতিশীল রাখিবার জন্য বক্ষোদেশ বেষ্টন করিয়া দুইটি চওড়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে। তারপর একটি স্লিং-এর সাহায্যে হাতখানি ঝুলাইয়া রাখিবে। ব্যাথার উপশম না হইলে ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলিবে।

হস্ত ভঙ্গ : অগ্রবাহু এবং ঊর্ধ্ববাহু—এই দুই জায়গায় হাত ভাঙিতে পারে।

অগ্রবাহু ভাঙিলে ঊর্ধ্ববাহুর সঙ্গে সমকোণ করিয়া বুকের উপর আড়া-আড়িভাবে হাতখানি রাখিতে হইবে। কনুই হইতে আঙুল পর্যন্ত অগ্রবাহুর সামনে ও পিছনে স্প্লিণ্ট দিয়া লইতে পার। তারপর হাত ও কব্জি জড়াইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে এবং একটি স্লিং-এর সাহায্যে ঝুলাইয়া রাখিবে।

ঊর্ধ্ববাহু ভাঙিলে আঘাতপ্রাপ্ত হাতটি বুকের উপর রাখ, আঙুলগুলি যেন বিপরীত দিকের কাঁধ স্পর্শ করে। বস্ত্রাদি অপসারণের প্রয়োজন নাই। বাহু ও বুকের মাঝখানে প্যাডিং দিয়া দুইটি চওড়া ব্যাণ্ডেজ দিয়া বুকের সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। তারপর স্লিং দিয়া হাত ঝুলাইয়া দিবে।

কব্জি ভাঙিলে উপরের নিয়মে প্রতিবিধান দিবে। তবে স্লিং দিয়া হাত ঝুলাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রোণীচক্র ভঙ্গ (Fracture of the Pelvies) **:** ইহা ভাঙিলে নিতম্ব ও কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ হয়। নাড়াচাড়া ও কাশিতে যন্ত্রণা বাড়ে। রোগী দাঁড়াইতে পারে না। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হইলে প্রস্রাবের রঙ কালো দেখায়।

প্রতিবিধান : হাঁটু সোজা রাখিয়া রোগীকে চিত করিয়া শোয়াও। রোগী হাঁটু মুড়িতে চাহিলে হাঁটুর নীচে একটি কম্বল ভাঁজ করিয়া দিবে। সত্বর চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

উরু, জানুফলক এবং পদভঙ্গ (Fracture of the thigh bone, kneecap; and leg) **:** ইহাদের যে কোন একটি ভাঙিলে আহত ব্যক্তিকে চিত করিয়া শোয়াইবে। আঘাতের স্থানে স্প্লিণ্ট লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। ভগ্নস্থান নিয়া বেশী নড়াচড়া করিবে না। সত্বর চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

পিষ্ট পদ (Crushed foot) ঃ পা পিষ্ট হইয়া ক্ষত সৃষ্টি করিতে পারে। ক্ষত দেখা দিলে জুতা খুলিয়া ফেলিবে। জুতা খুলিতে অসুবিধা হইলে উহা কাটিয়া ফেলিবে। তারপর আহত পাখানি তুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে এবং ক্ষতের চিকিৎসা চালাইবে। পা স্থিতিশীল রাখিবার জন্য একটি স্প্লিণ্ট লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে।

পায়ে ক্ষত না হইলে মোজা খুলিবার প্রয়োজন নাই। আহত পাখানি উঁচু করিয়া রোগীকে আরামদায়ক ভঙ্গীতে রাখিতে বল।

বেদনা (Pain) ঃ নানাকারণে এবং শরীরের নানা জায়গায় বেদনা দেখা দিতে পারে। ইহা কোন অসুখ নয় তবে অসুখের পূর্বলক্ষণ সূচনা করে। বাতের জন্য হাত-পায়ের গিটে, আবার অজীর্ণ, গুরুভোজন, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি কারণে অন্য কতকগুলি রোগের পূর্বলক্ষণ হিসাবে পেটে বেদনা দেখা দিতে পারে। লক্ষণ অনুযায়ী বেদনার চিকিৎসা চালাইতে হইবে, যেমন কোষ্ঠকাঠিন্যজনিত বেদনায় কোন laxative-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে, পরন্তু গুরুভোজন হইলে লেবুজল পান করিতে দিলে উপকার পাওয়া যায়। বেদনার সঠিক কারণ বোঝা না গেলে সর্বদা চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

কাটিয়া যাওয়া (Cuts)

আমাদের দেহচর্ম কোন ধারাল বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে কাটিয়া যাইতে পারে। এইভাবে শরীরের কোন অংশ আঁচড়াইয়া বা ছড়িয়া যাওয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এইরূপ আঘাতের প্রতিবিধান খুবই সহজ ! পরিষ্কার তুলা কিংবা বস্ত্রখণ্ডে আয়োডিন. বেঞ্জিন কিংবা ডেটল মাখাইয়া ক্ষতস্থানটিতে বুলাইয়া দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ক্ষতস্থানটি যদি অপরিষ্কার হয়, অথবা উহাতে ধারাল কাচ, পুরাতন ভাঙা টিন কিংবা কোন কাঁটা ফুটিয়া থাকে তবে প্রথমে সন্তর্পণে ঐ বিজাতীয় বস্তুটি বাহির করিয়া লইয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড জলে ভিজাইয়া ধুলাবালি মুছিয়া লইবে। তারপর আয়োডিন কিংবা বেঞ্জিন মাখাইয়া তুলার প্যাড দিয়া আঘাতের স্থানটি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলেই চলিবে। বিজাতীয় পদার্থটি যদি বাহির করা সম্ভব না হয়, তবে আঘাতের স্থানের উপরে প্রথমে তুলা দিয়া তারপর উহার চারিপাশে প্যাড দিবে। ঐ প্যাড যেন ক্ষতস্থান হইতে যথেষ্ট উপরে থাকে। এইবার প্যাডের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া সর্বদা চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

দেহচর্ম সামান্য কাটিয়া গেলে শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু আমাদের দেহের সর্বত্র কতকগুলি তন্তু ছড়াইয়া আছে। এই তন্তুগুলি যদি কোন কারণে কাটিয়া গিয়া ছিদ্র বা ক্ষত উৎপন্ন করে তবে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ, ছিদ্রপথ গভীর হইলে উহা দিয়া অবিরাম রক্তক্ষরণ হইতে থাকে এবং ঐ পথে নানারূপ রোগজীবাণু দেহে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। এইরূপ ক্ষত নানা প্রকারের ঃ—

(1) **কর্তনজনিত ক্ষত** (Incised wound) ঃ কোন ধারাল অস্ত্র, যেমন—ছুরি, বঁটি, ক্ষুর বা ব্লেড দিয়া আমাদের শরীরের অংশবিশেষ কাটিয়া গিয়া যে ক্ষত উৎপন্ন হয় তাহাকে বলে কর্তনজনিত ক্ষত। এইরূপ ক্ষতে সাধারণতঃ অবিরাম রক্তপাত হয়।

(2) **ছিন্নভিন্ন ক্ষত** (Lacerated wounds) ঃ কলকব্জা, শেলের অংশ অথবা জীবজন্তুর নখের আঘাতে আমাদের শরীর ছিন্নভিন্ন হইয়া কাটিয়া যায়। রক্তনালীগুলি ছিন্নভিন্ন হয় বলিয়া উহাতে কর্তনজনিত ক্ষতের মত অবিরাম রক্তপাত হয় না।

(3) পিষ্ট হইয়া ক্ষত (Contused wounds) : ইহাতে দেহস্থিত তন্তুগুলি ছিঁড়িয়া যায় না তবে থেঁতলাইয়া বা পিষ্ট হইয়া যায়। কোন ভোঁতা যন্ত্রের আঘাতে বা পেষণে পিষ্টক্ষতের সৃষ্টি হয়।

দেহ এইভাবে পিষ্ট হইলে বা থেঁতলাইয়া গেলে ত্বক্‌ হয়ত কাটিয়া যায় না কিন্তু ত্বকের অভ্যন্তরে কৈশিক নালী দিয়া প্রচুর রক্তক্ষরণ হইতে থাকে। যে স্থানে আঘাত লাগে সেই স্থানটি নীল বর্ণ ধারণ করে এবং স্ফীত হইয়া উঠিতে পারে। ইহাকেই বলে কালশিরা (Bruise)।

কালশিরার প্রতিবিধান : স্পিরিট ও জল সমপরিমাণে মিশাইয়া আঘাতের স্থানে ঠাণ্ডা সেঁক (compress) লাগাও। চোখে কালশিরা পড়িলে স্পিরিট ব্যবহার করিও না। শুধু জলপটি লাগাও।

(4) বিদ্ধ ক্ষত (Punctured wound) : ইহাতে ক্ষতের মুখ ছোট কিন্তু খুব গভীর হইতে পারে। সাধারণতঃ সূচ, ছুরি, বন্দুকের ছুঁচলো অগ্রভাগের আঘাতে এইরূপ ক্ষত উৎপন্ন হয়।

রক্তক্ষরণ (Bleeding)

ক্ষত গভীর হইলে ক্ষতস্থান দিয়া রক্তক্ষরণ হইতে থাকে। প্রতিবিধানকারীর এইক্ষেত্রে প্রধান কাজ হইল রক্তক্ষরণ বন্ধ করা। অধিক পরিমাণে রক্ত ক্ষরিত হইতে থাকিলে রোগীকে প্রথমেই শোয়াইয়া দিবে এবং ক্ষতস্থানটি উঁচু করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। তারপর যথাসম্ভব বস্ত্রাদি অপসারণ করিয়া ক্ষতস্থান উন্মুক্ত করিয়া দেখিবে রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে কিনা। রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেলে উহা অপসারিত করিবে না। ক্ষতস্থানে ধুলাবালি লাগিয়া থাকিলে তাহা ধুইয়া ফেলিয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া ড্রেসিং করিয়া ফেলিবে।

আঘাতের পরিমাণ গুরুতর হইলে অনেক সময় রক্তক্ষরণ বন্ধ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ঐ সকল ক্ষেত্রে আঘাতের স্থানে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করিয়া রক্তক্ষরণ বন্ধ করিতে হয়।

(১) প্রত্যক্ষ চাপসৃষ্টির সাহায্যে রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ

ক্ষতস্থানের যেখানে হইতে রক্ত পড়িতেছে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া সেই স্থানটি চাপিয়া ধর। যদি রক্তক্ষরণের স্থানটি দেখিতে বা ধরিতে পারা না যায় তবে সমগ্র ক্ষতস্থানটি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিবে। এইরূপভাবে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাহাকে বলে প্রত্যক্ষ চাপ। রক্তক্ষরণ কমিয়া আসিলে আঘাতের স্থান ড্রেস করিয়া দিবে।

(২) পরোক্ষ চাপসৃষ্টির সাহায্যে রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ

যে সকল স্থানে প্রত্যক্ষ চাপ ব্যর্থ হয়, কিংবা প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, যেমন ক্ষতস্থানে যদি কোন বিজাতীয় বস্তু থাকিয়া যায় তবে সেই সকল স্থানে পরোক্ষ চাপ প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়। পরোক্ষ চাপ দুই প্রকারে সৃষ্টি করা যায়—(ক) প্রেসার পয়েন্ট চাপ দিয়া কিংবা (খ) কনস্ট্রিকটিভ ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করিয়া।

(ক) প্রেসার পয়েন্ট : রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার জন্য যেখানে কোন ধমনী কিংবা শিরাকে উহার ঠিক নীচেকার অস্থির উপর চাপিয়া ধরা যায় তাহাকে প্রেসার পয়েন্ট বলে।

(খ) **কনস্ট্রিকটিভ ব্যাণ্ডেজ (Constrictive Bandage)ঃ** ইহা এক প্রকার সরু ব্যাণ্ডেজ। ব্যাণ্ডেজটির প্রান্তে দুইটি সরু ফিতা লাগান থাকে। এই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অত্যন্ত সহজ। ক্ষতস্থানের চারিপাশ ঘিরিয়া খুব শক্ত করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয়, নতুবা রক্তক্ষরণ আরও বেশী হইবে। পনের মিনিট পর ব্যাণ্ডেজ আলগা করিয়া দেখিতে
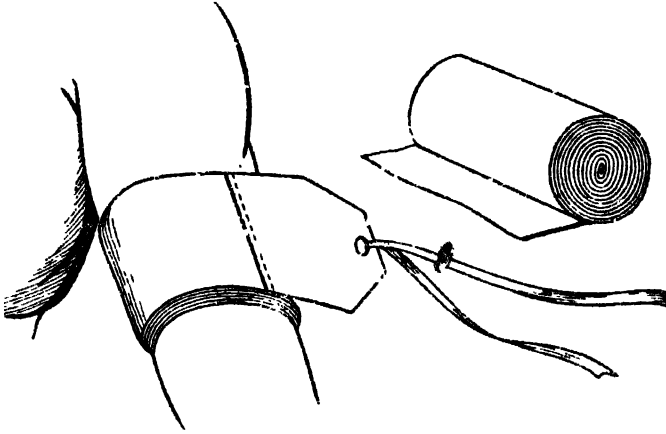
কনস্ট্রিকটিভ ব্যাণ্ডেজ

হয় রক্তক্ষরণ বন্ধ হইয়াছে কিনা, নতুবা আবার দৃঢ়ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। রক্তক্ষরণ বন্ধ হইলে ব্যাণ্ডেজ ঢিলা করিয়া রাখিবে। কনস্ট্রিকটিভ ব্যাণ্ডেজের অভাবে সাধারণ ব্যাণ্ডেজ কিংবা রুমালে একটি গেরো দিয়া লইয়া কাজ চালান যাইতে পারে। গেরোটি প্রেসার পয়েন্টের উপর রাখিয়া রুমাল বা ব্যাণ্ডেজের প্রান্ত দুইটি বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া নিয়া গ্রন্থি রচনা করিতে হয়।

অভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ হইতে রক্তক্ষরণঃ কেবল যে তীক্ষ্ন অস্ত্রে কাটিয়া গিয়া, ছোরা ও গুলির আঘাত লাগিয়া কিংবা চাপ, ধাক্কা ইত্যাদির ফলে দেহস্থিত অস্থি ভাঙিয়া গিয়া রক্তক্ষরণ হয় তাহাই নয়, অনেক সময় আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ হইতেও রক্তক্ষরণ হইতে থাকে। এই রক্তক্ষরণের কারণ চিকিৎসক ভিন্ন অপর ব্যক্তির নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ দুই রকমের—প্রকাশ্য (visible) ও গুপ্ত (concealed)। প্রকাশ্য রক্তক্ষরণের সময় মুখ দিয়া কিংবা মলমূত্রের সঙ্গে রক্ত বাহির হইয়া আসে। দেহের কোন্ অংশ হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছে তাহা রক্তের রং দেখিয়া অনুমান করা যায়। এই অনুমানের সুবিধার জন্য নীচে একটি তালিকা দেওয়া গেল।

ফুসফুস হইতেঃ সফেন রক্ত কাশির সঙ্গে উঠিয়া আসে। ইহার বর্ণ উজ্জ্বল লাল।

পাকস্থলী হইতেঃ বমনের সহিত রক্ত বাহির হইতে থাকে। ইহা দেখিতে কফির গুড়ার মত।

অন্ত্রের ঊর্ধ্বাংশ হইতেঃ ক্ষরিত রক্তের বর্ণ আলকাতরার মত।

অন্ত্রের নিম্নাংশ হইতেঃ ক্ষরিত রক্তের বর্ণ স্বাভাবিক।

মূত্রগ্রন্থি হইতে ঃ প্রস্রাবের সহিত রক্ত বাহির হয়। উহা ধোঁয়াটে অথবা লাল বর্ণের। এইরূপ রক্তক্ষরণের সময় মূত্রগ্রন্থির চারিপাশে ব্যথা অনুভূত হয়।

মূত্রাশয় হইতে ঃ রক্ত প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয় এবং প্রস্রাবে কষ্টবোধ হয়।

পরন্তু যকৃৎ (Liver), প্লীহা (Spleen) কিংবা অগ্ন্যাশয় (Pancreas) হইতে যে রক্তক্ষরণ হয় তাহা বাহির হইতে প্রকাশ পায় না (concealed bleeding)। চোখে দেখা যায় না বলিয়া রক্তক্ষরণ বন্ধ হইতে বিলম্ব হয় এবং ফলে চিকিৎসারও বিলম্ব ঘটে। অপ্রকাশিত বা গুপ্ত রক্তক্ষরণ তাই বড় বিপজ্জনক।

গুপ্ত রক্তক্ষরণের লক্ষণসমূহ

(১) রোগী দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহার মাথা ঘুরিতে পারে, কখনও বা মূর্ছা দেখা দেয়।

(২) মুখ ও ঠোঁট পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করে।

(৩) দেহচর্ম শীতল ও বিবর্ণ দেখায়।

(৪) ভীষণ তৃষ্ণাবোধ হইতে থাকে।

(৫) অস্থিরতা বাড়িয়া যায় এবং রোগী বেশী কথা বলিতে চেষ্টা করে।

(৬) নাড়ি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দ্রুত হয়। কখন কখন উহার স্পন্দন অনুভব করা যায় না।

(৭) শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত ও কষ্টকর হয়। মাঝে মাঝে হাই ওঠে ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

(৮) রোগী বায়ুর জন্য ব্যাকুল হয় (Air hunger)।

(৯) অচেতন হইয়া পড়িতে পারে।

বায়ুর জন্য ব্যাকুলতা, ভীষণ তৃষ্ণাবোধ এবং অস্থিরতা গুপ্ত রক্তক্ষরণ সূচনা করে। অন্যান্য লক্ষণগুলি স্নায়বিক আঘাতের ক্ষেত্রেও উপস্থিত থাকে।

প্রতিবিধান

(১) রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ কর।

(২) কোন খাদ্য বা পানীয় দিও না।

কয়েকটি বিশেষ স্থান হইতে রক্তক্ষরণ

আমাদের গণ্ডদেশ, জিহ্বা, মাড়ি, দাঁতের গর্ত, নাক ও কান প্রভৃতি স্থান হইতেও মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে। এই সমস্ত রক্তক্ষরণকে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ বলিয়া ভুল করিও না।

গলার সম্মুখের অংশ কিংবা জিহ্বা হইতে রক্তক্ষরণ হইতে থাকিলে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড কিংবা তুলা দিয়া রক্তক্ষরণের স্থানটি চাপিয়া ধর; **দাঁতের মাড়ি হইতে** যদি রক্ত পড়ে তাহা হইলে অনুরূপভাবে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড বা তুলা দিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা কর।

দাঁতের গর্তে যদি রক্তক্ষরণ হয়, তবে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড বা তুলা দিয়া প্রথমে গর্ত বুজাইয়া দাও। তারপর গর্তের পরিমাণ এক টুকরা তুলা উহার উপর রাখিয়া রোগীকে দাঁত দিয়া স্থানটি চাপিয়া ধরিতে বল।

নাক হইতে রক্তক্ষরণ ঃ (১) রোগীর মাথা সামনের দিকে ঝুকাইয়া রাখ এবং মুক্ত বায়ুতে রোগীকে বসাইয়া দাও।

(২) গায়ের আঁটসাট বস্ত্রাদি ঢিলা করিয়া দাও।

(৩) রোগীকে মুখ খুলিয়া রাখিতে বল এবং মুখ দিয়া নিঃশ্বাস লইতে বল।

(৪) রোগীর নাকের শক্ত অংশ নীচের দিকে জোর করিয়া ধরিতে বল।

(৫) রোগীর নাক ঝাড়িতে দিও না বা নাক বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিও না।

(৬) ইহাতে রক্ত বন্ধ না হইলে বরফ আনিয়া রোগীর নাকে দাও অথবা খুব ঠাণ্ডা জল নাকের উপর ঢালিতে থাক। বরফ দিলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

অচৈতন্য রোগীর নাক দিয়া রক্তক্ষরণের প্রতিবিধান

(১) কাঁধ এবং মাথা উঁচু করিয়া রাখ।

(২) পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া দাও এবং নাকের উপরিভাগে ধীরে ধীরে বুলাইতে থাক।

(৩) মুখ দিয়া যাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চালাইতে পারে এইজন্য মুখ খুলিয়া রাখ।

(৪) যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরিতেছে ততক্ষণ জিহ্বা টানিয়া ধরিয়া রাখ। নতুন জিহ্বা গলার ভিতরে আটকাইয়া গিয়া রোগীর নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

কান দিয়া রক্তক্ষরণ

(১) রোগীর মাথা সামান্য উঁচু করিয়া রাখিয়া যেদিকে আঘাত লাগিয়াছে সেই দিকে হেলাইয়া রাখ।

(২) কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিবার চেষ্টা করিও না।

(৩) একটি শুকনো ড্রেসিং দিয়া কানের উপর আলগাভাবে ব্যাণ্ডেজ কর।

করতল (Palm) হইতে রক্তক্ষরণ

কয়েকটি ধমনী আসিয়া করতলে মিশিয়াছে বলিয়া করতল হইতে রক্তক্ষরণ তীব্র হইতে পারে। করতলের ক্ষতে যদি কোন বাহিরের বস্তু না থাকে তবে ড্রেসিং ও প্যাড সরাইয়া আঙুল মুষ্টিবন্ধ করিয়া দাও। এইবার একটি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ লইয়া উহা বাঁধিয়া দাও।

স্ফীত (Varicose) শিরাসমূহ হইতে রক্তক্ষরণ

স্ফীত শিরা কাটিয়া গিয়া রক্তক্ষরণ হইতে পারে। তবে দেহের সমস্ত শিরা অপেক্ষা পায়ের শিরার রক্তক্ষরণই সবচেয়ে মারাত্মক। এই রক্তক্ষরণ বন্ধ করিতে না পারিলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

(১) আহত ব্যক্তির পা যথাসম্ভব উঁচু করিয়া তাহাকে চিত হইয়া শুইতে বল।

(২) একটি পরিষ্কার প্যাড দিয়া ক্ষতস্থানটি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দাও।

(৩) পায়ে গার্টার জাতীয় শক্ত কিছু বাঁধা থাকিলে তাহা খুলিয়া ফেল।

বক্ষ বা উদরের ক্ষতকে গুরুতর আপৎকালীন অবস্থা বলিয়া গণ্য করিবে এবং শীঘ্র চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

দাহ (Burning) ঃ দাহের ফলে চর্ম লাল বর্ণ ধারণ করিতে পারে কিংবা চর্মের ভিতরকার তন্তুগুলি পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। দহনের সঙ্গে তীব্র বেদনাবোধ ও জ্বালা দেখা দেয়। কোন ক্ষেত্রে স্নায়বিক আঘাত লাগাও অসম্ভব নয়।

দগ্ধস্থান জীবাণুমুক্ত রাখিতে হইবে এবং চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত ঐভাবে রাখিতে হইবে। দগ্ধস্থান জীবাণুমুক্ত করিয়া রাখা ভাল এবং যতদূর সম্ভব উহা নাড়াচাড়া করিবে না। শিশুদের দেহ সামান্য পুড়িয়া গেলেও উহা গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করিবে এবং অবিলম্বে চিকিৎসকের নিকট পাঠাইবে।

কোন ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রে আগুন লাগিয়া গেলে সাহায্যকারী ব্যক্তি আপনার আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিবে। সে তাহার সম্মুখে একটি কম্বল, কোট কিংবা পুরু টেবিল ঢাকনা লইয়া উহাদ্বারা জ্বলন্ত ব্যক্তিকে জড়াইয়া চিত করিয়া শোয়াইয়া ফেলিবে। একলা থাকিলে যদি আগুন লাগিয়া যায় তবে মেঝেতে গড়াইয়া হাতের নিকট যে আচ্ছাদন পাইবে তাহা দিয়া আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিবে এবং সাহায্যের জন্য লোকজন ডাকিবে। দেহে আগুন লাগিলে কদাপি দৌড়াইয়া উন্মুক্ত স্থানে যাইতে নাই। তাহাতে আগুন আরও বেশি জ্বলিয়া ওঠে।

দাহ প্রতিবিধানের সাধারণ নিয়ম

(১) দগ্ধস্থান অযথা নড়াচড়া করিও না।

(২) দগ্ধস্থানে কোনরূপ লোশন লাগাইবে না।

(৩) দগ্ধপোশাক অপসারিত করিবে না এবং ফোস্কা গালিয়া দিবে না।

(৪) শুষ্ক জীবাণুশূন্য ড্রেসিং কিংবা পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া দগ্ধস্থান ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিবে। ফোস্কা থাকিলে ব্যাণ্ডেজ আলগা রাখিবে।

(৫) সামান্য পুড়িয়া গেলে চিনি দিয়া হাল্কা চা প্রভৃতি গরম পানীয় প্রচুর পরিমাণে পান করিতে দিবে।

(৬) দহন যদি গুরুতর হয় সত্বর রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণ কর। আহত ব্যক্তিকে অজ্ঞান করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। তাই মুখ দিয়া কিছু খাওয়াইবে না। যদি ঘণ্টা চারেকের মধ্যে চিকিৎসকের সাহায্য না পাওয়া যায় তবে লবণমিশ্রিত জল পান করিতে দিবে। দুই গ্লাস জলে আধ চামচ লবণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে আধ চামচ সোডিয়াম বাইকারবোনেট মিশাইয়া পান করিতে দিবে।

রাসায়নিক পদার্থে দগ্ধ হইলে উহার প্রতিবিধান

১। অম্লদ্রব্যে দগ্ধ হইলে ঃ

(ক) দগ্ধ অঙ্গ প্রচুর জলে ধুইয়া ফেল কিংবা ডুবাইয়া রাখ।

(খ) এক পাইণ্ট গরম জলে চা-চামচের দুই চামচ সোডি বাইকারবোনেট মিশ্রিত করিয়া লোশন প্রস্তুত কর এবং উহাদ্বারা আহত স্থান ধুইয়া ফেল।

২। চুন প্রভৃতি ক্ষার পদার্থে দগ্ধ হইলে ঃ

(ক) চুনে পুড়িয়া গেলে চুন ঝাড়িয়া ফেল।

(খ) আহত স্থান প্রচুর জলে ধুইয়া ফেল।

(গ) ভিনিগার অথবা লেবুর রস সমপরিমাণ গরম জলে মিশিত করিয়া লোশন প্রস্তুত কর এবং লোশন দ্বারা ক্ষতস্থান ধুইয়া ফেল।

(ঘ) দাহের চিকিৎসা চালাও।

বিজাতীয় বস্তু (Foreign bodies) ঃ

দেহচর্মে কোন বিজাতীয় বস্তু প্রবেশ করিলে ঃ সূচ, পুরাতন ভাঙা লোহা বা কাচের টুকরা, মাছের কাঁটা ইত্যাদি বাহিরের কোন বস্তু চর্মে প্রবেশ করিলে আঘাতের স্থানটি স্থিতিশীল রাখিবে এবং চিকিৎসকের সাহায্যে উহা অপসারণ করিবে।

চক্ষুর মধ্যে কিছু প্রবেশ করিলে ঃ ধুলা, বালি, কয়লার গুঁড়া অথবা চোখের পাতার ছেঁড়া লোম (eye lash) চোখের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দারুণ অস্বস্তি সৃষ্টি করে। বাহিরের কোন বস্তু চোখের তারায় গিয়া আটকাইলে গুরুতর বিপদ দেখা দেয়। সুতরাং চোখের ভিতর কোন বস্তু প্রবেশ করিলে উহা সত্বর অপসারণের ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রতিবিধান ঃ (১) আহত ব্যক্তিকে চোখ রগড়াইতে দিবে না। শিশুর ক্ষেত্রে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে নতুবা দেহের সঙ্গে হাত বাঁধিয়া রাখিবে।

(২) আহত ব্যক্তিকে আলোর দিকে মুখ করিয়া বসাও এবং তাহার নীচেকার পাতা টানিয়া ধর। (ক) যদি বিজাতীয় কোন পদার্থ নজরে পড়ে এবং যদি দেখা যায় উহা চক্ষুগোলকে আটকাইয়া যায় নাই তবে পরিষ্কার একটি বস্ত্রখণ্ড অথবা রুমালের কোণ পাকাইয়া জলে ভিজাইয়া বস্তুটি ধীরে ধীরে অপসারিত কর।

(খ) বস্তুটি চক্ষুগোলকে আটকাইয়া থাকিলে উহা অপসারণের চেষ্টা করিও না। আহত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করিয়া নরম তুলার প্যাড দিয়া চোখ ব্যাণ্ডেজ করিয়া দাও এবং চিকিৎসকের সাহায্য নাও।

(গ) চোখের ভিতর যদি কোন বিজাতীয় বস্তু দেখা না যায় কিন্তু উপরের পাতায় কিছু প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ থাকে তবে উপরের পাতাটি সম্মুখের দিকে টানিয়া ধর এবং নীচের পাতাটি উপরের পাতার নীচ পর্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া বুলাইয়া আন। নীচের পাতার লোমগুলি বুরুশের কাজ করিবে এবং কয়েকবার এইভাবে নীচের পাতা

বুলাইয়া আনিলে পদার্থটি বাহির হইয়া আসিতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল না হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রতিবিধান কর ঃ

আহত ব্যক্তিকে আলোর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসাও এবং তাহার মাথা তোমার বুকের উপর চাপিয়া ধর। এইবার এক হাতে একটি দেশলাই-এর কাঠি উপরের পাতার উপর এক কিনারায় চাপিয়া ধর এবং অন্য হাত দিয়া উপরের পাতা উল্টাইয়া দাও। তারপর রুমালের কোণ জলে ভিজাইয়া বস্তুটি বাহির করিয়া আন।

(ঘ) অনেক সময় বিজাতীয় বস্তুটি চলিয়া গেলেও চোখের ভিতর একটা দারুণ অস্বস্তি হইতে থাকে। এইরূপ অস্বস্তি বোধ করিলে এবং চোখের ভিতর কোন পদার্থ না দেখা গেলে চোখে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দাও।

(ঙ) চোখে এলকালি (Alkali) অথবা দাহক অ্যাসিড (corrosive acid) পড়িলেও চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিতে হইবে। তারপর নরম তুলার প্যাড দিয়া চোখে আলগাভাবে ব্যাণ্ডেজ করিয়া আহত ব্যক্তিকে সত্বর চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর।

কানে কিছু প্রবেশ করিলে ঃ কোন কীটপতঙ্গ প্রবেশ করিলে কানে খানিকটা অলিভ অয়েল, স্যালাড অথবা সার্জিকাল স্পিরিট ঢালিয়া দাও। ইহাতে পতঙ্গটি ভাসিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া আসিবে। অন্য কোন কঠিন দ্রব্য প্রবেশ করিলে উহা বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া আহত ব্যক্তিকে সত্বর চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর।

নাকের ভিতর কিছু প্রবেশ করিলে ঃ আহত ব্যক্তিকে মুখ দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালাইতে বলিবে এবং বাহ্য পদার্থটি বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে সত্বর চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর।

পাকস্থলীর ভিতর কোন বস্তু প্রবেশ করিলে ঃ অসাবধানতাবশতঃ টাকা, পয়সা, বোতাম, আলপিন, সূঁচ ইত্যাদি পেটের ভিতর চলিয়া যাইতে পারে। রোগীকে তখন কোন কিছু খাইতে দিবে না এবং চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করিবে। মসৃণ কোন পদার্থ গিলিয়া ফেলিলে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। মলের সঙ্গে উহা বাহির হইয়া যাইবে।

গলায় মাছের কাঁটা আটকাইলে ঃ গলায় মাছের কাঁটা আটকাইলে দারুণ অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। কখনও বা বমি হইতে পারে। মাছের কাঁটা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

শ্বাসনালীর ভিতর বিজাতীয় বস্তু প্রবেশ করিলে ঃ শ্বাসনালীর ভিতর কোন খাদ্যকণা কিংবা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বস্তু আটকাইয়া যাইতে পারে। দুর্ঘটনা গুরুতর আপৎকালীন অবস্থা বলিয়া গণ্য করিবে কারণ, বস্তুটি শীঘ্র বাহির হইয়া না আসিলে রোগী শ্বাসরোধ হইয়া মারা যাইবে। তাই দুর্ঘটনা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণ করিবে। আহত ব্যক্তি যদি শিশু হয়, তবে চিকিৎসকের সাহায্য পাইবার পূর্বে তাহার পা দুইখানি ধরিয়া মাথাটি নীচের দিকে রাখিয়া দেখ বস্তুটি বাহির হইয়া আসে কিনা।

জন্তু-জানোয়ার ও কীট-পতঙ্গের দংশন (Bites and Stings)

কুকুর, শৃগাল, বাঘ, নেকড়ে বাঘ, ঘোড়া, বাঁদর প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ারের দংশন অত্যন্ত বিপজ্জনক কেননা এই সমস্ত পশু জলাতঙ্ক নামে একপ্রকার মারাত্মক ব্যাধির দ্বারা

আক্রান্ত হইয়া থাকে। জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত কোন পশু মানুষকে দংশন করিলে দংশিত ব্যক্তিরও ঐ রোগ হইবে। উপরোক্ত সকল পশুরই জলাতঙ্ক রোগ ছড়াইবার ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু মানুষ সমস্ত পশুর তুলনায় কুকুরের সংস্রবেই বেশী আসিয়া থাকে। তাই সাধারণতঃ কুকুরের দ্বারা মানুষের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগ সংক্রামিত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পালিত কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ঘটনা কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়, তবে শীতপ্রধান দেশে পালিত কুকুরকেও মানুষ কামড়াইতে দেখা যায়। গৃহপালিত কুকুরের দংশনেও বিষ থাকে। সুতরাং প্রত্যেক কুকুর-পালকেরই নিজ নিজ কুকুর সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত।

কুকুরের দংশনের প্রতিবিধান ঃ

(১) দংশিত ব্যক্তিকে অবিলম্বে চিকিৎসকের কাছে পাঠাইবে।

(২) রক্তক্ষরণ হইতে দিবে, কেননা ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের ফলে বিষ স্নায়ু বরাবর কেন্দ্রীয় স্নায়বিক প্রণালীতে চলিয়া যায়।

(৩) দংশিত স্থান নীচু করিয়া রাখিবে।

(৪) পটাশ পারমাঙ্গানেট জলের সঙ্গে মিশাইয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দাও।

(৫) যদি শীঘ্র চিকিৎসকের সাহায্য না পাওয়া যায় এবং ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় তবে অবিলম্বে ক্ষতস্থান দগ্ধ করিয়া দিবে। তীব্র কার্বলিক অ্যাসিড বা নাইট্রিক অ্যাসিডই ক্ষতস্থান দগ্ধ করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ঔষধ। দেশলাই-এর কাঠি বা অন্য ছুঁচলো কাঠি অ্যাসিডে ডুবাইয়া ক্ষতস্থানের চারিপার্শ্বে বুলাইয়া দিবে। ঘটনাস্থলে অ্যাসিড না পাওয়া গেলে একটি তপ্ত শলাকা দিয়া দংশিত স্থান পোড়াইয়া দিবে। তবেই ভাইরাস ধ্বংস হইয়া যাইবে। তবে দংশনের পর আধঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেলে আর দগ্ধ করিবার সার্থকতা নাই।

(৬) শুষ্কবস্ত্রখণ্ড দিয়া ক্ষতস্থান ড্রেসিং করিয়া দাও।

কুমীর, হাঙর ও সর্পের দংশনের প্রতিবিধান ঃ

আমাদের দেশে কুমীর, হাঙর কিংবা সর্পের দংশনের ঘটনা বিরল নয়। কুমীর ও হাঙরের দংশনের ফলে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কি দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে পারে।

কুমীর ও হাঙরের দংশনে ঃ

(১) রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে।

(২) স্নায়বিক আঘাতের (shock) চিকিৎসা করিবে।

(৩) ক্ষতস্থান ভাল করিয়া ড্রেস করিয়া দিবে।

সর্প দংশন ঃ পৃথিবীতে প্রায় সতের শত রকমের সাপ আছে। উহাদের মধ্যে ৩৫০ শত রকমের সাপ আবার বিষধর সাপ বলিয়া গণ্য। বিষধর সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। তাই বিষধর সাপ সাধারণতঃ লোকালয় বর্জন করিয়া চলে। যে সব সাপ সচরাচর আমরা দেখিতে পাই উহাদের দংশন মারাত্মক হয় না।

তবে অত্যন্ত ভয় পাইবার ফলে দংশিত ব্যক্তির দেহে অনেক সময় স্নায়বিক আঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বিষাক্ত সাপ কামড়াইলে সেই বিষ যাহাতে সমগ্র শরীরে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে সেজন্য জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

(১) সাপ কামড়াইলে উহার বিষ রক্ত সঞ্চালনের মধ্য দিয়া সমগ্র দেহে ছড়াইয়া পড়ে। তাই প্রথমেই রক্ত চলাচল বন্ধ করিবার জন্য বাহু কিংবা উরুতে দংশিত স্থান ও হৃদ্‌যন্ত্রের মাঝামাঝি কোন স্থান খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। অগ্রবাহু বা পায়ের উপরে কখনো বাঁধিবে না। প্রায় বিশ মিনিট পর্যন্ত এই বন্ধন রাখিয়া এক মিনিট আলগা দিয়া পরক্ষণেই আবার টানিয়া বাঁধিয়া দিবে। চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত এইভাবে কাজ চালাইয়া যাও।

(২) চাপিয়া বাঁধিবার পর ক্ষতস্থান পটাশ পারমাঙ্গানেটমিশ্রিত জল দিয়া ধৌত করিয়া দিবে। তারপর দংশিত স্থানটির কাছাকাছি কোথাও তীক্ষ্ন ছুরি, ক্ষুর, কিংবা ব্লেড দিয়া ¼ ইঞ্চি গভীর করিয়া চিরিয়া ফেল এবং ঐ স্থানে পটাশ পারমাঙ্গানেটের গুঁড়া ঘষিয়া দাও। যে ছুরি অথবা ব্লেড দিয়া ক্ষতস্থান চিরিবে তাহা আগুনে পোড়াইয়া লইবে কিংবা কিছুক্ষণ স্পিরিটে ভিজাইয়া লইবে।

(৩) দংশিত ব্যক্তির দেহ উত্তপ্ত রাখ এবং তাহাকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দাও।

(৪) গরম পানীয়, যথা—কড়া চা, কফি কিংবা দুধ খাইতে দাও। এই সময় মাদক দ্রব্য পান করিতে নাই।

(৫) দংশিত ব্যক্তির মন প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিবে। ভয় পাইলে তাহার স্নায়বিক আঘাতের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(৬) যদি নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায় তবে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস আনিবে।

রক্তশোষক জোঁক ঃ জলাশয় ও জঙ্গলই হইল রক্তশোষক জোঁকের আস্তানা। রক্ত খাইয়া ইহারা বাঁচিয়া থাকে। সুযোগ পাইলেই ইহারা মানুষ কিংবা জন্তু-জানোয়ারের দেহ এমনভাবে কামড়াইয়া ধরে যে উহাদের ছাড়ান কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

প্রতিবিধান ঃ (১) দেহ হইতে জোঁক ছাড়াইবার জন্য উহার শরীরে জ্বলন্ত দেশলাই বা সিগারেট চাপিয়া ধর। লবণ, চুন, পেট্রল অথবা প্যারাফিন ঢালিয়া দিলেও জোঁক ছাড়িয়া যায়।

(২) বাই-কার্বনেট অব সোডা, অ্যামোনিয়া অথবা কোন লোশন দিয়া জ্বালা দূর করিতে চেষ্টা কর।

(৩) শুষ্ক ড্রেসিং প্রয়োগ কর।

কীটপতঙ্গের হুল বিদ্ধ করা ঃ পিঁপড়া, শুঁয়াপোকা, বিষাক্ত মাকড়সা, মৌমাছি, ভীমরুল, কাঁকড়া-বিছা ইত্যাদি কীট মানুষের দেহে হুল বিদ্ধ করে। এইসব কীট যে স্থানে হুল বিদ্ধ করে সেই স্থান ফুলিয়া উঠে এবং তখন স্নায়বিক আঘাতের সৃষ্টি করে। শিশুদের পক্ষে এইরূপ হুল মারাত্মক হয়। কাঁকড়া-বিছার কামড় অত্যন্ত মারাত্মক। ইহাদের হুলে হাত-পায় খিল ধরিতে পারে।

প্রতিবিধান ঃ (১) যে স্থানে হুল বিদ্ধ হইয়াছে সেখানে বাই-কার্বনেট অব সোডা, তরল অ্যামোনিয়া অথবা এন্টিহিস্টামাইন (antihistamine) লাগাও।

(২) কাঁকড়া-বিছা দংশন করিলে Scorpion antitoxin ইনজেকশন দেওয়া হয়। তবে কেবল অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাই ইহা দিতে পারেন।

(৩) স্নায়বিক আঘাত প্রতিরোধের চেষ্টা কর।

(৪) আমাদের দেশে বোলতা হুল ফুটাইলে ক্ষতস্থানে তৎক্ষণাৎ মধু কিংবা গোময় প্রয়োগ করিবার বিধি আছে। ইহাতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৫) শুঁয়োপোকা কামড়াইলে আহত স্থানে চুন লাগাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দাও। তারপর একটি ছুরি দিয়া ধীরে ধীরে চাঁছিয়া ফেল। দেখিবে সমস্ত হুল উঠিয়া আসিয়াছে।

মূর্ছা (Fits)

মূর্ছা যাইবার নানাবিধ কারণ আছে ঃ মৃগীরোগ তাহাদের অন্যতম। মৃগীরোগ দুই ধরনের—সামান্য (minor) ও গুরুতর (major)। সামান্য রকম মৃগী রোগে চোখের তারা স্থির হইয়া যায় এবং রোগী সাময়িকভাবে মূর্ছাগ্রস্ত হয়। গুরুতর মৃগীরোগের মূর্ছা বহুক্ষণ ধরিয়া থাকে। রোগী নিজেই বুঝিতে পারে সে মূর্ছা যাইবে। রোগীর মাথাধরা, উত্তেজনা ও অবসাদ দেখা দেয়। মূর্ছিত অবস্থায় রোগীর চারিটি লক্ষণ পরিস্ফুট হয় ঃ

(১) রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং মাঝে মাঝে চীৎকার করিতে থাকে।

(২) রোগী প্রথমে কয়েক সেকেন্ড ধরিয়া শক্ত হইয়া থাকে এবং তাহার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করে।

(৩) অতঃপর তড়কা (convulsion) শুরু হয়। মুখ দিয়া ফেনা নির্গত হয় এবং রোগী মলমূত্রের বেগ ধারণে অক্ষম হয়। এইরূপ রোগী আপনার জিহ্বা কামড়াইতে পারে এবং হাতের নিকট কোন জিনিস পাইলে তাহার দ্বারা নিজেকে আঘাত করিয়া বসিতে পারে।

(৪) কিছুক্ষণ পরে তড়কা বন্ধ হইয়া গেলে রোগী হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে এবং অস্বাভাবিকভাবে হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে।

মৃগীরোগ ব্যতীত কোন মানসিক উত্তেজনার ফলেও রোগীর কার্যকলাপ সাময়িকভাবে আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। সাধারণতঃ দুর্বলচিত্তে লোকদের এইরূপ মানসিক আবেগে মূর্ছা যাইতে দেখা যায়। এই ধরনের মূর্ছাকে বলে হিস্টিরিয়া। হিস্টিরিয়া হইলে রোগীর হাত-পা শক্ত হইয়া যায় এবং বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। কখনও কখনও হিস্টিরিয়ার সঙ্গে তড়কা অর্থাৎ খিঁচুনিও দেখা দেয়।

প্রতিবিধান ঃ মূর্ছাগ্রস্ত রোগীর বস্ত্রাদি ঢিলা করিয়া দিবে এবং ঘরের দরজা-জানালা সব খুলিয়া দিবে। রোগীর হাতের কাছের সমস্ত দ্রব্য সরাইয়া ফেলিবে। সু বিধামত রোগীর দাঁতের মধ্যে চামচের হাতল প্রবেশ করাইয়া দিবে যাহাতে সে আপনার জিহ্বা কামড়াইয়া দিতে না পারে। রোগীর মুখের ফেনা পরিষ্কার করিয়া দাও।

রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর যদি হিস্টিরিয়া বলিয়া বোধ হয় তবে রোগীর প্রতি সহানুভূতি দেখাইবে না। তাহার সহিত দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলিবে, তবে কোনরূপ শাসন করিবে না। রোগী যতক্ষণ না সুস্থ হইয়া উঠিতেছে ততক্ষণ তাহাকে পর্যবেক্ষণাধীন রাখ।

অজ্ঞান অবস্থা (Fainting)

অনেক সময় অত্যাধিক গরম, ক্ষুধা, ক্লান্তি বা দুর্বলতাবশতঃ মস্তিষ্কে রক্তের সরবরাহ কমিয়া যায়। মস্তিষ্কে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত সরবরাহ না হইলে কিংবা রক্তের চাপ কমিয়া গেলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। ভয় পাইলে বা হঠাৎ দুঃসংবাদ শুনিলে অথবা দেহে কোন ভীষণ বেদনা উপস্থিত হইলে রক্তের চাপ কমিয়া যাইতে পারে। উত্তপ্ত বা বন্ধস্থানে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে কিংবা কোন কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হইলেও লোকে অজ্ঞান হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত মৃগী রোগেও অজ্ঞান অবস্থা দেখা যায়।

অজ্ঞান অবস্থার লক্ষণসমূহ ঃ অজ্ঞান হইবার পূর্বে রোগীর মাথাধরা ও চলাফেরায় কষ্ট প্রকাশ পাইতে পারে। অজ্ঞান হইবার পূর্বে মুখমণ্ডল সাধারণতঃ রক্তশূন্য ও পাণ্ডুর দেখায়। দেহচর্ম ঠাণ্ডা ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে। নাড়ি দুর্বল ও মন্থর গতিতে চলে এবং শ্বাসক্রিয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকে।

প্রতিবিধান ঃ কোন ব্যক্তি অজ্ঞান হইবার উপক্রম হইয়াছে দেখিলে তাহার মাথা দ্রুত নীচের দিকে নামাইয়া দিবে। যোগী যদি বসিয়া থাকে তবে হাঁটুর মধ্যে মাথা রাখিয়া পা পর্যন্ত ঝুলাইয়া দিবে। স্মেলিং সল্ট প্রয়োগ করিবে। রোগীর গলা, বুক ও কোমরের কাপড় ঢিলা করিয়া দিবে এবং রোগীর মুখে কৃত্রিম দাঁত থাকিলে তাহাও খুলিয়া ফেলিবে। রোগী যাহাতে যথেষ্ট মুক্ত বায়ু পাইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিও। অত্যাধিক ভিড়ের চাপে রোগী অজ্ঞান হইয়া থাকিলে ভিড় সরাইয়া দিবে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হইতে রোগীকে অপসারিত করিয়া যেখানে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যাইতেছে সেখানে নিয়া আসিবে। আরোগ্যলাভের পর রোগীকে গরম পানীয় দিবে।

রক্তক্ষরণ হেতু রোগী অজ্ঞান হইয়া থাকিলে প্রথমেই রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চেতনা ফিরাইয়া আনিবার প্রতিবিধান চালাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

F. শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যসূচী
(Child Development and Guidance Programme)

1. শিশুদের পর্যবেক্ষণ করা ও তাহাদের যত্ন লওয়া ঃ (Study and care of children)

(a) **সারা বছর ধরিয়া স্বাস্থ্যবান এবং আকর্ষণের বস্তু হইয়া থাকা।**

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মধ্যেই শিশুর প্রথম আবির্ভাব ঘটে। ঐ সময় হইতে প্রত্যেক জননীকে দুইটি কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ, শিশুর দৈহিক প্রয়োজন কি? দ্বিতীয়তঃ, কিভাবে ঐ প্রয়োজন মিটাইয়া তাহাকে স্বাস্থ্যবান ও আকর্ষণের বস্তু করিয়া তোলা যায়? সংক্ষেপে বলা যায় সদ্যোজাত শিশুর প্রয়োজন পাঁচটি—**খাদ্য, নীরবতা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ বায়ু ও উত্তাপ।** শিশুর দৈহিক প্রয়োজনের মধ্যে প্রথমেই পড়ে খাদ্য।

শিশুর খাদ্য

ক্যালোরী ঃ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আমাদের তাপের প্রয়োজন হয়। খাদ্যদ্রব্য হইতেই দেহে এই তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রয়োজনীয় তাপের পরিমাণ শারীরিক পরিশ্রম ও দেহের ওজনের উপর নির্ভর করে। এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শারীরিক পরিশ্রম কেবলমাত্র হাত-পা নাড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং শারীরিক পরিশ্রম ঐ বয়সের শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তায় পার্থক্য ঘটায় না। এইজন্য উহাদের দেহের ওজনের দ্বারা সর্বদা ক্যালোরীর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। সাধারণতঃ ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই প্রতি পাউণ্ড শরীরের ওজনের জন্য ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী থাকে এবং ধীরে ধীরে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা কমিতে থাকে। দেখা গিয়াছে যে এক বৎসর বয়স পর্যন্ত গড়পড়তা প্রতি পাউণ্ড শরীরের ওজনের জন্য প্রায় ৫৫ হইতে ৬০ ক্যালোরী (১২০ ক্যালোরী প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজনের জন্য) তাপের প্রয়োজন হয়। শিশুর দেহে এই তাপ কিভাবে জোগান দেওয়া যাইতে পারে? তাপ উৎপাদক খাদ্যের মধ্যে ফ্যাট বা স্নেহই হইতেছে প্রধান। কিন্তু শিশুর এই সময় স্নেহ হজম করিবার শক্তি কম থাকে। ফলে স্নেহপদার্থের পরিবর্তে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনই প্রধানতঃ শিশুর দেহে তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে। এইজন্য এই সময় শিশুর খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়। খাদ্যের প্রোটিন শিশুর দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ছাড়াও প্রধানতঃ তাপ উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রোটিন ঃ প্রোটিনের প্রথম এবং প্রধান কাজ দেহের ক্ষয়পূরণ করিয়া উহার বৃদ্ধি সাধন করা। শিশুর দেহ এই সময় দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং উহার খাদ্যে যথেষ্ট

পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন থাকা প্রয়োজন। শিশুর এক বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতি পাউণ্ড দেহের ওজনের জন্য গড়পড়তা প্রায় ১·৫ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই পরিমাণ প্রোটিন দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করিয়াও দেহে তাপ উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে। জন্মের প্রথম কয়েক মাস শিশু এই প্রোটিন মাতৃ-দুগ্ধ হইতেই পাইতে পারে। মাতৃ-দুগ্ধে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন ল্যাক্টো অ্যালবুমিন বর্তমান। উহা সহজেই হজম হয়। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-দুগ্ধের প্রোটিন দেহের সমস্ত চাহিদা পূরণ করিতে পারে না। এইজন্যই মাতৃ-দুগ্ধের সঙ্গে অন্যান্য প্রোটিনজাত খাদ্য শিশুকে খাওয়াইতে হয়। ৩।৪ মাস বয়স হইতে শিশুকে গরুর দুধ, ডিমের কুসুম ইত্যাদি খাওয়াইলে এই প্রোটিনের অভাব পূরণ হয়। গরুর দুধে প্রোটিনের পরিমাণ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা বেশী। তবে এই প্রোটিন (ক্যাসিন) মাতৃদুগ্ধের প্রোটিনের মত সহজ-পাচ্য নয়। এইজন্যই শিশুকে ধীরে ধীরে গরুর দুধ ধরাইতে হয়। তাহা না হইলে পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে। ৭।৮ মাসের শিশুকে প্রোটিনের জন্য মাংসের সুপ ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটিন না পাইলে শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হইবে।

কার্বোহাইড্রেট ঃ কার্বোহাইড্রেট তাপ উৎপাদক খাদ্য। শিশুর দেহে তাপ উৎপাদন করাই উহার প্রধান কাজ। প্রতি পাউণ্ড দেহের জন্য শিশুর প্রতিদিন প্রায় ৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট প্রয়োজন হইয়া থাকে। জন্মের সময় শিশুর পরিপাক শক্তি দুর্বল থাকে। এইজন্য তখন সহজপাচ্য কার্বোহাইড্রেট খাইতে দেওয়া প্রয়োজন। স্টার্চ ইত্যাদি কঠিন-পাচ্য কার্বোহাইড্রেট এই সময় শিশু হজম করিতে পারে না। মাতৃদুগ্ধের কার্বোহাইড্রেট (ল্যাক্টোজ) সহজপাচ্য। এইজন্য প্রথম ২।৩ মাস শিশুকে অন্য কোন কার্বোহাইড্রেট না দিয়া দুগ্ধই খাইতে দেওয়া উচিত। চিনিও একটি সহজপাচ্য কার্বোহাইড্রেট। তবে ধীরে ধীরে ইহা ধরাইতে হয়। ৫।৬ মাসের শিশুকে আলু, ভাত ইত্যাদি স্টার্চজাতীয় কার্বোহাইড্রেট ও সুসিদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এইভাবে ধীরে ধীরে সহজপাচ্য হইতে কঠিনপাচ্য কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যে শিশুকে অভ্যস্ত করাইতে হয়। উপযুক্ত পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট না পাইলে শিশু দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং উহার ওজন যথাযথ বৃদ্ধি পাইবে না।

স্নেহ ঃ স্নেহজাতীয় খাদ্য দেহে প্রধানতঃ তাপ উৎপন্ন করিয়া থাকে। জন্ম হইতে এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর খাদ্যে কতটুকু স্নেহপদার্থ থাকা দরকার তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয় নাই। মাতৃদুগ্ধে স্নেহের পরিমাণও কম থাকে। তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যে সহজপাচ্য স্নেহ পদার্থ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া স্নেহ জাতীয় খাদ্যে সাধারণতঃ ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' দ্রবীভূত থাকে। ফলে স্নেহজাতীয় খাদ্যে যেমন ক্যালোরীর চাহিদা পূরণ হয় তেমনি ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি'ও দেহে সরবরাহ করা হয়। জন্মের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ২।৩ ফোঁটা কড্‌লিভার অয়েল বা শার্কলিভার অয়েল দেওয়া যাইতে পারে। ৪।৫ মাসে শিশুকে একটু করিয়া মাখন ধরান যায়। তাছাড়া দুধের স্নেহতো আছেই। স্নেহ পদার্থের অভাবে দেহে ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি'র অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে শিশু পুষ্ট হইবে না এবং সহজেই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইবে।

ভাইটামিন ঃ দেহকে সুস্থ ও রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেই ভাইটামিনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভাইটামিন 'ডি' দেহের অস্থি বা হাড় গঠনে সহায়তা করে, এই ভাইটামিনের অভাব হইলে শিশুর হাড় ঠিকভাবে বাড়িতে পারিবে না এবং সে রিকেট রোগাক্রান্ত হইতে পারে। মাতৃদুগ্ধ হইতে শিশু ইহা পায় না। সুতরাং জন্মের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতেই শিশুকে কড-লিভার বা শার্ক-লিভার অয়েল দিতে হইবে। অপর একটি ভাইটামিনও মাতৃ-দুগ্ধে তেমন পাওয়া যায় না। ইহা হইতেছে ভাইটামিন 'সি'। এইজন্য কমলালেবুর রস, টমেটোর রস ইত্যাদি শিশুকে প্রথম হইতেই খাওয়াইয়া এই অভাব পূরণ করিতে হয়। 'এ' এবং 'বি' ভাইটামিনসমূহ সাধারণতঃ শিশু প্রথম প্রথম মাতৃ-দুগ্ধ হইতেই পায়। তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ভাইটামিনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ৬।৭ মাসের শিশুকে সবুজ সাক-সবজির জুস খাইতে দিয়া এই অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। ভাইটামিনের অভাব হইলে শিশু দুর্বল, ফ্যাকাশে ও রুগ্ন হইবে।

ধাতব লবণ ঃ দেহের বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং উহাকে সুস্থ রাখাই ধাতব লবণের কাজ। বিভিন্ন প্রকার ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহ জাতীয় ধাতব লবণই শিশুর পক্ষে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অস্থি ও হাড়ের প্রধান উপাদান। সুতরাং শিশুর খাদ্যে এই সকল লবণের অভাব হইলে শিশুর হাড় পুষ্ট হইবে না এবং সে 'রিকেট' রোগাক্রান্ত হইতে পারে। মাতৃ দুগ্ধে এবং গো-দুগ্ধে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস আছে। সুতরাং ঐ দুগ্ধ হইতেই শিশু তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাইতে পারে। এক বছর পর্যন্ত শিশুর খাদ্যে প্রতি পাউন্ড দেহের ওজনের প্রায় ০'৬ হইতে ০'৮ গ্র্যাম ক্যালসিয়াম থাকা প্রয়োজন। মাতৃ-দুগ্ধে লৌহেরও যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হয়। প্রতি পাউন্ড দেহের ওজনের জন্য প্রতিদিন প্রায় ৬ মিলিগ্রাম লৌহ এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর খাদ্যে থাকা প্রয়োজন, কিন্তু এই পরিমাণ লৌহ শিশু দুগ্ধ হইতে পায় না। ফলে ডিমের কুসুম ও শাক-সবজির জুস দিয়াই শিশুর লৌহের চাহিদা পূরণ করিতে হয়। ৪।৫ মাস বয়স হইতেই শিশুকে এই সকল খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। লৌহজাতীয় খাদ্য দেহে রক্ত-প্রস্তুতিতে সাহায্য করে। সুতরাং লৌহঘটিত খাদ্যের অভাব হইলে শিশুর দেহে রক্তাল্পতা দেখা দিবে ও সে 'অ্যাসিডিক' রোগাক্রান্ত হইবে।

জল ঃ এছাড়া শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণ জল খাওয়াইতে হইবে। প্রতি পাউন্ড দেহের ওজনের জন্য প্রতিদিন প্রায় ১'৫ হইতে ২'৫ আউন্স জলের প্রয়োজন। জল ফুটাইয়া ঠান্ডা করিয়া শিশুকে মাঝে মাঝে খাইতে দিবে। সর্বদাই ফুটান জল খাওয়ান উচিত কারণ জলে নানাপ্রকার রোগজীবাণু থাকিতে পারে। জলের সাহায্যে দেহের দূষিত পদার্থসমূহ বিভিন্ন পথে বাহির হইয়া যায়। ফলে দেহ সুস্থ থাকে।

দেখা যাইতেছে সারা বছর ধরিয়া সুস্থ থাকার প্রথম ও প্রধান উপকরণ হইল খাদ্য। উপযুক্ত আহার না পাইলে শিশুর যথাযথ বিকাশ হয় না। দৈহিক বিকাশের উপর মানসিক বিকাশও বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই শিশুকে উপযুক্ত পরিমাণে আহার দেওয়াই তাহাকে সুস্থ ও সবল রাখার প্রধান উপায়।

নীরব পরিবেশে বিশ্রামও শিশুর আরেকটি দৈহিক প্রয়োজন। শিশুকে তাই একাকী বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে হয়। অতিরিক্ত ক্লান্ত বা উত্তেজিত হইয়া ঘুমাইতে না দিয়া

প্রথম হইতেই শিশুকে নির্জন পরিবেশে ধীরে ধীরে ঘুমের মধ্যে প্রবেশ করিতে শিখান উচিত। কারণ এইভাবে ঘুমাইতে অভ্যস্ত হইলে পরিণত বয়সে অল্প বিশ্রামের ফল ভাল হয়।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা শিশুর অন্যতম দৈহিক প্রয়োজন। অপরিচ্ছন্নতার ফলেই আমাদের দেশের লোকেরা নানা প্রকার রোগে ভুগিয়া থাকে। শিশুর দেহ অত্যন্ত কোমল, তাহার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও খুব কম। তাই বয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় শিশুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মিত স্নানের প্রয়োজন আরও বেশী।

বিশুদ্ধ বায়ু ও প্রয়োজনীয় উত্তাপও শিশুর দৈহিক প্রয়োজনের অন্তর্গত। এই দুইটির অভাবে শিশুর দেহ উপযুক্তভাবে বাড়িতে পারে না। গৃহের সর্বাপেক্ষা আলো-বাতাসপূর্ণ কক্ষটি শিশুর জন্য নির্বাচন করা উচিত। শীতকালে শিশুকে উপযুক্ত জামাকাপড় পরাইতে হয় এবং নিয়মিত রৌদ্র-স্নান দিতে হয়। তবে গ্রীষ্মকালে অনাবশ্যক জামাকাপড় দিয়া শিশুকে মুড়িবার প্রয়োজন নাই।

উপরোক্ত বিধিগুলি পালন করিলেই সে স্বাস্থ্যে সুখে ও মনের আনন্দে দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। তাহার ঘুমের, স্নানের, আহারের, আদরের এমন কি কোলে লইবারও নির্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক।

(b) **জন্ম, শৈশব ও প্রাপ্তবয়স্ককাল : জীবনের প্রথম দ্বাদশ বৎসর** (Birth, infancy & maturation. The first dozen years)

জন্মকাল হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের এই জীবিতকালকে রুশো চারটি সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শৈশব (infancy), পাঁচ হইতে বার বৎসর পর্যন্ত বাল্য (childhood) ; বার হইতে পনেরো বৎসর পর্যন্ত প্রাক্-কৈশোর (Early abolescence) এবং পনেরো হইতে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত কৈশোরোত্তর (Late abolescence) কাল। ডঃ আর্নেস্ট জোন্স্‌ও মানুষের জীবনকে চারিটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন। রুশোর মত তিনি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রথম স্তরকে শৈশব এবং বার বৎসর পর্যন্ত দ্বিতীয় স্তরকে বাল্য আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু তারপর তাঁহার মতে অষ্টাদশ বর্ষ পর্যন্ত তৃতীয় স্তরটি কৈশোর ও শেষের স্তরটি হইল প্রাপ্ত বয়স্ককাল। রুশো কিংবা ডঃ জোন্স্ কেহই জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভের অবস্থাটিকে জীবনকালের মধ্যে গণনা করেন নাই। কিন্তু মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে শিশুর দেহের যতখানি পরিবর্তন সাধিত হয় জন্মের পর সারাজীবনেও ততখানি পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং মানবজীবনকে আমরা নিম্নরূপ পাঁচটি স্তরে ভাগ করিতে পারি :

(১) মাতৃগর্ভে অবস্থিতি ;

(২) জন্মের পর ৫ বৎসর শৈশবকাল ;

(৩) ৫ হইতে ১২ বৎসর বাল্যকাল ;

(৪) ১২ হইতে ২০ বৎসর কৈশোর—কৈশোর আবার দুইটি উপবিভাগে বিভক্ত—(ক) প্রাক্‌কৈশোর, (খ) কৈশোরোত্তর।

(৫) প্রাপ্তবয়স্ককাল।

শৈশব : শিশুর ক্রমবিকাশকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—দৈহিক, মানসিক, ভাষাগত, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক চেতনার বিকাশ।*

* শিশুর বিকাশ সম্বন্ধে একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য (ষষ্ঠ অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

দ্রুত দৈহিক বিকাশ শৈশবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। জন্মের পর এক মাসেই শিশু মাথা তুলিতে পারে, দুই মাসে মাথা খাড়া করিতে পারে, পাঁচমাসের সময় কিছুতে ঠেসান দিয়া বসিতে পারে, আট নয় মাসে দাঁড়াইতে পারে, নয় দশ মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে, এক বছরের মধ্যেই হাঁটিতে শেখে, পনের মাসে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে পারে এবং দেড় বছরে দৌড়াইতে পারে। দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলে মানসিক বিকাশ ও ভাষা শিক্ষার পালা। জন্মক্রন্দনের মধ্য দিয়া তাহার ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু হয়। তারপর প্রাক্‌কথন স্তর অতিক্রম করিয়া প্রায় এক বৎসর বয়সে সে কথা বলিতে শুরু করে।

ইতর প্রাণীদের মত শিশু কেবল সহজাত প্রবৃত্তির বশ। দেহের আনন্দ-বেদনার অনুভূতিটাই তাহার প্রবল থাকে। শুধু ভাললাগা মন্দলাগার মাপকাঠি দিয়া সে তাহার অচেনা জগৎকে বিচার করে। তবে ইতর প্রাণী যেমন এই স্তরেই থাকিয়া যায়, মানব-শিশু যখন শিখিতে শুরু করে তখন তাহার এই প্রবৃত্তিমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হয়।

তিন চারি বৎসর বয়স হইতে শিশুর মনে আত্মপর বোধ জাগিয়া ওঠে এবং সে অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়ে। জগতের সব কিছু যেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিতেছে, সে চায় সবাই কেবল তাহারই দিকে নজর দিক, সকলেই তাহার হুকুম পালন করুক। কোন রকমের ভাগীদার সে সহ্য করিতে পারে না। বাবা-মায়ের ভালবাসার উপর সে একাধিপত্য চায়, তাই ভাইবোন, বিশেষতঃ ছোট ভাইবোনদের উপর তাহার হিংসা আসে।

এই আত্মকেন্দ্রিকতার চরম পরিণতি আত্মপ্রেম। শিশু আপনার প্রেমে আপনি মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এই প্রবৃত্তিটির নাম দেওয়া হইয়াছে নার্শিসিজম (Narcissism)। গ্রীক গাথার এক আত্মপ্রেমমুগ্ধ নায়ক নার্শিসাসের কাহিনী হইতেই এই আত্মপ্রেমজনিত প্রবৃত্তিটির উক্ত নামকরণ হইয়াছে।

শিশু এই বয়সে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী থাকে। সে তখন বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে চায় না। শিশুর মনে আত্মপ্রসারেচ্ছা খুব প্রবল থাকে কিন্তু বাহিরের রূঢ়বাস্তবের নিকটে গিয়া সে এক প্রবল বাধা পাইতে থাকে। ফলে শিশু বাহিরের জগৎ হইতে নিজেকে গুটাইয়া ফেলে এবং সে গিয়া কল্পনার জগতে ঠাঁই লয়। এই কল্পনারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট স্বয়ং শিশু। ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করিয়া সে মাকে বিপদের মুখ হইতে উদ্ধার করে ; কখনো বা রামের মত বনবাসে যায়, কখন হয় বিড়াল ছানার কানাই মাস্টার, কখনো বা গলির মুখের ফেরিওয়ালা। শিশুর এই জাতীয় খেলার নাম দেওয়া হইয়াছে **কল্পনাবিলাসের খেলা** (Make believe play)।

বছর তিনেক বয়সের শিশুর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল পুনরাবৃত্তি বা জানা পথে চলিবার প্রবৃত্তি। এই সময়ে শিশুরা একই ধরনের খেলা খেলিতে, একই সুরের পুরান ছড়া বরাবর আবৃত্তি করিতে ভালবাসে। বস্তুতঃ নতুন পরিবেশ, নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জন্য শিশুমন তখনও প্রস্তুত হয় নাই। তাই তাহার সব কিছুতেই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

তিন বছর পর্যন্ত অনুকরণ প্রবৃত্তিও খুব প্রবল থাকে। এই অনুকরণ প্রবৃত্তির

ফলেই শিশু ভাষা শিক্ষা করে। খেলাধুলা, কাজকর্ম সব কিছুর মধ্যে বড়দের অনুকরণ করিয়া সে ধীরে ধীরে সমাজায়িত হইয়া ওঠে।

মানসিক বিকাশের দিক দিয়া শিশুর সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হইল কৌতূহল। সাধারণতঃ চার বৎসর বয়সের সময় তাহার এই কৌতূহল বেশী দেখা যায়। শিশুরা এই সময় খেলনা পাইলে ভাঙিয়া চুরিয়া দেখে উহা কিভাবে তৈরী। এই কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে গিয়া সে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তাহার কৌতূহল হইতেই জ্ঞান-পিপাসার গভীরতা, শিশুর মানসিক বিকাশের গতি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

শিশুর যৌন চেতনা ঃ ফ্রয়েড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন বড়দের মতই শিশুরও যৌনচেতনা রহিয়াছে। তবে শিশুর এই যৌনচেতনা প্রজননমূলক নয়। আপনার দেহের যে কোন স্থান বা প্রক্রিয়া হইতে যৌন আনন্দ পাওয়া যায় শিশু তাহাতেই নিযুক্ত হয়। শিশুর রতির আকাঙ্ক্ষা আপন দেহে আবদ্ধ বলিয়া মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর যৌন চেতনার নাম দিয়াছেন স্বরতিমূলক (auto-erotic) যৌন-চেতনা। একটু বড় হইলে ছেলে-শিশুদের আসক্তির পাত্রী হন মা এবং মেয়ে-শিশুদের ক্ষেত্রে বাবা। ফ্রয়েডের মতে এই আসক্তি মূলতঃ যৌন এবং ফ্রয়েড ইহার নাম দিয়াছেন ইডিপাস* কমপ্লেক্স (Oedipus complex)।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শৈশবই মানুষের শিক্ষার দিক হইতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সময়। এই সময় দেহের ও মনের শক্তিগুলি নমনীয় ও পরিবর্তনশীল থাকে, সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে ইচ্ছামত পরিচালনা করিয়া উহাদের ফিরান যায়। শৈশবই তাই শিশুর সর্বাঙ্গীণ গঠনের উপযুক্ত সময়।

বাল্য ঃ শৈশবের সঙ্গে বাল্যের একটা বিস্ময়কর পার্থক্য লক্ষণীয়। শৈশবে সব কিছুই থাকে একটা অসংযত ও অসংহত অবস্থায়। কি দৈহিক কি মানসিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই শিশুর একটা এলোমেলো বিপর্যস্ত ভাব দেখা যায়। কিন্তু বাল্যে উহার পরিবর্তে একটা অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব আত্মপ্রকাশ করে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতই তাহার আচরণ ধীর, সুসংহত। এইজন্য আর্নেস্ট জোন্‌স্‌ বয়ঃপ্রাপ্তিকে বাল্যের পুনরাবৃত্তি বলিয়াছেন।

বাল্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যূথবদ্ধতা। আত্মকেন্দ্রিক শিশুর মধ্যে সংঘচেতনা জাগিয়া ওঠে এবং সে দল গঠন করে। অন্তর্মুখী শিশু ধীরে ধীরে বহির্মুখী বালকে পরিণত হয়। পিতামাতা ও অন্যান্য বালকদের চেয়ে তাহার উপর দলের প্রভাব তখন বেশী। দলের নিন্দা, স্তুতি তাহার জীবনের মূল্য-বিচারের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়ায়। বাল্যে আত্ম-প্রচারের স্পৃহা বড় হইয়া ওঠে। আত্মপ্রচার ত একা একা সম্ভব হয় না, তাই অনুরাগী দল চাই।

সংঘপ্রিয়তা হইতে বালকের মনে গণমানসের অভ্যুদয় ঘটে। বালক গৃহে বাবামায়ের কর্তৃত্বাধীনে যে কাজ একা একা সমাধা করিতে পারে না, দলের সঙ্গে পড়িয়া উহাই সে

* গ্রীসের অন্তর্গত থীবসের রাজপুত্র। শৈশবে সে এক পাহাড়ে পরিত্যক্ত হয় এবং রাখালের গৃহে পালিত হয়। বড় হইয়া সে নিজের দেশে আসিয়া পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করে এবং স্বীয় জননীকে বিবাহ করে। এই কাহিনী হইতেই মায়ের প্রতি যৌন আসক্তির নামকরণ হইয়াছে ইডিপাস কমপ্লেক্স।

অনায়াসে সম্পাদন করে। "মিলেমিশে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ"—এই ভাবটি তখন প্রবল হইয়া ওঠে। এই প্রবৃত্তিটিকে তাই সৎপথে পরিচালনা করিতে পারিলে বালক ধীরে ধীরে একটি সুস্থ সুন্দর নাগরিকে পরিণত হইতে পারে।

শৈশবের সহজাত প্রবৃত্তিগুলিও ধীরে ধীরে বালকের আয়ত্ত হয়। ঈর্ষা, দ্বেষ ইত্যাদি ভাবাবেগগুলি আর পূর্বের মত নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে না, ক্রমশঃ সেগুলির গতি উর্ধ্বমুখী হয়। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বালক ক্রমশঃ খাপ খাইতে শেখে।

(c) **যৌবনোদ্গম ও বৃদ্ধি** (Puberty & Growth) ঃ

১২ হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত সময়কে কৈশোর কাল আখ্যা দেওয়া হয়। কৈশোর আবার দুইটি উপবিভাগে বিভক্ত—প্রাক্‌কৈশোর ও কৈশোরোত্তর। প্রাক্‌কৈশোরেই মানুষের প্রথম যৌবনোদ্গম হয়।

মানুষের জীবনের সব কয়টি বিভাগের মধ্যে যৌবনোদ্গমের সময়টি হইল সবচেয়ে জটিল ও সমস্যামূলক। স্টানলে হল কৈশোরের উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিয়া উহার নাম দিয়াছেন 'ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ কাল'। বালক এতকাল যে পথ ধরিয়া চলিতেছিল অকস্মাৎ তাহার মোড় ফেরে পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাভাবনা যেন এক ঝড়ের ঝাপটায় ওলটপালট হইয়া যায়। অপরিণত বালকজীবন এবং পূর্ণ যুবকজীবন—এই দুয়ের সন্ধিকাল এই কৈশোরকাল। এই সময়ের মনস্তত্ত্ব অতি জটিল, দেহ ও মনের পরিবর্তন সমস্যামূলক এবং চিন্তাভাবনা খাপছাড়া। এই বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এত দ্রুত সংগঠিত হয় যে বালক অনেক সময় সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে পারে না। ফলে বড়দের চোখে তাহাদের আচরণ ও কথাবার্তায় অনেক অসঙ্গতি, অশেষ ত্রুটি ধরা পড়ে।

যৌবনোদ্গমে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

দৈহিক পরিবর্তন ঃ প্রথম ঋতুর আগমন মেয়েদের দেহে যৌবন সূচনা করে। সাধারণতঃ বার হইতে ষোল বৎসরের মধ্যে মেয়েদের প্রথম ঋতু হইয়া থাকে। তাই এই বয়সেই মেয়েদের প্রথম যৌবন আরম্ভ হয়। মেয়েদের বেলা যেমন যৌবন সমাগমের একটি নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখা যায় ছেলেদের বেলা কিন্তু সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ থাকে না। কতকগুলি বাহ্যিক পরিবর্তন হইতেই ছেলেদের যৌবন আগমন বোঝা যায় যৌবন সমাগমে নারী ও পুরুষ উভয়েরই দেহে কতগুলি বাহ্য এবং অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলিই বাহ্য পরিবর্তনের কারণ।

বাহ্য পরিবর্তনের মধ্যে ছেলেদের এই সময় দাড়ি-গোঁফ দেখা যায়। বস্তি ও অন্যান্য প্রদেশে কেশোদ্গম হয়। গলার স্বর ভারি হয়, সমস্ত দেহে একটি সুন্দর সুঠাম ভাব দেখা দেয় ও দেহ সৌন্দর্যে ভরিয়া ওঠে। মেয়েদের দেহেও এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সময় তাহাদের স্তনযুগল বর্ধিত হয় এবং বস্তি ও অন্যান্য প্রদেশে কেশোদ্গম হইতে শুরু করে। তাহাদেরও গলার স্বর ভারি হয় এবং দেহ লাবণ্য ও শ্রীতে ভরিয়া ওঠে। ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই এই সময় জননেন্দ্রিয় বর্ধিত ও পুষ্ট হইতে থাকে।

প্রধানতঃ যৌন গ্রন্থিতেই অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন বেশী হইয়া থাকে। মেয়েদের প্রধান যৌনগ্রন্থি ডিম্বাধারে (Ovary) এই সময় ডিম্ব (Ovam) সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করে।

ইহাদের মধ্যে একটি হরমোন এস্ট্রোজেন (Estrogen) মেয়েদের দেহে যৌবনের বাহ্যিক লক্ষণগুলি প্রস্ফুটিত করিয়া থাকে। ইহারই প্রভাবে মেয়েদের স্তনযুগল বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশে কেশোদ্গম হইতে থাকে। এই হরমোনের প্রভাবেই জরায়ু (Uterus) ও জননেন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্ট হয় এবং ঋতুর আবির্ভাব ঘটে। ডিম্বাধার হইতে নিঃসৃত অপর হরমোনটি হইতেছে প্রজেস্টেরন (Progesterone)। এই হরমোনের প্রভাব গর্ভকালে নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে এবং স্তনযুগলের আনুষঙ্গিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

পুরুষের প্রধান যৌনগ্রন্থি অণ্ডকোষ (Testes)। যৌবন সমাগমে এই অণ্ডকোষে শুক্রের বা শুক্র-কীটের জন্ম হইতে থাকে এবং তাহাদের প্রজনন শক্তি জন্মায়। মেয়েদের ন্যায় ছেলেদের অণ্ডকোষেও হরমোন উৎপন্ন হয়। এরূপ একটি হরমোন টেস্টোস্টেরন (Testosterone) অণ্ডকোষে শুক্রোৎপাদনে সহায়তা করে। অপর একটি হরমোন এণ্ড্রোস্টেরনের (Androsterone) প্রভাবে জননেন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি ও দেহের বিভিন্ন অংশে কেশোদ্গম হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় হরমোনটির প্রভাবেই যৌবনের বাহ্য লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এখানে একটি কথা মনে রাখা উচিত যে যৌনগ্রন্থি নিঃসৃত এই সকল হরমোনের সৃষ্টি ও ক্রিয়া পিটুইটারি-গ্রন্থি-নিঃসৃত অপর এক প্রকার হরমোনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সুতরাং পিটুইটারি-গ্রন্থি-নিঃসৃত এই হরমোনও পরোক্ষ ভাবে মানুষের যৌবনবিকাশে সাহায্য করে।

মানসিক পরিবর্তন ঃ কিশোর-কিশোরীদের দেহে বিপুল পরিবর্তন আসে বটে কিন্তু মনের পরিবর্তনের তুলনায় দেহের এই পরিবর্তন প্রায় নগণ্য বলিলেই চলে। এই সময় ছেলে-মেয়েদের মনে যৌনচেতনার উন্মেষ হয় এবং ছেলে-মেয়েরা পরস্পরের প্রতি এক বিরাট আকর্ষণ অনুভব করিতে থাকে। হ্যাডো কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে বার তের বছর বয়স হইতেই ছেলে-মেয়েদের শিরায় শিরায় যৌবন-জলতরঙ্গ উদ্বেল হইয়া ওঠে। ইহারই নাম কিশোরকাল। এই সময় জোয়ারের স্রোতের অনুকূলে যদি নবজীবনের যাত্রা শুরু করা যায় তবে জীবনতরী সৌভাগ্যের কূলে গিয়া ভিড়িতে পারিবে ; তা নইলে নয়। বস্তুত এই সময় কিশোর-কিশোরীদের প্রতি অভিভাবকদের সতর্ক এবং সহানুভূতিশীল দৃষ্টি থাকা দরকার। নতুবা কুসঙ্গে পড়িয়া ছেলেরা সহজেই বিপথগামী হইতে পারে।

কিশোর-কিশোরীরা এই সময় আবার শিশুদের মত অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে। বালক বয়সের সংঘপ্রীতি আবার কমিয়া আসে এবং সে আবার গৃহকোণাশ্রয়ী কল্পনাবিলাসী ভাবুক হইয়া পড়ে। এই বয়সের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল **দিবাস্বপ্ন**। দৈহিক ও মানসিক পরিণতির ফলে তাহার মধ্যে যে চাহিদার সৃষ্টি হয় সেগুলি বাস্তবে তৃপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। ফলে কিশোর সেগুলি তৃপ্ত করিতে দিবাস্বপ্নের সাহায্য নেয়। তাহাদের দিবাস্বপ্ন বিশ্লেষণ করিলে দুই শ্রেণীর স্বপ্ন পাওয়া যায়—আত্ম-প্রতিষ্ঠাঘটিত এবং প্রণয়মূলক। কিশোর স্বপ্ন দেখে সে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পড়াশুনা, খেলাধুলায় সর্বত্রই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেছে। আর স্বপ্ন দেখে যে তাহার আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়ী কিংবা প্রণয়িণীকে লাভ করিতেছে। অধিকাংশ দিবাস্বপ্নই প্রক্ষোভে সিঞ্চিত থাকে এবং সাময়িকভাবে কিশোর-কিশোরীদের তৃপ্তি দেয়। 'দিবাস্বপ্ন' ছেলেমেয়েদের মানসিক

স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনেকখানি সাহায্য করে তবে অতিরিক্ত কল্পনাবিলাস সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী।

কৈশোরে ছেলেমেয়েদের বেশী অলসভাবে কালযাপন করিতে দিলে তাহাদের মনে নানারকম যৌনবিকার দেখা দিতে পারে। তাই মনোবিজ্ঞানীরা কিশোর-কিশোরীদের অবসর মুহূর্তগুলি নানারূপ নির্দোষ খেলাধূলা, গানবাজনা করা, ছবি আঁকা ইত্যাদি আনন্দবর্ধক কাজের মধ্যে নিয়োগ করিতে পরামর্শ দেয়। কিশোরকালই হইল দেহ গঠনের উপযুক্ত কাল। এইজন্যই এই বয়সে দেহকে শক্ত সমর্থ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য কৃচ্ছ্রতা সাধন দরকার। পান, ভোজন, শয়ন, ভ্রমণ, পোশাক-পরিচ্ছদ কোন দিকেই কিশোর-কিশোরীদের যেন বেশী আরামপ্রিয় করিয়া তোলা না হয়। কিশোর বয়স চরিত্র গঠনের সময় জানিয়াই প্রাচীন ভারতে এই সময়টি গুরুগৃহে কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া কাটাইবার রীতি ছিল। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকরাও অনেকেই কিশোরদের কৃচ্ছ্রসাধন সমর্থন করেন।

কৈশোরের আর একটি ধর্ম হইল বীরপূজা। এই বয়সে কিশোর-কিশোরীরা মনে মনে তাহাদের রুচি অনুযায়ী কোন আদর্শ বাছিয়া নেয় এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করিতে চায়। কাহারো এই আদর্শ হয়ত দেশনেতা, ধর্মনেতা, কাহারো বা প্রিয় খেলোয়াড় কিংবা চলচ্চিত্রাভিনেতা বা অভিনেত্রী। এই আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়া কেহ দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে, কেহ ধর্ম জীবনযাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করে। কেহ বা আদর্শ অভিনেতা-অভিনেত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদ, হাবভাব অনুকরণ করিতে চায়। এই বয়সে যাহাদের আদর্শ যত বড় পরবর্তীকালে তাহাদের জীবন ততই সুন্দর ও শ্রীমণ্ডিত হইয়া ওঠে। প্রবল নীতিবোধ ও পরার্থে আত্মবিসর্জন করার আকাঙ্ক্ষাও এই বয়সেই প্রবল থাকে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত অনেক বীরই ছিলেন কিশোর। মোটের উপর আত্মরতি ও পরোপচিকীর্ষা এই দুই বিপরীতমুখী আবেগই কিশোর বয়সে প্রবল থাকে এবং উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কিশোরকাল অতিবাহিত না হইলে যে কোন একটা দিকে জীবনের মানদণ্ড ঝুঁকিয়া ভাবসাম্য নষ্ট করিয়া দিতে পারে। তাই সহানুভূতি ও দরদ সহকারে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া অস্ফুট কলিকাগুলি যাহাতে যৌবনে মুকুলিত হইয়া ওঠে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক অভিভাবকেরই কর্তব্য।

(d) **কিশোর ও অপরাধপ্রবণদের সমস্যা**

(Problems of adolescents and delinquents)

কৈশোরের সমস্যা ঃ কিশোর বয়সে মনের যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে তাহার ফলে ব্যক্তির জীবনে কতকগুলি নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়। কৈশোরের এই সমস্যাগুলির কথা যদি জানা থাকে তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড়দের সঙ্গে যে একটা সংঘাত অনিবার্য হইয়া ওঠে তাহা রোধ করা যায়। কৈশোরের সমস্যাগুলি নিম্নরূপ ঃ—

(১) **স্বাধীনতার সমস্যা ঃ** যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের মনে একটা স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া ওঠে। তাহার এতকালের পরনির্ভরতা কাটাইয়া উঠিতে চায় এবং নিজেকে সমাজের একজন বলিয়া ভাবিতে শুরু করে। ফলে অভিভাবকদের সঙ্গে সংঘাত দেখা দেয়। অভিভাবকদের উচিত এই সময় উপহাস

না করিয়া তাহাদের বক্তব্য এবং মতামত শ্রদ্ধা সহকারে শোনা এবং কোনো কাজের দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া। এইরূপ কাজের ভার পাইলে কিশোরদের মনে দায়িত্ব বোধের সঞ্চার হয় এবং স্বাধীনতার চাহিদা তৃপ্ত হয়।

(২) **যৌন সমস্যা ঃ** এই সময় যৌন আকাঙ্ক্ষার বিকাশ ঘটে বলিয়া ছেলেদের মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েদের ছেলেদের প্রতি একটা আসক্তি জন্মে এবং অনেকেই প্রণয় ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়ে। ছেলেমেয়েদের তখন নানা যৌন সমস্যা দেখা দেয়, অনেকের আবার যৌনবিকৃতি ঘটে। এই বয়সে উপযুক্ত যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত এবং নির্দোষ খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, অভিনয়, সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে কিশোর-কিশোরীদের ব্রতী করা উচিত।

(৩) **বৃত্তিনির্বাচন সংক্রান্ত সমস্যা ঃ** এই বয়সে কিশোর-কিশোরীরা আপন আপন পছন্দ অনুযায়ী বৃত্তি বাছিয়া লইয়া স্বনির্ভর হইবার নানারূপ পরিকল্পনা করে। অভিভাবকরা সাধারণতঃ নিজেদের ইচ্ছাটা ছেলেমেয়েদের উপর চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। ফলে শিক্ষা এবং বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে একটা জবরদস্তি চলে এবং কিশোর-কিশোরীরা একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়। কৈশোরের এই সমস্যাটির যাহাতে সুষ্ঠু সমাধান হয় তাহার জন্য প্রত্যেক কিশোর কিশোরীর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি স্মরণ রাখিয়া প্রত্যেকের প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা দিতে পারিলে একদিকে যেমন মানসিক তৃপ্তি হইবে অন্যদিকে তেমনি তাহাদের আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হইবে এবং জীবনে তাহারা সহজেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইবে।

(৪) **জীবনদর্শন সংক্রান্ত সমস্যা ঃ** জীবনের অর্থ কি? ইহার সার্থকতাই বা কিসে? জীবন-সম্বন্ধে এইরূপ কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন সকল কিশোর-কিশোরীদের মনেই জাগে। এই সময় একটি উচ্চ জীবন-দর্শন তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে না পারিলে কিশোরের প্রানচঞ্চল্য অলস দিবা-স্বপ্নে অতিবাহিত হইতে পারে, এমন কি তাহারা অপরাধপ্রবণও হইয়া পড়ে। এইজন্য প্রত্যেক অভিভাবকেই উচিত কিশোরদের সম্মুখে একটি উচ্চভাবের আদর্শ স্থাপন করা যাহা তাহার সমস্ত জীবনকে অর্থময় করিয়া তুলিতে পারে।

কৈশোরের সমস্যাগুলির সমাধান না হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে তাহার মনের দ্বন্দ্ব সামলাইয়া উঠিতে পারে না, শৈশবের মানসিক কাঠামোতেই ফিরিয়া যায়, শৈশবের মাপকাঠি তাহার জীবনের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়ায়, সে অবুঝের মত আচরণ করে। সেই সময়কার দমিত যৌন-প্রবৃত্তি, আত্মবিস্তার প্রবৃত্তি সমাজবিরোধী আচরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। অচেতন মনের দ্বন্দ্ব হইতে অপরাধ জন্ম নেয়। সে জানিতে পারে না যে অন্যায় কাজ করিতেছে। স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরতার আকাঙ্ক্ষা ব্যাহত হইলে অভিভাবকদের প্রতি একটা বিদ্রোহের ভাব জাগে এবং উহা হইতে আসে চুরি ও গুণ্ডামী ইত্যাদি। অনেকেই আবার বাস্তবের রাজ্য হইতে নিজেকে গুটাইয়া নিয়া দিবা-স্বপ্নের আশ্রয় নেয়। এইভাবে তাহার চরিত্রের সুষ্ঠু বিকাশ স্বভাবতঃই ব্যাহত হয়।

অপরাধ প্রবণতা কৈশোরের ধর্ম নয়। অভিভাবকদের কিশোর মনস্তত্ত্বকে ভুল বুঝিবার ফলে এবং তাহার সমস্যাগুলির উপযুক্ত সমাধান খুঁজিয়া না পাইবার ফলেই কৈশোরে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। শাস্তি দিয়া কৈশোরের এই সকল অপরাধ,

বদখেয়াল কিংবা বেয়াড়াপনার চিকিৎসা সম্ভব নয়। ইহার জন্য চাই সুস্থ পরিবেশ, দরদ এবং প্রবৃত্তির উৎকর্ষণ। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের কাজ হইবে কৌতূহল, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা এবং স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি ইত্যাদি জীবন-প্রয়াসী শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করা এবং আত্মবিস্তারের প্রকৃষ্ট পন্থায় উহাদের কাজে লাগাইয়া জীবনকে তৃপ্ত করা।

অপরাধপ্রবণতা ঃ কিশোরদের মধ্যে আমরা অনেক সময় অবাঞ্ছিত আচরণ দেখিয়া থাকি। এইসব অবাঞ্ছিত আচরণ যখন সমাজবিরোধী কাজের রূপ নেয় তখন তাহাকে অপরাধপ্রবণতা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কৈশোর অপরাধের মধ্যে পড়ে অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারিতা, একগুয়েমি, অসৌজন্য, উচ্ছৃংখলতা, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, অনিয়মানুবর্তিতা, জুয়াখেলা, মাদকদ্রব্য সেবন, যৌন ব্যভিচার ও আত্মহত্যা।

কৈশোরের অপরাধপ্রবণতা অভিভাবক ও মনস্তাত্ত্বিকদের সামনে একটি গুরুতর সমস্যাবিশেষ। বংশধারাবাদীরা এতকাল মনে করিতেন বংশগতিই অপরাধের মূল কারণ এবং অপরাধপ্রবণ হইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। পরন্তু পরিবেশবাদীদের যুক্তি ছিল পরিবেশই মানুষকে অপরাধী তৈরী করে। একান্ত একপেশে বলিয়া এই দুইটি মতবাদই আজ পরিত্যক্ত। সকলেই আজ একমত বংশগতি এবং পরিবেশের সংমিশ্রণে অপরাধী সৃষ্টি হয়। এখন এই দুইটি উপাদানের কাহার কতটা প্রভাব আলোচনা করা যাইতেছে।

বংশগতির প্রভাব ঃ অপরাধপ্রবণ পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে সচরাচর একটা অপরাধপ্রবণতা দেখা যায়। সাধারণতঃ চোর, জুয়াচোর, পকেটমার, বারবনিতা ইত্যাদি ব্যক্তিদের সন্তানরা বাপমায়ের অপরাধকর্ম প্রত্যক্ষ করে এবং ঐদিকে আকৃষ্ট হয়। অনেক সময় বাপ মা সন্তানদের নিজ নিজ বৃত্তিতে দীক্ষা দেয়। ফলে তাহারা অপরাধী ছাড়া আর কি হইতে পারে? মনস্তাত্ত্বিকরা কিন্তু বংশগতির চেয়ে পরিবেশেরই বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন, তাহাদের মতে অপরাধপ্রবণতা ঠিক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নয় তবে অপরাধ সম্পাদনের একটা প্রবণতা শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে পাইতে পারে। অতি শৈশবে গৃহের দূষিত আবহাওয়া হইতে যেসব শিশুদের সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল পরবর্তী জীবনে তাহাদের কাহারো কাহারো মধ্যে বাপমায়ের অপরাধপ্রবৃত্তিগুলির প্রকাশ হইতে দেখা গিয়াছে। এইসব প্রবৃত্তির মধ্যে যৌন অপরাধ ও উগ্র স্বভাবই হইল প্রধান। তৃতীয়টি হইল উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ান। তবে শেষোক্তটি অতি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্য দেখা যায়।

পরিবেশের প্রভাব ঃ পরিবেশকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি—(ক) গৃহ পরিবেশ এবং (খ) বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ।

(ক) **গৃহ পরিবেশ ঃ** গৃহ পরিবেশের মধ্যে প্রথমেই পড়ে দারিদ্র্য। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' এই প্রচলিত প্রবাদ বাক্য একেবারে মিথ্যা নয়। ' তবে দারিদ্র্য প্রত্যক্ষভাবে কশোর মনে যতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে পরোক্ষভাবে কাজ করে তাহার চেয়ে অনেক বেশী। সঙ্কীর্ণ আলোবাতাসহীন ঘিঞ্জি বাড়িতে বাস, স্থানাভাব, অনাময় ব্যবস্থার ত্রুটি, গৃহে দিবারাত্র দ্বন্দ্বকলহ এ সমস্তই দারিদ্র্যের সঙ্গে জড়িত এবং শিশু ও কিশোর মনে ইহাদের প্রতিক্রিয়া ভয়ানক।

দারিদ্র্যের সঙ্গে আরও কতগুলি পারিবারিক কারণ যুক্ত হইতে পারে, যেমন শৈশবে পিতৃ কিংবা মাতৃবিয়োগ, পিতা প্রবাসে কিংবা অন্য কোনভাবে সন্তানদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন, জননী রুগ্ন কিংবা বাহিরে কর্মরত, ফলে সন্তানরা মায়ের সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত, বাপমায়ের অসুখী দাম্পত্য জীবন, বৈমাত্র ভাইবোনের জন্ম, পারিবারিক শৃঙ্খলার একান্ত অভাব কিংবা কঠোর নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলা, বাপমায়ের তুচ্ছতাচ্ছিল্য অনাদৃত অবহেলিত শিশুচিত্তের সমস্ত সুকুমার বৃত্তি নষ্ট করে এবং তাহার মনে জট পাকায়। এইসব শিশুরাই কৈশোরকাল উপস্থিত হইলে অবাধ্য, একগুঁয়ে, অনিয়মানুবর্তী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য অতিরিক্ত আদরেও এইসব দোষগুলি প্রকাশ পাইতে পারে।

প্রতিকারের উপায়ঃ বাপমায়ের স্নেহ ও সহানুভূতি এবং উন্নত গৃহপরিবেশ চাই। গৃহপরিবেশ উন্নত করা একেবারেই অসম্ভব হইলে কোন সহৃদয় অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে বালক ও কিশোরদের রাখা উচিত।

বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশঃ পারিবারিক জীবন ব্যতীত কিশোরদের জীবনে বৃহত্তর সামাজিক জীবনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পড়ে (১) তাহার বিদ্যা প্রতিষ্ঠান অথবা কর্মক্ষেত্র। (২) তাহার অবসর সময় উদ্‌যাপন এবং (৩) সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধব।

(১) **বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানঃ** অধিকাংশ বালক এবং কিশোরই পায় বাঁধাধরা শিক্ষা, মেধাবী বালকদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। ক্ষীণবুদ্ধি বালকদের আবার পড়াশুনাটা বোঝা বলিয়া মনে হয়। যেসব কিশোর পড়াশুনার পাট চুকাইয়া কাজে নামে তাহারা যখন কাজে আনন্দ পায় না তখনও সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ তাহাদের কাজ যদি একঘেয়ে ও যান্ত্রিক হয় তবে কাজে তাহাদের মন বসে না। ফলে তাহারা অনেক সময় অপরাধকর্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

প্রতিকারঃ বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষণপদ্ধতির উন্নতি সাধন করা দরকার। বালকের পাঠক্রম তাহার উপযোগী হওয়া চাই। বিদ্যালয়ে হাতের কাজ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে খেলাধুলা, বিতর্ক, ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক সম্মেলন ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(২) **অবসর সময় উদ্‌যাপনঃ** কিশোররা কিভাবে তাহাদের অবসর সময় উদ্‌যাপন করে তাহাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে অপরাধপ্রবণ কিশোররা সাধারণতঃ তাহাদের অলস মুহূর্তগুলিতেই নানারূপ সমাজবিরোধী কাজের পরিকল্পনা করে। অধিকাংশ কিশোরদের উপযুক্ত খেলাধুলা শরীরচর্চা কিংবা কোন গঠনমূলক কাজে যোগদান করার সুযোগ নাই। ফলে তাহারা আডডা দিয়া বাজে নাটক নভেল পড়িয়া এবং সিনেমা দেখিয়া সময় কাটায়।

সিনেমার কুফলঃ কৈশোরে সিনেমার কুফল সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। সিনেমার প্রতি যাহারা অতিরিক্ত আসক্ত হইয়া পড়ে তাহারা স্কুল কিংবা কলেজ পালায়, বাড়িতে মিথ্যা কথা বলে এবং সিনেমা দেখার পয়সা জোগাড় করিতে না পারিলে চুরি পর্যন্ত করে। অনবরত সিনেমা দেখিয়া সে একটি কল্পনার জগতে বাস করে এবং বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোন মিল নাই। জীবনকে তাহার সস্তা, মজাদার এবং নাটকীয় বলিয়া মনে হয়। সমস্ত ছবিতেই আবার কিছু না কিছু প্রেমের গল্প থাকে। উহা

তাহাকে যৌন সচেতন এবং অকালপক্ব করিয়া তোলে। সে কেবল উত্তেজনা, কৌতুক এবং রোমান্স খুঁজিয়া বেড়ায়। বাস্তবের মুখামুখি হইতে যখন ভয় পায় তখন অনেকে আবার মাদকদ্রব্য সেবন করে। অপরাধমূলক ছবি দেখিয়া অনেকে আবার অপরাধ করার প্রত্যক্ষ প্রেরণা পায়। মেয়েরাও চিত্রতারকাদের হাবভাব, কথাবার্তা এবং সাজপোশাক অনুকরণ করে। ফলে তাহারা চপলমতি হয় এবং হাল্কা আমোদপ্রমোদ খুঁজিয়া বেড়ায়।

প্রতিকার: কিশোর বয়সের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে ভাল ছায়াছবি নির্মিত হওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত খেলাধুলা, শরীর চর্চা, চিত্তাকর্ষক অথচ সুস্থ আমোদপ্রমোদের সুযোগ পাইলে কিশোর বয়সের প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করা সহজ হইবে।

(৩) **সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধব:** সবচেয়ে মারাত্মক হইল সঙ্গীদের প্রভাব। কুসঙ্গে পড়িয়া ভাল ঘরের ছেলেরা পর্যন্ত জুয়া খেলে, মাদক দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়, যৌন ব্যভিচার করে এবং মেয়েরা পর্যন্ত বহুগামিনী হয়।

প্রতিকার: সন্তানদের বন্ধুবান্ধব নির্বাচনে বাপমার সর্বদা সাহায্য করিতে হয় এবং তাহারা কিরূপ সঙ্গী নির্বাচন করে সেদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিতে হয়। নিজেদেরও অবসর সময় যতটা সম্ভব তাহাদের সঙ্গে কাটাইতে হয়।

দৈহিক ত্রুটি: দৈহিক খুঁত শিশুদের মনে হীনমন্যতার সৃষ্টি করে। বামন, খঞ্জ, কুব্জ লোকেরা সাধারণতঃ সঙ্গীদের উপহাসের পাত্র হইয়া থাকে। এইসব দৈহিক খুঁত থাকা সত্ত্বেও তাহারা কখন কখন সুস্থ সবল দেহের অধিকারী হইয়া থাকে। এইসব বালকদের কেহ কেহ আক্রমণাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অথবা অন্য কোন প্রকার অপরাধ কর্মের মধ্য দিয়া আত্মতৃপ্তিলাভের চেষ্টা করে।

প্রতিকার: শৈশবেই দৈহিক খুঁতগুলির চিকিৎসা হওয়া দরকার। তাছাড়া ছবি আঁকা, গান, আবৃত্তি, খেলাধুলা অথবা অনুরূপ কাজের মধ্য দিয়া তাহাদের আত্ম-তৃপ্তিলাভের সুযোগ দেওয়া উচিত।

বুদ্ধির প্রভাব: ক্ষীণবুদ্ধি অপরাধপ্রবণতার একটি প্রধান কারণ। ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার একটা গভীর যোগ আছে। অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষীণবুদ্ধির সংখ্যা যথেষ্ট। তাহারা সাধারণ মানুষের মত ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ যেসব কাজ করিতে ভয় পায় কিংবা দ্বিধা করে ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তিরা সহজেই সেসব কাজ করিতে পারে।

প্রতিকার: প্রথম হইতেই ক্ষীণবুদ্ধি বালকদের কোন হাতের কাজ কিংবা তাহাদের বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুসারে যে কোন কাজে লাগান দরকার।

(1) মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিশুশিক্ষার মূলনীতি
(Mental hygiene and principles of child guidance)

মানসিক স্বাস্থ্য: স্বাস্থ্য বলিতে আমরা এতকাল দৈহিক সুস্থতাই বুঝিতাম। কিন্তু বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা উহার এক নূতন সংজ্ঞা দিয়াছে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী দেহে সুস্থ এবং মনে পরিপূর্ণ ব্যক্তিকেই প্রকৃত সুস্থ ব্যক্তি বলা যাইবে। সুতরাং স্বাস্থ্য শব্দটির

মধ্যে মানসিক সুস্থতাও নিহিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ ইংরেজী health শব্দটি আসিয়াছে এ্যাংলো স্যাকসন wholth শব্দ হইতে। wholth শব্দের অর্থ হইল পরিপূর্ণতা। দেহ এবং মন উভয়ই সুস্থ থাকিলে এই পরিপূর্ণতা আসিতে পারে।

সমস্ত পাশ্চাত্যদেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবার ফলে আজ তাহারা মানসিক সুস্থতার উপর জোর দিতেছে। আমাদের এই ভারতে অবশ্য চিরদিনই উহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। মানসিক সুস্থতার লক্ষণ হইল মনের সমত্ব। কতগুলি বাহ্য লক্ষণদ্বারা মনের সুস্থতা বোঝা যায় যেমন,—(১) মানসিক সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তির ভাব দেখা যাইবে। (২) বাহিরের জগতের সঙ্গে তিনি সহজেই নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিবেন। (৩) তাহার আচরণ হইবে বাঞ্ছিত অর্থাৎ সমাজের অনুমোদিত। (৪) সাধারণ ঈর্ষা, কুটিলতা, রোষ প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তিগুলি তাহার মনে অযথা জট পাকাইবে না।

পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান দেখাইয়াছে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার ছেলেবেলার ছাপ দিয়া। প্রত্যেকটি শিশুর যাহাতে মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন থাকে এবং সে সুনাগরিকরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে এইজন্য প্রথম হইতেই শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শিশুমঙ্গল উদ্দেশ্যে যে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে শিশুর প্রতি বাবা মা তথা পরিবারের দায়িত্বকে চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—(1) শিশুর জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ সৃষ্টি করা, (2) শিশুর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সঞ্চার করা, (3) শিশুর মনকে সমাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা এবং (4) তাহাকে মুক্তির আনন্দ দেওয়া।

জন্মেই শিশু সামাজিক থাকে না। তবে সামাজিক হইয়া উঠিবার প্রবণতা এবং সামর্থ্য লইয়া সে জন্মায়। শিশুর মনের উপযুক্ত বিকাশ ঘটে বাবা মা এবং পরিবারের অন্যান্য পরিজনদের সান্নিধ্যে। আত্মকেন্দ্রিক শিশু ও বহির্বিশ্বের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে পরিবার। পরিবারকে তাই বলা হয় 'The half way house between the ego and society."

শিশুর দাবী : সন্তানের উপর যেমন বাবামায়ের দাবী রহিয়াছে সন্তানেরও বাবা-মায়ের উপর অনুরূপ কতগুলি দাবী আছে। ঐ দাবীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া শিশুর জীবন পরিচালিত করিতে হইবে।

শিশুর প্রথম দাবী **স্বাধীনতা**। তাহার সঙ্গে ব্যবহারের সময় মনে রাখিতে হইবে যে সে কতগুলি জন্মগত বৃত্তির সমষ্টি আর এই বৃত্তিগুলি প্রতি মুহূর্তে বিকাশের রাস্তা খুঁজিতেছে। গৃহ এই রাস্তা খুলিয়া দিবে—তাহাতে তাহার দেহ এবং মন দুয়েরই বিকাশ হইবে, সে ছুটিবে, লাফাইবে, খেলিবে, ছুঁড়িবে, সে হৈ হৈ করিবে, ভাঙিবে, গড়িবে, সব কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে হইবে। শিশুর যাহাতে বিপদ না হয় বাবা মা এইটুকু খেয়াল রাখিবেন কিন্তু তাহার জন্য এমন কিছু করিয়া দিবেন না যাহা সে নিজে করিতে পারে। জামা-জুতা নিজে পরা, নিজের পোশাক জিনিসপত্র নিজে গুছাইয়া রাখা—এইসব খুব ছোট-বেলায় অভ্যাস করাইতে হইবে। ইহার অর্থ তাহাকে জীবন নিয়া পরীক্ষা করিতে দেওয়া। ইহাতে যে স্বাবলম্বন, আত্মবিশ্বাস ও আত্মজ্ঞান শিক্ষা

হইবে, ভবিষ্যৎ জীবনের ঝড়ঝাপ্টায় উহা হইবে তাহার স্থায়ী সম্পদ। এই স্বাধীনতা তাহাকে শক্তিক্ষয়কারী জট হইতে বাঁচাইবে কারণ বৃত্তির দমন কোথাও হইবে না। নিরর্থক রোধনের জ্বালাও তাহাকে ভুগিতে হইবে না। 'ক'রো না' 'ক'রো না' এই কথার মত অকেজো জিনিস আর নাই।

স্বাধীনতার পরেই শিশুর আসে **নিরাপত্তা লাভের ইচ্ছা**। শিশু চায় দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তা। তাহার দৈহিক নিরাপত্তাবোধ যাহাতে ব্যাহত না হয় এইজন্য মায়ের কর্তব্য শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ান, ঘুমপাড়ান, পোশাক পরান এক কথায় যাবতীয় দেহিক প্রয়োজনগুলি মিটান।

সকল শিশুই দৈহিক নিরাপত্তার চেয়ে মানসিক নিরাপত্তার সম্বন্ধে বেশী সজাগ। দেখা গিয়াছে বাড়িতে রূঢ় ব্যবহার পাইলেও শিশুদের কাছে গৃহের পরিচিত পরিবেশই বেশী প্রিয়। নতুন ভাইবোনদের আগমনেও অধিকাংশ শিশু মানসিক নিরাপত্তা হারায়। নতুন শিশুর আগমনে বাপমাকে অনেক বেশী সতর্ক হইতে হইবে। গোড়ায় অতিরিক্ত আদর দিয়া পরে যেন শিশুকে বেশী অনাদর করা না হয়। তা ছাড়া বাবা মা বড়টিকে বুঝাইয়া দিবেন যে শিশুটি আসিতেছে সে তাহারই ভাই কিংবা বোন এবং অতি স্নেহের জন। আর বড়টির সামনে ছোটটিকে নিয়া বেশী আহ্লাদ করা চলিবে না, তবেই শিশুর মানসিক নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

শিশুর তৃতীয় দাবী হইল **স্বীকৃতি লাভ**। শিশু আবেগপ্রবণ এবং আত্মকেন্দ্রিক। সে সব কিছুর মধ্যেই তাহার নিজের গুরুত্ব দেখিতে চায়। শিশুকে শুধু আনন্দ দিবার জন্য এই স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন নয়, এই স্বীকৃতি তাহাকে পরিবারের তথা রাষ্ট্রের প্রকৃত সভ্যরূপে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে। তাড়য়েৎ বা পালয়েৎ কোন বয়সেই নয়, সব সময়েই 'মিত্রবদাচরেৎ'। বস্তুতঃ শিশু একটা শূন্য কুম্ভ নয়। তাহার একটা ব্যক্তিত্ব আছে—তাহাকে সম্মান করিতে হইবে, তুচ্ছ কিংবা অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। তাহার আগ্রহে কিংবা মনে কোন আঘাত না লাগে দেখিতে হইবে। তাহার অর্বাচীন কথা নিয়া হাসিঠাট্টা করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাহার অজস্র কেনতে বিরক্ত হইবার উপায় নাই কারণ এগুলি শিশুর কাছে বাস্তব সমস্যা। কৌশলে এইসব প্রশ্নের জবাব দিয়া শিশুর বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিত্বে অনেকটা প্রভাব ফেলা যায়। শিশুকে সম্মান করিলে সে নিজেকে সম্মান করিতে শেখে এবং পরকেও সম্মান করিতে শেখে।

শিশু অতিশয় অনুকরণপ্রিয়। সে সর্বদাই অপরের চালচলন হাবভাব নকল করিয়া চলে। তাই সবচেয়ে বেশী দরকার দৃষ্টান্তের। ব্যক্তিত্বই শুধু ব্যক্তিত্ব ফুটাইতে পারে। যেসব নৈতিক গুণ শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করিতে চাই, দেহ ও মনের যেসব অভ্যাস তাহার মধ্যে রোপণ করিতে চাই, যেসব পরিস্থিতিতে তাহার নিকট যে ব্যবহার পাইতে আশা করি, সেইসব উপদেশ দিয়া নয়, নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাকে শিখাইতে হইবে। বাড়িওয়ালা ভাড়া চাহিতে আসিলে বাবা যদি বলিয়া পাঠান—'বলগে, বাবা বাড়ি নেই'—ইহার পর সত্য ভাষণের কোন শিক্ষাই কাজে লাগে না। রেটিচিয়াস বলিয়াছেন—'আগে উদাহরণ, পরে নিয়ম' (Example is better than precept)। শিশুর ভাষা শিক্ষা যেমন অন্যের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া—কেতাব-ব্যাকরণ হইতে এই শিক্ষা হয় না ; তাহার নৈতিক শিক্ষাও তেমনি বয়স্কদের অনুকরণ করিয়া। বাবামায়ের প্রতি অত্যধিক আসক্তি হইতে শিশু মনে করে তাঁহারাই আদর্শ মানুষ। তাঁহারা যাহা করেন

তাহাই ভাল। তাঁহারা যদি এই মর্যাদা না রাখেন তবে শিশু নিজের কাছে কোন আদর্শের কোন মর্যাদা রাখিতে শিখিবে না। আমাদের শিশু যে মানুষ হয় না বেশির ভাগ এই কারণে। বাবামার জীবন হইতে মানুষ হইবার খোরাক তাহারা বিশেষ কিছু পায় না।

মিথ্যাকথা ও চুরি : মিথ্যা কথা ও চুরি করার জন্য বাবামা শিশুকে অনেক সময় শাসন করেন। শাসন করার পূর্বে দেখিতে হইবে ইহার সূত্র কোথায়? বয়স্করা মিথ্যা কথা বলে শিশুকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে, শিশুরা তাহা করে না। কোন কোন মিথ্যার কারণ অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা স্মৃতির ভুল, কোন কোন মিথ্যা সমাজের রীতিনীতি তৈয়ারী করিয়া দেয়—যেমন 'অপ্রিয় সত্য বলিতে নাই'। কল্পনার আতিশয্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি কখন একটা সাধারণ কথাকে রং চং দিয়া বলিবার প্রেরণা দেয়। কখন বাবামার দৃষ্টান্ত কিংবা কুশিক্ষা মিথ্যা বলিতে শিখায়। শিশু যদি বোঝে সত্য কথা বলিলে সুবিচার পাইবে না কিংবা তাহার ইচ্ছাকে কোনমতেই সম্মান করা হইবে না তখন সে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রথম প্রবঞ্চনা করিতে শেখে।

চুরিও তাই। অবুঝ শিশু যাহা পায় তাহাতেই হাত দেয়—তাহা চুরি করে। শিশুর অধিকারবোধ অতৃপ্ত থাকিলে আর তাহার ইচ্ছা ও আকর্ষণ অনুযায়ী কোন প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে অর্জন করিতে না পারিলে সে চুরি করিতে শেখে।

শিশু-শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা আমাদের ঘরে ঘরে প্রচলিত। ইহার চেয়ে বাবা মা ভাল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন :

(1) জবরদস্তির তুলনায় উৎকৃষ্টের আভাস, ইঙ্গিত ও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। (2) চাপ দেওয়া স্বাভাবিক বিকাশের বিরোধী। ইহাতে ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়, অসন্তোষ জমা হয়। শাস্তি ছাড়া অন্যরকম চাপ দিয়াও শিশুকে সহযোগী এবং বিচারশীল করা যাইতে পারে। (3) শিশুকে যদি অন্যায় কাজের জন্য তিরস্কার করা হয় তবে ভাল কাজে যখন সে সাধ্যমত চেষ্টা করিবে তখন খেয়াল করিয়া তাহাকে প্রশংসা করিতে হইবে। (4) কোন ভাল কাজে তাহার আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া তাহার বদভ্যাসগুলি দূর করার চেষ্টা করিতে হইবে। (5) বেশী বকাবকি করিলে ওগুলি গা-সওয়া হইয়া যায়, পরে আর তাহাতে শিশু পরোয়া করে না। (6) সামান্য বিষয় নিয়া খুঁত ধরা কিংবা অন্যের সামনে দোষ দেখানো সাধারণ ভদ্রতার নিয়মবিরুদ্ধ। ভদ্রতার নিয়ম শিশু ও বয়স্কে সমান মান্য। (7) বাবা-মা যে সম্মান সন্তানের নিকট আশা করেন সেই সম্মান তাঁহাদের নিকট সন্তানেরও প্রাপ্য। (8) শাসন কিংবা সংশোধনের সময় বাবা-মা কণ্ঠস্বর সংযত রাখিবেন, মুখে তাঁহাদের হাসি থাকিবে। (9) সব সময় দেখিতে হইবে কাজটার উদ্দেশ্য কি? অন্যায় ভাবে শাসন করিয়া অনেক সময় অনেক সদ্বৃত্তিকে আমরা মারিয়া ফেলি। (10) শিশুর বয়স ও বুদ্ধি কোন্ স্তরে আছে তাহা দেখিতে হইবে। সংশোধনের উদ্দেশ্য পরের স্তরে তাহাকে পথ দেখাইয়া নেওয়া। (11) অনেক সময় বাবামায়ের দাবীটা সঙ্গত থাকে না। উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাবামা অনেক সময় আপন উচ্চাভিলাষ সন্তানের উপর দিয়া মিটাইতে চেষ্টা করেন। ফলে শিশুকে জীবনের সমস্ত খেলাধুলা সকল আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে লেখাপড়া গানবাজনা ইত্যাদিতে পারদর্শী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শৈশবের দাবী যৌবন ও বার্ধক্যের দাবীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

সন্তানের কাছে আমরা অন্ধ বাধ্যতা চাই না, চাই বিচারশীল সহযোগিতা, তাহারা স্বাধীন ব্যক্তিত্ব অর্জন করিবে—তাহারা ভাবিবে, বিচার করিবে, নিজে নিজে সিদ্ধান্ত করিতে শিখিবে। ভুল করিলে তাহাকে কেমন করিয়া শাসন করিব এটা সমস্যা নয়, ভুল এড়াইয়া চলিতে কিভাবে তাহাকে সাহায্য করিব তাহাই আসল সমস্যা।

পুরস্কার ঃ শাস্তির মত পুরস্কার প্রথায়ও গলদ আছে। অনেক সময়ই পুরস্কার হয় ঘুষের নামান্তর এবং শিশুকে শোধরাইবার বদলে তাহাকে আরও স্বার্থপর করিয়া তোলে। 'লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে ফেল, একটা পয়সা পাবে।' 'ফ্রকটা পর, একটা বিস্কুট দেব'—এগুলি ঘুষ। শিশু বুঝিল খাওয়া বা জামা পরা তাহার নিজের প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন তাহার মায়ের, মা স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাকে দাম দিতেছেন। সে আরও শিখিল অন্যায়ভাবে নিজের অভিষ্ট সিদ্ধি করিতে এবং দর কষাকষি করিতে—'একটা নয়, দুটো পয়সা'। 'বিস্কুট নয়,' 'চকোলেট' ইত্যাদি। ইহার চেয়েও খারাপ হইতেছে স্নেহের ঘুষ "আমাকে যদি ভালবাস তবে আমার কথা শোন, লক্ষ্মীটির মত ঘুমাও।" স্বার্থ-সিদ্ধির লোভ দেখাইয়া তাহাকে দিয়া কাজ করাইতে নাই, অন্যের ইচ্ছার উপরে জোর দিয়াও নয়। তাহার কাজ তাহার নিজেরই প্রয়োজন—না করিলে সে প্রশংসা পাইবে না, করিলে পাইবে। এইটুকুই যথেষ্ট।

বেয়াড়া শিশু (Problem-child)—বেয়াড়া শিশুদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়—অল্পবুদ্ধি (backward), যাহারা বিশৃঙ্খল ও আচরণে সমতা রাখিতে পারে না (akward), তাই কিছুই করিতে পারে না, খেয়ালী (troublesome)—যাহারা শুধু শিখিতে অচেষ্ট নয়, নতুন অসুবিধা সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট। আবার কোন কোন শিশু এই সবগুলি দোষ নিজের মাথায় জড় করিয়া আছে।

প্রতিকার—এই দোষ যদি বাপ-মার কাছ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া হয় তবে বিশেষ কিছু প্রতিকার নাই। কোন দৈহিক ত্রুটি বা অঙ্গহানির দরুনও তা দেখা দিতে পারে। খুব সাবধানে বিশেষজ্ঞ দ্বারা তখন চিকিৎসা করা দরকার। এই অবস্থায় শুধু ধৈর্যশীল স্নেহ ও উৎসাহ তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বেয়াড়ামির জন্য দায়ী গৃহ ও স্কুলের আবহাওয়া। দারিদ্র্য, শৈশবে পিতৃমাতৃ বিয়োগ, বাপমার তাচ্ছিল্য, কড়া শাসন - এইসব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া অচেতন মনে জট বাঁধায়। তারপর স্কুলে গিয়া ছেলে পায় বাঁধাধরা ছাঁচে ঢালা শিক্ষা। তাহার আগ্রহ জাগানো হইল না। তাহার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখা হইল না। বিদেশী ভাষা ও অনাবশ্যক পাঠ্যবস্তু তাহার কাঁধে চাপানো হইল। তারপর আসিল পরীক্ষার ভীতি, অল্পবয়সে তাহার সমস্ত আনন্দের নির্বাসন ও সকল আশার সমাধি। রবীন্দ্রনাথ শিশুশিক্ষার এই দুর্দশার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তিদ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টাদ্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে" (রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসমস্যা)। গৃহে দমিত দ্বন্দ্বের নিরসন ও বৃত্তির উৎকর্ষণ এবং স্কুলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা—বেয়াড়া শিশুকে শোধরাইতে হইলে ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই।

সপ্তম অধ্যায়

ভাবী গৃহস্থদের পারিবারিক জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা
(Family life Education for Future Home-Makers

ভারতীয় বিবাহের উদ্দেশ্য ঃ

বিবাহের মধ্য দিয়া প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের একটা সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এই দুই অভিপ্রায়ের মধ্যে মিল বেশী না বিরোধ বেশী তাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবাহের চেহারা ও ভাবের পার্থক্য ঘটে। আমাদের দেশে এতকাল সমাজ রক্ষাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন ভারতের সমাজ-জীবন ছিল সম্পূর্ণ গৃহকেন্দ্রিক। তাহাদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, ধর্ম সমস্ত মঙ্গলকার্য গৃহস্থের দানের সাহায্যে চলিত। দান যে কেবল ধনীরই কর্তব্য ছিল তাহা নয় সকল গৃহীকেই শ্রাদ্ধ বিবাহ ইত্যাদি কাজে আপামর জনসাধারণকে নিজ নিজ সাধ্যমত দান করিতে হইত। এইভাবে দানের মধ্য দিয়া দাতা নিজেই সার্থক হইয়া উঠিতেন। সমাজ যেখানে গৃহকেন্দ্রিক বিবাহকে সেখানে নিজের পথে চলিতে দিতে চাহিলে বিপদ ঘটে। এখানে বিবাহের বাঁধ বাঁধা থাকিলে সমাজের বাঁধ টেঁকে। বিবাহ ছিল তাই ভারতীয়দের কাছে এক মহাযজ্ঞস্বরূপ।

কিন্তু সমাজের শৃঙ্খলে সকল মানুষকে সমানভাবে বাঁধা যায় না। মনুকে তাই গান্ধর্ব, রাক্ষস, অসুর ও পৈশাচ বিবাহ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সামাজিক ইচ্ছা নয়, মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাই এইসব বিবাহে প্রবল ছিল। শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ ছিল চারি প্রকার—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্য। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই শ্রেষ্ঠ। এই বিবাহের রীতি অনুসারে অযাচক বরে কন্যা দিতে হইবে। যে বর কন্যাকে নিজে প্রার্থনা করে সে তাহার সামাজিক উপযোগিতাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। বিবাহের ব্যাপারে এত কড়াকড়ির উদ্দেশ্য ছিল সৌজাত্য রক্ষা।

1. **বিবাহের প্রস্তুতি ঃ**
   (Preparation for marital life)

ভারতে বিবাহ একটা তপস্যার রূপ ধারণ করিয়াছিল। তাহার লক্ষ্য ছিল সুসন্তান লাভ, কবির ভাষায় কুমারসম্ভব। মহাকবি কালিদাসের তিনটি অপরূপ কৃতি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলমে বিবাহের এই উদ্দেশ্যই প্রকট হইয়াছে।

দাম্পত্য জীবনে প্রেমেরও একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং বিবাহের বহুপূর্ব হইতেই কন্যার জীবনে তাহার প্রস্তুতি শুরু হইয়া থাকে।

স্বামী নামক একটি ভাবকে তাহারা ভক্তি করিতে শেখে। নানা কাহিনী, ব্রত-পূজার মধ্য দিয়া এই ভক্তিকে মেয়েদের রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়। তারপর বিবাহের পর তাহারা যাহা পায় তাহা কোন ব্যক্তি নয় পায় একটি ভাব তাহার নাম স্বামী। এই ভাবের কাছেই সে আত্মসমর্পণ করে। তারপর বিবাহের দিন নানা মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়া তাহাকে বুঝান হইয়া থাকে সে যাহাতে পতিব্রতা হইয়া সুগৃহিণী হয় এবং পতিকুলে দৃঢ় থাকে।

পাণিগ্রহণের মন্ত্রগুলিও নানা উপদেশে ভরা। প্রথম মন্ত্রে কন্যাকে পাণিগ্রাহকের সংসারের সুখসৌভাগ্য বর্ধনের কথা বলা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে বলা হয় কন্যা যেন সর্বতোভাবে স্বামীর অনুগামিনী হয়, গৃহপালিত সমস্ত পশুগুলির পরিচর্যায় তাহার কল্যাণ হস্ত নিযুক্ত হয়। স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যেন তাহার প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি থাকে। গর্ভাধানের উদ্দেশ্যে চতুর্থ মন্ত্রটি পাঠ করা হয়। পঞ্চম মন্ত্রটি অতি পবিত্র এবং গভীর। এই মন্ত্রে স্বামী পত্নীকে বলেন, 'প্রিয়তমে, তোমাকে কেবল আমার সেবা কিংবা সুখের নিমিত্ত গ্রহণ করিতেছি না, তুমি আমার পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী সকলের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।' সংসারের পাঁচজনের জন্য ব্যক্তিগত সুখ বিসর্জন দিবার মহান্ আদর্শ একমাত্র ভারতেই বর্তমান একথা বলা বাহুল্য। তারপর স্বামীস্ত্রীর হৃদয়ের ঐক্যসাধনের নিমিত্ত স্বামী বধূকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন—

যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

হে দেবি! আজ হইতে তোমার ঐ হৃদয় আমার হউক আর আমার এই হৃদয় তোমার হউক।

বস্তুতঃ বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল তিনটি—

(১) সুস্থ সুন্দর গৃহরচনা, (২) সু-সন্তান সৃষ্টি এবং (৩) দম্পতির আত্মিক মিলন।

মেয়েরা যাহাতে উপযুক্ত গৃহিণী হইয়া উঠিতে পারে এইজন্য প্রথমেই প্রয়োজন **গৃহবিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য অর্থনীতির শিক্ষা**। বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল সুসন্তান-লাভ। মা হওয়াটা অবশ্য মেয়েদের একেবারে স্বভাবের মধ্যে কিন্তু মাতৃত্বের একটা সাধনা রহিয়াছে। সে সাধনা সন্তান নয়, সুসন্তান সৃষ্টির সাধনা। এই সাধনাকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য মেয়েদের আপন স্বাস্থ্যটি সুদৃঢ় করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবী সন্তানের উপযুক্ত মা হইবার জন্য তাহাকে **স্বাস্থ্যতত্ত্ব** এবং শিশু **মনোবিজ্ঞানের** প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশুরাই যে রুগ্ন দুর্বল অনেক সময় তাহার কারণ দারিদ্র্য নয়, জননীর অজ্ঞতাই তাহাকে রুগ্ন করিয়া তোলে। মনোবিজ্ঞানের উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে মেয়েরা শিশুকে ঠিক পথে পরিচালনা করিতে পারে না। অতিরিক্ত আদরে আহ্লাদে তাহাকে একেবারে ননীর পুতুল করিয়া ফেলে নতুবা তাহার প্রাক্ক্ষোভিক প্রয়োজন মিটাইতে না পারিয়া তাহার মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, কখনো বা তাহাকে অপরাধপ্রবণ করিয়া তোলে।

মাতৃরূপ ব্যতীত নারীর আরেকটি রূপ আছে, সেই রূপ প্রেয়সীর। যৌবনে পুরুষ নারীর প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করে। তাই বিবাহের প্রস্তুতির পর্বে মেয়ে পুরুষ উভয়েরই যৌনশিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। উপযুক্ত যৌন শিক্ষা দ্বারা বিবাহ সফল করিয়া তোলা সম্ভবপর হয়। তবে সফল যৌন জীবনই দাম্পত্যজীবনের শেষ কথা নয়। পরিণত বয়সে দম্পতি পরস্পরকে আপনার আত্মার আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তখনই নারী প্রকৃত প্রেয়সী হইয়া ওঠে। বস্তুতঃ প্রেয়সীরূপে নারীর সাধনা হইল পুরুষের সকল প্রকার উৎকৃষ্ট প্রচেষ্টাকে প্রাণবান করিয়া তোলা। নারীর যে গুণের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় সে হইল তাহার মাধুর্য বা আনন্দশক্তি। এই

মাধুর্য কিন্তু মোহিনীশক্তি নয়, মোহ দিয়া পুরুষকে আকর্ষণ করা যায় বটে কিন্তু সুস্থ, সুন্দর, আনন্দময় গৃহ রচনা করা যায় না। তাই মাধুর্যের সঙ্গে চাই ধৈর্য, ত্যাগ, সংযম, চিন্তায় ও ব্যবহারে শ্রীর অনুশীলন। ইহাই বিবাহের প্রকৃত প্রস্তুতি।

2. **পারিবারিক জীবন শুরু ঃ**
(Beginning of a family)

বিবাহের পর নরনারীর দাম্পত্যজীবন শুরু হইয়া যায়। এই জীবনের গুরুত্ব অনেক এবং দায়িত্বও প্রচুর। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত পূর্বরাগের পালা চলিয়াছিল কিন্তু তখন তাহারা পরস্পরকে জানিবার সুযোগ পায় নাই। দাম্পত্যজীবন শুরু হইলে উভয়ে উভয়কে নিবিড়ভাবে জানার সুযোগ পায়। তখন দুই জনের চরিত্রের বৈশিষ্ট-গুলির সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি ধরা পড়ে। এই সময় দুজনে যদি দুজনের সঙ্গে ঠিক ঠিক খাপ খাওয়াইতে পারে তবেই দাম্পত্যজীবন সুখের হইতে পারে।

দাম্পত্য জীবনের কতকগুলি প্রতিকূল উপাদান আছে। প্রথম হইতেই এইসব প্রতিকূল উপাদান সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। এই উপাদানগুলি হইল ঃ

(১) **জনতৃসংসক্তি** (Parent Fixation) ঃ দাম্পত্য সুখের একটি প্রধান অন্তরায় হইতে পারে জনতৃসংসক্তি অর্থাৎ বরবধূর নিজ নিজ বাপমার প্রতি প্রবল আসক্তি। বিবাহের পরে বধূ যদি আসিয়া দেখে স্বামী মায়ের আঁচলধরা এবং একান্ত অনুগত তখন একটা মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অনুরূপভাবে মেয়েরাও পিতার প্রতি প্রবল আসক্ত থাকিতে পারে। এই সকল মেয়েরা সচরাচর পিতার অনুরূপ স্বামী কামনা করে। স্বামীগৃহে পদার্পণ করিবার পর তাহারা যদি প্রতি পদে পিতার সহিত স্বামীর অবাঞ্ছিত তুলনা করে তবে অসন্তোষ দেখা দেয়। কারণ পিতার যে বয়স ও অভিজ্ঞতা থাকে যুবক স্বামী সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। দম্পতির প্রবল বাস্তববোধই এইসব সমস্যার সমাধান করিতে পারে।

(২) **চারিত্রিক দ্বন্দ্ব** (Conflicting Personalities) ঃ স্বামীস্ত্রীর চারিত্রিক দ্বন্দ্ব দাম্পত্য সুখের আরেকটি প্রধান অন্তরায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি অত্যন্ত জেদী কিংবা আত্মাভিমানী (egotistical) হয় এবং একে অপরের নিকট হার মানিতে একেবারে নারাজ থাকে তবে সংঘাত অনিবার্য। এরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের চরিত্রে নমনীয়তা গুণটির অনুশীলন দরকার, নতুবা পরস্পরের সঙ্গে খাপখাওয়ানো অসম্ভব হইয়া পড়ে।

(৩) **শ্বশ্রূমাতার উপস্থিতি ঃ** আমাদের দেশে বধূ নিপীড়নের কাহিনী আজও শোনা যায়। শ্বশ্রূমাতারা পুত্রবধূকে অবাঞ্ছিত অংশীদার মনে করিয়া নানারূপ জট পাকায়। এখানে স্ত্রীর নম্রতা গুণ এবং স্বামীর বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সময়মত হস্তক্ষেপ দরকার।

(৪) **নৈরাশ্য** (Frustration) ঃ কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত হইতে আসে নৈরাশ্য। বিবাহের পর প্রথম অনুরাগের পালা শেষ হইলে নতুন নতুন সমস্যা আসিতে থাকে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার সমস্যা ত থাকেই তার উপর দেখা দেয় বাসগৃহের সমস্যা, সীমাবদ্ধ আয়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সংসার চালাইবার সমস্যা ইত্যাদি। স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের নিকট পরস্পরের চাহিদাও কিছু থাকে। সেগুলি না

মিটিলে নৈরাশ্য আসিতে পারে। স্বামীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে স্ত্রী নিজেকে খাপ খাওয়াইতে না পারিলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মনে নৈরাশ্য আসে।

কাহার কিসে নৈরাশ্য আসিবে বলা কঠিন। তবে বলা যায় স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগ, ছোটখাটো দোষত্রুটিগুলিকে লঘু করিয়া দেখার চেষ্টা, নির্ভরতার মনোভাব, একের অন্যকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার সদিচ্ছা লইয়া দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে তবে ঐ জীবন সুখের হয়।

3. **জনিতাদের দায়িত্ব ঃ**

(Responsibility of Parenthood)

সন্তানপালনে প্রত্যেক পিতামাতার দায়িত্ব রহিয়াছে। এই দায়িত্ব দ্বিবিধ—প্রথমতঃ, সন্তানের ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন অর্থাৎ শিশু যে সম্ভাবনা লইয়া জন্মিয়াছে সেই সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে ফুটাইয়া তোলা। দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রথম ও প্রধান উপকরণ হইল একটি সুস্থ সবল দেহ। তাই সন্তানপালনে বাপ-মার প্রাথমিক কর্তব্য হইল নীরোগ বলিষ্ঠ শিশুর জন্মদান। শিশুকে সুস্থ রাখার জন্য মা-বাবা একদিকে যেমন সন্তানের দৈহিক প্রয়োজনগুলি মিটাইবেন অন্যদিকে তেমনি নিজেদের দেহকেও সুস্থ, সবল ও নীরোগ রাখিবেন।

প্রাথমিক দৈহিক প্রয়োজন মিটিবার পরে শিশুর প্রয়োজন মানসিক নিরাপত্তা। শিশুর মনে নিরাপত্তা জাগাইবার জন্য পিতামাতার বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। সব বাপ-মাই অবশ্য সন্তানকে ভালবাসেন কিন্তু অনেক সময় তাহাদের আচরণের ত্রুটির ফলে শিশুর নিরাপত্তা বোধ বিঘ্নিত হয়। যেমন, নতুন সন্তানের আগমনের ফলে বাপ-মা অনেক সময় নবজাতটিকে লইয়া বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়েন, কখনো একটি সন্তানের সঙ্গে আরেকটির অবাঞ্ছিত তুলনা করেন যাহার ফলে স্বল্পবুদ্ধি শিশুর মধ্যে হীনমন্যতা দেখা দেয় ; অনেক বাপ-মা সন্তানদের সামনেই নিজেদের আর্থিক অভাব-অভিযোগের কথা নিয়া আলোচনা করেন। এইরূপ আলোচনা শিশুর মনকে ভারাক্রান্ত করে এবং শিশুর নিরাপত্তাবোধ নষ্ট করে।

শিশুর মনে নিরাপত্তার ভাব জাগাইবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইল তাহাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা। শিশু যদি অনুভব করে যে সে পরিবারের একজন বাঞ্ছিত ব্যক্তি, গৃহে তাহারও একটি নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং তাহার সেই আসন আর কাহারো দ্বারা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয় তবেই শিশুর মনে নিরাপত্তা বোধ জাগিবে। সব শিশুদের যোগ্যতা সমান নয় ; একটি হয়ত লেখাপড়ায় ভাল, আরেকটি গায় ভাল, আবার আরেকটি হাতের কাজে পটু। বাপ-মার কর্তব্য একটির সঙ্গে অন্যটির মেধার তুলনা না করিয়া প্রত্যেকটিকে তার নিজ নিজ কাজে উৎসাহ দেওয়া। প্রত্যেকে যেন উপলব্ধি করে তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সবই গর্বের, আনন্দের এবং প্রশংসার। এইভাবে মা-বাবার কাছে আপন প্রতিভার স্বীকৃতি পাইলে শিশুদের সহজ স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয়।

সন্তান বড় হইলে অনেক বাপ-মা অভিযোগ করেন সংসারের প্রতি ছেলের কোন দায়িত্ববোধ জাগে নাই। পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে দায়িত্বের ভাব জাগাইয়া তোলা

বাপ-মায়েরই কর্তব্য। সহযোগিতাই হইল পরিবার তথা সমাজজীবনের বনিয়াদ। শিশুকে ছোট ছোট কাজের ভার দিয়া তাহার মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব জাগাইতে হইবে এবং তাহাকে দায়িত্বশীল করিয়া তুলিতে হইবে। পরিবারের সাধারণ সমস্যাগুলি যখন আলোচিত হইবে তখন তাহার মতামতকেও বয়স্কদের সমান মর্যাদা দিতে হইবে।

শিশুকে সমাজায়িত করার জন্য গৃহে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার যাহাতে শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ হইতে পারে, অভ্যাস ও চিন্তাধারা সমাজ জীবনের উপযোগী হইতে পারে। শৈশবে বাপ-মার কাছে শিষ্টাচার, বিনয়, কথার মর্যাদা রক্ষা করা প্রভৃতি কতকগুলি সদাচার ও সদ্গুণের অনুশীলন হওয়া উচিত এবং ইহার জন্য চাই উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। শিশুর বাপ-মা যদি পরিবারের পাঁচজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন, বয়স্কদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সৌহার্দ্য রক্ষা করিয়া চলেন তবেই শিশুর জীবনে ঐসব গুণগুলি ফুটিতে পারে, তা নইলে নয়।

জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে প্রত্যেক মানুষকেই কিছু না কিছু অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হয়। বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে বাপ-মা অনেক সময় সন্তানদের সামর্থ্য এবং ঝোঁকটা উপলব্ধি করিতে চান না। লব্ধপ্রতিষ্ঠ পিতারা আবার সন্তানকেও নিজের মতই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চান, কখনো আবার নিজের বৃত্তিতে নিযুক্ত করার জন্য ছেলেকে প্রস্তুত করান। তাহাদের ধারণা উপযুক্ত শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের দ্বারা সন্তানের মধ্যে আপন প্রতিভার সঞ্চার করা কঠিন হইবে না। এইভাবে শিশুর শিক্ষা লইয়া একটা জোরজবরদস্তি চলে। বাপ-মার ভুলটা এই যে সন্তানকে এক তাল কাদা ভাবিয়া তাহারা নিজেদের কুম্ভকারের আসনে বসান এবং আপন ইচ্ছামত রূপ দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উঁহারা কেবল শিশু উদ্যানের মালি মাত্র। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ রচনা করিয়া যাওয়াই তাহাদের কাজ।

4. পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ
(Interpersonal relationship in family life)

ভারতের দুইখানি মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' পারিবারিক জীবনের চিত্র। পারিবারিক সম্পর্ক যখন সুন্দর হয় তখন তাহা জীবনকে কত মধুর, সরস ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে তাহাই দেখান হইয়াছে রামায়ণে। আর এই সম্পর্ক যখন ঈর্ষা ও কলহে জর্জর হইয়া ওঠে তখন জীবনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া যে কী সাংঘাতিক হইতে পারে তাহাই আমরা দেখিয়াছি মহাভারতে। পারিবারিক সদ্ভাব কিংবা অ-সদ্ভাবের উপর নির্ভর করে একটি পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের শান্তি, চরিত্রের বিকাশ, আর্থিক সমৃদ্ধি এমন কি তাহার উত্থান পতন পর্যন্ত। পারিবারিক লোকেদের অসদ্ভাবের ফলে শিশুরা বিপর্যস্ত হয় সবচেয়ে বেশী।

পরিবারের কাছে শিশুর প্রথম দাবী হইল নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তার অভাব ঘটিলে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না। শিশু যদি তাহার আপন জনের কাছে ভালবাসা পায় তবেই তাহার মধ্যে নিরাপত্তার ভাব জাগে। শিশুর সব চাইতে আপন জন হইল তাহার মা এবং বাবা। প্রত্যেক মা বাবাই অবশ্য নিজ নিজ সন্তানকে ভালবাসেন। তবে মা বাবার ভালবাসাই শিশুর কাছে যথেষ্ট নয়, শিশুর চরিত্র বিকাশের জন্য মা বাবারও পরস্পরকে ভালবাসা চাই। তাহারা যদি দিনরাত কলহ

করেন কিংবা উভয়ের মধ্যে খিটিমিটি যদি লাগিয়াই থাকে তবে শিশু (বালক ও কিশোররাও) প্রথমেই একটা সঙ্কটে পড়ে—মা বাবার মধ্যে কে ঠিক ? সে কাহার পক্ষ লইবে ? শৈশবেই এইভাবে যাহার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া যায় পরিণত বয়সেও তাহাকে দেখা যায় ভীরু এবং দ্বিধাগ্রস্ত। পরিবারের লোকেদের মধ্যে অসম্ভাবের পরিণতি এইখানেই সীমাবন্ধ নয়। ইহার ফল আরও সুদূরপ্রসারী।

স্বামী-স্ত্রী ছাড়া গৃহের অন্যান্য সকলের মধ্যেও সম্ভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন। গৃহের নিরানন্দময় পরিবেশ কিংবা গুমোট আবহাওয়া শিশুচিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। ঘরে তাহারা কোন আনন্দ পায় না। স্নেহের বদলে হয়ত পায় বকুনি আর মারধর। বয়স্কদের মধ্যেও দেখে শুধু কলহ আর বিদ্বেষ। ঘরে এই শান্তির অভাব স্বভাবতঃই তাহাদের মনকে বাড়ির বাহিরে ঠেলিয়া দেয়। শিশু ও বালকরা লেখা পড়ায় মনোযোগ দেয় না। অধিকাংশ সময় খেলিয়া বেড়ায়। কিশোররা আবার নানারকম কুসংসর্গে মেশে। বেশীর ভাগ বালকবালিকা ও কিশোর কিশোরীরা সিনেমায় যাতায়াত শুরু করে। সিনেমার থ্রিল সাময়িকভাবে তাহাদের দুঃখ ভুলাইয়া দেয় বটে কিন্তু সিনেমার কুফলগুলি শীঘ্রই তাহাদের মধ্যে প্রকট হইয়া ওঠে। মনস্তাত্বিকরা আজ সকলেই একমত যে বালক ও কিশোরদের অপরাধ প্রবৃত্তির মূলে থাকে শৈশবীয় নিরানন্দময় পরিবেশ।

শিশুর প্রক্ষোভগুলির কোনটিই জন্মগত নয়। ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিগুলি এবং রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতি অসদ্‌বৃত্তিগুলি উভয়ই তাহার অর্জিত। কাজেই শিশুরা যদি বাড়ির লোকেদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, করুণা ও সহানুভূতি দেখিতে পায় আর কলহ কপটতাকে ঘৃণা করিতে দেখে তবে সহজেই তাহাদের মধ্যে সদ্‌প্রবৃত্তিগুলি প্রবল হইয়া উঠিবে এবং অসদ্‌বৃত্তিগুলিকে আবার বড়দের অনুকরণ করিয়া তাহারা ঘৃণা করিতে শিখিবে। আজিকার শিশুই আবার ভবিষ্যতের নাগরিক। শৈশবে যাহার মধ্যে সামাজিক সদ্‌-গুণগুলির বিকাশ হইবে পরিণত বয়সে সে যে সুস্থ নাগরিক হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরিবারের লোকেদের সুস্থ সম্পর্কের উপরেই গৃহের প্রকৃত শান্তি, শৃঙ্খলা ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে। পরস্পরের মধ্যে সম্ভাব থাকিলেই স্ত্রী স্বামীর জন্য, পুত্র পিতার জন্য, ভগ্নী ভ্রাতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। পিতার কষ্টোপার্জিত ধন পুত্র স্বচ্ছন্দে নষ্ট করে না। অভাবগ্রস্ত ভাইকে ভাই সাহায্য করে। পারিবারিক জীবনের এই ভালবাসা ও সহানুভূতি পরে আবার সমাজ জীবনেও প্রতিফলিত হয়। আমাদের জীবন গৃহকেন্দ্রিক। আমাদের দেশের পারিবারিক সম্বন্ধগুলি যদি সুন্দর হইত তবে সমাজ জীবনকে আমরা আরও সহজে সুন্দরতর করিয়া তুলিতে পারিতাম, সাধারণের মধ্যে সমাজ চেতনা জাগাইতে আমাদের এত বেগ পাইতে হইত না।

5. পরিবার পরিকল্পনা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য :
(Concept of family planning and personal health)

পরিবার পরিকল্পনা কাহাকে বলে ?—পরিবার পরিকল্পনা কথাটি আজ আর কাহারও অবিদিত নয়। শিক্ষিত লোকমাত্রই এই কথাটির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। পরিবার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে জন্মনিয়ন্ত্রণ (birth control)।

সাধারণভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বলিতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমাইবার যত রকম পদ্ধতি জানা আছে তাহার সবগুলিকেই বুঝায়। এই হিসাবে শিশু-হত্যা, ভ্রূণ-হত্যা, বিলম্বে বিবাহ, ব্রহ্মচর্য পালন, যান্ত্রিক কিংবা রাসায়নিক উপায়ে জন্মরোধ করা সবই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত। কিন্তু আধুনিক পরিভাষায় জন্মনিয়ন্ত্রণ শুধু জন্মনিরোধ নয়। ইহার যেমন একটি নেতিবাচক (negative) দিক আছে তেমনি আবার একটি ইতিবাচক (positive) দিকও আছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের এই ইতিবাচক দিকটির উপর জোর দিবার জন্য ১৯৪২ সালে আমেরিকার জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানটি উহার National Birth Control League নাম বদলাইয়া Planned Parenthood Federation of America নামকরণ করে। জন্মনিয়ন্ত্রণ তথা পরিবার পরিকল্পনার প্রকৃত অর্থ হইল সুপরিকল্পিত ভাবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে স্বামীস্ত্রীর আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী অল্পসংখ্যক সুস্থ ও সবল সন্তান উৎপাদন করা। জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে শিশুর আগমন সম্পূর্ণভাবে বাপমার ইচ্ছাধীন। পরিবার পরিকল্পনা একদিকে যেমন অবাঞ্ছিত শিশুর জন্ম প্রতিরোধ করে অন্যদিকে তেমনি বাঞ্ছিত শিশুর আগমনকে উৎসাহিত করে।

পরিবার পরিকল্পনার উপায়—পুরাতন ও নব্য—পরিবার পরিকল্পনাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রসঙ্গ কিন্তু পুরানো আমলের লোকেরাও উহার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিল না। তাহারা সাধারণতঃ শিকড় বাকড় বা মন্ত্রপূত ঔষধের সাহায্যে অবাঞ্ছিত শিশুর জন্ম প্রতিরোধের চেষ্টা করিত। বর্তমান যুগের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তুলনায় অনেক উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত।

জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক যেসব পন্থা জানা আছে তাহার মধ্যে দম্পতির যে কোন একজনের বন্ধ্যাত্ব স্বীকার (sterilization) এবং যান্ত্রিক অথবা রাসায়নিক পদ্ধতিতে জন্মনিরোধ করাই প্রধান। ভ্রূণের ধ্বংসসাধনও (abortion) অন্যতম উপায় তবে ভ্রূণহত্যা নরহত্যারই নামান্তর। শুক্রকীট এবং বিকশিত ডিম্বাণুর মিলনেই ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। উহারা যদি একত্র মিলিত হইতে না পারে তবে সন্তানের জন্ম হয় না। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মূলকথা হইল এই মিলনকে প্রতিরোধ করা অর্থাৎ সহজ ভাষায় গর্ভরোধ করা। জন্মনিয়ন্ত্রণ বা গর্ভ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা (conception control) বর্তমান রাষ্ট্রগুলি পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী গ্রহণ করিতেছে।

পরিবার পরিকল্পনা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা ঃ জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের দেশে কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রসূতি মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশী। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সন্তান প্রসব ছিল প্রসূতি মৃত্যুর প্রধান কারণ। নারীর পক্ষে সন্তানধারণ মানেই নিজের জীবনের উপর একটা ঝুঁকি লওয়া। তাহার উপর অনেক সময় ঘন ঘন সন্তানধারণের ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে, প্রসূতি জরায়ুসংক্রান্ত নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাহার দৈহিক সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

প্রসূতি মৃত্যুর মতই আমাদের দেশে শিশু-মৃত্যুর হারও খুব বেশী ছিল। ইহার কারণ অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে দুই সন্তানের জন্মসময়ের ব্যবধান এবং শিশু-মৃত্যুর হারের মধ্যে বেশ একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জন্মসময়ের ব্যবধান যত কম হইবে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা তত বেশী হইবে। দুই সন্তানের জন্মের মধ্যে অন্ততঃ তিন বৎসরের

ব্যবধান থাকা প্রয়োজন। শিশু এবং প্রসূতি মৃত্যুর হার হ্রাস করা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য।

কোন কোন রোগ আবার, যেমন—যক্ষ্মা, সিফিলিস ও গণোরিয়া প্রভৃতি বাপ মা হইতে সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হয়। নরনারীর এই জাতীয় রোগ থাকিলে তাহাদের সন্তান না হওয়াই বাঞ্ছনীয় কারণ এই সকল রুগ্ন সন্তান পরিবারের অশান্তির কারণ হয়, সমগ্র সমাজের নিরাপত্তা নষ্ট করে এবং জাতির স্বাস্থ্য দুর্বল করিয়া ফেলে। সুতরাং রুগ্ন শিশুর জন্মদান বন্ধ করিয়া পরোক্ষে জাতির স্বাস্থ্যের মান স্থির রাখা পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণের আরেকটি উদ্দেশ্য।

খাদ্যকে দেহের কাজে লাগান: পাচনতন্ত্র, পরিপাক ও মেটাবলিজম

(Utilization of food by the body : digestion, absorption and metabolism)

পাচনতন্ত্র ও পরিপাক ক্রিয়া (Digestive system and digestion) : বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে খুব সামান্য কয়েকটি দ্রব্যই (যেমন গ্লুকোজ, ধাতব লবণ ইত্যাদি) দেহ সরাসরি গ্রহণ করিয়া আপন কাজে লাগাইতে পারে। অবশিষ্ট অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যই যতক্ষণ না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয় ততক্ষণ শরীরের কোন কাজে লাগে না। ভাতের প্রধান অংশ শ্বেতসার। কিন্তু এই শ্বেতসার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যতক্ষণ না গ্লুকোজে পরিণত হইতেছে ততক্ষণ শরীরের কোন উপকারে আসিবে না। শ্বেতসার গ্লুকোজে পরিণত হইলেই দেহ ঐ গ্লুকোজ শোষণ করিয়া উহা হইতে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে। এইরূপে খাদ্যের প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিডে এবং স্নেহ-পদার্থ ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারিনে পরিণত হইলেই ঐ সকল উপাদান দেহের উপকারে আসিবে।

পরিবার পরিকল্পনার একটি আর্থিক এবং একটি সামাজিক দিকও আছে। প্রত্যেক পরিবারের আয় ও রোজগারের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। ঐ সীমিত আয়ের মধ্যে প্রত্যেকটি সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষায় গড়িয়া তুলিয়া জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সন্তানের সংখ্যা বাঁধিয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। পরিবারগুলি লইয়াই আবার একটি জাতি তথা রাষ্ট্র গঠিত হয়। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে দেশের অগ্রগতিও ব্যাহত হয়। বিপুল জনসংখ্যাই ভারতের মত শস্যশালিনী দেশের পক্ষেও বিরাট বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিবার পরিকল্পনার সামাজিক দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। সন্তান সংখ্যা বেশী হইলে মা বাবার পক্ষে প্রত্যেকটি শিশুর সমান যত্ন লওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের ব্যাপার লইয়া পরিবারে খিটিমিটি ও কলহ লাগিয়াই থাকে। অনাদৃত, অবহেলিত দারিদ্র্যজর্জর শিশুরা গৃহের এই অস্বাস্থ্যকর মানসিক পরিবেশ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য স্বভাবতঃই বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তারপর নানা কুসঙ্গে পড়িয়া বিভিন্ন অপরাধ করে এবং এইভাবে পরিবার তথা সমগ্র দেশের সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। পরিবার পরিকল্পনার দ্বারা সমাজের কিশোর অপরাধীর সমস্যা বহুলাংশে দূর করা যায়।

খাদ্যের এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হওয়াকেই পাচন ক্রিয়া বা পরিপাক ক্রিয়া বলে। খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া দেহের যে অংশে সম্পন্ন হয় তাহাকে **পাচনতন্ত্র (Digestive system)** বলে। মুখ-গহ্বর (mouth) অন্ন-নালী (oesophagus), পাকস্থলী (Stomach), ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine) এবং বৃহদন্ত্র (large intestine) লইয়া এই পাচনতন্ত্র সংগঠিত। খাদ্য-দ্রব্য পাচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হইয়া অবশেষে রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া দেহের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়।

মুখ-গহ্বরে পরিপাক ঃ আমাদের মুখে সর্বদাই লালা নিঃসৃত হইতেছে। এই লালা প্যারটিড (parotid), সাব-লিংগুয়াল (sublingual) এবং সাব-ম্যাক্সিলারী (sub-maxillary) নামক তিনটি বিভিন্ন গ্রন্থি হইতে আসে। ইহার বেশীর ভাগই জল। এই জল ছাড়াও অ্যামাইলেস বা টায়ালিন (amylase or ptyalin) নামক এক প্রকার জারক পদার্থ (enzyme), মিউসিন এবং কিছু ধাতব লবণ এই লালার মধ্যে পাওয়া যায়।

ইহা সাধারণতঃ মৃদু ক্ষারধর্মী। দৈনিক প্রায় 1000 সি. সি. হইতে 1500 সি. সি. লালা একজন ব্যক্তির মুখে নিঃসৃত হয়।

লালা আমাদের খাদ্য-দ্রব্যকে সিক্ত ও নরম করে। ইহার মিউসিন ভুক্ত দ্রব্যকে পিচ্ছিল করিয়া অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে পৌঁছাইতে সাহায্য করে। অ্যামাইলেস বা টায়ালিন খাদ্যের শ্বেতসার জাতীয় পদার্থকে ভাঙিয়া মলটোজ-এ (maltose) পরিণত করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া মুখ-গহ্বরেই প্রথম শুরু হয়। শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ যাহাতে উত্তমরূপে টায়ালিনের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে সেইজন্য খাদ্য-দ্রব্য ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া চর্বণ করা প্রয়োজন। অতি অল্প সময় খাদ্য-দ্রব্য মুখ-গহ্বরে থাকে বলিয়া সামান্য পরিমাণ শ্বেতসার মলটোজে পরিণত হয়। কাঁচা শ্বেতসার (uncooked) জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের মুখে কোন পরিবর্তন হয় না।

পাকস্থলীতে পরিপাক ঃ মুখ-গহ্বর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত খাদ্যদ্রব্যসমূহ লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া আমাশয় বা পাকস্থলীর মধ্যে পৌঁছে। অন্ন-নালী মুখ-গহ্বর হইতে শ্বাসনালীর পিছন দিক দিয়া বরাবর নিচে নামিয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই অন্ন-নালীর মুখ বন্ধ থাকে। শুধু ভুক্ত-দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার সময়ই উহা খুলিয়া যায়। দৈর্ঘ্যে উহা প্রায় পাঁচ ইঞ্চি। অন্ন-নালীর শেষ প্রান্ত হইতে পাকস্থলী আরম্ভ হইয়াছে এবং এই সংযোগস্থলকে আগমদ্বার (cardiac end) বলে। পাকস্থলীর শেষপ্রান্ত নির্গমদ্বার (pylorus end) দ্বারা ডিওডেনামের (deodenum) সহিত যুক্ত। ইহা প্রায় 12 ইঞ্চি লম্বা এবং 5 ইঞ্চি চওড়া। পাকস্থলীর ভিতরের প্রাচীর এক প্রকার শ্লৈষ্মিক পদার্থের আবরণে ঢাকা থাকে। এই আবরণের গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। ছিদ্রগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলের মুখ। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলগুলি এক একটি গ্রন্থির সহিত সংযুক্ত থাকে। এই সকল গ্রন্থি হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয় যাহাকে আমাশয় রস (gastric juice) বলে।

বদখেয়াল কিংবা বেয়াড়াপনার চিকিৎসা সম্ভব নয়। ইহার জন্য চাই সুস্থ পরিবেশ, দরদ এবং প্রবৃত্তির উৎকর্ষণ। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের কাজ হইবে কৌতূহল, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা এবং স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি ইত্যাদি জীবন-প্রয়াসী শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করা এবং আত্মবিস্তারের প্রকৃষ্ট পন্থায় উহাদের কাজে লাগাইয়া জীবনকে তৃপ্ত করা।

অপরাধপ্রবণতা ঃ কিশোরদের মধ্যে আমরা অনেক সময় অবাঞ্ছিত আচরণ দেখিয়া থাকি। এইসব অবাঞ্ছিত আচরণ যখন সমাজবিরোধী কাজের রূপ নেয় তখন তাহাকে অপরাধপ্রবণতা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কৈশোর অপরাধের মধ্যে পড়ে অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারিতা, একগুয়েমি, অসৌজন্য, উচ্ছৃংখলতা, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, অনিয়মানুবর্তিতা, জুয়াখেলা, মাদকদ্রব্য সেবন, যৌন ব্যভিচার ও আত্মহত্যা।

কৈশোরের অপরাধপ্রবণতা অভিভাবক ও মনস্তাত্ত্বিকদের সামনে একটি গুরুতর সমস্যাবিশেষ। বংশধারাবাদীরা এতকাল মনে করিতেন বংশগতিই অপরাধের মূল কারণ এবং অপরাধপ্রবণ হইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। পরন্তু পরিবেশবাদীদের যুক্তি ছিল পরিবেশই মানুষকে অপরাধী তৈরী করে। একান্ত একপেশে বলিয়া এই দুইটি মতবাদই আজ পরিত্যক্ত। সকলেই আজ একমত বংশগতি এবং পরিবেশের সংমিশ্রণে অপরাধী সৃষ্টি হয়। এখন এই দুইটি উপাদানের কাহার কতটা প্রভাব আলোচনা করা যাইতেছে।

বংশগতির প্রভাব ঃ অপরাধপ্রবণ পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে সচরাচর একটা অপরাধপ্রবণতা দেখা যায়। সাধারণতঃ চোর, জুয়াচোর, পকেটমার, বারবনিতা ইত্যাদি ব্যক্তিদের সন্তানরা বাপমায়ের অপরাধকর্ম প্রত্যক্ষ করে এবং ঐদিকে আকৃষ্ট হয়। অনেক সময় বাপ মা সন্তানদের নিজ নিজ বৃত্তিতে দীক্ষা দেয়। ফলে তাহারা অপরাধী ছাড়া আর কি হইতে পারে? মনস্তাত্ত্বিকরা কিন্তু বংশগতির চেয়ে পরিবেশেরই বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন, তাহাদের মতে অপরাধপ্রবণতা ঠিক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নয় তবে অপরাধ সম্পাদনের একটা প্রবণতা শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে পাইতে পারে। অতি শৈশবে গৃহের দূষিত আবহাওয়া হইতে যেসব শিশুদের সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল পরবর্তী জীবনে তাহাদের কাহারো কাহারো মধ্যে বাপমায়ের অপরাধপ্রবৃত্তিগুলির প্রকাশ হইতে দেখা গিয়াছে। এইসব প্রবৃত্তির মধ্যে যৌন অপরাধ ও উগ্র স্বভাবই হইল প্রধান। তৃতীয়টি হইল উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ান। তবে শেষোক্তটি অতি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্য দেখা যায়।

পরিবেশের প্রভাব ঃ পরিবেশকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি—(ক) গৃহ পরিবেশ এবং (খ) বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ।

(ক) **গৃহ পরিবেশ ঃ** গৃহ পরিবেশের মধ্যে প্রথমেই পড়ে দারিদ্র্য। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' এই প্রচলিত প্রবাদ বাক্য একেবারে মিথ্যা নয়।, তবে দারিদ্র্য প্রত্যক্ষভাবে কিশোর মনে যতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে পরোক্ষভাবে কাজ করে তাহার চেয়ে অনেক বেশী। সঙ্কীর্ণ আলোবাতাসহীন ঘিঞ্জি বাড়িতে বাস, স্থানাভাব, অনাময় ব্যবস্থার ত্রুটি, গৃহে দিবারাত্র দ্বন্দ্বকলহ এ সমস্তই দারিদ্র্যের সঙ্গে জড়িত এবং শিশু ও কিশোর মনে ইহাদের প্রতিক্রিয়া ভয়ানক।

দারিদ্র্যের সঙ্গে আরও কতগুলি পারিবারিক কারণ যুক্ত হইতে পারে, যেমন শৈশবে পিতৃ কিংবা মাতৃবিয়োগ, পিতা প্রবাসে কিংবা অন্য কোনভাবে সন্তানদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন, জননী রুগ্ন কিংবা বাহিরে কর্মরত, ফলে সন্তানরা মায়ের সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত, বাপমায়ের অসুখী দাম্পত্য জীবন, বৈমাত্র ভাইবোনের জন্ম, পারিবারিক শৃংখলার একান্ত অভাব কিংবা কঠোর নিপীড়নমূলক শৃংখলা, বাপমায়ের তুচ্ছতাচ্ছিল্য অনাদৃত অবহেলিত শিশুচিত্তের সমস্ত সুকুমার বৃত্তি নষ্ট করে এবং তাহার মনে জট পাকায়। এইসব শিশুরাই কৈশোরকাল উপস্থিত হইলে অবাধ্য, একগুয়ে, অনিয়মানুবর্তী ও উচ্ছৃংখল হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য অতিরিক্ত আদরেও এইসব দোষগুলি প্রকাশ পাইতে পারে।

প্রতিকারের উপায়ঃ বাপমায়ের স্নেহ ও সহানুভূতি এবং উন্নত গৃহপরিবেশ চাই। গৃহপরিবেশ উন্নত করা একেবারেই অসম্ভব হইলে কোন সহৃদয় অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে বালক ও কিশোরদের রাখা উচিত।

বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশঃ পারিবারিক জীবন ব্যতীত কিশোরদের জীবনে বৃহত্তর সামাজিক জীবনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পড়ে (১) তাহার বিদ্যা প্রতিষ্ঠান অথবা কর্মক্ষেত্র। (২) তাহার অবসর সময় উদ্‌যাপন এবং (৩) সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধব।

(১) **বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানঃ** অধিকাংশ বালক এবং কিশোরই পায় বাঁধাধরা শিক্ষা, মেধাবী বালকদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। ক্ষীণবুদ্ধি বালকদের আবার পড়াশুনাটা বোঝা বলিয়া মনে হয়। যেসব কিশোর পড়াশুনার পাট চুকাইয়া কাজে নামে তাহারা যখন কাজে আনন্দ পায় না তখনও সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ তাহাদের কাজ যদি একঘেয়ে ও যান্ত্রিক হয় তবে কাজে তাহাদের মন বসে না। ফলে তাহারা অনেক সময় অপরাধকর্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

প্রতিকারঃ বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষণপদ্ধতির উন্নতি সাধন করা দরকার। বালকের পাঠক্রম তাহার উপযোগী হওয়া চাই। বিদ্যালয়ে হাতের কাজ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে খেলাধুলা, বিতর্ক, ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক সম্মেলন ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(২) **অবসর সময় উদ্‌যাপনঃ** কিশোররা কিভাবে তাহাদের অবসর সময় উদ্‌যাপন করে তাহাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে অপরাধপ্রবণ কিশোররা সাধারণতঃ তাহাদের অলস মুহূর্তগুলিতেই নানারূপ সমাজবিরোধী কাজের পরিকল্পনা করে। অধিকাংশ কিশোরদের উপযুক্ত খেলাধুলা শরীরচর্চা কিংবা কোন গঠনমূলক কাজে যোগদান করার সুযোগ নাই। ফলে তাহারা আড্ডা দিয়া বাজে নাটক নভেল পড়িয়া এবং সিনেমা দেখিয়া সময় কাটায়।

সিনেমার কুফলঃ কৈশোরে সিনেমার কুফল সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। সিনেমার প্রতি যাহারা অতিরিক্ত আসক্ত হইয়া পড়ে তাহারা স্কুল কিংবা কলেজ পালায়, বাড়িতে মিথ্যা কথা বলে এবং সিনেমা দেখার পয়সা জোগাড় করিতে না পারিলে চুরি পর্যন্ত করে। অনবরত সিনেমা দেখিয়া সে একটি কল্পনার জগতে বাস করে এবং বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোন মিল নাই। জীবনকে তাহার সস্তা, মজাদার এবং নাটকীয় বলিয়া মনে হয়। সমস্ত ছবিতেই আবার কিছু না কিছু প্রেমের গল্প থাকে। উহা

তাহাকে যৌন সচেতন এবং অকালপক্ব করিয়া তোলে। সে কেবল উত্তেজনা, কৌতুক এবং রোমান্স খুঁজিয়া বেড়ায়। বাস্তবের মুখামুখি হইতে যখন ভয় পায় তখন অনেকে আবার মাদকদ্রব্য সেবন করে। অপরাধমূলক ছবি দেখিয়া অনেকে আবার অপরাধ করার প্রত্যক্ষ প্রেরণা পায়। মেয়েরাও চিত্রতারকাদের হাবভাব, কথাবার্তা এবং সাজপোশাক অনুকরণ করে। ফলে তাহারা চপলমতি হয় এবং হাল্কা আমোদপ্রমোদ খুঁজিয়া বেড়ায়।

প্রতিকার : কিশোর বয়সের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে ভাল ছায়াছবি নির্মিত হওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত খেলাধুলা, শরীর চর্চা, চিত্তাকর্ষক অথচ সুস্থ আমোদপ্রমোদের সুযোগ পাইলে কিশোর বয়সের প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করা সহজ হইবে।

(৩) **সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধব :** সবচেয়ে মারাত্মক হইল সঙ্গীদের প্রভাব। কুসঙ্গে পড়িয়া ভাল ঘরের ছেলেরা পর্যন্ত জুয়া খেলে, মাদক দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়, যৌন ব্যভিচার করে এবং মেয়েরা পর্যন্ত বহুগামিনী হয়।

প্রতিকার : সন্তানদের বন্ধুবান্ধব নির্বাচনে বাপমার সর্বদা সাহায্য করিতে হয় এবং তাহারা কিরূপ সঙ্গী নির্বাচন করে সেদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিতে হয়। নিজেদেরও অবসর সময় যতটা সম্ভব তাহাদের সঙ্গে কাটাইতে হয়।

দৈহিক ত্রুটি : দৈহিক খুঁত শিশুদের মনে হীনমন্যতার সৃষ্টি করে। বামন, খঞ্জ, কুব্জ লোকেরা সাধারণতঃ সঙ্গীদের উপহাসের পাত্র হইয়া থাকে। এইসব দৈহিক খুঁত থাকা সত্ত্বেও তাহারা কখন কখন সুস্থ সবল দেহের অধিকারী হইয়া থাকে। এইসব বালকদের কেহ কেহ আক্রমণাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অথবা অন্য কোন প্রকার অপরাধ কর্মের মধ্য দিয়া আত্মতৃপ্তিলাভের চেষ্টা করে।

প্রতিকার : শৈশবেই দৈহিক খুঁতগুলির চিকিৎসা হওয়া দরকার। তাছাড়া ছবি আঁকা, গান, আবৃত্তি, খেলাধুলা অথবা অনুরূপ কাজের মধ্য দিয়া তাহাদের আত্ম-তৃপ্তিলাভের সুযোগ দেওয়া উচিত।

বুদ্ধির প্রভাব : ক্ষীণবুদ্ধি অপরাধপ্রবণতার একটি প্রধান কারণ। ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার একটা গভীর যোগ আছে। অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষীণবুদ্ধির সংখ্যা যথেষ্ট। তাহারা সাধারণ মানুষের মত ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ যেসব কাজ করিতে ভয় পায় কিংবা দ্বিধা করে ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তিরা সহজেই সেসব কাজ করিতে পারে।

প্রতিকার : প্রথম হইতেই ক্ষীণবুদ্ধি বালকদের কোন হাতের কাজ কিংবা তাহাদের বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুসারে যে কোন কাজে লাগান দরকার।

(1) মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিশুশিক্ষার মূলনীতি
(Mental hygiene and principles of child guidance)

মানসিক স্বাস্থ্য : স্বাস্থ্য বলিতে আমরা এতকাল দৈহিক সুস্থতাই বুঝিতাম। কিন্তু বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা উহার এক নূতন সংজ্ঞা দিয়াছে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী দেহে সুস্থ এবং মনে পরিপূর্ণ ব্যক্তিকেই প্রকৃত সুস্থ ব্যক্তি বলা যাইবে। সুতরাং স্বাস্থ্য শব্দটির

মধ্যে মানসিক সুস্থতাও নিহিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ ইংরেজী health শব্দটি আসিয়াছে এ্যাংলো স্যাকসন wholth শব্দ হইতে। wholth শব্দের অর্থ হইল পরিপূর্ণতা। দেহ এবং মন উভয়ই সুস্থ থাকিলে এই পরিপূর্ণতা আসিতে পারে।

সমস্ত পাশ্চাত্যদেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবার ফলে আজ তাহারা মানসিক সুস্থতার উপর জোর দিতেছে। আমাদের এই ভারতে অবশ্য চিরদিনই উহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। মানসিক সুস্থতার লক্ষণ হইল মনের সমত্ব। কতগুলি বাহ্য লক্ষণদ্বারা মনের সুস্থতা বোঝা যায় যেমন,—(১) মানসিক সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তির ভাব দেখা যাইবে। (২) বাহিরের জগতের সঙ্গে তিনি সহজেই নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিবেন। (৩) তাহার আচরণ হইবে বাঞ্ছিত অর্থাৎ সমাজের অনুমোদিত। (৪) সাধারণ ঈর্ষা, কুটিলতা, রোষ প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তিগুলি তাহার মনে অযথা জট পাকাইবে না।

পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান দেখাইয়াছে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার ছেলেবেলার ছাপ দিয়া। প্রত্যেকটি শিশুর যাহাতে মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সে সুনাগরিকরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে এইজন্য প্রথম হইতেই শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শিশুমঙ্গল উদ্দেশ্যে যে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে শিশুর প্রতি বাবা মা তথা পরিবারের দায়িত্বকে চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—(1) শিশুর জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ সৃষ্টি করা, (2) শিশুর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সঞ্চার করা, (3) শিশুর মনকে সমাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা এবং (4) তাহাকে মুক্তির আনন্দ দেওয়া।

জন্মেই শিশু সামাজিক থাকে না। তবে সামাজিক হইয়া উঠিবার প্রবণতা এবং সামর্থ্য লইয়া সে জন্মায়। শিশুর মনের উপযুক্ত বিকাশ ঘটে বাবা মা এবং পরিবারের অন্যান্য পরিজনদের সান্নিধ্যে। আত্মকেন্দ্রিক শিশু ও বহির্বিশ্বের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে পরিবার। পরিবারকে তাই বলা হয় 'The half way house between the ego and society."

শিশুর দাবী ঃ সন্তানের উপর যেমন বাবামায়ের দাবী রহিয়াছে সন্তানেরও বাবা-মায়ের উপর অনুরূপ কতগুলি দাবী আছে। ঐ দাবীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া শিশুর জীবন পরিচালিত করিতে হইবে।

শিশুর প্রথম দাবী **স্বাধীনতা**। তাহার সঙ্গে ব্যবহারের সময় মনে রাখিতে হইবে যে সে কতগুলি জন্মগত বৃত্তির সমষ্টি আর এই বৃত্তিগুলি প্রতি মুহূর্তে বিকাশের রাস্তা খুঁজিতেছে। গৃহ এই রাস্তা খুলিয়া দিবে—তাহাতে তাহার দেহ এবং মন দুয়েরই বিকাশ হইবে, সে ছুটিবে, লাফাইবে, খেলিবে, ছুঁড়িবে, সে হৈ হৈ করিবে, ভাঙিবে, গড়িবে, সব কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে হইবে। শিশুর যাহাতে বিপদ না হয় বাবা মা এইটুকু খেয়াল রাখিবেন কিন্তু তাহার জন্য এমন কিছু করিয়া দিবেন না যাহা সে নিজে করিতে পারে। জামা-জুতা নিজে পরা, নিজের পোশাক জিনিসপত্র নিজে গুছাইয়া রাখা—এইসব খুব ছোট-বেলায় অভ্যাস করাইতে হইবে। ইহার অর্থ তাহাকে জীবন নিয়া পরীক্ষা করিতে দেওয়া। ইহাতে যে স্বাবলম্বন, আত্মবিশ্বাস ও আত্মজ্ঞান শিক্ষা

হইবে, ভবিষ্যৎ জীবনের ঝড়ঝাপ্টায় উহা হইবে তাহার স্থায়ী সম্পদ। এই স্বাধীনতা তাহাকে শক্তিক্ষয়কারী জট হইতে বাঁচাইবে কারণ বৃত্তির দমন কোথাও হইবে না। নিরর্থক রোধনের জ্বালাও তাহাকে ভুগিতে হইবে না। 'ক'রো না' 'ক'রো না' এই কথার মত অকেজো জিনিস আর নাই।

স্বাধীনতার পরেই শিশুর আসে **নিরাপত্তা লাভের ইচ্ছা**। শিশু চায় দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তা। তাহার দৈহিক নিরাপত্তাবোধ যাহাতে ব্যাহত না হয় এইজন্য মায়ের কর্তব্য শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ান, ঘুমপাড়ান, পোশাক পরান এক কথায় যাবতীয় দৈহিক প্রয়োজনগুলি মিটান।

সকল শিশুই দৈহিক নিরাপত্তার চেয়ে মানসিক নিরাপত্তার সম্বন্ধে বেশী সজাগ। দেখা গিয়াছে বাড়িতে রূঢ় ব্যবহার পাইলেও শিশুদের কাছে গ হের পরিচিত পরিবেশই বেশী প্রিয়। নতুন ভাইবোনদের আগমনেও অধিকাংশ শিশু মানসিক নিরাপত্তা হারায়। নতুন শিশুর আগমনে বাপমাকে অনেক বেশী সতর্ক হইতে হইবে। গোড়ায় অতিরিক্ত আদর দিয়া পরে যেন শিশুকে বেশী অনাদর করা না হয়। তা ছাড়া বাবা মা বড়টিকে বুঝাইয়া দিবেন যে শিশুটি আসিতেছে সে তাহারই ভাই কিংবা বোন এবং অতি স্নেহের জন। আর বড়টির সামনে ছোটটিকে নিয়া বেশী আহ্লাদ করা চলিবে না, তবেই শিশুর মানসিক নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

শিশুর তৃতীয় দাবী হইল **স্বীকৃতি লাভ**। শিশু আবেগপ্রবণ এবং আত্মকেন্দ্রিক। সে সব কিছুর মধ্যেই তাহার নিজের গুরুত্ব দেখিতে চায়। শিশুকে শুধু আনন্দ দিবার জন্য এই স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন নয়, এই স্বীকৃতি তাহাকে পরিবারের তথা রাষ্ট্রের প্রকৃত সভ্যরূপে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে। তাড়য়েৎ বা পালয়েৎ কোন বয়সেই নয়, সব সময়েই 'মিত্রবদাচরেৎ'। বস্তুতঃ শিশু একটা শূন্য কুম্ভ নয়। তাহার একটা ব্যক্তিত্ব আছে—তাহাকে সম্মান করিতে হইবে, তুচ্ছ কিংবা অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। তাহার আগ্রহে কিংবা মনে কোন আঘাত না লাগে দেখিতে হইবে। তাহার অর্বাচীন কথা নিয়া হাসিঠাট্টা করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাহার অজস্র কেনতে বিরক্ত হইবার উপায় নাই কারণ এগুলি শিশুর কাছে বাস্তব সমস্যা। কৌশলে এইসব প্রশ্নের জবাব দিয়া শিশুর বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিত্বে অনেকটা প্রভাব ফেলা যায়। শিশুকে সম্মান করিলে সে নিজেকে সম্মান করিতে শেখে এবং পরকেও সম্মান করিতে শেখে।

শিশু অতিশয় অনুকরণপ্রিয়। সে সর্বদাই অপরের চালচলন হাবভাব নকল করিয়া চলে। তাই সবচেয়ে বেশী দরকার দৃষ্টান্তের। ব্যক্তিত্বই শুধু ব্যক্তিত্ব ফুটাইতে পারে। যেসব নৈতিক গুণ শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করিতে চাই, দেহ ও মনের যেসব অভ্যাস তাহার মধ্যে রোপণ করিতে চাই, যেসব পরিস্থিতিতে তাহার নিকট যে ব্যবহার পাইতে আশা করি, সেইসব উপদেশ দিয়া নয়, নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাকে শিখাইতে হইবে। বাড়িওয়ালা ভাড়া চাহিতে আসিলে বাবা যদি বলিয়া পাঠান—'বলগে, বাবা বাড়ি নেই'—ইহার পর সত্য ভাষণের কোন শিক্ষাই কাজে লাগে না। রেটিচিয়াস বলিয়াছেন—'আগে উদাহরণ, পরে নিয়ম' (Example is better than precept)। শিশুর ভাষা শিক্ষা যেমন অন্যের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া—কেতাব-ব্যাকরণ হইতে এই শিক্ষা হয় না, তাহার নৈতিক শিক্ষাও তেমনি বয়স্কদের অনুকরণ করিয়া। বাবামায়ের প্রতি অত্যধিক আসক্তি হইতে শিশু মনে করে তাঁহারাই আদর্শ মানুষ। তাঁহারা যাহা করেন

তাহাই ভাল। তাঁহারা যদি এই মর্যাদা না রাখেন তবে শিশু নিজের কাছে কোন আদর্শের কোন মর্যাদা রাখিতে শিখিবে না। আমাদের শিশু যে মানুষ হয় না বেশির ভাগ এই কারণে। বাবামার জীবন হইতে মানুষ হইবার খোরাক তাহারা বিশেষ কিছু পায় না।

মিথ্যাকথা ও চুরি ঃ মিথ্যা কথা ও চুরি করার জন্য বাবামা শিশুকে অনেক সময় শাসন করেন। শাসন করার পূর্বে দেখিতে হইবে ইহার সূত্র কোথায় ? বয়স্করা মিথ্যা কথা বলে শিশুকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে, শিশুরা তাহা করে না। কোন কোন মিথ্যার কারণ অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা স্মৃতির ভুল, কোন কোন মিথ্যা সমাজের রীতিনীতি তৈয়ারী করিয়া দেয়—যেমন 'অপ্রিয় সত্য বলিতে নাই'। কল্পনার আতিশয্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি কখন একটা সাধারণ কথাকে রং চং দিয়া বলিবার প্রেরণা দেয়। কখন বাবামার দৃষ্টান্ত কিংবা কুশিক্ষা মিথ্যা বলিতে শিখায়। শিশু যদি বোঝে সত্য কথা বলিলে সুবিচার পাইবে না কিংবা তাহার ইচ্ছাকে কোনমতেই সম্মান করা হইবে না তখন সে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রথম প্রবঞ্চনা করিতে শেখে।

চুরিও তাই। অবুঝ শিশু যাহা পায় তাহাতেই হাত দেয়—তাহা চুরি করে। শিশুর অধিকারবোধ অতৃপ্ত থাকিলে আর তাহার ইচ্ছা ও আকর্ষণ অনুযায়ী কোন প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে অর্জন করিতে না পারিলে সে চুরি করিতে শেখে।

শিশু-শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা আমাদের ঘরে ঘরে প্রচলিত। ইহার চেয়ে বাবা মা ভাল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন ঃ

(1) জবরদস্তির তুলনায় উৎকৃষ্টের আভাস, ইঙ্গিত ও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। (2) চাপ দেওয়া স্বাভাবিক বিকাশের বিরোধী। ইহাতে ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়, অসন্তোষ জমা হয়। শাস্তি ছাড়া অন্যরকম চাপ দিয়াও শিশুকে সহযোগী এবং বিচারশীল করা যাইতে পারে। (3) শিশুকে যদি অন্যায় কাজের জন্য তিরস্কার করা হয় তবে ভাল কাজে যখন সে সাধ্যমত চেষ্টা করিবে তখন খেয়াল করিয়া তাহাকে প্রশংসা করিতে হইবে। (4) কোন ভাল কাজে তাহার আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া তাহার বদভ্যাসগুলি দূর করার চেষ্টা করিতে হইবে। (5) বেশী বকাবকি করিলে ওগুলি গা-সওয়া হইয়া যায়, পরে আর তাহাতে শিশু পরোয়া করে না। (6) সামান্য বিষয় নিয়া খুঁত ধরা কিংবা অন্যের সামনে দোষ দেখানো সাধারণ ভদ্রতার নিয়মবিরুদ্ধ। ভদ্রতার নিয়ম শিশু ও বয়স্কে সমান মান্য। (7) বাবা-মা যে সম্মান সন্তানের নিকট আশা করেন সেই সম্মান তাঁহাদের নিকট সন্তানেরও প্রাপ্য। (8) শাসন কিংবা সংশোধনের সময় বাবা-মা কণ্ঠস্বর সংযত রাখিবেন, মুখে তাঁহাদের হাসি থাকিবে। (9) সব সময় দেখিতে হইবে কাজটার উদ্দেশ্য কি ? অন্যায় ভাবে শাসন করিয়া অনেক সময় অনেক সদ্বৃত্তিকে আমরা মারিয়া ফেলি। (10) শিশুর বয়স ও বুদ্ধি কোন্ স্তরে আছে তাহা দেখিতে হইবে। সংশোধনের উদ্দেশ্য পরের স্তরে তাহাকে পথ দেখাইয়া নেওয়া। (11) অনেক সময় বাবামায়ের দাবীটা সঙ্গত থাকে না। উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাবামা অনেক সময় আপন উচ্চাভিলাষ সন্তানের উপর দিয়া মিটাইতে চেষ্টা করেন। ফলে শিশুকে জীবনের সমস্ত খেলাধুলা সকল আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে লেখাপড়া গানবাজনা ইত্যাদিতে পারদর্শী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শৈশবের দাবী যৌবন ও বার্ধক্যের দাবীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

সন্তানের কাছে আমরা অন্ধ বাধ্যতা চাই না, চাই বিচারশীল সহযোগিতা, তাহারা স্বাধীন ব্যক্তিত্ব অর্জন করিবে—তাহারা ভাবিবে, বিচার করিবে, নিজে নিজে সিদ্ধান্ত করিতে শিখিবে। ভুল করিলে তাহাকে কেমন করিয়া শাসন করিব এটা সমস্যা নয়, ভুল এড়াইয়া চলিতে কিভাবে তাহাকে সাহায্য করিব তাহাই আসল সমস্যা।

পুরস্কার ঃ শাস্তির মত পুরস্কার প্রথায়ও গলদ আছে। অনেক সময়ই পুরস্কার হয় ঘুষের নামান্তর এবং শিশুকে শোধরাইবার বদলে তাহাকে আরও স্বার্থপর করিয়া তোলে। 'লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে ফেল, একটা পয়সা পাবে।' 'ফ্রকটা পর, একটা বিস্কুট দেব'—এগুলি ঘুষ। শিশু বুঝিল খাওয়া বা জামা পরা তাহার নিজের প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন তাহার মায়ের, মা স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাকে দাম দিতেছেন। সে আরও শিখিল অন্যায়ভাবে নিজের অভিষ্ট সিদ্ধি করিতে এবং দর কষাকষি করিতে—'একটা নয়, দুটো পয়সা'। 'বিস্কুট নয়,' 'চকোলেট' ইত্যাদি। ইহার চেয়েও খারাপ হইতেছে স্নেহের ঘুষ "আমাকে যদি ভালবাস তবে আমার কথা শোন, লক্ষ্মীটির মত ঘুমাও।" স্বার্থ-সিদ্ধির লোভ দেখাইয়া তাহাকে দিয়া কাজ করাইতে নাই, অন্যের ইচ্ছার উপরে জোর দিয়াও নয়। তাহার কাজ তাহার নিজেরই প্রয়োজন—না করিলে সে প্রশংসা পাইবে না, করিলে পাইবে। এইটুকুই যথেষ্ট।

বেয়াড়া শিশু (Problem-child)—বেয়াড়া শিশুদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়—অল্পবুদ্ধি (backward), যাহারা বিশৃংখল ও আচরণে সমতা রাখিতে পারে না (akward), তাই কিছুই করিতে পারে না, খেয়ালী (troublesome)—যাহারা শুধু শিখিতে অচেষ্ট নয়, নতুন অসুবিধা সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট। আবার কোন কোন শিশু এই সবগুলি দোষ নিজের মাথায় জড় করিয়া আছে।

প্রতিকার—এই দোষ যদি বাপ-মার কাছ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া হয় তবে বিশেষ কিছু প্রতিকার নাই। কোন দৈহিক ত্রুটি বা অঙ্গহানির দরুনও তা দেখা দিতে পারে। খুব সাবধানে বিশেষজ্ঞ দ্বারা তখন চিকিৎসা করা দরকার। এই অবস্থায় শুধু ধৈর্যশীল স্নেহ ও উৎসাহ তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বেয়াড়ামীর জন্য দায়ী গৃহ ও স্কুলের আবহাওয়া। দারিদ্র্য, শৈশবে পিতৃমাতৃ বিয়োগ, বাপমার তাচ্ছিল্য, কড়া শাসন—এইসব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া অচেতন মনে জট বাঁধায়। তারপর স্কুলে গিয়া ছেলে পায় বাঁধাধরা ছাঁচে ঢালা শিক্ষা। তাহার আগ্রহ জাগানো হইল না। তাহার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখা হইল না। বিদেশী ভাষা ও অনাবশ্যক পাঠ্যবস্তু তাহার কাঁধে চাপানো হইল। তারপর আসিল পরীক্ষার ভীতি, অল্পবয়সে তাহার সমস্ত আনন্দের নির্বাসন ও সকল আশার সমাধি। রবীন্দ্রনাথ শিশুশিক্ষার এই দুর্দশার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তিদ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টাদ্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে" (রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসমস্যা)। গৃহে দমিত দন্দ্বের নিরসন ও বৃত্তির উৎকর্ষণ এবং স্কুলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা—বেয়াড়া শিশুকে শোধরাইতে হইলে ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই।

সপ্তম অধ্যায়

ভাবী গৃহস্থদের পারিবারিক জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা
(Family life Education for Future Home-Makers)

ভারতীয় বিবাহের উদ্দেশ্য ঃ

বিবাহের মধ্য দিয়া প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের একটা সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এই দুই অভিপ্রায়ের মধ্যে মিল বেশী না বিরোধ বেশী তাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবাহের চেহারা ও ভাবের পার্থক্য ঘটে। আমাদের দেশে এতকাল সমাজ রক্ষাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন ভারতের সমাজ-জীবন ছিল সম্পূর্ণ গৃহকেন্দ্রিক। তাহাদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, ধর্ম সমস্ত মঙ্গলকার্য গৃহস্থের দানের সাহায্যে চলিত। দান যে কেবল ধনীরই কর্তব্য ছিল তাহা নয় সকল গৃহীকেই শ্রাদ্ধ বিবাহ ইত্যাদি কাজে আপামর জনসাধারণকে নিজ নিজ সাধ্যমত দান করিতে হইত। এইভাবে দানের মধ্য দিয়া দাতা নিজেই সার্থক হইয়া উঠিতেন। সমাজ যেখানে গৃহকেন্দ্রিক বিবাহকে সেখানে নিজের পথে চলিতে দিতে চাহিলে বিপদ ঘটে। এখানে বিবাহের বাঁধ বাঁধা থাকিলে সমাজের বাঁধ টেঁকে। বিবাহ ছিল তাই ভারতীয়দের কাছে এক মহাযজ্ঞস্বরূপ।

কিন্তু সমাজের শৃঙ্খলে সকল মানুষকে সমানভাবে বাঁধা যায় না। মনুকে তাই গান্ধর্ব, রাক্ষস, অসুর ও পৈশাচ বিবাহ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সামাজিক ইচ্ছা নয়, মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাই এইসব বিবাহে প্রবল ছিল। শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ ছিল চারি প্রকার—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্য। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই শ্রেষ্ঠ। এই বিবাহের রীতি অনুসারে অযাচক বরে কন্যা দিতে হইবে। যে বর কন্যাকে নিজে প্রার্থনা করে সে তাহার সামাজিক উপযোগিতাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। বিবাহের ব্যাপারে এত কড়াকড়ির উদ্দেশ্য ছিল সৌজাত্য রক্ষা।

1. **বিবাহের প্রস্তুতি ঃ**
   (Preparation for marital life)

ভারতে বিবাহ একটা তপস্যার রূপ ধারণ করিয়াছিল। তাহার লক্ষ্য ছিল সুসন্তান লাভ, কবির ভাষায় কুমারসম্ভব। মহাকবি কালিদাসের তিনটি অপরূপ কৃতি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলমে বিবাহের এই উদ্দেশ্যই প্রকট হইয়াছে।

দাম্পত্য জীবনে প্রেমেরও একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং বিবাহের বহুপূর্ব হইতেই কন্যার জীবনে তাহার প্রস্তুতি শুরু হইয়া থাকে।

স্বামী নামক একটি ভাবকে তাহারা ভক্তি করিতে শেখে। নানা কাহিনী, ব্রত-পূজার মধ্য দিয়া এই ভক্তিকে মেয়েদের রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়। তারপর বিবাহের পর তাহারা যাহা পায় তাহা কোন ব্যক্তি নয় পায় একটি ভাব তাহার নাম স্বামী। এই ভাবের কাছেই সে আত্মসমর্পণ করে। তারপর বিবাহের দিন নানা মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়া তাহাকে বুঝান হইয়া থাকে সে যাহাতে পতিব্রতা হইয়া সুগৃহিণী হয় এবং পতিকুলে দৃঢ় থাকে।

পাণিগ্রহণের মন্ত্রগুলিও নানা উপদেশে ভরা। প্রথম মন্ত্রে কন্যাকে পাণিগ্রাহকের সংসারের সুখসৌভাগ্য বর্ধনের কথা বলা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে বলা হয় কন্যা যেন সর্বতোভাবে স্বামীর অনুগামিনী হয়, গৃহপালিত সমস্ত পশুগুলির পরিচর্যায় তাহার কল্যাণ হস্ত নিযুক্ত হয়। স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যেন তাহার প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি থাকে। গর্ভাধানের উদ্দেশ্যে চতুর্থ মন্ত্রটি পাঠ করা হয়। পঞ্চম মন্ত্রটি অতি পবিত্র এবং গভীর। এই মন্ত্রে স্বামী পত্নীকে বলেন, 'প্রিয়তমে, তোমাকে কেবল আমার সেবা কিংবা সুখের নিমিত্ত গ্রহণ করিতেছি না, তুমি আমার পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী সকলের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।' সংসারের পাঁচজনের জন্য ব্যক্তিগত সুখ বিসর্জন দিবার মহান্ আদর্শ একমাত্র ভারতেই বর্তমান একথা বলা বাহুল্য। তারপর স্বামীস্ত্রীর হৃদয়ের ঐক্যসাধনের নিমিত্ত স্বামী বধূকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন—

যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

হে দেবি! আজ হইতে তোমার ঐ হৃদয় আমার হউক আর আমার এই হৃদয় তোমার হউক।

বস্তুতঃ বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল তিনটি—

(১) সুস্থ সুন্দর গৃহরচনা, (২) সু-সন্তান সৃষ্টি এবং (৩) দম্পতির আত্মিক মিলন।

মেয়েরা যাহাতে উপযুক্ত গৃহিণী হইয়া উঠিতে পারে এইজন্য প্রথমেই প্রয়োজন **গৃহবিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য অর্থনীতির শিক্ষা**। বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল সুসন্তান-লাভ। মা হওয়াটা অবশ্য মেয়েদের একেবারে স্বভাবের মধ্যে কিন্তু মাতৃত্বের একটা সাধনা রহিয়াছে। সে সাধনা সন্তান নয়, সুসন্তান সৃষ্টির সাধনা। এই সাধনাকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য মেয়েদের আপন স্বাস্থ্যটি সুদৃঢ় করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবী সন্তানের উপযুক্ত মা হইবার জন্য তাহাকে **স্বাস্থ্যতত্ত্ব** এবং শিশু **মনোবিজ্ঞানের** প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশুরাই যে রুগ্ন দুর্বল অনেক সময় তাহার কারণ দারিদ্র্য নয়, জননীর অজ্ঞতাই তাহাকে রুগ্ন করিয়া তোলে। মনোবিজ্ঞানের উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে মেয়েরা শিশুকে ঠিক পথে পরিচালনা করিতে পারে না। অতিরিক্ত আদরে আহ্লাদে তাহাকে একেবারে ননীর পুতুল করিয়া ফেলে নতুবা তাহার প্রাক্ষোভিক প্রয়োজন মিটাইতে না পারিয়া তাহার মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, কখনো বা তাহাকে অপরাধপ্রবণ করিয়া তোলে।

মাতৃরূপ ব্যতীত নারীর আরেকটি রূপ আছে, সেই রূপ প্রেয়সীর। যৌবনে পুরুষ নারীর প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করে। তাই বিবাহের প্রস্তুতির পূর্বে মেয়ে পুরুষ উভয়েরই যৌনশিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। উপযুক্ত যৌন শিক্ষা দ্বারা বিবাহ সফল করিয়া তোলা সম্ভবপর হয়। তবে সফল যৌন জীবনই দাম্পত্যজীবনের শেষ কথা নয়। পরিণত বয়সে দম্পতি পরস্পরকে আপনার আত্মার আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তখনই নারী প্রকৃত প্রেয়সী হইয়া ওঠে। বস্তুতঃ প্রেয়সীরূপে নারীর সাধনা হইল পুরুষের সকল প্রকার উৎকৃষ্ট প্রচেষ্টাকে প্রাণবান করিয়া তোলা। নারীর যে গুণের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় সে হইল তাহার মাধুর্য বা আনন্দশক্তি। এই

মাধুর্য কিন্তু মোহিনীশক্তি নয়, মোহ দিয়া পুরুষকে আকর্ষণ করা যায় বটে কিন্তু সুস্থ, সুন্দর, আনন্দময় গৃহ রচনা করা যায় না। তাই মাধুর্যের সঙ্গে চাই ধৈর্য, ত্যাগ, সংযম, চিন্তায় ও ব্যবহারে শ্রীর অনুশীলন। ইহাই বিবাহের প্রকৃত প্রস্তুতি।

2. **পারিবারিক জীবন শুরু ঃ**
(Beginning of a family)

বিবাহের পর নরনারীর দাম্পত্যজীবন শুরু হইয়া যায়। এই জীবনের গুরুত্ব অনেক এবং দায়িত্বও প্রচুর। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত পূর্বরাগের পালা চলিয়াছিল কিন্তু তখন তাহারা পরস্পরকে জানিবার সুযোগ পায় নাই। দাম্পত্যজীবন শুরু হইলে উভয়ে উভয়কে নিবিড়ভাবে জানার সুযোগ পায়। তখন দুই জনের চরিত্রের বৈশিষ্ট-গুলির সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি ধরা পড়ে। এই সময় দুজনে যদি দুজনের সঙ্গে ঠিক ঠিক খাপ খাওয়াইতে পারে তবেই দাম্পত্যজীবন সুখের হইতে পারে।

দাম্পত্য জীবনের কতকগুলি প্রতিকূল উপাদান আছে। প্রথম হইতেই এইসব প্রতিকূল উপাদান সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। এই উপাদানগুলি হইল ঃ

(১) **জনতৃসংসক্তি** (Parent Fixation) ঃ দাম্পত্য সুখের একটি প্রধান অন্তরায় হইতে পারে জনতৃসংসক্তি অর্থাৎ বরবধূর নিজ নিজ বাপমার প্রতি প্রবল আসক্তি। বিবাহের পরে বধূ যদি আসিয়া দেখে স্বামী মায়ের আঁচলধরা এবং একান্ত অনুগত তখন একটা মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অনুরূপভাবে মেয়েরাও পিতার প্রতি প্রবল আসক্ত থাকিতে পারে। এই সকল মেয়েরা সচরাচর পিতার অনুরূপ স্বামী কামনা করে। স্বামীগৃহে পদার্পণ করিবার পর তাহারা যদি প্রতি পদে পিতার সহিত স্বামীর অবাঞ্ছিত তুলনা করে তবে অসন্তোষ দেখা দেয়। কারণ পিতার যে বয়স ও অভিজ্ঞতা থাকে যুবক স্বামী সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। দম্পতির প্রবল বাস্তববোধই এইসব সমস্যার সমাধান করিতে পারে।

(২) **চারিত্রিক দ্বন্দ্ব** (Conflicting Personalities) ঃ স্বামীস্ত্রীর চারিত্রিক দ্বন্দ্ব দাম্পত্য সুখের আরেকটি প্রধান অন্তরায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি অত্যন্ত জেদী কিংবা আত্মাভিমানী (egotistical) হয় এবং একে অপরের নিকট হার মানিতে একেবারে নারাজ থাকে তবে সংঘাত অনিবার্য। এরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের চরিত্রে নমনীয়তা গুণটির অনুশীলন দরকার, নতুবা পরস্পরের সঙ্গে খাপখাওয়ানো অসম্ভব হইয়া পড়ে।

(৩) **শ্বশ্রূমাতার উপস্থিতি ঃ** আমাদের দেশে বধূ নিপীড়নের কাহিনী আজও শোনা যায়। শ্বশ্রূমাতারা পুত্রবধূকে অবাঞ্ছিত অংশীদার মনে করিয়া নানারূপ জট পাকায়। এখানে স্ত্রীর নম্রতা গুণ এবং স্বামীর বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সময়মত হস্তক্ষেপ দরকার।

(৪) **নৈরাশ্য** (Frustration) ঃ কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত হইতে আসে নৈরাশ্য। বিবাহের পর প্রথম অনুরাগের পালা শেষ হইলে নতুন নতুন সমস্যা আসিতে থাকে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার সমস্যা ত থাকেই তার উপর দেখা দেয় বাসগৃহের সমস্যা, সীমাবদ্ধ আয়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সংসার চালাইবার সমস্যা ইত্যাদি। স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের নিকট পরস্পরের চাহিদাও কিছু থাকে। সেগুলি না

মিটিলে নৈরাশ্য আসিতে পারে। স্বামীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে স্ত্রী নিজেকে খাপ খাওয়াইতে না পারিলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মনে নৈরাশ্য আসে।

কাহার কিসে নৈরাশ্য আসিবে বলা কঠিন। তবে বলা যায় স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগ, ছোটখাটো দোষত্রুটিগুলিকে লঘু করিয়া দেখার চেষ্টা, নির্ভরতার মনোভাব, একের অন্যকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার সদিচ্ছা লইয়া দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে তবে ঐ জীবন সুখের হয়।

3. **জনিতাদের দায়িত্ব ঃ**

(Responsibility of Parenthood)

সন্তানপালনে প্রত্যেক পিতামাতার দায়িত্ব রহিয়াছে। এই দায়িত্ব দ্বিবিধ—**প্রথমতঃ,** সন্তানের ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন অর্থাৎ শিশু যে সম্ভাবনা লইয়া জন্মিয়াছে সেই সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে ফুটাইয়া তোলা। দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রথম ও প্রধান উপকরণ হইল একটি সুস্থ সবল দেহ। তাই সন্তানপালনে বাপ-মার প্রাথমিক কর্তব্য হইল নীরোগ বলিষ্ঠ শিশুর জন্মদান। শিশুকে সুস্থ রাখার জন্য মা-বাবা একদিকে যেমন সন্তানের দৈহিক প্রয়োজনগুলি মিটাইবেন অন্যদিকে তেমনি নিজেদের দেহকেও সুস্থ, সবল ও নীরোগ রাখিবেন।

প্রাথমিক দৈহিক প্রয়োজন মিটিবার পরে শিশুর প্রয়োজন মানসিক নিরাপত্তা। শিশুর মনে নিরাপত্তা জাগাইবার জন্য পিতামাতার বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। সব বাপ-মাই অবশ্য সন্তানকে ভালবাসেন কিন্তু অনেক সময় তাহাদের আচরণের ত্রুটির ফলে শিশুর নিরাপত্তা বোধ বিঘ্নিত হয়। যেমন, নতুন সন্তানের আগমনের ফলে বাপ-মা অনেক সময় নবজাতটিকে লইয়া বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়েন, কখনো একটি সন্তানের সঙ্গে আরেকটির অবাঞ্ছিত তুলনা করেন যাহার ফলে স্বল্পবুদ্ধি শিশুর মধ্যে হীনমন্যতা দেখা দেয়; অনেক বাপ-মা সন্তানদের সামনেই নিজেদের আর্থিক অভাব-অভিযোগের কথা নিয়া আলোচনা করেন। এইরূপ আলোচনা শিশুর মনকে ভারাক্রান্ত করে এবং শিশুর নিরাপত্তাবোধ নষ্ট করে।

শিশুর মনে নিরাপত্তার ভাব জাগাইবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইল তাহাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা। শিশু যদি অনুভব করে যে সে পরিবারের একজন বাঞ্ছিত ব্যক্তি, গৃহে তাহারও একটি নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং তাহার সেই আসন আর কাহারো দ্বারা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয় তবেই শিশুর মনে নিরাপত্তা বোধ জাগিবে। সব শিশুদের যোগ্যতা সমান নয়; একটি হয়ত লেখাপড়ায় ভাল, আরেকটি গায় ভাল, আবার আরেকটি হাতের কাজে পটু। বাপ-মার কর্তব্য একটির সঙ্গে অন্যটির মেধার তুলনা না করিয়া প্রত্যেকটিকে তার নিজ নিজ কাজে উৎসাহ দেওয়া। প্রত্যেকে যেন উপলব্ধি করে তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সবই গর্বের, আনন্দের এবং প্রশংসার। এইভাবে মা-বাবার কাছে আপন প্রতিভার স্বীকৃতি পাইলে শিশুদের সহজ স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয়।

সন্তান বড় হইলে অনেক বাপ-মা অভিযোগ করেন সংসারের প্রতি ছেলের কোন দায়িত্ববোধ জাগে নাই। পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে দায়িত্বের ভাব জাগাইয়া তোলা

বাপ-মায়েরই কর্তব্য। সহযোগিতাই হইল পরিবার তথা সমাজজীবনের বনিয়াদ। শিশুকে ছোট ছোট কাজের ভার দিয়া তাহার মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব জাগাইতে হইবে এবং তাহাকে দায়িত্বশীল করিয়া তুলিতে হইবে। পরিবারের সাধারণ সমস্যাগুলি যখন আলোচিত হইবে তখন তাহার মতামতকেও বয়স্কদের সমান মর্যাদা দিতে হইবে।

শিশুকে সমাজায়িত করার জন্য গৃহে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার যাহাতে শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ হইতে পারে, অভ্যাস ও চিন্তাধারা সমাজ জীবনের উপযোগী হইতে পারে। শৈশবে বাপ-মার কাছে শিষ্টাচার, বিনয়, কথার মর্যাদা রক্ষা করা প্রভৃতি কতকগুলি সদাচার ও সদ্‌গুণের অনুশীলন হওয়া উচিত এবং ইহার জন্য চাই উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। শিশুর বাপ-মা যদি পরিবারের পাঁচজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন, বয়স্কদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সৌহার্দ্য রক্ষা করিয়া চলেন তবেই শিশুর জীবনে ঐসব গুণগুলি ফুটিতে পারে, তা নইলে নয়।

জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে প্রত্যেক মানুষকেই কিছু না কিছু অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হয়। বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে বাপ-মা অনেক সময় সন্তানদের সামর্থ্য এবং ঝোঁকটা উপলব্ধি করিতে চান না। লব্ধপ্রতিষ্ঠা পিতারা আবার সন্তানকেও নিজের মতই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চান, কখনো আবার নিজের বৃত্তিতে নিযুক্ত করার জন্য ছেলেকে প্রস্তুত করান। তাহাদের ধারণা উপযুক্ত শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের দ্বারা সন্তানের মধ্যে আপন প্রতিভার সঞ্চার করা কঠিন হইবে না। এইভাবে শিশুর শিক্ষা লইয়া একটা জোরজবরদস্তি চলে। বাপ-মার ভুলটা এই যে সন্তানকে এক তাল কাদা ভাবিয়া তাহারা নিজেদের কুম্ভকারের আসনে বসান এবং আপন ইচ্ছামত রূপ দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা কেবল শিশু উদ্যানের মালি মাত্র। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ রচনা করিয়া যাওয়াই তাহাদের কাজ।

4. পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ
(Interpersonal relationship in family life)

ভারতের দুইখানি মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' পারিবারিক জীবনের চিত্র। পারিবারিক সম্পর্ক যখন সুন্দর হয় তখন তাহা জীবনকে কত মধুর, সরস ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে তাহাই দেখান হইয়াছে রামায়ণে। আর এই সম্পর্ক যখন ঈর্ষা ও কলহে জর্জর হইয়া ওঠে তখন জীবনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া যে কী সাংঘাতিক হইতে পারে তাহাই আমরা দেখিয়াছি মহাভারতে। পারিবারিক সদ্ভাব কিংবা অ-সদ্ভাবের উপর নির্ভর করে একটি পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের শান্তি, চরিত্রের বিকাশ, আর্থিক সমৃদ্ধি এমন কি তাহার উত্থান পতন পর্যন্ত! পারিবারিক লোকেদের অসদ্ভাবের ফলে শিশুরা বিপর্যস্ত হয় সবচেয়ে বেশী।

পরিবারের কাছে শিশুর প্রথম দাবী হইল নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তার অভাব ঘটিলে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না। শিশু যদি তাহার আপন জনের কাছে ভালবাসা পায় তবেই তাহার মধ্যে নিরাপত্তার ভাব জাগে। শিশুর সব চাইতে আপন জন হইল তাহার মা এবং বাবা। প্রত্যেক মা বাবাই অবশ্য নিজ নিজ সন্তানকে ভালবাসেন। তবে মা বাবার ভালবাসাই শিশুর কাছে যথেষ্ট নয়, শিশুর চরিত্র বিকাশের জন্য মা বাবারও পরস্পরকে ভালবাসা চাই। তাহারা যদি দিনরাত কলহ

করেন কিংবা উভয়ের মধ্যে খিটিমিটি যদি লাগিয়াই থাকে তবে শিশু (বালক ও কিশোররাও) প্রথমেই একটা সঙ্কটে পড়ে—মা বাবার মধ্যে কে ঠিক? সে কাহার পক্ষ লইবে? শৈশবেই এইভাবে যাহার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া যায় পরিণত বয়সেও তাহাকে দেখা যায় ভীরু এবং দ্বিধাগ্রস্ত। পরিবারের লোকেদের মধ্যে অসদ্ভাবের পরিণতি এইখানেই সীমাবদ্ধ নয়। ইহার ফল আরও সুদূরপ্রসারী।

স্বামী-স্ত্রী ছাড়া গৃহের অন্যান্য সকলের মধ্যেও সদ্ভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন। গৃহের নিরানন্দময় পরিবেশ কিংবা গুমোট আবহাওয়া শিশুচিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। ঘরে তাহারা কোন আনন্দ পায় না। স্নেহের বদলে হয়ত পায় বকুনি আর মারধর। বয়স্কদের মধ্যেও দেখে শুধু কলহ আর বিদ্বেষ। ঘরে এই শান্তির অভাব স্বভাবতঃই তাহাদের মনকে বাড়ির বাহিরে ঠেলিয়া দেয়। শিশু ও বালকরা লেখা পড়ায় মনোযোগ দেয় না। অধিকাংশ সময় খেলিয়া বেড়ায়। কিশোররা আবার নানারকম কুসংসর্গে মেশে। বেশীর ভাগ বালকবালিকা ও কিশোর কিশোরীরা সিনেমায় যাতায়াত শুরু করে। সিনেমার থ্রিল সাময়িকভাবে তাহাদের দুঃখ ভুলাইয়া দেয় বটে কিন্তু সিনেমার কুফলগুলি শীঘ্রই তাহাদের মধ্যে প্রকট হইয়া ওঠে। মনস্তাত্ত্বিকরা আজ সকলেই একমত যে বালক ও কিশোরদের অপরাধ প্রবৃত্তির মূলে থাকে শৈশবীয় নিরানন্দময় পরিবেশ।

শিশুর প্রক্ষোভগুলির কোনটিই জন্মগত নয়। ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিগুলি এবং রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতি অসদ্‌বৃত্তিগুলি উভয়ই তাহার অর্জিত। কাজেই শিশুরা যদি বাড়ির লোকেদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, করুণা ও সহানুভূতি দেখিতে পায় আর কলহ কপটতাকে ঘৃণা করিতে দেখে তবে সহজেই তাহাদের মধ্যে সদ্‌প্রবৃত্তিগুলি প্রবল হইয়া উঠিবে এবং অসদ্‌বৃত্তিগুলিকে আবার বড়দের অনুকরণ করিয়া তাহারা ঘৃণা করিতে শিখিবে। আজিকার শিশুই আবার ভবিষ্যতের নাগরিক। শৈশবে যাহার মধ্যে সামাজিক সদ্‌-গুণগুলির বিকাশ হইবে পরিণত বয়সে সে যে সুস্থ নাগরিক হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরিবারের লোকেদের সুস্থ সম্পর্কের উপরেই গৃহের প্রকৃত শান্তি, শৃঙ্খলা ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে। পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাকিলেই স্ত্রী স্বামীর জন্য, পুত্র পিতার জন্য, ভগ্নী ভ্রাতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। পিতার কষ্টোপার্জিত ধন পুত্র স্বচ্ছন্দে নষ্ট করে না। অভাবগ্রস্ত ভাইকে ভাই সাহায্য করে। পারিবারিক জীবনের এই ভালবাসা ও সহানুভূতি পরে আবার সমাজ জীবনেও প্রতিফলিত হয়। আমাদের জীবন গৃহকেন্দ্রিক। আমাদের দেশের পারিবারিক সম্বন্ধগুলি যদি সুন্দর হইত তবে সমাজ জীবনকে আমরা আরও সহজে সুন্দরতর করিয়া তুলিতে পারিতাম, সাধারণের মধ্যে সমাজ চেতনা জাগাইতে আমাদের এত বেগ পাইতে হইত না।

5. পরিবার পরিকল্পনা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য :
(Concept of family planning and personal health)

পরিবার পরিকল্পনা কাহাকে বলে?—পরিবার পরিকল্পনা কথাটি আজ আর কাহারও অবিদিত নয়। শিক্ষিত লোকমাত্রই এই কথাটির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। পরিবার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে জন্মনিয়ন্ত্রণ (birth control)।

সাধারণভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বলিতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমাইবার যত রকম পদ্ধতি জানা আছে তাহার সবগুলিকেই বুঝায়। এই হিসাবে শিশু-হত্যা, ভ্রূণ-হত্যা, বিলম্বে বিবাহ, ব্রহ্মচর্য পালন, যান্ত্রিক কিংবা রাসায়নিক উপায়ে জন্মরোধ করা সবই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত। কিন্তু আধুনিক পরিভাষায় জন্মনিয়ন্ত্রণ শুধু জন্মনিরোধ নয়। ইহার যেমন একটি নেতিবাচক (negative) দিক আছে তেমনি আবার একটি ইতিবাচক (positive) দিকও আছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের এই ইতিবাচক দিকটির উপর জোর দিবার জন্য ১৯৪২ সালে আমেরিকার জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানটি উহার National Birth Control League নাম বদলাইয়া Planned Parenthood Federation of America নামকরণ করে। জন্মনিয়ন্ত্রণ তথা পরিবার পরিকল্পনার প্রকৃত অর্থ হইল সুপরিকল্পিত ভাবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে স্বামীস্ত্রীর আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী অল্পসংখ্যক সুস্থ ও সবল সন্তান উৎপাদন করা। জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে শিশুর আগমন সম্পূর্ণভাবে বাপমার ইচ্ছাধীন। পরিবার পরিকল্পনা একদিকে যেমন অবাঞ্ছিত শিশুর জন্ম প্রতিরোধ করে অন্যদিকে তেমনি বাঞ্ছিত শিশুর আগমনকে উৎসাহিত করে।

পরিবার পরিকল্পনার উপায়—পুরাতন ও নব্য—পরিবার পরিকল্পনাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রসঙ্গ কিন্তু পুরানো আমলের লোকেরাও উহার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিল না। তাহারা সাধারণতঃ শিকড় বাকড় বা মন্ত্রপূত ঔষধের সাহায্যে অবাঞ্ছিত শিশুর জন্ম প্রতিরোধের চেষ্টা করিত। বর্তমান যুগের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তুলনায় অনেক উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত।

জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক যেসব পন্থা জানা আছে তাহার মধ্যে দম্পত্তির যে কোন একজনের বন্ধ্যাত্ব স্বীকার (sterilization) এবং যান্ত্রিক অথবা রাসায়নিক পদ্ধতিতে জন্মনিরোধ করাই প্রধান। ভ্রূণের ধ্বংসসাধনও (abortion) অন্যতম উপায় তবে ভ্রূণহত্যা নরহত্যারই নামান্তর। শুক্রকীট এবং বিকশিত ডিম্বাণুর মিলনেই ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। উহারা যদি একত্র মিলিত হইতে না পারে তবে সন্তানের জন্ম হয় না। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মূলকথা হইল এই মিলনকে প্রতিরোধ করা অর্থাৎ সহজ ভাষায় গর্ভরোধ করা। জন্মনিয়ন্ত্রণ বা গর্ভ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা (conception control) বর্তমান রাষ্ট্রগুলি পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী গ্রহণ করিতেছে।

পরিবার পরিকল্পনা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষাঃ জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের দেশে কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রসূতি মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশী। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সন্তান প্রসব ছিল প্রসূতি মৃত্যুর প্রধান কারণ। নারীর পক্ষে সন্তানধারণ মানেই নিজের জীবনের উপর একটা ঝুঁকি লওয়া। তাহার উপর অনেক সময় ঘন ঘন সন্তানধারণের ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে, প্রসূতি জরায়ুসংক্রান্ত নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাহার দৈহিক সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

প্রসূতি মৃত্যুর মতই আমাদের দেশে শিশু-মৃত্যুর হারও খুব বেশী ছিল। ইহার কারণ অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে দুই সন্তানের জন্মসময়ের ব্যবধান এবং শিশু-মৃত্যুর হারের মধ্যে বেশ একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জন্মসময়ের ব্যবধান যত কম হইবে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা তত বেশী হইবে। দুই সন্তানের জন্মের মধ্যে অন্ততঃ তিন বৎসরের

ব্যবধান থাকা প্রয়োজন। শিশু এবং প্রসূতি মৃত্যুর হার হ্রাস করা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য।

কোন কোন রোগ আবার, যেমন—যক্ষ্মা, সিফিলিস ও গণোরিয়া প্রভৃতি বাপ মা হইতে সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হয়। নরনারীর এই জাতীয় রোগ থাকিলে তাহাদের সন্তান না হওয়াই বাঞ্ছনীয় কারণ এই সকল রুগ্ন সন্তান পরিবারের অশান্তির কারণ হয়, সমগ্র সমাজের নিরাপত্তা নষ্ট করে এবং জাতির স্বাস্থ্য দুর্বল করিয়া ফেলে। সুতরাং রুগ্ন শিশুর জন্মদান বন্ধ করিয়া পরোক্ষে জাতির স্বাস্থ্যের মান স্থির রাখা পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণের আরেকটি উদ্দেশ্য।

খাদ্যকে দেহের কাজে লাগান: পাচনতন্ত্র, পরিপাক ও মেটাবলিজম

(Utilization of food by the body : digestion, absorption and metabolism)

পাচনতন্ত্র ও পরিপাক ক্রিয়া (Digestive system and digestion): বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে খুব সামান্য কয়েকটি দ্রব্যই (যেমন গ্লুকোজ, ধাতব লবণ ইত্যাদি) দেহ সরাসরি গ্রহণ করিয়া আপন কাজে লাগাইতে পারে। অবশিষ্ট অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যই যতক্ষণ না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয় ততক্ষণ শরীরের কোন কাজে লাগে না। ভাতের প্রধান অংশ শ্বেতসার। কিন্তু এই শ্বেতসার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যতক্ষণ না গ্লুকোজে পরিণত হইতেছে ততক্ষণ শরীরের কোন উপকারে আসিবে না। শ্বেতসার গ্লুকোজে পরিণত হইলেই দেহ ঐ গ্লুকোজ শোষণ করিয়া উহা হইতে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে। এইরূপে খাদ্যের প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিডে এবং স্নেহ-পদার্থ ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারিনে পরিণত হইলেই ঐ সকল উপাদান দেহের উপকারে আসিবে।

পরিবার পরিকল্পনার একটি আর্থিক এবং একটি সামাজিক দিকও আছে। প্রত্যেক পরিবারের আয় ও রোজগারের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। ঐ সীমিত আয়ের মধ্যে প্রত্যেকটি সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষায় গড়িয়া তুলিয়া জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সন্তানের সংখ্যা বাঁধিয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। পরিবারগুলি লইয়াই আবার একটি জাতি তথা রাষ্ট্র গঠিত হয়। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে দেশের অগ্রগতিও ব্যাহত হয়। বিপুল জনসংখ্যাই ভারতের মত শস্যশালিনী দেশের পক্ষেও বিরাট বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিবার পরিকল্পনার সামাজিক দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। সন্তান সংখ্যা বেশী হইলে মা বাবার পক্ষে প্রত্যেকটি শিশুর সমান যত্ন লওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের ব্যাপার লইয়া পরিবারে খিটিমিটি ও কলহ লাগিয়াই থাকে। অনাদৃত, অবহেলিত দারিদ্র্যজর্জর শিশুরা গৃহের এই অস্বাস্থ্যকর মানসিক পরিবেশ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য স্বভাবতঃই বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তারপর নানা কুসঙ্গে পড়িয়া বিভিন্ন অপরাধ করে এবং এইভাবে পরিবার তথা সমগ্র দেশের সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। পরিবার পরিকল্পনার দ্বারা সমাজের কিশোর অপরাধীর সমস্যা বহুলাংশে দূর করা যায়।

খাদ্যের এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হওয়াকেই পাচন ক্রিয়া বা পরিপাক ক্রিয়া বলে। খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া দেহের যে অংশে সম্পন্ন হয় তাহাকে **পাচনতন্ত্র** (Digestive system) বলে। মুখ-গহ্বর (mouth) অন্ন-নালী (oesophagus), পাকস্থলী (stomach), ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine) এবং বৃহদন্ত্র (large intestine) লইয়া এই পাচনতন্ত্র সংগঠিত। খাদ্য-দ্রব্য পাচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হইয়া অবশেষে রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া দেহের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়।

মুখ-গহ্বরে পরিপাক ঃ আমাদের মুখে সর্বদাই লালা নিঃসৃত হইতেছে। এই লালা প্যারটিড (parotid), সাব-লিংগুয়াল (sublingual) এবং সাব-ম্যাক্‌সিলারী (sub-maxillary) নামক তিনটি বিভিন্ন গ্রন্থি হইতে আসে। ইহার বেশীর ভাগই জল। এই জল ছাড়াও অ্যামাইলেস বা টায়ালিন (amylase or ptyalin) নামক এক প্রকার জারক পদার্থ (enzyme), মিউসিন এবং কিছু ধাতব লবণ এই লালার মধ্যে পাওয়া যায়।

ইহা সাধারণতঃ মৃদু ক্ষারধর্মী। দৈনিক প্রায় 1000 সি. সি. হইতে 1500 সি. সি. লালা একজন ব্যক্তির মুখে নিঃসৃত হয়।

লালা আমাদের খাদ্য-দ্রব্যকে সিক্ত ও নরম করে। ইহার মিউসিন ভুক্ত দ্রব্যকে পিচ্ছিল করিয়া অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে পেঁছাইতে সাহায্য করে। অ্যামাইলেস বা টায়ালিন খাদ্যের শ্বেতসার জাতীয় পদার্থকে ভাঙিয়া মলটোজ-এ (maltose) পরিণত করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া মুখ-গহ্বরেই প্রথম শুরু হয়। শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ যাহাতে উত্তমরূপে টায়ালিনের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে সেইজন্য খাদ্য-দ্রব্য ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া চর্বণ করা প্রয়োজন। অতি অল্প সময় খাদ্য-দ্রব্য মুখ-গহ্বরে থাকে বলিয়া সামান্য পরিমাণ শ্বেতসার মলটোজে পরিণত হয়। কাঁচা শ্বেতসার (uncooked) জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের মুখে কোন পরিবর্তন হয় না।

পাকস্থলীতে পরিপাক ঃ মুখ-গহ্বর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত খাদ্যদ্রব্যসমূহ লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া আমাশয় বা পাকস্থলীর মধ্যে পেঁছে। অন্ন-নালী মুখ-গহ্বর হইতে শ্বাসনালীর পিছন দিক দিয়া বরাবর নিচে নামিয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই অন্ন-নালীর মুখ বন্ধ থাকে। শুধু ভুক্ত-দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার সময়ই উহা খুলিয়া যায়। দৈর্ঘ্যে উহা প্রায় পাঁচ ইঞ্চি। অন্ন-নালীর শেষ প্রান্ত হইতে পাকস্থলী আরম্ভ হইয়াছে এবং এই সংযোগস্থলকে আগমদ্বার (cardiac end) বলে। পাকস্থলীর শেষপ্রান্ত নির্গমদ্বার (pylorus end) দ্বারা ডিওডেনামের (deodenum) সহিত যুক্ত। ইহা প্রায় 12 ইঞ্চি লম্বা এবং 5 ইঞ্চি চওড়া। পাকস্থলীর ভিতরের প্রাচীর এক প্রকার শ্লৈষ্মিক পদার্থের আবরণে ঢাকা থাকে। এই আবরণের গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। ছিদ্রগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলের মুখ। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলগুলি এক একটি গ্রন্থির সহিত সংযুক্ত থাকে। এই সকল গ্রন্থি হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয় যাহাকে আমাশয় রস (gastric juice) বলে।

পাকস্থলীর একেবারে উপরের অংশকে ফাণ্ডাস (fundus) বলে। খাদ্যদ্রব্য মুখ-গহ্বর হইতে আসিয়া এই ফাণ্ডাসে প্রায় ½—2 ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করে। এই সময় লালার টায়ালিন বা অ্যামাইলেস খাদ্যের শ্বেতসার জাতীয় উপাদানের আরও কিছু অংশ মলটোজে পরিণত করিবার সুযোগ পায়। ধীরে ধীরে খাদ্যদ্রব্য ফাণ্ডাস হইতে পাকস্থলীর অপর প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আমাশয় রসের সহিত (gastric juice) মিশ্রিত হইতে থাকে। আমাশয় রস প্রধানতঃ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, প্রো-রেনিন (pro-renin),
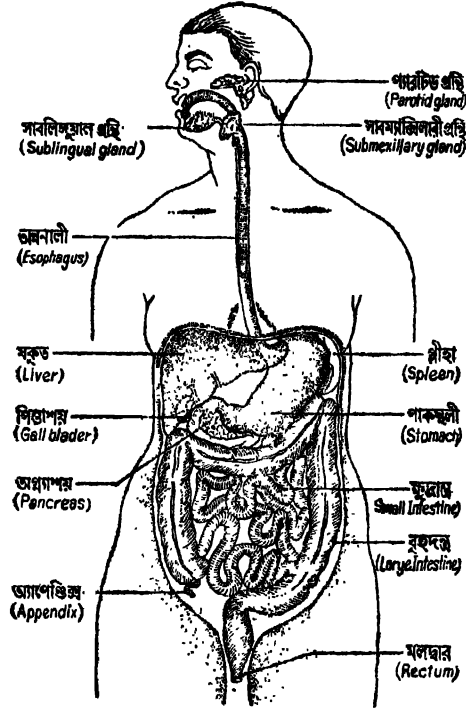
পাচনতন্ত্র

পেপসিনোজেন (pepsinogen) এবং লাইপেস (lipase) দ্বারা গঠিত: হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রো-রেনিন এবং পেপসিনোজেন হইতে যথাক্রমে রেনিন ও পেপসিন উৎপন্ন করে। রেনিন, পেপসিন এবং লাইপেস—এই তিনটি আমাশয় রসের জারক পদার্থ (enzyme)। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জন্য আমাশয় রসটি তীব্র আম্লিক (acidic)। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (১) খাদ্যের প্রোটিন ..রম করিয়া পরিপাকে সহায়তা করে। (২) ইহার সাহায্যে প্রো-রেনিন এবং পেপসিনোজেন হইতে যথাক্রমে রেনিন এবং পেপসিন উৎপন্ন হয়। (৩) খাদ্যের ইক্ষু শর্করা (cane sugar) এই অ্যাসিডের

সাহায্যে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজে (fructose) পরিণত হয়। (৪) খাদ্য-দ্রব্যের সহিত কোন দূষিত জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে ইহা ঐ জীবাণু তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিয়া
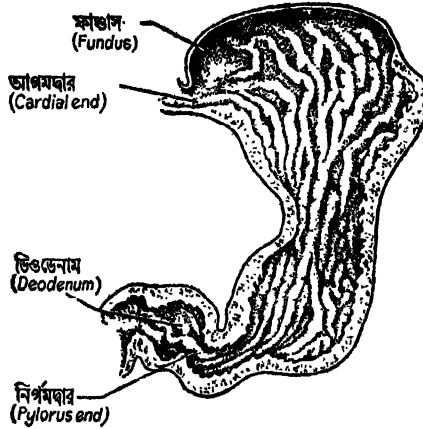
পাকস্থলীর লম্বালম্বি কাটা অংশ

ফেলে। ইহা ছাড়া (৫) নির্গমদ্বার (pylorus end) খুলিতে এবং (৬) খাদ্যের লৌহ জাতীয় পদার্থ শোষণেও এই অ্যাসিড সহায়তা করিয়া থাকে।

পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য কতক্ষণ অবস্থান করিবে তাহা উহার পরিমাণ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তরল খাদ্যদ্রব্য 15 মিনিট হইতে আধঘণ্টার বেশী অবস্থান করে না। এইজন্যই তরল খাদ্য-দ্রব্যে আমাদের তাড়াতাড়ি ক্ষুধার উদ্রেক হয়। স্নেহজাতীয় খাদ্য-দ্রব্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সময় পাকস্থলীতে অবস্থান করে। সাধারণতঃ 4 হইতে 5 ঘণ্টা কাল খাদ্য-দ্রব্য পাকস্থলীতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে পেপসিন খাদ্যের প্রোটিন হইতে প্রোটিয়োসঃ (proteoses) এবং পেপটোন (peptone) উৎপন্ন করে। রেনিন দ্বারা দুধ ছানায় পরিণত হয়। লাইপেস ডিম এবং ক্রীমের স্নেহ-পদার্থের সামান্য কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড (fatty acid) এবং গ্লিসারিনে পরিণত করে। অধিকাংশ স্নেহপদার্থেরই পাকস্থলীতে কোন পরিবর্তন হয় না। এইভাবে বিভিন্ন জারক রসের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়া সর্বশেষে একটি পাতলা মণ্ডের (chyme) আকার ধারণ করে। এই মণ্ড ধীরে ধীরে পাকস্থলীর পেশীর সংকোচন এবং বিস্তারের ফলে নির্গমদ্বার দিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে (small intestine) প্রবেশ করে।

ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক ঃ খাদ্যের সর্বাপেক্ষা বেশী পরিবর্তন হয় এই ক্ষুদ্রান্ত্রে। প্রায় 5 ঘণ্টাকাল খাদ্য-দ্রব্য এই ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থান করে। কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক অবস্থায় মোট পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে প্রায় 9 ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়।

পাকস্থলীর পিছনের দিকে প্রায় 6 ইঞ্চি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি অগ্ন্যাশয় (pancreas) আছে। ইহা একটি ক্ষুদ্র নলের দ্বারা ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত যুক্ত। খাদ্য-দ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রে

প্রবেশ করিলে এই অগ্ন্যাশয় হইতে এক প্রকার ক্লোম রস (pancreatic juice) বাহির হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। এই ক্লোম রসে অ্যামাইলোপসিন (amylopsin), স্টিয়াপসিন (steapsin), ট্রিপসিন (trypsin) এবং কাইমো-ট্রিপসিন (chymotrypsin) নামক প্রধান প্রধান চারটি জারক পদার্থ থাকে। ট্রিপসিন এবং কাইমোট্রিপসিন প্রথমে ট্রিপসিনোজেন এবং কাইমোট্রিপসিনোজেন আকারেই অগ্ন্যাশয় হইতে নির্গত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক আবরণ হইতে এন্টারোকাইনেস (enterokinase) নামক এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহা ট্রিপসিনোজেন হইতে ট্রিপসিন উৎপন্ন করে। এই ট্রিপসিন আবার কাইমোট্রিপসিনোজেন হইতে কাইমোট্রিপসিন প্রস্তুত করে। এই ক্লোম রস ক্ষারধর্মী (basic)। উহা খাদ্য-দ্রব্যের আম্লিক (acidic) ভাব প্রশমিত করিয়া মৃদু ক্ষারত্ব প্রদান করে।

অ্যামাইলোপসিন খাদ্যের অবশিষ্ট শ্বেতসার মলটোজে (maltose) পরিণত করে। ইহা কাঁচা (uncooked) শ্বেতসার হইতেও মলটোজ উৎপন্ন করিতে পারে। স্টিয়াপসিন স্নেহপদার্থ হইতে গ্লিসারিন এবং ফ্যাটি অ্যাসিড (fatty acid) উৎপন্ন করে। যে সকল প্রোটিনের পাকস্থলীতে কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই তাহা এইখানে ট্রিপসিন এবং কাইমোট্রিপসিন দ্বারা প্রধানতঃ প্রোটিয়োস্ (proteoses) এবং পেপটোনে (peptone) পরিণত হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের কাজে যকৃৎ (liver) সহায়তা করে। যকৃৎ হইতে পিত্তরস (bile) উৎপন্ন হইয়া পিত্তাশয়ে (gall bladder) সঞ্চিত হয়। একটি ক্ষুদ্র নলের সাহায্যে এই পিত্তরস ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবাহিত হয়। ইহা স্নেহপদার্থ পরিপাকে সহায়তা করে।

ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক আবরণ হইতে একপ্রকার রস নির্গত হয়। এই রসকে সাক্কাস এন্টেরিকাস (succus entericus) বলে। এই রসে ইরেপ্সিন (erepsin), সুক্রেস (sucrase), মল্টেস্ (maltase) এবং ল্যাক্টেস্ (lactase) নামক চারিটি জারক পদার্থ থাকে। ইহা ছাড়া এন্টারোকাইনেস্ (enterokinase) নামক আরও একটি পদার্থ এই রসে দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙুলের ন্যায় একপ্রকার অভিক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়

ইরেপ্সিন প্রোটিয়োস্ (proteose) এবং পেপটোন (peptone) ভাঙিয়া অ্যামিনো অ্যাসিড (amino acids) প্রস্তুত করে। সুক্রেস্ খাদ্যের ইক্ষু শর্করা (cane sugar) হইতে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ (fructose) উৎপন্ন করে। মল্টেস্ এবং ল্যাক্টেস্ যথাক্রমে মল্টোজ (maltose) এবং দুগ্ধ শর্করা (lactose) ভাঙিয়া প্রথমটি গ্লুকোজ এবং শেষেরটি গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজ (galactose) প্রস্তুত করে।

এইরূপে ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য-দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

পরিপাক প্রাপ্ত হইবার পর খাদ্যদ্রব্যসমূহ রক্তের মধ্যে শোষিত হয়। এই শোষিত হইবার কাজটুকু প্রায় সম্পূর্ণরূপেই এই ক্ষুদ্রান্ত্রে হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙুলের ন্যায় একপ্রকার অভিক্ষেপ (projections) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অভিক্ষেপকে ভিলাই (villi) বলে। ভিলাইয়ের মধ্যে অসংখ্য কৈশিক রক্তবহানলী (capillary blood vessels) আছে। ইহাদের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়।

বৃহদন্ত্রের কাজঃ ক্ষুদান্ত্র হইতে ভুক্তদ্রব্যের অবশিষ্টাংশ বৃহদন্ত্রে পরিচালিত হয়। বৃহদন্ত্র হইতে প্রধানতঃ খাদ্যের জলীয় অংশটুকু দেহে শোষিত হইয়া বাকী অংশ মলে পরিণত হয়। এই মল প্রতি 24 ঘণ্টা অন্তর দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া কর্তব্য। শাক-সব্জি ও তরিতরকারির দুষ্পাচ্য সেলুলোজ পেশীর সংকোচনের সৃষ্টি করিয়া বৃহদন্ত্র হইতে এই মল নিষ্কাশিত করিতে সহায়তা করে। **এইজন্যই খাদ্য-দ্রব্যে প্রচুর সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ থাকা উচিত।**

প্রোটিনের পরিপাক

খাদ্যের প্রোটিন সরাসরিভাবে আমাদের দেহ গ্রহণ করিতে পারে না। এই প্রোটিন ভাঙিয়া যখন অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয় তখনই উহা শরীরের কাজে লাগে। **পাচনতন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যের প্রোটিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ্যামিনো অ্যাসিডে বিভক্ত হওয়াকেই প্রোটিন পরিপাক ক্রিয়া** (Protein digestion) **বলে।**

প্রোটিন পরিপাক ক্রিয়া প্রথমে পাকস্থলীতেই শুরু হয়। পাকস্থলীর গাত্র হইতে নিঃসৃত **আমাশয় রসে** (gastric juice) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং পেপসিনোজেন থাকে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পেপসিনোজেন হইতে পেপ্সিন উৎপন্ন করে। তাছাড়া এই অ্যাসিডের সংস্পর্শে প্রোটিন কিছুটা নরম হয়। এই নরম প্রোটিন **পেপসিন** এন্‌জাইমের সহায়তায় **প্রোটিয়োস** (Proteoscs) এবং **পেপটোনে** (Peptone) পরিণত হয়। সাধারণত 4 হইতে 5 ঘণ্টাকাল খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে থাকে। ইহার পর খাদ্যদ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র একটি সরু নলের দ্বারা অগ্ন্যাশয়ের (pancreas) সহিত যুক্ত। অগ্ন্যাশয় হইতে **ক্লোম রস** (pancreatic juice) ঐ সরু নলের সাহায্যে ক্ষুদ্রান্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়; ক্লোম রসটি ক্ষার জাতীয়, সুতরাং, ইহা পাকস্থলী হইতে আগত খাদ্য-দ্রব্যের আম্লিক (acidic) ভাব দূর করিয়া মৃদু ক্ষারত্ব প্রদান করে। ক্লোম রসের ট্রিপসিনোজেন ও কাইমোট্রিপসিনোজেন ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক আবরণ হইতে নিঃসৃত এন্‌টারোকাইনেসের (enterokinase) সহায়তায় যথাক্রমে ট্রিপসিন (trypsin) ও কাইমোট্রিপসিনে (chymo-trypsin) পরিণত হয়। যে সকল প্রোটিনের পাকস্থলীতে কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই, সেই সকল প্রোটিন এখানে **ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন** এই দুইটি এন্‌জাইমের সাহায্যে **প্রোটিয়োস ও পেপটোনে** রূপান্তরিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্র হইতে **সাক্কাস এন্‌টেরিকাস** (succus entericus) নামক একটি রস নিঃসৃত হয়। এই রসে **ইরেপসিন** (erepsine) নামক

একটি এনজাইম থাকে। এই **এনজাইম** উৎপন্ন প্রোটিয়োস ও পেপটোন ভাঙিয়া **অ্যামিনো অ্যাসিড** (amino-acid) উৎপন্ন করে। এইরূপে প্রোটিনের পরিপাক ক্রিয়া পাকস্থলীতে আরম্ভ হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে সম্পূর্ণ হয়।

পরিপাক ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ঐ ক্ষুদ্রান্ত্রেই শোষণ ক্রিয়া (absorptions) আরম্ভ হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙুলের ন্যায় অভিক্ষেপ (projections) দেখা যায়। এই সকল অভিক্ষেপসমূহকে **ভিলাই** (villi) বলে। (১২৯ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ।) ভিলাইয়ের মধ্যে অসংখ্য কৈশিক রক্ত বহানলী (capillary blood vessels) আছে। ইহাদের সাহায্যেই পরিপাকপ্রাপ্ত অ্যামিনো-অ্যাসিডসমূহ শোষিত হইয়া রক্তের মধ্যে পরিচালিত হয়। এই রক্ত হইতে অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহ পরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রোটিন পরিপাকে যে সকল এন্‌জাইম অংশ গ্রহণ করে তাহাদের নাম, উৎপত্তি ও কাজ নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হইল ঃ

এন্‌জাইম	উৎপত্তিস্থল	যাহার উপর ক্রিয়া করে	খাদ্যের পরিণতি
(১) পেপসিন	পাকস্থলী	প্রোটিন	প্রোটিয়োস ও পেপটোন
(২) ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	প্রোটিন	প্রোটিয়োস ও পেপটোন
(৩) কাইমো-ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	প্রোটিন	প্রোটিয়োস ও পেপটোন
(৪) ইরেপসিন	ক্ষুদ্রান্ত্র	প্রোটিয়োস ও পেপটোন	অ্যামিনো অ্যাসিড

পরিপাকের সহায়ক এনজাইমসমূহ
(Digestive Enzymes)

খাদ্যের পরিপাক করিতে যে সকল জারকরস (enzyme) অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাদের নাম, উৎপত্তি ও কাজ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

জারক পদার্থ (Enzyme)	যে গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হয় (Secreted by)	যাহার উপর ক্রিয়া করে (Substance acted upon)	খাদ্যের পরিণতি (Products of Enzyme activity)
টায়ালিন বা অ্যামাইলেস	লালাগ্রন্থি	পরিপক্ব (cooked) শ্বেতসার	মলটোজ
রেনিন	পাকস্থলীর গ্রন্থি	দুধের প্রোটিন	ছানা প্রস্তুতি
পেপসিন	„ „	প্রোটিন	প্রোটিয়োস এবং পেপটোন
লাইপেস	„ „	স্নেহ	গ্লিসারিন এবং ফ্যাটি অ্যাসিড
ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	প্রোটিন	প্রোটিয়োস এবং পেপটোন
কাইমো-ট্রিপসিন	„ „	প্রোটিন	প্রোটিয়োস এবং পেপটোন
অ্যামাইলোপসিন	„ „	শ্বেতসার	মলটোজ
স্টিয়াপসিন	„ „	স্নেহ	গ্লিসারিন এবং ফ্যাটি অ্যাসিড
এনটারোকাইনেস	ক্ষুদ্রান্ত্রের-শ্লৈষ্মিক আবরণ	ট্রিপসিনোজেন	ট্রিপসিন
ইরেপসিন	„ „	প্রোটিয়োস এবং পেপটোন	অ্যামিনো অ্যাসিড
সুক্রেস	„ „	ইক্ষু শর্করা	গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ
মলটেস	„ „	মলটোজ	গ্লুকোজ
ল্যাক্টেস	„ „	দুগ্ধ-শর্করা	গ্লুকোজ এবং গ্যালাক্টোজ

A. প্রথম অধ্যায়

১। গৃহপরিচালনা কাহাকে বলে? গৃহপরিচালনায় গৃহপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কি?

২। গৃহপরিচালনায় গৃহপরিকল্পনা, নির্দেশনা ও সমীক্ষা কিভাবে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। গৃহপরিচালনা বলিতে কি বুঝ? সুষ্ঠুভাবে গৃহপরিচালনার জন্য গৃহকর্ত্রীর কি কি গুণ থাকা উচিত?

৪। মনুষ্যসম্পদ কাহাকে বলে? গৃহপরিচালনায় মনুষ্যসম্পদের ভূমিকা নির্দেশ কর।

B. দ্বিতীয় অধ্যায়

১। গৃহকর্ত্রীর ব্যক্তিত্ব এবং আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত? গৃহকর্ত্রীর প্রয়োজনীয় গুণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। একটি পরিবারে গৃহণীর বিভিন্ন ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। এই সমস্ত ভূমিকার মধ্যে কোন্ ভূমিকাটি তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয়? কেন মনে হয় কারণ দর্শাও।

৩। সম্পদের শ্রেণীবিভাগ কর। গৃহপরিচালনায় এইসব সম্পদ কিভাবে কাজে লাগান হয়?

৪। 'মনুষ্যসম্পদ এবং পার্থিব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা গৃহপরিচালনা সার্থক করিয়া তোলা যায়'—এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ কর।

৫। অর্থব্যয় সম্বন্ধে কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইতে পারে? ইহাদের মধ্যে কোন্ পদ্ধতিটি তোমার শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়? কেন মনে হয় কারণ দর্শাও।

C. তৃতীয় অধ্যায়

১। পারিবারিক বাজেট কাহাকে বলে? ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। (ক) কোন্ কোন্ বিষয়ের দ্বারা বাজেট প্রভাবিত হয়?

(খ) কিভাবে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের একটি বাজেট আরেকটি হইতে পৃথক্ করা যায়?

৩। পারিবারিক বাজেট তৈরী করিবার মূলনীতিগুলি কি? দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের মাসিক বাজেটের আনুমানিক হিসাবের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

৪। সাংসারিক বাজেট রচনার মূলনীতিগুলি কি? এইরূপ বাজেট তৈয়ারী করিতে কি কি বিষয় মনে রাখা দরকার?

৫। গৃহের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ।

৬। বাজেট বলিতে কি বুঝায়? তোমার ব্যক্তিগত খরচের হিসাব কিভাবে রাখিবে বর্ণনা কর।

৭। পারিবারিক হিসাব কাহাকে বলে? এইরূপ হিসাব রাখার সুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৮। ঋণ কাহাকে বলে? কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে মানুষ ঋণ করে?

৯। ঋণের অপকারিতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

১০। অর্থসঞ্চয়ের বিভিন্ন উপায় ও তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে লিখ। মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে কোন্ পদ্ধতি উপযুক্ত মনে কর?

১১। ব্যাঙ্কের চলতি হিসাব ও সেভিংস হিসাবের মধ্যে পার্থক্য কি? উহাদের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা কর।

১২। চেক কাহাকে বলে? উহার সুবিধা কি?

১৩। চেক কি? উহা কত প্রকারের? উহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

১৪। জীবনবীমা প্রধানতঃ কয় প্রকারের। উহার বিবরণ দাও।

১৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—

(ক) সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা; (খ) জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনা; (গ) স্থায়ী আমানত; (ঘ) ক্রসড চেক; (ঙ) কোম্পানীর শেয়ার; (চ) ব্যাঙ্ক ও তাহার কার্যাবলী।

D. চতুর্থ অধ্যায়

১। তন্তু চিনিবার জন্য কিরূপ পরীক্ষার সাহায্য লইবে? পরীক্ষাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। রেশম তন্তু সম্বন্ধে কি জান? পশম তন্তুর সহিত উহার পার্থক্য কিভাবে নির্ণয় করা যায়?

৩। খাঁটি রেশম ও কৃত্রিম রেশমের পার্থক্য কিভাবে নির্ণয় করা যায়?

৪। সূতি, লিনেন, রেশম ও পশম তন্তুর একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।

৫। পোশাক পরিকল্পনা কাহাকে বলে? গৃহিণীর পোশাক পরিকল্পনাসংক্রান্ত দায়িত্বগুলি বর্ণনা কর।

৬। শুষ্ক ধোলাইয়ের জন্য কোন্ কোন্ জিনিসের প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। ধৌত প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭। দাগ কয় প্রকার ও কি কি? সব রকম দাগের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৮। কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার জন্য কোন্ কোন্ দ্রব্য ব্যবহার করিবে? বস্ত্রাদি হইতে দাগ উঠাইবার সময় কোন্ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন?

৯। প্রাণিজ দাগ বলিতে কি বুঝ ? কম্বল হইতে রক্তের দাগ কিভাবে উঠাইবে ?

১০। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—

(ক) লোহার দাগ বা মরিচা উঠাইবার প্রণালী।
(খ) চায়ের দাগ উঠাইবার প্রণালী।
(গ) কালির দাগ উঠাইবার প্রণালী।
(ঘ) ঘাসের দাগ উঠাইবার প্রণালী।
(ঙ) রক্তের দাগ উঠাইবার প্রণালী।

E. পঞ্চম অধ্যায়

১। শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্য কি কি ?

২। নিজের প্রতি শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্য কি ?

৩। শয়ান অবস্থায় কিভাবে একটি রোগীর শয্যা পরিবর্তন করিবে। রোগীর শয্যার জন্য কি কি সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৪। একটি আদর্শ রোগি-কক্ষের অবস্থান ও উহার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। গর্ভবতী জননীর চিকিৎসাগত যত্নের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার ?

৬। একটি শিশু উপযুক্ত চিকিৎসাগত যত্ন পাইতেছে কিনা কিভাবে বুঝিবে ? শিশুর চিকিৎসাগত যত্নের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার ?

৭। শিশুদের দাঁত কিভাবে নষ্ট হয় ? কিভাবে শিশুর দাঁতের যত্ন লইবে ?

৮। অনাক্রম্যতা শক্তি কিভাবে অর্জন করা যায় ? শিশুর দেহে অনাক্রম্যতা শক্তি সঞ্চারের জন্য কি কি ধরনের টিকা লওয়া উচিত ?

৯। বৃদ্ধ ব্যক্তির যত্ন লইবার সময় কোন্ কোন্ বিষয় খেয়াল রাখিবে ?

১০। অস্থিভঙ্গ কয়প্রকার ও কি কি ? অস্থিভঙ্গের কিরূপ প্রতিবিধান দিবে ?

১১। গুপ্ত রক্তক্ষরণের লক্ষণ কি ? গুপ্ত রক্তক্ষরণ হইলে কি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবে ?

১২। নাক দিয়া রক্তক্ষরণ হইলে কি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবে ?

১৩। চোখে, কানে এবং নাকের ভিতর কোন বিজাতীয় বস্তু প্রবেশ করিলে কি প্রতিবিধান দিবে ?

১৪। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কিরূপ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবে ঃ—

(ক) পাঁচ বছরের একটি বালিকা পয়সা গিলিয়া ফেলিয়াছে।
(খ) পাগলা কুকুরে দংশন করিয়াছে।
(গ) হাতে শুঁয়োপোকা লাগিয়াছে।
(ঘ) রাস্তায় এক ব্যক্তি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

•F. ষষ্ঠ অধ্যায়

১। সারা বছর ধরিয়া একটি শিশুকে সুস্থ রাখার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ?

২। একটি শিশুর মানসিক ও দৈহিক পরিপুষ্টির মূল প্রয়োজনগুলি বর্ণনা কর।

৩। মানুষের জীবনের প্রধান স্তরগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। কৈশোরে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যেসব প্রধান প্রধান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সেগুলির উল্লেখ কর।

৫। কৈশোরকালে বালিকাকে পরিচালিত করিতে গিয়া জনকজননী এবং অভিভাবকের কি কি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত ?

৬। অপরাধপ্রবণতা কাহাকে বলে ? কৈশোরে কি কি ধরনের অপরাধপ্রবণতা দেখা যায় ? উহার প্রতিকার কি ?

৭। মানসিক স্বাস্থ্য বলিতে কি বুঝ ? দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে কোন্‌টি তোমার অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয় ? কেন মনে হয় কারণ দর্শাও।

৮। একটি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

G. সপ্তম অধ্যায়

১। বিবাহের প্রস্তুতি কাহাকে বলে ? এইরূপ প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা কি ? বিবাহের প্রস্তুতির জন্য একটি বালিকার কি কি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ?

২। জনিতাদের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

৩। "পারিবারিক জীবনে সকলের মধ্যে সদ্ভাব না থাকিলে শিশুরা বিপর্যস্ত হয় সবচেয়ে বেশী"—এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৪। পরিবার পরিকল্পনা কাহাকে বলে ? ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার সম্বন্ধ কি ? এই বিষয়ে আলোচনা কর।